আমি শ্রীকবিকঙ্কণ

আমি শ্রীকবিকঙ্কণ

বুক ট্রাস্ট
৩০/১ বি, কলেজ্ রো
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ / মার্চ ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ / সুনীল শীল

প্রকাশক বরুণ গঙ্গোপাধ্যায় বুক ট্রাস্ট ৩০/১ বি কলেজ রো কলকাতা ৭০০০০৯ মুদ্রক যশোদা মাইতি ৫২/১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৯

আমি শ্রীকবিকঙ্কণ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত

শ্রী শ্রী দূর্গা ॥ ৪ ॥

নম গনেশায় নমঃ ॥

অথ শ্রীশ্রী দূর্গার পঞ্চশতো নাম নির্স্কতে

তং পরমা প্রকিতি অগতির গতি।
পঞ্চম পাতকি ডাকে ষৃণ গো পার্ব্বতি॥
তং নমামী সৈল তং গাইত্রি রূপীনি।
আগম নিগম তং ব্রহ্মাণ্ড প্রষবিনি॥
প্রপণ্য প্রশন্যা ভবে তং গতি ত্রিপূরা
ভবে ওঁ তৎ পদাশ্রয়ে দুঃক্ষুহরা॥
দয়ামই দার্ক্ষ্যানি দিগাম্বর দারা।
রক্ষিনি রঙ্গিনি রঙ্গনাম রক্তধারা॥
শঙ্করি সাকম্বরি শষান বাসিনি।
ষরেশ্বরি ষসার মই প্রষতি নন্দীনি॥
সনাতনি সিবেরূপী সম্ভুর গেঁহিনি॥
সমন ভয়েতে আছে শষংকিতো প্রানি॥
সঙ্খিনি ষলিনি সিবে শহষা সঙ্করি।
সর্ব্বানি সর্ব্ব শক্তি ষর্গ্গ শাকম্বরি॥
শষি সিরমুনি সেল সিখর বাসিনি।
শর্ন্যলতা শান্তি ষত্তি উরোগো আপনি॥
সগুন ধারিণি সিবে শড়াঙ্ক রূপীনি।
শতি শাধ্যা শনাতণি শংসার তারিনি॥
সর্ব্ব জিবে দয়া তোমার সর্ব্বমঙ্গলা।
সেবক তারিতে আইশ সেবক বৎস্বলা॥
দয়া করো ধুর্জ্জটীনি পষুপতির প্রান।

১. পষুপতির প্রাণ পরপৃষ্ঠা হইতে আগত।

২. ৩৪ সে.মি দীর্ঘ ১২$\frac{১}{৪}$×২ দোভাঁজ পাতায় লিখিত, হরফ $\frac{১}{২}$ সে.মি

৩. তুলোট কাগজ, কালো কালি (ভূষো) স্পষ্ট হরফ কাটাকুটি নেই

৪. ২য় ভাজে অর্থাৎ এ পাতাব বামে ১ লেখা আছে ডাইনে

৫. মধ্যবর্তী ভাজের ভিতরে কোনো লেখা নেই। মাথার দিক পাতার উপর জোড়া

৬. তিন স্তবকে ৯ ছত্র লেখা আছে।

হরো প্রিয়ে হৈমবতি করো পরিত্রাণ ॥
হরি হর হিরণ্যে গর্ব্বের তুমি মুল।
হরি লি নন্দের ভিতি রাখিতে গকুল ॥
হরজায়া হৈমবতি হেমন্ত নন্দীনি।
হয়ো অন্বঙ্গত দূর্গে হরের গেঁহিনি ॥
হরা আঙ্গ নিবাসিনি হর অঙ্গনা।
হরো পাপ হর তাপ হর জন্ত্রনা ॥
ত্রি-তাপে তাপী তো-তারা এ তাপীতো প্রান।

কাতর কিঙ্করে কালি করো পরিত্রান ॥
ক্ষেমির হরিলি ভার দির্ত্তে করি ক্ষিন।
ক্ষেনেক থাকিয়ে রাখ আমি দাষ ক্ষিন ॥
ক্ষেমা করো ক্ষেমঙ্করি ক্ষেম মহেশ্বরি।
ক্ষেমিয়ে সকল দোষ রর্ক্ষ ক্ষেমঙ্করি ॥
নম নির্ত্তনারায়ণি নিমুণ্ড মালিনি।
নিসম্ভূ নাসিনি জয়া নিল পতাকিনি ॥
নন্দ গোপ ষুতা হয়ে রাখিলি গকুল॥

অন্তিম কালেতে দূর্গে হয়ো অনুকুল ॥
র্ন্যি র্গুনা সৎ র্গুনাবতি নিদান বশতি।
ন্রপতি নির্ণ্যয় ভয় ভাঙ্গি ভগোবতি ॥
ন্রপর্তির্নি।। পষুপতি প্রজাপর্তি তুমি পুরূশ আদান।
স্পর্শমনি পাদ পদ্দে তোমারূপ পুঞ্জে অবিরাম ॥
প্রতিদিন পূজে তোমার প্রকৃতি রূপীনি।
পষুতুষ্ট পামোর আমি কিবা পূজো জানি ॥

১. একই আকার কাগজে লেখা ৯ছত্র।
২. ২০ ছত্রে নৃপতিনি উপবে রেফ চিহ্ন / অর্থে ওটি কাটা বা বাদ।
৩. যতিচিহ্ন ব্যাপারে আধুনিক বা প্রথম পদে একটি ও দ্বিতীয় পদে।। ব্যবহৃত;

শ্রীশ্রী দুর্গানাম ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

প্রানবৎস্বলা দেবি পরম মঙ্গলা।
পাদ পঁদে স্থল দেয়ো মা সেবক বৎস্বলা ॥[১]
তমো হন্তি দমোঅন্তি তমেকা তারা।
হরো রমে বর্গ ভিমে মহেশ দারা ॥
ত্রির্গুনা ত্রিবিধা জয়া ত্রৈলর্ক্ষতারিনি।
তরঙ্গ তারিনি তুমি ত্রিশক্তি রূপীনি ॥
তুরিতে তারিয়ে তোল তাপীতো তনয়।
ত্রান হেতু তোমা বৈ অন্যা কেহো নয় ॥

মৃগাঙ্ক মকুট মুনি মস্তক মালিনি।
মহিশ মদ্যানি মধু কৈটব নাসিনি ॥
মহেশের অর্গ্গতনু মরাল গমনা।
মধু বনে কৈলি মধু বংসের স্থাপনা ॥
মুক্ত কেসি মৃদু হাসি মা ভৈ মাতঙ্গিনি।
মুক্ত করগো মো অধমে তংমুক্তকারিনি ॥
মহালক্ষি মহাকালি তং মুণ্ডু মালিনি।
মহিশাষুরে বিনাসিনি মহিশ মদ্যানি ॥

বুদ্ধিরূপা নিদ্রেবতি সংসার কারিনি।
বন্দী সালে ত্রান করমা বলোদ বাহিনি ॥
বৈষ্ণবি বিমলা বরা বিন্দুবাসিনি।
বটপত্রে ভেযেছিলে বিষ্ণুর জননি ॥
বুদ্ধি রূপা বুদ্ধি হরা বন্দন হারিনি।
বষুদেব চরাচরি নন্দের নন্দিনি ॥
বি সঙ্কটে বসুদেবে করিলি উর্দ্ধার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলি কালিন্দীর পার ॥ ০ ॥
শ্রীশ্রী দুর্গা ৪ ॥ ০ ॥

১. পৃষ্ঠার বাম ২ ডাইনে ৵ চিহ্ন আছে।
২ ৯ ছত্র লেখা আছে।

শ্রীশ্রী দূর্গানাম ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

লোভ মতি অতি আমি লম্পট পাতকি।
লোভে লক্ষ ধন পায়ে লাভ কৈলাম কি ॥
কংকালি কলাবতি কমলিনি শতি।
কালো কামিনি কালি কেষ্ট সখি পার্ব্বতি ॥
কালি কপালিনি কান্তা কপোলকুণ্ডলা।
কালরাত্র কুঞ্জু আখি কতো জোন ছলা।
ভয়োঙ্করা ভয়োহারা ভৈরবি ভারথি।
ভয়োঙ্কারি ভয়োহারি ভিমে ভগোবতি ॥

ভদ্রকালি ভূদেবি মাড়ুৎ পতি ভারথি।
ভুপতি ভবণে ভয় ভাঙ্গ ভগোবতি ॥
জগতো জননি জয়া নিস্তার কারিনি।
জর্ন্ম জরা মির্ত্তু হরা জয় পতাকিনি ॥
জটাজুট বতি জয়া বুদ্ধি বিনাসিনি।
জিবের জিবন জনার্দ্যণ শহাইনি।
জর্ন্ম জুড়া জর্ন্ম জরা জর্ন্ম বিনাসিনি।
জশদা নন্দীনি জয়া জয়ন্তি জামিনি ॥

জমের জাতনা হিতে জঠোর জাতনা।
জষ পাই যদি পুরায়ো আমার কামনা ॥
জগৎ কত্রি জগৎ ধাত্রি ত্বং হি জোগমায়া।
জাহ্নবি জগতেশ্বরি জগীন্দ্র জায়া ॥
চণ্ডীকা চামুণ্ডা চণ্ডী প্রচণ্ড নাসিনি।
কালি কাত্যায়াণি দেবি কৈবল্ল্য দাইনি ॥
দুঃক্ষু বিনাসিনি দূর্গে দক্ষের নন্দীনি।
দণ্ডধর দণ্ডধরি দারিদ্র নাসিনি ॥

শ্রীশ্রী দূর্গানাম ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দিপ্তরূপী দিবাকরি দনুজ দলনি।
দশভুজা দিগাম্বরি দৈত্য বিনাসিনি ॥
দূর্গে ২ পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ দলনি দয়াবতি বেদমাতা ॥
দুর্য্যোয় দক্ষিনে কালি দুরিতো নাসিনি।
দুঃক্ষি দায়ে দয়া কর দুঃক্ষু বিনাসিনি ॥
দুর কর দূর্গে আমার অকাল মরণ।
দুস্তার শাগরে দূর্গে কর মা তারন ॥

শরন্যা শঙ্কটে রর্ক্ষ দর্ক্ষ নন্দীনি।
ভব নিরে ডোবে দূর্গা নামের তরনি ॥
অকাণ্ড ব্রর্হ্মাণ্ড দূর্গে ডাস্ত জয়ন্তি।
সর্ব্বজিবে আবির্ভাবে সর্ব্ব বিধাত্রি ॥
তং সর্ক্ষ তং মর্ক্ষ তং গতি ভবে ॥
তমেকা তারিনি তারা তং গতি সিবে।
তং জন্ত্র তং মন্ত্র তং পারাৎপরা।
তমে ত্রিগুনা দাইনি তন্ত্রিনি তং তারা ॥
তং রাজ রাজেশ্বরি সর্ব্বমঙ্গলা।
কাল ভয়ে নিবারিনি কেষ্ট সখি বগলা ॥

অপন্যা অপরা জিতে অম্বিকে অভয়া ॥
আদ্যাসক্তি অর্ন্যপুর্ন্যা দেহ পদো ছায়া ॥
যেধঙ্গিশ দির্ঘকেসি তং বষুন্ধরা।
ধরো ২ ধাতর্ব্য উষ্ণে রক্তধারা ॥
ধিশর্না ধবলা বতি ধান্য ধারিনি।
ধরনি ধারিনি ধাত্রি ধুর্ক্ষাক্ষ নাসিনি ॥
ধরেন্দ্র তনয়া তং হি ধরা ধা ধরা।
শ্র॰ গোধরা খর্পরা পাতঙ্গি মর্ন্দর্ন্দরা[৪] ॥

---

১. শেষ ছত্রের খর্পরা পাতঙ্গি মর্ন্দর্ন্দরা, পর পাতা হইতে মুদ্রিত

২. এ পাতার বামে ৩ ডাইনে ২⁄ আছে।

৩. ৯ ছত্রে সমাপ্ত ॥

৪. মর্ন্দরা শব্দের 'ন্দ' হয়ত দরা হবার নির্দেশ।

শ্রীশ্রী দূর্গানাম ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

হ্রি রূপা হ্রিঙ্কারা তারা শহং চণ্ডীকে।
হ্রির্ম্মই চির্ম্মই তং হ্রিম্বিজে হ্রিলেখা অম্বিকে ॥
নমার্দ্ধে হং দূর্গে তব অঙিস্ত্র জুগলং।
সর্ব্ব বাদি শাজু জাজি কৈবল্ল্যে স্থলং ॥
নমামি তবাঙ্ঘ্রি দন্দং নির্ব্বানাধারং।

তৎপদ কনাংসে দেহি কিঞ্চিতো স্থলং ॥
হে পূন্যে কুরূমে পুর্ন্য আসা সফলং।
দূর্গে ২ হংসিনি প্রনবাসিনি।
অম্বালিকে অম্বাম্বি কো অভিনন্দীনি ॥
প্রকৃতি পরূসা কারা নিরাকারা তং।
বিরিঞ্চি মাধব হর অঙিস্ত্র বাঞ্চিতং ॥
ত্রি পঞ্চরা ত্রি ধ্যান ধরা ত্রিশক্তা বন্দীনি।
বিতর মে কৃপা পালব ত্রিদষ ষনি ॥

জটাজুট বর্ম্ম অর্দ্ধ চন্দ্র সেখরে।
অতোসি কুশম বন্যাভাং অস্ত্র দষ করে ॥
ত্রিযুল খর্গ চক্রঞ্চ শক্তিঞ্চ বানং।
দক্ষিনাংসে পঞ্চভুজ অস্ত্র প্রমানং ॥
ক্ষেটকং পুন্য পাপঞ্চ পাশমং কুশং।
ঘণ্টাস্বা পরূশং বামে অস্ত্র বিশেষং ॥
দক্ষিণ চরণ সিংহে স্থাপন করি।
কিঞ্চিত দুর্দ্ধ বামাঙ্গুষ্ঠ-স্বর্ম্মহিশ পরি ॥
হর হৃদে ত্রিভঙ্গিনি বিস্তার বক্রাং।

১. বিস্তার বক্রাং পর পৃষ্ঠা হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রী দূর্গানাম ॥ শ্রীকবিকঙ্কন ॥

ভ্রুকুটী জটীলা ভঙ্গি রক্ত ত্রিনেত্রাং ॥
বিভুশনা উষ্ট্র জৎ পরাং।
ভিশনা দেহ কৃশ তৎ পবাং ॥
বং বিজে বিজই বিশ্বমই বিধাত্রি।
বিশ্বরূপা বিশ্যাস্বরি তং বিশ্ব কত্রি ॥
কঠোর জঠোর মমো প্রনাস কর।
খণ্ড দেবি কর্ম্ম বিপাকং জর্ম্মকাণ্ড হরো ॥
অনন্যা তরন্যা তরি সামান্য জলে।
তরঙ্গ সং প্র্যাপ্ত হৈলে তরি জায়ো তলে ॥

ত্রানে অপরূপা দূর্গার পদ তরনি।
সিরে ধরি ভব পার হই তৎক্ষনি ॥
নাস্তি হালি নাস্তি ধজি নাহিকো দণ্ড।
নিজ গুণ প্রভাবে তরি ভ্রমে ব্রহ্মাণ্ড ॥
সানর্ক্ষ কৈবল্য দিয়ে রাখ শ স্থানে।
নির্ত্ত ঐহ নির্ত্ত মই হেরি নয়নে ॥
কে বুঝিতে পারে দূর্গে তোমার মন্ত্রনা।
শ্রীহরি করিলে পার প্রলয় জমুনা ॥
শত্য জুগে নাম তোমার শত্য সনাতনি।
ত্রতা আয় ত্রিপুরেশ্বরি ত্রিগুন ধারিনি ॥
দ্ব্যাপরেতে দূর্গা নাম দূগতি হারিনি।
কলি কালে কালির নাম কলুস নাসিনি ॥

১. অত্র পাতা ১০ ছত্রে সমাপ্ত।

২. অত্র মাতা বিধিমতে বামে ৪ এবং দক্ষিনে ৷৹ আছে। পুঁথি অখণ্ড।

শ্রীশ্রী দুর্গানাম ॥ শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শত্য রজর্ত্তম গুণ সকলি তোমাতে।
তং হি নিরাকার সাকার সংসারেতে ॥
দূর্গা নামে কত গুণ কহিব কি নরে।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন কহিতে না পারে ॥
পঞ্চাশতো দূর্গা নাম জে করে শ্রবন।
অনাসে পরম গতি ব্যাসের বচন ॥
দূর্গা ২ বলে জেই পথে চলে জায়।
ষুল হাথে ষুলপানি পশ্চাতে গোড়ায় ॥
জয় দূর্গা পাদপদ্মে মজাইয়া মন।
পঞ্চশতো নাম করেন শ্রী কবিকঙ্কণ ॥
ইতি শ্রীশ্রী দূর্গার পঞ্চশতো নাম সমাপ্ত ৪ ॥

৩. এই পৃষ্ঠার প্রথম দুটি ছত্রের মধ্যভাগে কালের ছাপ বা কালি উঠে এসে বিভ্রান্তি করছিলো কয়েকটি শব্দ উদ্ধারে।

একে চন্দ্র

বর্ধমান জেলার দক্ষিণ—পূর্বে রায়না থানার অধীনে ও হুগলি জেলার উত্তর সীমান্তে দামিন্যা বলে একটা গ্রাম আছে। রত্নাসু নদীর তীরে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল বলে একসময় পরিচিতি ছিল এই এলাকা। তখন এই গ্রামের আয়তন দুই বর্গমাইলেরও বেশি ছিল না। তখন একই সঙ্গে বাংলা, বিহার আর ওড়িশার শাসনকর্তা ছিলেন রাজা মানসিংহ। আমি এই সময়ের মানুষ, চণ্ডীমঙ্গল আমার কাব্যের নাম। এই কাব্যে এমন একটা সময়ের কথা আমি বলতে চেয়েছি যে সময়ে মুসলমান শাসকদের অত্যাচার উৎপীড়নে বাংলার সাধারণ মানুষ উত্যক্ত, বিরক্ত, মানসম্ভ্রম রক্ষা করতে সন্ত্রস্ত অক্ষম, এমনকি, প্রাণ বাঁচাতেও অসমর্থ। সে সময়ে আমি বলতে গেলে যৌবন-তরঙ্গে সংসারস্রোতে ভাসছি।

"শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়রদেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সুজনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় করি কৃষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ ॥
উজির হল রায়জাদা ব্যাপারীরা ভাবে সদা
ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনর কাঠায় কুড়া
নাহি মানে প্রজার গোহরি ॥
সরকার হৈল কাল বিলভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার আরে জখোজ টাকা দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।

প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইল বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
কোতালিবা বড় পাপ সজ্জনের কাল সাপ
কড়ির কারণে বহু মারে ।
আথালি পাথালি কড়ি লেখা জোখা নাহি দড়ি
খত দিয়া লেবা নিতে পারে ॥
পেয়াদা সভার নাছে প্রজাবা পালায় পাছে
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা ।
প্রজার ব্যাকুলচিত্ত বেচে ধান্য গরু নিত্য
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীগড় যার গাঁ
যুক্তি করি গম্ভীর খাঁর সনে ।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রামানন্দ ভাই
পথে দেখা হৈল তার সনে ॥
তেলিগাঁযে উপনীত রূপরায় কৈল হিত
যদুকুণ্ড তেলি কৈল বক্ষা ।
দিয়া আপনার ঘর নিবাবণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ।
বাহিল গোড়াই নদী সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি
তেউটায় হৈনু উপনীত ।
দারুকেশ্বর তবি পাইনু বাতনগিরি
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত ॥
নারায়ণ পবাশর ছাড়িলাম আমোদর
উপনীত গোখড়ানগরে ।
তৈল বিনা করি স্নান উদক করিনু পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥
আশ্রয়ি পুখুবআড়া নৈবেদ্য শালুকনাডা
পূজা কৈ নু কুমুদ প্রসূনে ।
ক্ষুধা ভয় পবিশ্রমে নিদ্রা গেনু সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
করিয়া পরম দয়া দিয় চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত ।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রা নগরে উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান ।

পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিণু নৃপমণি
রাজা দিল দশ আড়া ধান ॥
বীর মাধবের সুত বাঁকুড়াদের গুণযুত
সুত পাশে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
গুরু করি করিলে পূজিত ॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দী সে জানে স্বপ্নেব সন্ধি
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নবপতি
গায়েনের দিলেন ভূষণ ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ কুলে শীলে অবদাত
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাহার আদেশ পান শ্রী কবিকঙ্কণ গান
মম ভাষা করিও কুশল ॥"

দামোদরের শাখানদী কাঁকিখালের পাশে এখন তোমরা গিয়ে যদি দাঁড়াও কবিকঙ্কণের ছায়ায় দেখবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা ইতিহাস। সেই ইতিহাসের অন্বেষণে যদি তোমাদের এতটুকু আগ্রহ থাকে তাহলে একদিন বেড়িয়ে পড়। চলে এসো আমার জন্মভিটেতে। বর্ধমান থেকে খুব বেশি দূর তো নয়। মাত্র তিরিশ কিলোমিটার। পণ্ডিতেরা আমার জন্মবৃত্তান্ত, জন্ম সময়, আমার রচনা ইত্যাদি নিয়ে অনেক ভারী ভারী কথা বলেন। তাঁরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করতে থাকুন।

আমরা চলো যাই দামিন্যা। এখানে এলে অনেকের সঙ্গেই তোমাদের আলাপ হবে। জানতে পারবে আমার পুথির কথা। এখানে একটি চণ্ডীমঙ্গল পুথি আছে। তৈরি হয়েছে সংগ্রহশালা। সেখানে আমার রচনা ওই পুথি রাখা আছে। পুথিটি আমার বংশধররা পারিবারিক ভাবে সংগ্রহ করে রেখেছে। বংশপরম্পরায় তাঁরা এটি সংরক্ষিত করেছে ভালো ভাবেই। এই গ্রামে এখনও আমার কোনো কোনো বংশধর বাস করেন।

দামিন্যার ভূমিতে পা রাখলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই। আসলে জন্মভূমি তো! আর আমি এই ভূমিরই পুত্র। দামিন্যা, দামিন সাঁওতালি শব্দ। জমিন শব্দের সদর্থক। 'ন্য' শব্দ সাঁওতালিতে 'নিজ'। নিয়—নিজ। গ্রামটা অপেক্ষাকৃত নিজ বা নিচু জায়গায়। জমিন নিচু বা জমিন নিজ এই রকম হতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখবে, দামিন্যা গ্রামটা নিচু। বন্যা প্লাবিত এলাকা বলে এখানকার বাড়িগুলো উঁচু উঁচু জায়গায় অবস্থান করে। এখানেই আমার পিতা হৃদয় মিশ্রের সংসার ছিল।

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
নিরবধি পূজিয়া গোপাল।
আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর মন্ত্র জপি দশাক্ষব
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥

সে সংসার ছিল বড়ো সুখের। পিতামহ জগন্নাথ, পিতা হৃদয় বা কবি গুণরাজ মিশ্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিধিরাম বা কবিচন্দ্র, আমি মুকুন্দ এবং ছোটো রামানন্দ—সব এক শব্দের নাম। আমরা রাঢ়ীয় শ্রেণির ব্রাহ্মণ, কয়ড়ি গাঞি।

কয়েড়ি অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ।

আমাব দুই পুত্র শিবরাম ও পঞ্চানন, কন্যা যশোদা, পুত্র শিবরামের বধূ চিত্রলেখা, জামাতা মহেশ। দামিন্যায় আমার পূর্বপুরুষদের বাস প্রায় ছয় সাত পুরুষ ধরে। কৃষিজাত শস্যে আমাদের জীবন কাটত। পিতামহ জগন্নাথ, "মীন—মাংস ত্যাগী" নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন। বাড়িতে 'গোপালের' নিত্যপূজা হত। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। সেই রকমই একজন রমণী ছিলেন দেবকী, আমার পিতামহী। কোনো রকমে সারা বছরের খোরাকি জোগাড় হয়, এই ছিল পিতা হৃদয় মিশ্রের মধ্যবিত্ত জীবন।

দামিন্যায় বসে কৃষিকাজ আর পূজা অর্চনা করে আমাদের দিন কাটত। ছোটোবেলা থেকেই এখানকার প্রকৃতি এবং পরিবেশ আমাকে লেখার প্রেরণা দিত। এখান থেকেই আমি কবিত্বশক্তি লাভ করি। আমার শিববন্দনা রচনা প্রথম পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই বন্দনায় আমি উল্লেখ করি নিজ গ্রামের শিবমন্দিরের কথা।

"অষ্টমঙ্গলা সায়
শ্রী কবিকঙ্কণ গায়
শ্রী অমর সেনের মন্দিরে।"

খুবই সাদামাঠা আমার জীবন। তেমন কিছু অবশ্য বলার মতো নয়। তবে অনেক পথ আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। এই পথ চলার অনেক গল্প আছে। সেগুলো বলা যেতে পারে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। সেই জন্মভূমি আমাকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। আমাকে মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হবার আশঙ্কায় আপন জন্মস্থান ছেড়ে দূরে চলে যেতে হয়েছে। শেষ বয়সে আবার আমি দেশে ফিরে এসেছি। তবে না ফিরলেই বোধহয় ভালো ছিল। পুত্র শিবরাম ও পরবর্তী বংশধরেরা পরবর্তী সময়ে দামিন্যা ও ছোটোবৈনানে বসবাস করেছে। বলতে গেলে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ সাহিত্যে আমি প্রবেশ করেছি। কি তাই তো?

—হ্যাঁ। বাংলায় তখন মানসিংহের রাজত্বকাল চলছিল।

পিতা হৃদয় মিশ্রের তিন ছেলে। আমরা তিন ভাই। বড়ো নিধিরাম কবি হিসাবে কবিচন্দ্র নামে খ্যাতি পেয়েছিল। ছোটো রামানন্দ কবিতা টবিতার ধার ধারত না। লোকে বলত আমি নাকি কবিপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল। শিবকীর্তন নামে ছোট্ট একটি পুস্তিকা তখন আমি রচনা করে ফেলেছি। তখন আমার বয়স বেশি নয়। তবু সর্বদা কলমের মুখে আঁচড় কাটত আমার মনের ভিতরের অনন্দময় জগতের অন্বেষণ।

ছোট্ট আমাদের পরিবার কিন্তু সুখে থাকতে পারল না। সে সুযোগ কেড়ে নিল দুষ্টু রাজশক্তি। দিল্লিতে মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসকদের মধ্যে অহরহ ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছিল

আর সেই কাণ্ড বঙ্গ প্রদেশকে অস্থির করে তুলছিল। যদিও স্থানীয় শাসকরা ছিল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, নিরীহ প্রকৃতির। কিন্তু মোগল, আফগান, পাঠান, পোর্তুগীজ ও মারাঠা বর্গীরা হাঙ্গামা ও যথেষ্ট লুটপাট করে অস্থির করে ফেলছিল গোটা দেশ। এমন একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল যে স্থানীয় শান্তিপ্রিয় শঙ্খবণিক, কংসবণিক, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকরা দেশ ত্যাগ করে নিজেদের সুবিধা মতো জায়গায় চলে যেতে লাগল।

হোসেন কুলী বাংলার শাসনকর্তা। তিনি কিন্তু সুবিধের লোক ছিলেন না। উপঢৌকন পেলে খুশি হয়ে যান। পাঠানরা এই সুযোগকে কাজে লাগাল। তারা নামমাত্র মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে হোসেন কুলীকে বশ করে ফেলল। ডিহিদার মামুদ শরিফও সেই সুযোগে সদর শহর সেলিমাবাদে লুঠপাট চালাতে শুরু করে দিল। যেমন ডিহিদার তেমনি তার উজির। সবাই যেন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের শত্রু হয়ে গেল। কোণে কোণে দড়ি ফেলে জমি মাপে। তাতেও তুষ্ট না হলে পনেরো কাঠায় এক বিঘা ধরে হিসেব করে কর বসায়। প্রজাদের কোনো কথা শোনে না। পতিত জমি উর্বরা বলে লিখে তার উপরও কর বসিয়ে দেয়। পোদ্দার বারো আনায় টাকা ধরে প্রতি দিন-পিছু এক পয়সা সুদ নিতে শুরু করে। এমনই অবস্থা দাঁড়াল যে ন্যায্য দামে দেশে ধান গোরু কিনবার লোক পাওয়া দুষ্কর হল। তারপর আষাঢ় মাস শেষ হতে চলল আকাশে বৃষ্টির দেখা নেই।

দামিন্যা সেলিমাবাদ পরগনার অধীন জমিদার গোপীনাথ নন্দীর তালুক। যার তালুকে সাতপুরুষ ধরে বাস আমাদের। উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হওয়ার সুবাদে গ্রামের সকলে আমাদের চক্রবর্তী বলে অভিহিত করে। সময়টা হয়ে গেল বড়ো মন্দ। হিন্দুদের হিন্দুয়ানি মাথা তুলছে, মুসলমানদের তা সহ্য হচ্ছে না। গ্রামে গ্রামে উচ্চচূড় দেবালয়ের প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দৈব্যোৎসব, নৃত্যগীত, হরিসংকীর্তনে দেশ চঞ্চল হয়ে উঠছে। ওদিকে পাঠান সুলতান দাউদ দিল্লীশ্বরের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বঙ্গের অধিকর্তা হয়ে আসছেন মানসিংহ। কিন্তু ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচার কমছে না। বঙ্গের সর্বত্র হিন্দুরা ধুল্যাবলুণ্ঠিত, কেবল এই রাঢ় বঙ্গেই তাদের যত বাড়বাড়ন্ত। আর তাই ডিহিদার মামুদ শরিফ ঝাঁপিয়ে পড়ল। খাজনা ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে জমিদার গোপীনাথ নন্দীকে মামুদ উত্যক্ত করতে লাগল।

জমিদার হিসাবে গোপীনাথ নন্দী স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি মামুদ শরিফের অত্যাচারের বিরোধিতা করলেন। মামুদ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বন্দি করার নির্দেশ দিলেন। ঢাল সড়কি হাতে দুজন পাইক চলে এল জমিদার গোপীনাথ নন্দীকে ধরে নিয়ে যেতে। পাইকেরা জাতিতে ডোম। গোপীনাথ নন্দী তাদের স্পর্শে বিষণ্ণ বোধ করলেন। দেখলেন পাইকদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে স্বয়ং ফউজদার। গোপীনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে ধরা হচ্ছে কেন? তিনি কী করেছেন?

ফউজদার তার উত্তরে কাফের বেতমিজ! বলে তাকে গালাগাল করল। বলল কী করেছিস? আগে চল, তারপর দেখাচ্ছি কি করেছিস। এই, একে বেঁধে নিয়ে চল।

হুকুম শুনে একজন পাইক ধাক্কা মেরে গোপীনাথকে ফেলে দিল। অন্যজন তাঁকে দু—চারটে লাথি মারতে এগিয়ে এল। গোপীনাথকে বাঁধা হল। ফউজদারকে দেখে গোপীনাথের

লোকজন কে কোথায় লুকিয়ে পড়ল বোঝা গেল না। পাইকরা গোপীনাথকে মারতে মারতে নিয়ে চলল। ফউজদার তার দাড়ি নাড়তে নাড়তে হিন্দুদের দুর্নীতি সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ফারসি ও আরবি শব্দের বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে পিছনে পিছনে চলতে লাগল।

আর গোপীনাথ সেই অবসরে তবে রে, বলে ফউজদারের মুখে একটি ঘুষি মেরে বসলেন।

তোবা তোবা বলতে বলতে ফউজদার নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে ধরাশায়ী হলেন। এই বয়সে তার যে দু-চারটে দাঁত অবশিষ্ট ছিল সেগুলো কোথায় লুকিয়ে পড়ল। পাইকেরা ছুটে এসে গোপীনাথকে বেদম প্রহার দিতে শুরু করে দিল। তাঁর হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ি পড়িয়ে কিল চড় লাথি ঘুষি মারতে মারতে ধরে নিয়ে চলল। সে এক হুটোপাটি অবস্থা। পথিকরা সবাই রাস্তা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জমিদার গোপীনাথ নন্দী বন্দি হওয়ার ফলে স্বাধীনচেতা প্রজাদের মানসিকতা ভেঙ্গে গেল। বিচার ও তার উপর যা হুকুম হল তা শুনে সকলে শিউরে উঠল। গোপীনাথকে নাকি জীবন্ত পুঁতে ফেলা হবে। গোপীনাথ নন্দীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর রাষ্ট্র হতেই নগরে হুলস্থূল পড়ে গেল। গৃহস্থরা যে যেখানে পারল পালাল। কেউ চলে যায় মাসির বাড়ি, কেউ চলে যায় পিসির বাড়ি। কেউ যায় খুড়োর বাড়ি, কেউ মামার বাড়ি, কেউ শ্বশুরবাড়ি, কেউ জামাইবাড়ি, সপরিবারে ঘটি বাটি সিন্দুক—প্যাঁটরা তক্তপোশ যে যা পারল মাথায় করে নিয়ে পালাতে লাগল। দোকানদার দোকান নিয়ে পালায়। মহাজন গোলা বেচে পালায়। আড়তদার আড়ত বেচে পালায়। কারিগর হাতের যন্ত্রপাতি মাথায় চাপিয়ে পালাতে চায়। বড়ো হুলস্থূল চারদিকে। মামুদের অত্যাচার আরও প্রশস্ত হল। এহেন অবস্থায় কে আর সুখে থাকতে পারে! আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে আমিও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গেলাম।

শিষ্য দামাল মন্ত্রণা করতে এসে বলে, এবারে কী করবেন? গ্রাম তো উঠে যাবার অবস্থা।

—গুষ্টিসুদ্ধ জবাই হব দেখছি।

—একে একে সবাই সরে পড়ছে। এখানে থাকলে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। জমিদারকে ধরে নিয়ে গেল। আর আমাদের জীবনে কোনো ভরসা আছে? সেদিন মধু ঘোষেরা উঠে দক্ষিণে চলে গেল। তখন বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে বলল, এখানে জিনিসপত্র বড়ো মাগ্‌গি। আমাদের পাড়ায় তো মাত্র ক'ঘর আছে, বাকিরা সকলে চলে গেছে। পরিবারের সকলে চলে যেতে চাইছে, আমিও চলে যাচ্ছি।

—তবে কি জানো। বাড়ি ঘরদুয়ার সব খরচপত্র করে করা হয়েছে, এই সব ফেলে-ঝেলে যাওয়া গরিব মানুষের বড়ো দায়। ওকে বললাম।

—তা কি করবেন। প্রাণটা আগে না বাড়ি—ঘর আগে? শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে, তখন আবার ফিরে আসা যাবে। বাড়ি ঘরদুয়ার তো আর পালাবে না।

—না তা পালাবে না অবশ্য।

—তবে ফিরে এসে খালি পেলে হয়। সে সব কি আর আস্ত থাকবে?

জমিদারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ডিহিদারের পেয়াদারা ঘরের দুয়ারে দুয়ারে থানা দিতে বসল। প্রজারা আর কেউ পালিয়ে যেতেও সাহস করে না। ব্যাকুল হয়ে কেউ কেউ ছ'আনায় টাকা হিসাব ধরে ধান গোরু বিক্রি করে, গোপনে গোপনে রাতের অন্ধকারে অন্যত্র চলে যেতে শুরু করে দিল। গ্রামে তোমরা চণ্ডীর আটন দেখতে পাবে। আমি চণ্ডীর পূজা করেছিলাম। চণ্ডীকে অন্য রূপ দিয়েছি। আমার সেই চণ্ডীর পূজা করতে বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। বহু কষ্টে আরাধ্যা চণ্ডীর পূজা করেছিলাম। মহিষমর্দ্দিনী চতুর্ভুজা আমার শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নিয়ে, গলে বনমালা শোভিতা হয়ে বসে আছেন। গ্রামের মানুষ এখন সেই চণ্ডীর পূজা করে। কিন্তু আমি রীতিমতো একঘরে হয়েছিলাম। সে সব দুঃখের কথাই আজ শোনাব তোমাদের!

ওরা তখন বলেছিল, ও হচ্ছে মুকুন্দর চণ্ডী। আজ আমার চণ্ডী গ্রামে পূজা পাচ্ছে। কি মজার ব্যাপার বলোতো? যাকগে সে সব কথা। প্রথমে পুথির কথা বলি। পুথিখানি আমার বংশধরেরা আমার আরাধ্যদেবী চণ্ডীমূর্তিব পাশে রেখে দিয়েছিল সযত্নে। আমি তো প্রথমেই বলেছি আমার পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব ছিলেন। ভগবতী যখন আমায় দেখা দেন, আমি তখন আপন কুলমন্ত্র পরিবর্তন করতে ইতস্তত কবেছিলাম। দেবী তখন আমাকে বলেছিলেন, আমাতেই তুমি তোমার ইষ্টদেবীর মূর্তি দেখতে পাবে। তাই আমার কল্পিত মহিষমর্দ্দিনী মূর্তির রূপ এই রকমের। আমার পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব ছিলেন এতে যেমন আমার কোনো সন্দেহ নেই। তেমনি চণ্ডীমঙ্গল লেখাব অনেক আগেই আমি জগন্নাথমঙ্গল কাব্য নামে একটি উৎকল—মাহাত্ম্য রচনা করেছিলাম। সেই গ্রন্থের অনেক স্থলেই আমি উল্লেখ করেছি বারবার—

"দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রীহরি"।

তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, দামিন্যার পুথির শেষে লিখিত আছে--

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

এই কবিতার উপর নির্ভর করলে তোমাদের কাছে ধরা পড়ে যাবে আমার ভণিতা। ১৪৯৯ শকাব্দের পয়লা কার্তিক শুক্রবার আমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছিলাম। অর্থাৎ সাল হিসাবে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা কার্তিক শুক্রবার আমার দামুন্যা ত্যাগের সময়।

রাজা মানসিংহ অস্থায়ীভাবে বাংলায় আসেন ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে আর তাঁর রাজত্বকালের শেষ ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ। মাঝে ১৫৮৯ ও ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে দু'বার তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমি দামিন্যা পরিত্যাগ করে আড়ড়ায় চলে যাই। তার দু চার বৎসরের মধ্যে আমি চণ্ডীকাব্য সম্পূর্ণ করি। আসলে বাংলা ভাষায় চণ্ডীমঙ্গলের একাধিক প্রাচীন পুথির সন্ধান পেয়ে তোমরা গোলকধাঁধায় পড়ে গেছ। পুথিগুলির মধ্যে মিল যেমন আছে অমিলও তেমন আছে। আবার কোনো দুখানি পুথির পাঠ একরকম নয়। তোমরা নিশ্চয় জানো যে কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান আমার বহু আগে থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। আর সেই উপাখ্যান থেকেই আমি তা সংগ্রহ করে লিখেছি কালকেতু ও শ্রীমন্তের কাহিনি। কেমন করে?

আজ সেই কথাই শোনাব তোমাদের।

ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে বর্গীরা ধেয়ে এল। ওরা ধানের গোলা লুঠ করে জ্বালিয়ে দিল গ্রাম। শিশু নারীদের গায়ে হাত দিতেও ওদের হাত কাঁপে না। শক্তিগড়, তালিতগড়, সেনপাহাড়ি গড়ে সুলতানের প্রচুর সৈন্য মোতায়েন আছে। তবু এদের প্রতিহত করা বঙ্গের সৈন্যদলের পক্ষে সম্ভব হল না। গ্রামাঞ্চলে মহাজনি সুদের ব্যাপকতা তখন অনেক বেড়ে গেছে। রাজস্ব দেওয়ার জন্য কৃষককে মহাজনের কাছে হাত পাততে হয়। পর পর বছরে অজন্মা হলে কৃষকের সর্বনাশ দেখে কে? অজন্মার জন্য রাজস্ব কমে না, মুকুব হয় না কর। ধার করেও সাধারণ মানুষকে রাজস্ব দিতে হয়। নির্ধারিত রাজস্বে ফসলেব অর্ধেক চলে যায়। আর মহাজনের ধার শোধ করতে চলে যায় বাকি অর্ধেক। কৃষক খাবে কী? তার কথা কেউ ভাবে না। এইভাবে ধারে ধারে কৃষকের জীবনটা বরবাদ হয়ে যায়।

কৃষককে রাজস্ব দিতে হয় নির্দিষ্ট টাকার হারে। রাজস্ব ধার্য হয় শস্যের পরিমাণে। আর এই শস্য তোলার মরসুমে কৃষকদের ধান বিক্রি করে রাজস্ব দিতে হয়। বাজারে তখন শস্যের দাম সামান্য। শস্যের দাম কম থাকায় উৎপন্ন শস্যের বেশি অংশই কৃষককে বিক্রি করে দিতে হয় রাজস্ব মেটাতে। কৃষকের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হয়। অথচ রাষ্ট্র প্রভু, জাতীয় ক্ষেত্রে মালিক। জমির মালিক, সব কিছুর মালিক। সার্বভৌম এই শক্তির কুক্ষগত। সার্বভৌমতার দাবি নিয়ে সম্রাট কর চাপায়। এই অধিকার তার আছে। কারণ তিনি দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখেন। দেশের মানুষকে তারই মূল্য দিতে হয় কর ব্যবস্থার মাধ্যমে। এর বাইরেও চাষিকে কর দিতে হয়। তার সারা বছরের উৎপাদিত শস্যের একটি বড়ো অংশ 'আবওয়াব' অর্থাৎ বেআইনি কর মেটাবার জন্য চলে যায়। এই করো দিতে সে বাধ্য। নইলে পরিবার—পরিজন নিয়ে তার বাস করা দায়। দিল্লির সম্রাটেরা বারবার ফরমান জারি করে এই কর নিষিদ্ধ করে। কিন্তু করলে কি হবে? স্থানীয় এই তথাকথিত সম্রাটদের হাত থেকে রেহাই পেতে ওই ফরমান কোনো কাজে আসে না।

ফসল ভালো হলেও তাতে হাত দিতে পারে না কৃষক। বকেয়া ধার শোধ দিতে তা চলে যায় মহাজনের গোলায়। অনেক সময়ই মহাজন কৃষকের জমি থেকে শস্য তুলে নিয়ে যায় সবাসরি। এর ওপর আছে রাষ্ট্রের দাবি, আছে ডিহিদারের অত্যাচার। রায়তদের তাই নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি থাকে না। খালি পেটে তাদের পক্ষে চাষ করাও সম্ভব নয়। আফিং খেয়ে তারা মরে। রায়তদের আগে টাকা ধার দিয়ে পরে তার বিরুদ্ধে শস্য সংগ্রহ করার মধ্যেই দাদন ব্যবস্থায় মহাজনদের আসল ফাঁকি লুকিয়ে থাকে। আবাদকল্পে মূলধনের জন্য ধারেব দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্র সরাসরি ধার দেয় না। সে জামিনদার হয়ে মহাজনের মাধ্যমে টাকা দেয়। নগদ টাকা ছাড়াও মহাজন গোরু, হাল, বীজধান ধার দেয়। ফেরত নেয় টাকার সমান হারে সুদ-সহ। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নেয় সে। এই প্রথা কৃষকদের ধ্বংসকে ডেকে আনে। কিন্তু তা বলে কখনও তারা জমি থেকে উৎখাত হয় না। কৃষিঋণ শোধ করে, না দিতে পারলেও ঋণের উপর আবার নতুন ঋণের বোঝা চাপে। সেই বোঝার ভারে নুব্জ কৃষক সেই জমিতেই লাঙল চালায়।

মহাজনের দেওয়া ঋণ উচ্ছিষ্টের মতো গ্রহণ করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন দিয়ে জমিতে ফসল ফলায়। উৎখাত ফসলের সামান্য অংশমাত্র ভোগ করবার সুযোগ পায়। পরিবার-পরিজন নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতেও সাহস পায় না। ডিহিদারের লোক ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র।

কিন্তু ধানের ব্যবসায়ী, অন্যান্য ফসলের ব্যবসায়ীরা সহজেই বাণিজ্যে তাদের লাভকে সুদে খাটাতে পারে। সম্পন্ন কৃষক, জমিদারেরা কৃষি থেকে গৃহীত উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ মূলধন হিসাবে খাটায়। মহাজনি ব্যবস্থায় মূলধন নিজে থেকেই বেড়ে চলে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীরা মহাজনদের কাছে টাকা রেখে নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। সেই জমা টাকাই মহাজন আবার বেশি সুদে খাটিয়ে নেয় অন্যদের কাছে।

যদু আমাকে বোঝায়, এবার থেকে দিল্লির সরকারের হুকুমে উৎপন্ন শস্যের ভিত্তিতে, মাপজোখ ও জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নিরূপণ হবে। এজন্য কর্মচারী নিয়োজিত হয়েছে। লাঙল পিছু কর দিতে হবে না। এতে আমাদের লাভ হবে। ফসলের বেশি অংশ আর কর দিতে চলে যাবে না। নতুন ব্যবস্থা ভালো হবে। আমি এসব হিসাব বুঝি না। সাধারণ কৃষক আমি। সাধারণ কৃষকের চেতনায়, ব্যাপক অত্যাচার না হলে, প্রতিরোধের ধারণা তৈরি হয় না। এদেশের কৃষকদের সহিষ্ণুতা বিস্ময়কর। মার খেতে খেতে মরে যাবে। তবু টুঁ শব্দটি করবে না। কিন্তু অত্যাচার সীমা অতিক্রম করলে নিজেদের বাঁচার তাগিদেই তো মানুষ প্রতিরোধ করতে চায়। কৃষক হলেও সেও তো মানুষ। এদেশের কৃষক সংগঠিত নয়। অসংগঠিত কৃষক, অত্যাচারিত কৃষক তাই প্রথমে ভাবে, কী দরকার বাপু ঝামেলাতে গিয়ে। অন্য জায়গায় চলে যাই ভিটেমাটি ছেড়ে। যেখানে ভালো ব্যবহার পাব সেখানে বাস তৈরি করব, কাজ নেই ঝামেলাতে।

জাতিতে আমি ব্রাহ্মণ। রাজার চোখে ব্রাহ্মণরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তারা বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করবার সুযোগ পায়। আমি যথেষ্ট সুনামেরও অধিকারী। কিন্তু ব্রাহ্মণ হলেও মূলত আমি কৃষিজীবী। আমিও ভয় পেলাম। রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে তখন ভয় পেতেই হয়। প্রাচীন সাহিত্য মৃচ্ছকটিক, তাকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। মৃচ্ছকটিকেও তাই বলা হয়েছে। আমি কিন্তু সম্পন্ন চাষি। জমির ওপর নিজস্ব ভোগদখলি স্বত্ব আছে। পরের জমি চাষ করি না, নিজের জমি আমি চাষ করি। তবু আমি ভয় পেলাম। আমার ভাষায় লিখলাম—

সহর সেলিমা বাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবাস নেউগি গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥

বনবাসী মানুষ এক সময় সমাজ গড়ে তুলেছে। গড়ে তুলেছে গোষ্ঠীজীবন। গোষ্ঠী গঠনের পর সেই গোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে মানুষ কিছু নিয়মও তৈরি করেছে। নিয়ম ভাঙলে বিচারের প্রশ্ন ওঠে। মানুষ সমাজ গঠনের পর ক্রমে তা আরো সংগঠিত রূপ নিতে

শুরু করেছে। চালু হয়েছে রাজন্য ব্যবস্থা। রাজন্য বাবস্থা চালু হওয়ার পর এসেছে বিচার-ব্যবস্থা। অবশ্য বিচার-ব্যবস্থা রাজার হাতেই। বিচার-ব্যবস্থায় তৈরি হয় আইন। কথায় বলে আইন নাকি খুব দৃঢ়। হাকিম নড়ে, হুকুম নড়ে না।

বিচার-ব্যবস্থার বৈচিত্র্য এনেছে আইনের ব্যাখ্যা। বিচারক একজন রক্তমাংসের মানুষ। তার মানবিক অবস্থান প্রভাব বিস্তার করে বিচারের ওপর। প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র দুধরনের আদালতের কথা বলেছে, কণ্টকশোধন ও ধর্ম আদালত। কণ্টকশোধন আদালতকে পরিচালনা করে অমাত্যরা। ধর্ম-আদলতের বিচারক কাজি। প্রদেশের সুবেদার বিচারকের আসনে বসেন। পঞ্চায়েত স্তরেও বিচার-ব্যবস্থা একটা আছে। বড়ো ধরনের মামলা রাজা নিজে দেখেন। সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হলে রাজার অনুমতি লাগে। সুলতান অবশ্য শরিয়ত মতে বিচার করেন। নিম্ন আদালতের বিপক্ষে রাজা বা সুলতানের কাছে আবেদন করা যায়। নকল সাক্ষ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হলেও নকল সাক্ষী সমাজে এক ধরনের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের সাক্ষীর অভাব হয় না।

সরকারি কর্মচারীদের অপরাধ বিচার করার জন্য আলাদা 'মজলিশ' আদালতের ব্যবস্থা হয়েছে। সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতায় সুবেদার তদন্ত সাপেক্ষে রায় দেন। তবে শাসকের রক্ত শিরায় থাকলে সাধারণ অপরাধের বিচার হয় না। ফউজি শাসনে রায় দেন কাজিসাহেব। কিন্তু ফউজদারের হাতে সামরিক ক্ষমতা থাকায় অনেক সময় ফউজদার আসামীকে বাঁচিয়ে দেন, রায় কার্যকর হয় না। সম্রাট ছাড়া অন্য কেউ উঁচুতে বসতে পারেন না এটাই নিয়ম। এমনকি সম্রাটের পরিবারের সদস্যদের বিচার সম্রাট নিজেই করবেন। বিদ্রোহ না করলে কড়া শাস্তি কখনও কেউ পায় না। আর ডিহিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবে কে? অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী কর্মচারী বড়োজোর বদলি নয় বরখাস্ত হবে। আর বিচারে সব সময় ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় শক্তি। রাজা যদি ভালো তাহলে বিচারও ন্যায্য হয়। আর রাজা যদি স্বেচ্ছাচারী হয় তাহলে বিচার-ব্যবস্থা তারই তাঁবেদারী করে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা, জমাট মেঘ উঠেছে! উথালপাতাল হাওয়া বইছে। সঙ্গে নামছে বৃষ্টি। পুকুরের জলে ঢেউ উঠছে, যেন জলতরঙ্গ বাজছে। হাওয়ায় পদ্মপাতা নুয়ে নুয়ে পড়ছে। ওরা বর্ষণকে মাথা পেতে বরণ কবতে চাইছে। দেখি যশোদার মন নেচে উঠেছে। তার মনের সাথে শবীর অকাল বষর্ণকে বরণ করার জন্য নেচে উঠেছে। মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে অদূরে ভিজছে পঞ্চানন। যশোদা তার এলো চুল দুলিয়ে দুলিয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। ধীরে ধীরে বৃষ্টির প্রাবল্য বেড়ে চলে। যশোদা বুঝতে পারে ভেজা আর ঠিক হবে না। সে ভাইকে টেনে নিয়ে ছুটে আসে গাছতলায়। নিজের আঁচল দিয়ে ভাইয়ের মাথা ঢাকতে চায়। দেখে নিজের আঁচল শাড়ি সব ভিজে একশা। মানকচুর আর একটা পাতা কেটে নিয়ে সে ভাইয়ের মাথায় টোকার মতো ধরে। পঞ্চাননের মাথায় মানপাতার আড়াল দিয়ে যশোদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকে গাছতলায়।

পরের দিনই দুজনের বেদম জ্বর আসে। বৃষ্টিও হয়ে যায় দুদিন লাগাম ছাড়া। পঞ্চানন ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিত্য কবিরাজ গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। অন্য কবিরাজকে ধরে

নিয়ে এসেছি। তিনি পথ্য দিলেন। সে পথ্য কোনো কাজ করে না। পঞ্চাননের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে থাকে। কবিরাজকে ডাকতে হয় বারবার। তিনি আসেন আর ওষুধ পরিবর্তন করেন। ওষুধ-পথ্য দেওয়া হয়। তাতে কাজ হয় না। রাতে বৃষ্টি বাড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ে জ্বর। মৃত্যুর দূত হয়ে বৃষ্টি টোকা মারে আমার ঘরের দরজায়। ঝড়ো হাওয়ায় প্রদীপ নিভু নিভু। স্ত্রী মমতা ওর কপালে ভিজে ন্যাকড়ার প্রলেপ দিতে থাকে, আর মনেপ্রাণে ডাকে চণ্ডীকে। রাত বেড়ে চলে। বেড়ে চলে ঝড়। ঘন ঘন বজ্রপাত হয়। পঞ্চাননকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মমতা। প্রার্থনা করে ওর জন্য। হে মা চণ্ডী তুমি ওকে বাঁচিয়ে দাও, প্রয়োজনে আমাকে নাও।

যশোদারও জ্বর কমে না। তবে মেয়েদের প্রাণ কইমাছের জান। সেই জন্যেই বোধহয় ও শক্ত আছে। ওই অবস্থাতেই ও ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করে। ওকে বোঝাই, ওরে কাঁদিস না। তুই কাঁদলে, আমার চোখের জল যে বাধা মানে না! বোঝায় মমতা। কিন্তু বোঝে না যশোদা। মৃত্যুর হাত থেকে পঞ্চাননকে বুঝি আর বাঁচানো যাবে না। দুদিন পর দমকা হাওয়ায় প্রদীপ নিভে গেল। পঞ্চাননের মৃত্যু হল। পঞ্চানন চলে গেল। মনে হল, অন্তিম সময়ে পঞ্চানন একবার বুঝি 'বাবা' বলে ডেকে ছিল অস্ফুট স্বরে। তারপরেই প্রদীপটা ঝড়ে নিভে গেল। কি হল তা বোঝার আগেই আলো জ্বালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আলো যখন জ্বলল, পঞ্চানন তখন নেই।

যশোদা ডুকরে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল মমতা। কাঁদতে পারলাম না আমি। একবুক হাহাকার নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। তারা ভরা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোথায় ঝড় বৃষ্টি তখন? মেঘ কেটে গেছে। ফুটফুটে তারায় ভরে আছে আকাশ। পঞ্চানন সেই আকাশের কোথাও তারা হয়ে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। এবার কী করব? অন্তত একা থাকলে হেঁটে দুঃখের নদী পার হওয়া যায়। কিন্তু একা নই যে। ওরা যে রয়েছে, ওদের সকলকে ফেলে কোথায় যাব? ওরা কেউ একা একা দুঃখের এই উজান ঠেলে ওপারে যেতে পারবে না। দুঃখের জলে ভরা নদীর জল এত ভারী, যা পাষাণের থেকেও বেশি ভারী মনে হয়।

তবু এক অপ্রতিরোধ্য নিয়তির মতো পথে পা বাড়াই। বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়ে মনটা হু হু করে ওঠে। সব কিছু তছনছ হয়ে গিয়েছে। জল কাদা। গোয়ালের চাল উড়ে গিয়েছে। গোরুটা দাওয়ার এক কোণে শীতে কাঁপছে থরথর করে। বেড়ার ধারে ফুল গাছগুলো মাটিতে লুটিয়ে কাদায় মাখামাখি। পঞ্চাননের ডালিম গাছ ভেঙে পড়ে আছে। খাঁখাঁ গোয়াল ঘর। বাছুরটা কোথাও দেখা যায় না। সব যেন শূন্য হয়ে গেছে আমার। সব কিছু খালি। পঞ্চানন নেই ভাবতে পারি না। বাবা-মা ছেড়ে গেছে অনেক দিন আগে। ছেড়ে গেছে সংসারের অনেকেই। তবু সেদিন বুকে গড়বার সাহস ছিল। আশায় আবার বুক বেঁধে ছিলাম। কিন্তু আজ? আজ আমার বুক ভেঙে গেল। কলিজার টুকরা খসে পড়ল বুক থেকে।

এক বুক দুঃখ নিয়ে চাঁদের ঝিমানো আলোয় বসে থাকি। মনে মনে ভাবি কি করব? এ আমার কি হল, এ আমি কী করছি? সংসার সমাজ সব কিছু ভুলে শুধু সাহিত্য রচনায় মন দিয়েছি? সাহিত্য করার জন্য পাগল হচ্ছি, তা সাহিত্য লিখব কি? ভিতরে একটা কান্না বুক

ঠেলে ঠেলে উঠে আসে। জীবনে কাউকে ঠকাই নি, অসততা করিনি। তাহলে আমার এইরকমভাবে শাস্তি হচ্ছে কেন? শুধু নিজের নয়, স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের জীবনও বিপন্ন করে তুলছি। স্থির করলাম জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাব। যে দেশে কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছচারী। অন্যায় উচ্ছৃঙ্খল জীবনে নিত্য ব্যস্ত। প্রজার দুঃখ বোঝে না, কর না দিলেই পড়তে হয় রোষানলে। যঃ পলাযতি স জীবতি। চলে যাব, এদেশ ছেড়ে। প্রজার দল দলে দলে পালিয়ে যাচ্ছে। গোপনে, রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতো। কিন্তু আমি কোথায় পালাব? নানা জনের কাছে পরামর্শ নিই। কি করব? কোথায় যাব? পরিবারের কি হবে? যাকে মনে ধরছে তাঁর কাছেই সমস্যার কথা খুলে বলছি। কিন্তু কে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? সকলেই নিজের নিজের সমস্যায় অস্থির। সকলেই ভাবছে পালাবার কথা।

আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম চলে যাব। স্থির করলাম, চলেই যাব। গঙ্গাদাসবাবুকে খবর পাঠালাম, আপনার কাছে একটু আশ্রয় চাই। পার্শ্ববর্তী চণ্ডীবাটী গ্রামের অধিবাসী গরিব এবং শ্রীমন্ত আমার শুভানুধ্যায়ী। বেশ কিছুদিন ধরেই আমাকে পরামর্শ দিচ্ছিল জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করতে। আর সত্যিই তো মামুদ শরিফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ সবাই। একে একে সবাই গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। গরিব আর শ্রীমন্ত ওরা নিজেরাও আমার কথা ভেবে যেতে পারছে না। কিন্তু ওরাও এবার গ্রাম ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল।

আমি ভেবেছিলাম প্রবলতার কারণে এই অত্যাচার, কোনো রকম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশত নয়। কিছুদিন পর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মোটামুটি পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে। কোনো রকমে কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে নিই। তারপর হয়তো শান্তি আসবে। চলে যেতে মন চাইছিল না। এতদিনকার পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাব? কিন্তু দেখলাম উপায় নেই। চলে যেতেই হবে। বংশানুক্রমিক ভাবে বৈষ্ণব আমরা। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আমাদের অগাধ ভক্তি। পরিবারের সকলেই নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং পরম বৈষ্ণব। গোপালদেব ঠাকুর আমাদের কুলদেবতা। গ্রামে গ্রাম্যদেবতা হিসাবে চক্রাদিত্য শিবের অবস্থান। তাঁকেও খুব মান্য করি। কিন্তু এই দেব-দ্বিজের পূজা অর্চনা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। গঙ্গাদাস বাবুর উত্তর এল, হ্যাঁ, তাঁর আশ্রয়ে যাওয়া যেতে পারে।

কার্তিক মাসে দীপদান অতিশয় পুণ্যজনক কাজ। কার্তিক মাসে যাঁরা বিষ্ণুর অগ্রে দীপ দান করেন তাঁদের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ফল লাভ হয়। প্রতি বছর এ সময়ে সারা রাত্রি ঘৃত দিয়ে দীপ জ্বেলে বিষ্ণুকে ও পিতৃপুরুষদের দীপদান করি। এবারে তা সারলাম কোনো রকমে নমো নমঃ করে। রাত্রি চারপ্রহর শেষ হয় হয় এমন সময় গ্রাম পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ দিনের বেলায় স্ত্রী-পরিজন নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করা অসম্ভব। পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী সময় নির্ণয় করে জন্মভূমি পরিত্যাগ করার নির্দিষ্ট ক্ষণ স্থির করলাম।

পেয়াদা সবার কাছে প্রজার পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা ।

ঘরের কুড়ুলটুকুও বিক্রি করতে হয় এক টাকার জিনিস দশ আনায়। সকলের সঙ্গে পরামর্শ

করে রওনা হলাম। যাত্রায় সঙ্গী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই রামানন্দ ও অনুগত শিষ্য দামাল। গ্রামত্যাগের সময় সঙ্গে বিশেষ কিছুই নিতে পারলাম না। গৃহদেবতাকে বক্ষে চেপে পথে বের হলাম।

গরিব সত্যিই গরিব। পরনে আটপউরে ধুতি, চাদর আর পায়ে খড়ম। সব সময় মুখে একটুখানি হাসি লেগে আছে ওর। একটুখানি টাক, একটু ভুঁড়ি, একটু বেঁটেখাটো কাঠামো আর কথাবার্তায় একটু স্থানীয় টান। কোন্ গাঁয়ে কী পাওয়া যায়, কোথাকার প্রাকৃতিক চেহারা কেমন, কোন্ দিকটায় ঢেউ খেলানো রুক্ষ মাটি, কোথায় আদিগন্ত ধানখেত, দরকার হলে পালকি পাওয়া যাবে কোত্থেকে, নদীর ধারে বিশাল কাশবন কোন্ তল্লাটে অথবা হাজার হাজার তালগাছ পাহারা দিচ্ছে কোন্ এলাকা—সব তথ্য জমা আছে গরিবের গোলগাল মাথার খুলির মধ্যে।

মুড়াই নদীর পারে এসে পৌঁছোলাম। নদীর ধারে একটা ঘাট, খানিকটা ধানখেত পেরিয়ে একটা ভাঙা মন্দির, তার পিছন দিকটায় আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা দূরে একটা গ্রাম দেখতে পাওয়া গে.। খোড়ো চাল, মাটির বাড়ি নিয়ে ছাড়া ছাড়া কয়েকটি পাড়া। প্রচুর গাছগাছালি। একটা বড়ো বাঁশবাগান, ফাঁকে সরু পায়ে চলা পথ। উঁচু ডাঙা জমির উপরে বিশাল একটা আদ্যিকালের ঝুরি-নামা বট। তলায় ধম্মো ঠাকুরের থান। এছাড়া আছে গাঁয়ের লাগোয়া মস্ত একটা টলটলে জলের দিঘি। জলজ ঘাসেরা সেখানে থাবা বসায়নি। ঝিরঝিরে হাওয়ায় নরম ঢেউ—এ দিঘিতে ফুটন্ত শাপলা-শালুকেরা দোল খাচ্ছে। এই দিঘির চারপাশের খাড়া খাড়া গাছগুলো জলের আয়নায় নিজেদের দেখছে। খেজুর গুঁড়ি বসানো আটপউরে ঘাটের খানিকটা দূরেই জলকলমি লতারা হালকা বেগুনি রঙের ফুলগুলোকে বুকে নিয়ে ব্যস্ত ফড়িংদের ওড়াওড়ির ফাঁকে একটুখানি বসে জিরোবার ব্যবস্থা। এখানেই একটুখানি জিরিয়ে নিলাম।

দিঘির পাড়ে ফোঁৎ করে দশাসই নাকের গহ্বর থেকে পোযাটাক ধুলো ঝেড়ে ফেলল গরিব। উচ্ছ্বাসের ফোয়ারা বইয়ে দিয়ে চিৎকার করে আবৃত্তি করে উঠল,

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি!

না, ওর কবিতা শোনার মতো মনের অবস্থা নেই। বসবার উপায় নেই। পেরিয়ে এলাম ভোলিএল গ্রাম। যা কিছু সামান্য ছিল তাড়াহুড়োয় সেটুকুও লুঠ করে নিল রূপ রায় নামে একটা দুষ্ট লোক। হিতৈষী সেজে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল সে, অসহায় অবস্থার সুযোগ নিল। সারাদিন ধরে হেঁটেছি। সন্ধে হয়ে আসছে এবার। কোথায় রাত্রি বাস করব, স্থির করতে পারি না। হাঁটছি আর দেখছি একটু একটু করে মেঘ ছড়াচ্ছে আকাশে। তারার আলো নিভতে শুরু করেছে। কিছু পরেই চারপাশে একটা পাক খেয়ে দেখি, কোথাও এতটুকু আলো নেই। যেটাকে রাস্তা বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে কাদা। পাঁচ হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। এই ধরাকে রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই রকমেরই ঘোর ঘন অন্ধকারে। সাথে ছিল অঝোর ধারায় বর্ষণ, আর অশনির ঘনঘটা। আমার জন্মভূমি ত্যাগ এই রকমই নিশুতি আঁধারে। শুধু বর্ষণ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সামনে দ্বারকেশ্বর নদী। হেমন্তের সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলাম। আজ এখানেই রাত্রিবাস করতে হবে। পরদিন সকালে দেখি, নদীর কূলে বিরাট একটা বটগাছ। তার ছায়ায় ছোট্ট একটা নৌকো বাঁধা। মাঝি নেই। নৌকোর ওপরে গিয়ে বসলাম সবাই। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে মাঝি এসে হাজির হল। নদীর বাঁধানো ঘাট জীর্ণ হয়ে পড়েছে। বটবৃক্ষ সেখানে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। কার্তিক মাস, কূলে কূলে ভরে আছে নদী। ভাঙা ঘাটের তিন চারটে সিঁড়ি কেবল বাকি আছে ডুবতে। ঘাটের পাশে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট কলাপাতা চর্বণ করছে একটা ষাঁড়। চারদিক নিস্তব্ধ। এমন সময় একজন মহিলার কণ্ঠে চিৎকার শুনতে পেলাম।

—ঘাটে কার নৌকো? নৌকো সরিয়ে নাও।

চিৎকারে সজাগ হলাম। মাঝির গান থেমে গেছে। সে জানতে চাইল—কে চিৎকার-করে?

মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল। তোমরা কেমন লোক গা? নৌকো সরাতে বলছি, নৌকা সরাচ্ছ না? মাঠাকুরানি যে ঘাটে নাইতে পারছে না।

মাঝি রেগে গিয়ে বলে, নৌকো সরাব না। তোমার মাঠাকুরানিকে অন্য ঘাটে গিয়ে নাইতে বলো।

মাঝিকে বললাম, মহিলারা ঘাটে এসেছেন, এখানে নৌকো থাকলে ওদের স্নান করতে অসুবিধা হবে।

মাঝি বলে, ঠাকুরানিরা যখন এতদূর আসতে পেরেছেন, তখন একটু কষ্ট করে অন্য ঘাটে গেলেই তো পারেন।

—আঃ। তুমি বড্ড কথা বলো।

আমার বিরক্তিতে মাঝি লগি তুলে নিয়ে নৌকা দূরে নিয়ে বাঁধল। ঘাটের কিছুটা দূরে বাঁশঝাড়ের বন। নদীর কূল ক্ষয়ে যাবার কারণে তা নদী বক্ষে ঢলে পড়েছে। তারই নীচে বাঁশের সাথে মাঝি নৌকা বাঁধল। নদীর বুকে খুব দ্রুত একটা নৌকো আসতে দেখলাম। নৌকোটা চলছিল খুব জোরে জোরে। মনে হল ফউজদারের নৌকো বুঝি। বাদশাহি কোশা তো এদিকে দেখতে পাওয়া যায় না। প্রকাণ্ড কোশা। একদিকেই পঞ্চাশখানা বইঠা পড়ছে। নদীর বুকে দু-তিনখানা মহাজনি নৌকো পাল টাঙিয়ে ধীরে ধীরে উজানে চলছিল। কোশাখানা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। কিছু গোলমালের আওয়াজ উঠল। আমি ভয় পেলাম।

মাঝি চিৎকার করে উঠল—ডাকাত পড়েছে, ডাকাত পড়েছে ওই দেখুন! তিনখানা নৌকাই এবার মরবে।

মহাজনি নৌকোর মাঝিমাল্লারা ঝপাং ঝপাং করে জলে ঝাঁপ দিল। হঠাৎ কোশাখানা এবারে তির বেগে ঘাটের দিকে আসতে লাগল। আমি প্রমাদ গুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘাট থেকে মহিলাদের আর্তনাদ ভেসে এল। কি করা যায় ভেবে পেলাম না।

মাঝি ফিশফিশ করে বলল, নৌকো এই বাঁশঝাড়ের ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। ওরা টের পাবে না।

ছোট্ট নৌকো অনায়াসে বাঁশঝাড়ের মধ্যে জায়গা পেল। বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে দেখলাম এক পাঠান ঘাটের ওপর স্নানরতা সেই মহিলাকে নৌকোয় তোলার চেষ্টা করছে। মহিলা চিৎকার করছেন। হরি, শ্রীমদুসূদন! কে কোথায় আছ, রক্ষা কর। কোথা থেকে একঝাঁক তির ছুটে এল বটে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হল। মহিলা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন ঘাটের সিঁড়িতে। মূর্ছিতা মহিলাকে তুলে নিয়ে দস্যুর দল নৌকো ভাসিয়ে দিল। ওদের নৌকো দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলে মাঝি আমাদের নৌকো খুলে নিল।

যশোদা মমতা সকলেই ভয় পেয়েছে। আমিও যে ভয় পাইনি তা নয়। এমনই একটা দিনের কথা মনে পড়ল। গ্রামে হরনাথের অবিবাহিত যুবতী কন্যাকে পাঠানরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তর্কালঙ্কারেব সঙ্গে প্রবীণেরা হরনাথের শাস্তি বিধান করেছিল। তার ধোপা নাপিত হুঁকো বন্ধ করে দেওয়া হবে। আলোচনায় একজন টিপ্পনী কেটেছিল, হরনাথ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের শাস্তি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

—বেশি কি? এরকম শাস্তি না দিলে, কিছুদিন পর হরনাথ পাঠান জামাইকে নিয়ে এসে ঘরে তুলবে। এ সমাজ রসাতলে যাবে। কালিদাস, তুমি কিছু বোঝ না? প্রবীণ চাটুজ্জে হিন্দুজাতিকে রক্ষায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

—তাই তো কী করা যায়? তর্কালঙ্কার ইতস্তত করছিলেন!

—দ্যাখো কালিদাস, তোমরা যদি হরনাথকে সমাজচ্যুত না করো, তা হলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

আমি তখন জানতে চেয়েছিলাম, হরনাথের অপরাধটা কী?

—বলো কি মুকুন্দ? চাটুজ্জ্যে অবাক হয়েছিলেন।

—গোস্বামীর কন্যাকে পাঠানেরা তুলে নিয়ে গেছে, অপরাধ নয়?

—কন্যা নদীতে স্নান করতে গেছে। দুষ্কৃতী তাকে তুলে নিয়ে গেল। হল পিতৃকুলের অপরাধ?

চাটুজ্জ্যে বলেন—কন্যা নদীতে স্নান করতে যায় কেন?

—এই গ্রামের কোন্ গৃহের মহিলারা নদীতে স্নান করতে যায় না শুনি?

—কিন্তু তা বলে সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে না?

—সমাজের তো কোনো ক্ষতি হয়নি চাটুজ্জ্যে মশায়।

—তুমি আর কথা বোলো না মুকুটি। তোমার বোন যখন মুসলমানের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিল। তখন তুমি তাকে গৃহে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করনি?

—সেজন্য আমাকে কম দণ্ড ভোগ করতে হয়নি। মুকুটি মশায় ব্যক্তিগত আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে তাঁর কন্যাসমা বোনটি এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। সেই নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ অনেক কিছুই গ্রামে ঘটে গেছে। তিনি চুপ করে গেলেন। আমি তখন জানতে চাইলাম, হরনাথের কন্যা কি পাঠানের সাথে স্বেচ্ছায় কুলত্যাগ করেছে?

—না। তা করেনি।

—অপুত্রক হরনাথের কন্যা পাঠান কর্তৃক অপহৃতা হয়েছে। আমাদের উচিত তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা।

—কি করবে? ওরা গোলাগুলি নিয়ে লড়াই করে। ওরা কি যা তা দস্যু, যে লাঠিয়াল পাঠাব? ফউজদার সুবেদার পর্যন্ত ওদের ভয় করে। সেখানে আমরা কি করব?

—গোস্বামীকে কিন্তু জাতিচ্যুত করা উচিত। চাটুজ্জ্যে তখনও তড়পাচ্ছিলেন।

—তোমরা মানুষ না পাষাণ? উপকার করতে পার না, অপকার করতে জানো। অভাগিনিকে উদ্ধার করার চেষ্টা না করে, তার পিতাকে জাতিচ্যুত করতে চাও? হে মহাদেব, এই সমাজ রসাতলে যায় না কেন? তর্কালঙ্কার শেষ চেষ্টায় কেঁদে ফেলেছিলেন।

কেউ একজন বলেছিল, অনেক হয়েছে। এবারে একটা কিছু করা দরকার।

হরনাথ অর্ধনগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তর্করত্ন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। সহানুভূতি পেয়ে বৃদ্ধ হরনাথ কাঁদছিলেন। বিলাপ করছিলেন, হায় হায়! মা আমার দুদিন উপবাসী ছিল। ব্রত শেষ করে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। দুর্বৃত্ত তাকে তুলে নিয়ে গেল। হায়! এ জগৎ সংসারে এমন কেউ কি নেই, যে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে পারে?

হরনাথের বিলাপ শুনে তর্কালঙ্কার তাকে বলেন, হরনাথ, তুমি গৃহে ফিরে যাও! তোমার কন্যা নিশ্চয় ফিরে আসবে। বিলাপ না করে, গৃহদেবতার কাছে তার মঙ্গল কামনা করো।

সেদিন আমি ভেবেছিলাম, হরনাথের কন্যা গৃহে ফিরলে তর্কালঙ্কারবা তখন কি বলবেন। হরনাথের কন্যা আর ফিরে আসেনি। এদেশে মেয়েদের ফেরার পথ সমাজ খুলে রাখেনি। আবার আজ ভাবলাম সেই কথা!

কোনো রকমে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে দামোদরকে বাঁয়ে রেখে পরাশর নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। নদীতীরে নদীর জলে নৌকায় নৌকায় দেখি লোকে লোকারণ্য। নদীবক্ষে যেন নৌবাহিনীর সম্মিলন হচ্ছে। চার-পাঁচ হাজার মনের নৌকো যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে ছোটো বড়ো অনেক নৌকো। ভাটার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। তার মধ্যে দু-এক খানা বজরা। একখানি বজরার কামরার সামনে দুজন মুসলমান রমণী বসে আছে। একজন যুবতী ও রূপসী। অপর জন প্রৌঢ়া। যুবতীর হাতে গজদন্ত নির্মিত সেতার। সেতারে সিন্ধুর মিঠা গত বাজছে। সুন্দরীর গোলাপের ন্যায় সুন্দর অধরে হাসির রেখা দূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় সম্ভ্রান্তবংশীয়া অথচ নর্তকী বলে বিশ্বাস হয় না।

কেউ একজন বলল, এ বাদশাহের বেটি। পাঠানেরা ধরে এনেছিল, এখন প্রাণের দায়ে ছেড়ে দিয়েছে। আর একজন বলল, এ ইরানের তাওয়াইফ, সুবেদারের মজলিশে মুজরো করতে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ ফকির শ্মশ্রুতে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে বললেন, রমণী নিশ্চয় পরিজাদি, আশমান থেকে নেমে এসেছেন আমাদের গান শোনাবার জন্য। হুরিপরি দেখার সময় নেই আমাদের। এখানে দাঁড়ালে চলবে না। আমরা পরাশর পার হলাম। যেতে হবে আরো দক্ষিণে—নিরাপদ কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে। এল গোচড়িয়া গ্রাম। এরই মধ্যে পথশ্রান্ত ক্লান্ত বিপর্যস্ত সকলে। এক মুঠোভাতের জন্য কাঁদছে যশোদা। তার করুণ চোখে

জলের ধারা গালের ওপব শুকিয়ে গেছে। সাবা রাত ও কেঁদেছে। পাছে কান্নার আওয়াজ হয়, ভয়ে কাপড়ে মুখ গুঁজে চেপে রেখেছিল।

উষার প্রথম আলোয় এসে পৌঁছলাম গনগনির মাঠের ধারে। সামনে বিরাট এক দিঘি। দিঘির পাড়ে এসে পাকুড় গাছের নীচে সবাই বসলাম। এবারে একটু বিশ্রাম নিতে হবে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেছে। তাছাড়া মুখেও কিছু দেওয়া প্রয়োজন। কিছুমাত্র সম্বল নেই। স্নানের তেল নেই। বিনা তেলে স্নান করল সবাই। সঙ্গে চালের সঞ্চয় বেশি নেই তাই উদক পান করা হল। এভাবে কতদিন বাঁচা যাবে জানি না। প্রাণ কোনো রকমে বজায় আছে। শিববাম বোঝে, যশোদা বোঝে না, ক্ষুধায় সে কেঁদে ফেলে। সকলে ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে কাতর। শ্রান্ত সকলে ঘুমিয়ে পড়ে গাছের তলায়।

দিঘিব জলে দেখি শাপলা ফুটে আছে। গরিব মানুষদের অনেক সময়ই দেখেছি অভাবের সময় গেঁড়ি, গুগলির সঙ্গে শালুক সেদ্ধ করে খেতে। রামানন্দকে বললাম দুটো শালুক ফুল তুলে আনতে। পাষাণ দেবতার উদ্দেশ্যে শালুক পোড়া দিয়ে নৈবেদ্য সাজালাম। মাথার উপরে ডিহিদারের অত্যাচারের নির্মম খাঁড়া ঝুলছে। পরিবারকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি আমি। পথই এখন আমাদের ঘরবাড়ি। এখানে দেবতার পূজা নৈবেদ্য সাজাব কীভাবে? এই সব ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। চণ্ডী আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখা দিলেন। ঘুমের মধ্যে দেবী চণ্ডীর আদেশ পেলাম। দেবী চণ্ডী আমাকে তাঁর প্রচাব উদ্দেশ্যে গীত রচনা করতে নির্দেশ দিলেন।

কবিলা পরম দযা
দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব

শালুক নাড়া দিয়ে সেদিনের মতো শিশুপুত্রদের ক্ষুধা দূব হল। এরপর কি হবে, ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে যায়। চণ্ডীব নির্দেশ পেযেছি। আমার ঘর নেই। ঘবে ভাত নেই। ছেলেমেযেরা অভুক্ত। এর মধ্যে দেবী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মঙ্গলগান রচনা কববার। আমি বৈষ্ণব, বংশ পবম্পরায় একসময় আমরা শৈব ছিলাম। কুলদেবতা গোপালের নিত্যভোগ দিই এখনও। ভগবতী'কে কি করে বোঝাব যে, আমি কি করে রচনা করব তাঁর বন্দনা গান?

চণ্ডীবাটীতে এসে পৌঁছোলাম। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করলাম। গুরুদেব কাশীনাথ তর্কালঙ্কার আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। টোলে ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াতে তিনি পটু। তসর নামাবলি গায়ে মানুষটির মাথায় কেশ বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। কেশাভাবে সেখানে চন্দনের ঘনঘটা। কপালে লম্বা চন্দনতিলক। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিভৃতে আলোচনা করলাম। জানতে চাইলাম তাঁর উপদেশ। তিনি চণ্ডী কথকথা লিখতে উপদেশ দিলেন।

দেবী আমাকে অভয় দিয়ে বলেছেন, আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাতেই তোমার ইষ্টদেবতার মূর্তি দেখতে পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই। তবু কুলগুরুর নির্দেশ নিলাম।

চণ্ডী বলেছেন, কিন্তু গান বাঁধব কোথায়? মাথার মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণার পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে

অনবরত। শিবরাম আর আমি পুকুরপাড়ে বসে নিমকাঠিতে দাঁত মাজি। আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম। সবাই যখন বিশ্রাম নেয়। আমি তখন লিখি—

জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা.....
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটি জার গাঁ
যুক্তি কইল গভির খাঁঞের সনে।
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥

দিবসের দ্বিতীয় প্রহর শুরু হওয়ায় আমরা চণ্ডীবাটী থেকে দ্রুত পদে ফিরছিলাম। তর্কালঙ্কারের গৃহ থেকে তিউটা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। দেখি পথে ভীষণ জনতা। দ্রুতপদে চলা অসম্ভব। তবুও সকলকে নিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত চলছিলাম। বাজার পার হয়ে এক অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হলাম। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান অট্টালিকা থেকে বাইরে এলেন। আমাদের পাশে পাশে দ্রুত চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম এক গৃহের সামনে তিনজন মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। এদের একজনের গায়ে কালো পরিধান। বাকি দু-জনকে দেখে মনে হল সাধারণ সেনা হবে। সেনা দেখে ভয় পেলাম। গৃহের সামনে বসে আছে একজন যুবক। কাতর কণ্ঠে সে বলছে যে, সে হিন্দু। সে মুসলমান হবে না। কৃষ্ণ বসন পরিহিত মৌলবির পা ধরে সে মুক্তি চাইছে। তাকে ছেড়ে দেবার জন্য মিনতি করছে।

মৌলবি বলছিলেন, কাল তোকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়েছি। আর আজ তুই বলছিস এ কথা? তুই জানিস না, তোর আত্মীয়-স্বজনরা তোকে নরকে পাঠাবে। তুই আমার সাথে পাণ্ডুয়া চল।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেই মুসলমান তাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, কী হয়েছে?

মৌলবি বললেন, এই হিন্দু গতকাল পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। আজ বলে কিনা আমি মুসলমান হব না।

মুসলমান অবাক হয়ে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মুসলমান হয়েছ?

যুবক তখন মুসলমানের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলে, হিন্দু মুসলমানের ভগবানের দিব্যি, আমি মুসলমান হতে চাই না।

এই মৌলবি আমাকে জোর করে মুসলমান করতে চায়।

—মৌলবি কি মিথ্যা কথা বলছে?

—হ্যাঁ হুজুর। আমাকে বাঁচান।

মুসলমান তখন মৌলবিকে বললেন, ও যা বলল বুঝেছ? তুমি জোর করবে না। কাজির কাছে যাও। তার কাছে তোমার অভিযোগের কথা বলো। তিনি ন্যায়বিচার করবেন।

—আমরা কাজির বিচারাধীন নই। আমরা খোদাতাল্লার সেবক। এ হিন্দু মুসলমান হয়েছে। আমি একে ধরে নিয়ে যাব। উত্তেজিত মৌলবি জবাব দিলেন।

মুসলমান কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, এ আকবর বাদশাহের এলাকা মৌলবি। এখানে তোমার গায়ের জোর চলবে না।

—আমাকে দণ্ড দেবার ক্ষমতা তোমার বাদশাহের বাবারও নেই। তুমি বেশি কথা বলবে না, তাহলে তোমাকেও ধরে নিয়ে যাব।

মৌলবির উত্তরে মুসলমান ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেন। মৌলবিকে তিনি বললেন, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। তুমি বাদশাহকে গালি দাও। আইন অনুযায়ী তোমাকে শূলে দেওয়া উচিত। তুমি কি এদেশে নতুন এসেছ? বাদশাহের আইন জানো না? তুমি এ স্থান ত্যাগ করো, নতুবা মরবে।

মৌলবি ততোধিক ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হয়ে বলল, তুই নিজে মুসলমান হয়ে আমার কাজে বাধা দিচ্ছিস? ব্যাটা কাফের।

এবারে মুসলমান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, পাষণ্ড, তোর কি মরতে ইচ্ছে হয়েছে?

মৌলবি মুসলমানকে গালি দিতে দিতে যুবককে জোর করে ধরে নিয়ে চললেন। মুসলমান যেপথে এসেছিলেন সেপথেই ফিরে গেলেন। আমরা দ্রুত স্থান ত্যাগের চেষ্টায় মৌলবিকে পাশ কাটিয়ে সামনে হাঁটতে লাগলাম।

পায়ে পায়ে নদীর পাড়ে এসে উঠলাম। দেশটা দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে! নদীকে দেখে মনে হয় নদীও মানুষের দুঃখের ভারে ভরা বহতা নদী। চারদিকটা ভালো করে দেখে নিই। ডিঙি নৌকো পেলে ভালো হতো। কিন্তু উপায় কী। যা থাকে কপালে বলে ছিপ নৌকোতেই উঠে পড়ি সবাইকে নিয়ে। এভাবে গড়াই নদী পার হলাম। ঘাটে কেউ নেই। পাড় থেকে আবার হাঁটা শুরু হল। সন্ধ্যা নেমে আসছে।

কদিনের পথচলার পরিশ্রমে ক্লান্ত সকলে। সঙ্গে নিত্য সঙ্গী উপবাস। উপবাসে উপবাসে ক্লিষ্ট শরীর। বেশিক্ষণ এক নাগাড়ে হাঁটা যায় না। মমতা যশোদা শিবরাম সবার অবস্থা কাহিল। ওদের নিয়ে দ্রুত হাঁটা অসম্ভব। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিতে হয়। তারপর আহারের সংস্থান করতে হবে। সাধারণত ভোর রাতের দিকে হাঁটা দিই। শীত আসতে বেশি দেরি নেই। ভোরের দিকে শীতের প্রকোপ লাগে। পথের বেশির ভাগ কর্দমাক্ত, প্রায়ই কাদায় পা ডুবে যায়। পরিচিত পথে হাঁটা নিরাপদ নয়, তাই যতদূর সম্ভব সেই পথ বর্জন করে চলি। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। দু'পাশের মাঠ আধো অন্ধকারে ঢাকা। বোঝা গেল ডান দিকের মাঠে একটা ব্যাং প্রবল আর্তনাদ করছে। ব্যাঙের ডাক অনেক শুনেছি। আর্তনাদ এই প্রথম। সম্ভবত সাপের পেটে যাচ্ছে ওটা। তখনই খেয়াল হল এই অন্ধকারে পায়ের সামনে সাপ পড়লে তো বুঝতে পারব না।

দ্রুত হাঁটলে ছোবল মারার সুযোগ কম। এই ভেবে সকলকে দ্রুত চলতে নির্দেশ দিই। নিজেও দ্রুত চলতে শুরু করি। কিছুক্ষণের মধ্যে বড়ো বড়ো গাছের মাঝখানে এসে পৌঁছাই। সব গাছ আমি চিনি না। এগুলো কি গাছ চেনা সম্ভব নয়। তবে বেশ ঝাঁকড়া। গাছের নীচে আসতেই আবার একটা কান্নার মতো শব্দ কানে এল। যেহেতু ওপর থেকে ভেসে আসছে তাই পাখির কান্না বলেই বোধ হয়। পাখিও যে মানুষের গলায় কেঁদে উঠতে

পারে তা জানা ছিল না। শরীরে কাঁটা ফুটল। ভূত-প্রেত নিয়ে কখনও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করি-নি।

ভূত-দুর্বলচিত্ত মানুষের কল্পনায় তৈরি। কিন্তু পরিবেশ কখনও কখনও ওদের অস্তিত্ব তৈরি করতে সাহায্য কবে। এই আধো অন্ধকার, অন্ধকারে ওই গোঙানির শব্দ, পাতার খসখস, পায়ের তলার কাদা-মাটি একত্রিত হয়ে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা ভূতের গল্পগুলোকে মনে পড়িয়ে দেয়। আমার মনেও সেই অনুভূতি কাজ করতে থাকে। দ্রুত হাঁটছি সবাই। কিন্তু কানের পর্দা থেকে গোঙানির আওয়াজ কিছুতেই দূর হয় না। কিছু অস্পষ্ট ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। বুঝতে পারি কোনো গ্রামে এসে পড়েছি। সম্ভবত এই গ্রামের নাম তিউটা হতে পারে। বাড়িগুলোব দরজা-জানলা দেখি সব বন্ধ। আলো জ্বলছে না কোথাও। রাত কত ঠাওর হয় না। ধ্রুবতারাকে দেখবার চেষ্টা করি। রাতে গ্রামের সব মানুষ ঘুমিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। একটা বড়ো বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বিস্তর ডাকাডাকির পর সাড়া মেলে। দুজন মানুষ বের হয়ে আসে। একজনের হাতে একটা মশাল, অন্য জনেব হাতে মোটাসোটা একটা লাঠি।

আমাদের দেখে ওবা বুঝতে পারে যে আমরা কেউ দুর্বৃত্ত নয়। ওরা জানতে চায়, কোথা থেকে আসছি এই রাতে? কোথায যেতে চাই? গঙ্গাদাসবাবুর নাম করি। বলি তিনি আমার পরিচিত। ওঁর সঙ্গে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক আছে। ওঁর কাছেই এসেছি। গঙ্গাদাসবাবু থাকেন দক্ষিণপাড়ায়। বাড়িটা একবাব দেখিয়ে দিন।

ওরা পথ দেখায়। সামনের মোড় থেকে ডান দিকে হাঁটলেই লক্ষ্য করি, কথা বলার সময দুজনে ঘুরিয়ে ফিরিযে আমাদের সকলকে দেখছিল। মনে হচ্ছিল ওদের সেই দৃষ্টি স্বাভাবিক ছিল না। দক্ষিণপাড়ায় ঢুকেও দেখি বাড়িগুলো সব অন্ধকাবে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। গাছপালাগুলোও সব নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুমা ঠাকুরদার ঝুলিতে ভূতুড়ে যে ধরনেব গ্রামের বর্ণনা থাকে হুবহু সেই রকমের মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে বিশাল বাড়িটাকে ঠাওর করতে পারলাম। বাড়িটাব কাছে এলে সব কিছু ঠিক ঠিক মিলে গেল।

গ্রামেব সবচেয়ে বড়ো বাড়ি গঙ্গাদাসবাবুর। অনেকদিন পরে তিউটা এলাম। গ্রামে কোঠা বাড়ি তত দেখা যায় না। এ বাড়ি তো বাড়ি নয়, একটা বড়ো অট্টালিকা। বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হই। তিনমহলা বাড়ি। বাড়ির পাশে একটা টলটলে দিঘি। সেখানে ফোটে পদ্ম শালুক। দিঘির বাঁধানো ঘাটের পাড়ে ভ্রমবের গুঞ্জন শোনা যায়। মনে পড়ে যায় বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে বসে, জলের ঢেউ দেখতে দেখতে এ বাড়ির মেয়েরা মাখা কয়েদবেল, গোঁড়া লেবু, তেঁতুল চেটে চেটে খায়। ঘাটের সিঁড়িগুলো অনেক নীচ পর্যন্ত চলে গেছে। সিঁড়িব শেষ ধাপে গিয়ে বসলে সেখানে শোনা যায় অতল জলের আহ্বান। সেই আহ্বানে সাড়া দিলে পাতালকন্যার সাক্ষাৎ মেলে। এই সবের মধ্যে আমার সরল, আনন্দিত শৈশবের একটা যোগাযোগ আছে। যা ফিরে পাওয়ার সৌভাগ্য এই জীবনে আর হবে না। কবে সেই ছেলেবেলায় এসেছিলাম এই বাড়িতে। গঙ্গাদাসবাবুর পিতামহের সময় থেকে এদের বাড়বাড়ন্তের শুরু।

ওপর দিকে তাকাতেই বাড়ির ছাতে একটা চলন্ত কালো বস্তুকে দেখতে পেলাম। মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। শুধু ছাদের একপাশ থেকে সেটা অন্য পাশে চলে গেল নিমেষে। হঠাৎ দেখা গেল, আবার মিলিয়ে গেল এমন। কেউ যেন উঁকি মারছে, আবার লুকিয়ে পড়ছে মনে হল। দ্রুত বাড়ির দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। দরজায় আওয়াজ করে হেঁকে উঠলাম—

গঙ্গাদাস বাবু—।

—বাড়িতে কেউ আছেন? দরজাটা খুলবেন?

বেশ কয়েকবার চিৎকার করবার পর দোতলা থেকে একটা গলার স্বব শুনতে পাওয়া গেল।

—কে? কে ওখানে? কী চাই?

—দামিন্যা থেকে আসছি। গঙ্গাদাসবাবু আমাকে আসতে লিখেছিলেন।

চেঁচিয়ে বলি।

—নাম কী?

—মুকুন্দ। দামিন্যার মুকুন্দ চক্রবর্তী।

নামটা বলার কিছুক্ষণ পরে হুকুম হল, কার্তিক, দরজাটা খুলে ওদের ভিতরে নিয়ে আয়।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা খোলা হল। বিশাল দরজার পেটের মধ্যে, একটা ছোটো দরজা। সেটা খোলাব সময় প্রাগৈতিহাসিক আওয়াজ শোনা গেল। অন্ধকারের মাঝে একটা মশাল এগিয়ে এল। দরজার পাল্লা একটু সরে দাঁড়াতে কার্তিককে দেখতে পেলাম। কার্তিকেব বয়স কিছু বেশি। কতগুলো চাবি তার ঘুনসিতে ঝুলছে। মুখ বড়ো রুক্ষ। বোঝা গেল দরজাটা ভীষণ ভারী। সকলকে নিয়ে ভিতবে ঢুকলাম। দরজা লাগিয়ে লোকটা আবার হুড়কো টেনে দিল। আবার সেই রকম একটা আওয়াজ হল। হুড়কোর আওয়াজটা আরও সাংঘাতিক। সামনে এগিয়ে আসা মশাল হাতে লোকটা আমার হাতবাক্সের দিকে একটা হাত বাড়াল।

বলল, ওটা দিন।

বললাম. থাক, এতটা পথ যখন বইতে পেরেছি তখন এটুকু নিশ্চয় পারব।

—না। কর্তার হুকুম।

—আঃ। বলছি তো বেশি ভারী নয়।

—না। ওর ভেতরে অস্ত্র থাকতে পারে। তর্ক না বাড়িয়ে লোকটা জোর করে আমার হাতবাক্সটা হস্তগত করল।

সঙ্গের সবাই অবাক হল। অবাক হলাম আমিও। আমাদের এগিয়ে দিতে আসা লোক দুটো চলে গেছে। মনের কোণে প্রশ্ন দেখা দিল, কেউ এবাড়িতে লুকিয়ে অস্ত্র নিয়ে আসতে পারে তাহলে? বাড়ির ভেতবে ঢোকার পর মশালের আলোয় বাঁধানো উঠোন চোখে পড়ল। দু পাশে চওড়া বিবাট দাওয়া। যে মানুষটি উপব থেকে কথা বলেছিলেন, তিনি এবারে নীচে নেমে এসেছেন। দেখলাম তাঁব পবনে ফতুয়া এবং ধুতি। বয়স ষাট পেরিয়েছে। তবে টানটান চেহারা। হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আমাব চিঠিটা কি আপনার সঙ্গে আছে?

—আছে। ধুতির কোঁচড় থেকে চিঠিটা বার করে তাঁর হাতে তুলে দিই।

সেটার উপর চোখ বুলিয়েই ভদ্রলোকের গলার স্বর বদলে যায়, ও হো! আমার লোক গিয়েছিল তো ঘাটে। আপনাদের তো দুপুরের খেয়ায় আসার কথা। আসেননি দেখে আমার লোক ফিরে এসেছে। একটা খবরও তো দেবেন। এই অন্ধকারে কাদা ভরা রাস্তায় কীভাবে এলেন বলুন তো?

অল্প কথায় ঘটনাগুলো জানালাম। বললাম, ঘাটে বসে রাত না কাটিয়ে হেঁটেই আসতে পারব ভেবে এগিয়ে ছিলাম। রাস্তার অবস্থা জানলে অবশ্য পা বাড়াতাম না।

—আপনার খুব ভাগ্য ভালো তাই সশরীরে পৌঁছোতে পেরেছেন। যাক এখন হাত-পা ধুয়ে সবাই একটু থিতু হয়ে বসুন গিয়ে। খাবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি, এখনকার মতো খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। পরে কাজের কথা হবে। এই বলে তিনি কার্তিক বলে সেই মশালধারী কাজের লোকটিকে আবার ডাকলেন।

বললেন, বাবুদেরকে স্নানঘরটা দেখিয়ে দে।

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। ওঁর খড়মের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র বাড়িটা আবার ভয়ংকরভাবে চুপচাপ হয়ে গেল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর খাবার নিয়ে এল কার্তিক। ভাত, ডাল, মাছ ভাজা, বেগুন ভাজা আর ক্ষীর। কার্তিক বিনীতভাবে বলল, এখনকার মতো এই সেবা করে নিন। পরে অন্য ব্যবস্থা হবে। আপনাদের খুব অসুবিধা হবে।

অসুবিধে। একবার ভাবলাম বলি, অসুবিধা বইকি! সারারাত মাঠেঘাটে পড়ে থাকতাম, এতো অমৃত পাওয়া।

কার্তিক বললে, আপনারা খুব ভাগ্যবান বাবু।

—কেন বলো তো? ঠোঁটের কোণে ঝুলছিল প্রশ্নটা।

—না। এত রাত্রে গনগনির মাঠ ভেঙে সশরীরে এলেন সবাই। তাই বলছি।

—কেন? ওখানে কী হয়? আমার তখন খুব জানবার ইচ্ছা।

কার্তিক বললে, জানেন না? ওখানে তেনারা সব থাকেন।

—তেনারা? কে তেনেরা?

—ওই যে, রাম রাম বলে কপালে হাত ছোঁয়ায় কার্তিক! বলে, তেনাদের নাম করতে নেই গো। মৃত আত্মারা সব।

—ও। হাঁপ ছাড়ি। বললাম, না। ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।

ছেলেমেয়েরা খাওয়া শুরু করল। আমার খাওয়ার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। যদিও গত রাতে সেই কখন দুমুঠো খুদকুঁড়ো খাওয়া হয়েছিল। তবু মমতা কিছু তুলে ধরল মুখের সামনে।

খেতে খেতেই কথা হল।

—আচ্ছা কার্তিক। তোমাদের গ্রামের মানুষরা দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকে কেন? এখানে কী খুব ডাকাতি হয়?

—ছোটো মুখে বড়ো কথা কি মানায় বাবু? আপনি এসব কর্তার মুখে শুনবেন।

মনে হল কার্তিক নড়ে উঠল আমার কথায়। সে বললে, আপনাদের খাওয়া হয়ে গেলে সকড়ি বাসন উঠোনে নামিয়ে রাখবেন। কাজের লোক নিয়ে যাবে। দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। অসুবিধা হলে ঘরের বাতিটা জ্বেলে রাখবেন।

আচ্ছা আমি এখন যাই। বলে, কার্তিক চলে গেল।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। গনগনির মাঠ পেরোতে অতটা কাদা-জলের হাঁটাহাঁটি করে শরীর বোধহয় আরাম চাইছিল।

দেখলাম, বেশ রোদ উঠে গেছে। টকটকে বেলা। হাত-মুখ ধুয়ে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছে। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম কথাবার্তা কী বলব? যদি অসুবিধা মনে হয় এখানে আশ্রয় নেওয়া ঠিক হবে না। তাহলে কোথায় যাব? চণ্ডীবাটী? ঠিক। এখানে না পোষালে চণ্ডীবাটী ফিরে যাব মনে মনে স্থির করে রাখলাম। সকাল সকাল কথা সেরে নেব। তাহলে কথা সকালেই যদি হয়ে যায় তাহলে দুপুরের খেয়া ধরে ফিরে যাব।

ঘোমটা দেওয়া এক কাজের মহিলা প্রাতরাশ নিয়ে এল। লুচি, বেগুনভাজা, আর ক্ষীর।

আবার ক্ষীর। বুঝলাম এ বাড়িতে দুধের কোনো অভাব নেই। কিন্তু এত সকালে এত আহার করার অভ্যেস আমার নেই। তাই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললাম। মমতা ইতস্তত করছিল। বলল, কিছুই তো তখন খেলে না।

আমি বললাম, এখন তো আমি এসব খাই না।

মহিলা বললেন, মা রাগ করবেন।

মা কে তা জানি না। তবু বললাম, তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন।

অনিচ্ছা নিয়েও স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইল। ছেলে-মেয়েরা খাবে, বলে খাবার নামিয়ে রেখে মহিলা চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে কার্তিক দরজায় এল। এ কী আপনি কিচ্ছু খেলেন না?

—সকালে আমি কিছু খাই না। তাছাড়া আমার খিদে পায়নি।

—অ। কার্তিক বলে, কর্তা আপনার জন্যে বাগানে অপেক্ষা করছেন।

—চলো। বলে উঠে পড়লাম।

কার্তিকের সঙ্গে বাগানে গেলাম। বাগানটি ফুলের নয়। নানান ধরনের সবজির চাষ চারপাশে। মাঝে দুটো বসবার আসনচৌকি। যার একটিতে বসেছিলেন স্বয়ং কর্তা। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুম হয়েছে?

হ্যাঁ। খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই-

—বসুন। হ্যাঁ, প্রথমে আপনার বর্তমান অবস্থার কথা একটু বিশদে শুনি।

—চিঠিতে আমি যা লিখেছি তার বেশি কিছু আমার বলার নেই। বললাম।

—আপনার বয়স তো বেশি নয়।

—আজ্ঞে উনপঞ্চাশ।

—আর একটা পরিবার করলে কেমন হয়?

চুপ করে থাকি। কি বলতে চাইছেন উনি, তা বুঝবার চেষ্টা করি।

—আপনার সঙ্গে যারা এসেছেন আপনার পরিবার?

—হ্যাঁ। স্ত্রী। ছেলে-মেয়ে সকলেই আছে। আছে ভাই এবং বন্ধু।

—ব্রাহ্মণ। ছোটো পরিবার তা এত অভাব কেন?

—কৃপণ নই যে।

—এবার বলুন, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

—হ্যাঁ। আপনি দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে কী বলতে চাইছেন?

—বছর সাতেক আগে আমি আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সন্তান। মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া সুন্দরী একটি মেয়েকে আমার পুত্রবধূ করে এবাড়িতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। বিয়েও হল খুব ধূম করে। সেদিন ওদের কালরাত্রি। বর কনেকে আলাদা আলাদা থাকতে হয়। ছেলে গেল বন্ধুদের সাথে গান শুনতে পাশের গ্রাম খরবাড়ি। মাঝরাতে ফেরার সময় জঙ্গলের পথে তাকে সাপে কাটল।

তিনি চুপ করলেন। চুপ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ।

এবারে লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের বয়স অনেক। ছিয়াত্তর চলছে নাকি এমনই শুনেছি। ভালো করে দেখে বুঝলাম, ভদ্রলোক বার্ধক্যেও সুপুরুষ। তিনি আবার কথা শুরু করলেন।

—আমার ছেলের ফুলশয্যা হল না। মেয়েটির মামা এল খবর পেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, এ অবস্থায় মেয়েটির কী দশা হবে?

—আমি বললাম, বউমা যদি আপত্তি না করেন তাহলে আমি তাঁকে নিজের মেয়ে ভেবে মাথায় তুলে রাখব। আমার তো কোনো মেয়ে নেই। সেই থেকে বউমা আমার মেয়ে হয়ে এখানে আছেন। কিন্তু আমার তো বয়স হচ্ছে। আমার পরে তাঁর কী হবে? এই ভাবনায় আমি মরতেও পারছি না। তাই আপনাকে অনুরোধ।

—আপনি কি তাহলে বিধবা বিবাহ করতে বলছেন?

—বিধবা কি বলছেন মশাই? বিয়ের লগ্ন ছিল মধ্যরাতের পরে। সেসব চুকতে চুকতে ভোর হয়ে যায়। পরদিন বেলায় ফিরে আসে সবাই আমার বাড়িতে। সেদিনেরই রাত ছিল কালরাত্রি-সব অর্থেই। ওই রাত্রিতেই ছেলেটা আমার শেষ হয়ে গেল। মেয়েটা নিজেকে বিবাহিতা ভাবার অবকাশই পেল না। আপনি আমার সেই মাকে বিধবা বলছেন?

তিনি এবার আমার দিকে ফিরলেন।

বললেন, অবশ্য আপনি আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।

মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠছিলাম। ছেলের বধূকে নিজের মেয়ে মনে করে ইনি আবার বিয়ে দিতে চাইছেন। এ ধরনের ঘটনা সচরাচর ঘটে না। জিজ্ঞাসা করলাম, তা এখন তাঁর বয়স কত?

তিনি গলা তুললেন, কার্তিক!

কার্তিক হাজির হলে বললেন, মাকে একবার এখানে আসতে বল।

—এজ্ঞে যাই কর্তা।

মাথা নেড়ে সে চলে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

তিনি অভয় দিলেন, স্বচ্ছন্দে।

—রাত্রে এই গ্রামে ঢোকার পর থেকে লক্ষ্য করছি গ্রামে সবাই যেন কেমন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। অস্ত্র হাতে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। ব্যাপারটা কী?

তিনি মাথা নাড়লেন, ও এই ব্যাপার। আসলে এখানকার মানুষ খুব ভয় পেয়েছে।

—কীসের ভয়? ডাকাতের?

—না।

—তাহলে?

—গত ছ'মাসে এই গ্রামে তিনজন বাইরের মানুষ মারা গিয়েছে। এদের শরীরে কোথাও সামান্য ক্ষতচিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আর প্রতিটি ঘটনাই ঘটেছে রাত্রে। গুজব ছড়িয়েছে। গ্রামের রাস্তায় দুষ্টু আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফলে সন্ধের পরপরই দরজা জানলা বন্ধ করে দিচ্ছে সবাই। সকালেই কয়েকজন এসেছিল আমার বাড়িতে। তারা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, রাতে এ বাড়িতে কেউ এসেছে কিনা। আর এসে থাকলে তারা বেঁচে আছে কিনা। ওরা অবাক হয়ে ফিরে গেল, আপনাদের দেখে। এসব অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না। তবে—

কথার মাঝখানেই তিনি এলেন। বাগানের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দেই তিনি হেঁটে এলেন।

দেখলাম, বিন্দুমাত্র সাজগোজ ছাড়াই রীতিমতো সুন্দরী এক নারীকে। একসময় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়। তবে একটু শীর্ণ। আর অত্যধিক ফরসা। রক্তশূন্যতাও হতে পারে।

—আমায় ডেকেছেন বাবা?

গলাটিও ভারী মিষ্টি।

—হ্যাঁ মা। গঙ্গাদাস আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি আমাদের অতিথি।

নারী হাত জোড় কবে নমস্কার করলেন। তাঁর দৃষ্টি নিম্নগামী।

আমিও প্রতি-নমস্কার জানালাম।

—বাতে আপনাদের খেতে অসুবিধা হয়েছে বলে আমি দুঃখিত। তিনি বললেন।

—সে কী। দোষ তো আমাদেরই। না জানিয়ে এসেছি একেবারে রাতে। অবশ্য আমাদের একটুও অসুবিধা হয়নি।

গঙ্গাদাস বললেন, আপনার আসার কথা ছিল বিকেলে। রাত্রে আসছেন জানলে নিষেধ করতাম। তেমন হলে ওপারের খেয়াঘাটেই রাত কাটাতে বলতাম।

তিনি বললেন, হ্যাঁ! ভাগ্য আপনাদেরকে সাহায্য করেছে।

—ভাগ্য? ভাগ্য আপনি বিশ্বাস করেন? জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

স্মিত হেসে তিনি বললেন, করি বইকি।

এবার আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। নীচের দিকে তাকিয়ে বললাম, অবশ্য আমার কাছে ডাকাতরা আর কী বা পেত।

—ঠিকই। যাক গে, আপনারা কথা বলুন। আমার কিছু কাজ আছে, সারি গিয়ে।

কথাগুলো বলে গঙ্গাদাস উঠে পড়লেন।

এবার তাঁকে দেখলাম। দেখলাম তিনিও স্থির চোখে আমাকে দেখছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কেন এবাড়িতে এসেছি।

—জানি। তিনি নীচু গলায় বললেন।

—তাহলে আপনার আপত্তি নেই তো?

—আমার কথা পরে। এখানে আসার পরে, আমায় দেখে, এ বাড়ির আবহওয়া দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে তাই বলুন।

—এখনও কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। তবে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। শ্বশুর পুত্রবধূস্থানীয়াকে নিজের মেয়ে ভেবে নিয়ে আবার তাঁকে সংসারী করতে চাইছেন, এই ব্যাপারটা একটু অভিনব নয় কি?

—আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি কি আরো কিছু জানতে চান?

—সাধারণত বিধবা হওয়ার পর মেয়েরা বাপের বাড়িতেই ফিরে যান। আপনার তো স্বামীর সঙ্গে একটি রাতও কাটেনি। তাহলে আপনি কেন এখানে থেকে গেলেন? কোন্ আকর্ষণে? জিজ্ঞেস করলাম।

—প্রথম কথা আমার কোনো বাপের বাড়ি ছিল না। থাকতাম তো মামার বাড়িতে অবাঞ্ছিতের মতো। এখানে স্বামী না পাই, পিতৃস্নেহ পেলাম। আমার নিজের বাবা-মা'য়ের কোনো স্মৃতি নেই। বিয়ের আগে আমার সম্মান নিয়ে কেউ ভেবেছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু এখানে যা আমি পেয়েছি, সেটা মামার বাড়িতে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

তিনি এবারে থামলেন।

—আমাকে কি আপনার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়? সরাসরি জানতে চাইলাম।

হাসলেন তিনি।

বললেন, গ্রহণ তো করে পুরুষেরা। মেয়েরা কেবল মেনে নেয়। সত্যি কথা বলতে কী, দেখুন বিয়ের কোনো বাসনাই আর আমার মধ্যে বেঁচে নেই। ওসব আমার মধ্যে মৃত। কেবল বাবাকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া আমার কোনো চাহিদা নেই।

—বুঝলাম।

—কী বুঝলেন?

—বলব না। আপনাদেব এখানে অদ্ভুত আতঙ্ক রাত্রে।

—আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?

হাসলাম। বললাম, করি, আবার করি না।

—মানে?

—আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আমি পালটা প্রশ্ন করলাম।

তিনি উত্তর দিলেন, ঈশ্বরকে বিশ্বাস? করি, আবার কবি না।

—রাত্রে বাড়ির ছাতে আপনি ঘোরাফেরা করছিলেন না? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—কেন বলুন তো? তাঁর চোখ দুটো ছোটো হল।

—না এমনি জানতে চাইলাম।

তিনি এবার বললেন, আমার মনে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতেই আপনাদের এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো।

—কারণটা জানতে পারি কি?

—আপনি বাইরের লোক। এখানে যারা রহস্যজনক ভাবে মারা গিয়েছেন তারা সকলেই বাইরের লোক।

—এদিকে কি ডাকাত আর পাইকদের অত্যাচার খুব বেশি? নাকি যারা মারা গেছে, সব ডিহিদারের লোক?

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশির করে একটা নাম না জানা সরীসৃপ যেন নেমে গেল। কিন্তু তাঁর কথায় মনে সাহস এনে বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আমায় অন্য কিছু ইঙ্গিত করছেন?

—না। যা ঘটেছে তাই বললাম।

গঙ্গাদাস ফিরে এলেন। বললেন, কি, কথাবার্তা সারা হল?

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, হ্যাঁ।

—বাবা আমি এখন যেতে পারি? নীচু গলায় তিনি জানতে চাইলেন।

—এসো মা।

গঙ্গাদাস মাথা নাড়তেই তিনি চলে গেলেন আবার তেমনই ভাবে, যেমন ভাবে এসেছিলেন। ছন্দে ছন্দে যেন তাঁর চলার পথে একটি করে কমল ফুটে উঠল।

—মা আমার বড়ো ভালো মেয়ে। বয়স হচ্ছে, আমি চলে গেলে মায়ের যে কি হবে, এই ভেবে ঘুমোতে পারি না। বললেন গঙ্গাদাস।

গাছপালার ভিতর দিয়ে তাঁর চলে যাওয়ার পথটি দেখছিলাম।

বললাম, আলাপ হল। ভালো লাগল।

—এখনই আপনাকে কিছু বলতে হবে না। ভেবেচিন্তে বললেই হবে। যদি আপত্তি থাকে তাহলেও জানাবেন।

—নিশ্চয়ই। আমি তাহলে তৈরি হয়ে নিই?

—সে কী কথা! আজই চলে যাবেন?

—হ্যাঁ।

—স্নান খাওয়া না সেরে চলে যাবেন?

—হ্যাঁ

—আমার অকল্যাণ হবে যে!

—কিচ্ছু অকল্যাণ হবে না। এখনি রওনা দিলে দুপুরে খেয়ায় পার হয়ে যাব। বিকালেই পৌঁছে যাব গন্তব্য স্থলে। নইলে আমারও ওদিকে রাত হয়ে যাবে।

—তাহলে চলেই যাবেন? এখানে কিছুদিন বাস করলে হয় না?

—না।

—কার্তিক, এঁদের তবে তুই তুলে দিয়ে আসবি। হ্যাঁ, এখন কোন্ দিকে যাবেন।

—দেখি।

—ঠিক আছে। তাহলে ওই কথাই রইল। আমিও একটু বেরুব। মুকুন্দ মাথা নাড়তে বৃদ্ধ করুণ মুখে চলে গেলেন। কার্তিক, মাকে বল কিছু চিঁড়ে বাতাসা বেঁধে দিক।

আমার আর গোছাবার কি আছে? বাগানটি বেশ বড়ো। ফলের গাছ ছাড়াও শাকসবজির চাষ হয়েছে। তাদের নধর চেহারা দেখে চোখের খুব আরাম হল। সীমানার দিকে বিচিত্র সব আকাশমুখী গাছ। কত বছর ধবে এরা দাঁড়িয়ে আছে মনে মনে তার একটা হিসাব কষি। একটা জঙ্গল যেন। সেগুন, শাল, পিয়াল, পলাশ, অশোক, দেবদারু, তমাল কত রকমের সব বৃক্ষ। বৃক্ষ আদি প্রাণ, বৃক্ষের সাথে মানুষের অনাদিকালের আত্মীয়তা। কত আনন্দ! বৃক্ষ ফল, ফুল, ছায়া আশ্রয় দিচ্ছে জীবজগতকে। উদ্ভিদের মধ্যে কত বৈচিত্র্য, গন্ধ, বর্ণ। উদ্ভিদকে ঘিরে কত পশুপক্ষীর জীবন। মানুষের জীবিকা অরণ্যকে অবলম্বন করে। জঙ্গলের শ্যামল শোভা, সবুজ বনানী আমাদের তাপিত চিত্তে আনন্দের ঝরনাধারা বইয়ে দেয়।

তাল নারীকেল নগবে শোভা
শঙ্কব পূজিতে রাখিল বেলবন।
পটতরু বাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জন বিশ্রাম ॥

আমার মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার সেই ঘটনা। উন্মত্ত ঝড়ে আম কুড়োনোর স্মৃতি। ধুপধাপ তাল পড়ার শব্দ? গ্রীষ্মে আম জাম কাঁঠাল লিচু পেয়ারা কলা খেয়ে খেয়েই সকলে আনন্দে আত্মহারা। ঘন বর্ষায় পুকুর নদীর মাছ একেবারে ঘরের উঠোনে উঠে আসে। ছুটে ছুটে চলে সেই মাছ ধরা। সেই মাছ ধরাও ছিল কত আনন্দের। নদীতে কলার ভেলায় ডিঙি ভাসানো। দুষ্টুদের সাথে পাল্লা দিয়ে সাত সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি যেন এমনি ভাব। বৃষ্টি স্নাত মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধে মন পাগল করা বৃষ্টি ভেজার আনন্দ। সেই আনন্দ জানিয়ে দেয়, ফসল ফলবে ভিজে বুক চিরে। সবুজ ধানের গাছ মাথা তুলবে আকাশে। ধানের মাথা সাজবে শিষের মুকুটে। সবুজ ধানের শিষ মাথা উঁচু করে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকবে ভোরের শিশিরের অপেক্ষায়। শিশির নেমে আসবে তার প্রস্ফুটিত ঠোঁটের ডগায়। আর সেই ভারে চুপটি করে নুয়ে পড়বে ধানের গাছ। কয়েকদিনের অপেক্ষা, তারপরই দুধ জমে উঠবে ধানের শিষের খোলের ভিতরে। সেই দুধ জমাট বাঁধবে। তৈরি হবে ধান। মাঠের পর মাঠ ভরবে সোনালি ধানে। ধানের খেতে ঝিলমিলিয়ে উঠবে ঢেউ। এসব কি ভোলা যায়?

এমনি করে আবার যখন সরষে চাষের সময় হবে, আদিগন্ত মাঠে তখন ছড়িয়ে পড়বে সরষে খেতের বিস্তার। সবুজ, নীল, হলুদ মিশে আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যায়। মাঠে মাঠে প্রজাপতি, ফড়িং আর মৌমাছিদের চঞ্চলতা বাড়ে। পাখিদের অক্লান্ত গানে ভরে ওঠে চারদিক। এমনি করে ভালো লাগে নদীর কলতান। নদীর পাড়ে বৃদ্ধ বটের নীলাঞ্জন ছায়া। মাঠের পর মাঠ জমিতে আল দিয়ে সীমানা বাঁধা, কিন্তু আকাশ সাম্যবাদী। তার কোনো সীমানা নেই, তার আছে শুধু নীল সীমানা। তাতে গরিব ধনী সবার সমান অধিকার। প্রশান্ত আকাশ শ্রেণিহীন ভাবে চাঁদ, সূর্য, তারার আলো বিলিয়ে দেয়। নেই কোনো আল, নেই

কোন বেড়ার বন্ধন। এসব কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাই নেই কারো সাথে ঝগড়া।

পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। তোমার অতীত থেকে তুমি কখনো বিচ্ছিন্ন হোয়ো না। মানুষ জীবনের পথে 'করতে করতে' 'শিখতে শিখতে' এগিয়ে চলে। কতদিন আগে মানুষের জন্ম হয়েছে। মানুষ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ভেবেছে, আমায় বাঁচতে হবে, আমায় শিখতে হবে, আমায় জানতে হবে। এখানে দিন এসে রাতের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশে গোল থালার মতো সূর্য ওঠে। ভীষণ তার দীপ্তি। ভীষণ তার উত্তাপ। আকাশের পথ ধরে এগোতে এগোতে সেই থালা আকাশের ঢাল বেয়ে নেমে যায় নীচে। তারপর অন্ধকার। মাথার ওপর জেগে ওঠে শূন্যতা। সেই শূন্যতায় জেগে ওঠে ছোটো, বড়ো অসংখ্য আলোর বিন্দু। সেখানে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে আসে আর একটি আলোর টিপ। তার নাম চন্দ্র। রুপোর মতো নরম আলো চারপাশে ছড়িয়ে দেয় যে। আকাশের একটি আলো সোনার মতো উজ্জ্বল আর একটি আলো রুপোর মতো মিষ্টি। তার একদিকে থাকে নীলিমা, আর একদিকে থাকে কালো অন্ধকারের চাদর।

মানুষ তখনও সোনা দেখেনি, রুপোর সঙ্গে হয়নি তখনো মানুষের পরিচয়। মানুষের তখনো ভাষা জ্ঞান হয়নি। মানুষের তখন শুধু ধ্বনি আছে, অক্ষর নেই। খিদে আছে, রন্ধন নেই। নিদ্রা আছে শয্যা নেই। হাত আছে, হাতিয়ার নেই। গাছে গাছে পাখি ডাকে। মানুষ পাখির ডাককে নকল করে। নকল করতে চায় প্রকৃতির সব কিছু। নকল করতে করতে মানুষ শেখে, জানে। শিখতে শিখতে মানুষের জ্ঞান হয়।

হঠাৎ কানের কাছে ডাক এল, চলুন।

দেখলাম কার্তিক চলে এসেছে। তার এক হাতে তেল চকচকে সেই লাঠি। আর এক হাতে একটা বড়ো পুঁটুলি। হ্যাঁ ঠিকই, খালি পেটে তো সৌন্দর্য উপভোগ্য নয়। পা বাড়াই কার্তিকের সাথে।

একটা বাড়ি যে এত লম্বা হতে পারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ি। এখন সাত শরিকে থাকে যদিও সবাই ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের যে পাশে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে পরপর চারটে ঘর আর বিশাল উঠোন। উলটো দিকে তিনটে বড়ো বড়ো ঘর লাগোয়া দাওয়া। সবাই তৈরি ছিল। বাক্য ব্যয় না করে সবাই হাঁটতে শুরু করল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কার্তিককে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কতদিন কাজ করছ এ বাড়িতে?

—এঁজ্ঞে, সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে।

এক পাশে বিশাল দিঘি। দিঘিতে মাছ আছে ভালো বলেই মনে হয়। গাছে পাকা আম ঝুলছে। বারোমেসে আম। আম অমৃত ফল, ফলের রাজা। মউমাছিদের গুঞ্জন আম গাছের ডালে ডালে। এই গ্রামে কয়েকজন মানুষ খুন হয়েছে। কিন্তু তাদের মৃত্যু-রহস্য অনাবিষ্কৃত। আঘাতের কোনো চিহ্ন ছিল না মৃতদের শরীরে। এটা কি করে সম্ভব? বহিরাগত মানুষ মরেছে। কিন্তু কে মারল তাদের? কেনই বা মারল? তাদের কি মরার আর কোনো জায়গা ছিল না? এখানে এসে সবাই আত্মঘাতী হয়েছে? না পাঠান পাইকদের কাজ? এই সব

ভাবতে ভাবতে গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলেছি। চারপাশের বাড়িগুলো সব নিঝুম। এই বেলাতেও কেউ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। একসময় গ্রামের প্রান্তে এসে থামি।

বলি, কার্তিক এবারে তুমি ফিরে যেতে পারো।

কার্তিক মাথা নাড়ে। না। আপনাদের গনগনির মাঠের পাশ দিয়ে যেতে হবে। চলুন আরো এগিয়ে দিয়ে আসি।

এই পথেই রাতে এসেছি। রাতের সেই বিভীষিকাময় রাস্তা এখন দিনের আলোয় কত সুন্দর। জঙ্গুলে পরিবেশ। চারদিকে জঙ্গল, ঝাঁকড়া গাছ চারপাশে। তবু এখন আর কোনো ভয় লাগে না। বললাম, কার্তিক, আমাদের জন্য তুমি আবার এত কষ্ট করবে।

কার্তিক কোনো কথা না বলে হেঁটে চলে। আবার দাঁড়ালাম।

বললাম, খেয়াঘাট আর তো বেশি দূরে নেই। অনেকটা পথ আবার তোমায় ফিরতে হবে। এবার তুমি ফিরে যাও।

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনাদের খেয়া নৌকোতে তুলে না দিয়ে আমার ফেরা হবে না।

—সে কী! তোমার ফিরতে তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে যে।

—হোক দেরি। আসলে মন থেকে ভয়টাকে সরাতে পারছি না। কার্তিক বলে।

বুঝতে পারলাম না, কার্তিকের এত ভয় কেন।

বললাম, তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ কার্তিক।

—না না। ওরাও ছিল বাইরে লোক। আপনারাও—

চকিতে মনে পড়ে গেল ওই কথাগুলো। জানতে চাইলাম, আচ্ছা কেন ওদের মরতে হয়েছিল কার্তিক?

—তা তো জানি না।

—তাহলে?

খেয়াঘাটে এসে উপস্থিত হই। হেসে বলি, ব্যাস আর তোমার কোনো চিন্তা নেই। এবারে তুমি ফিরে যাও।

কার্তিক মাথা নাড়ল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বলল, আবার আসবেন কর্তা, মামনি আপনার পথ চেয়ে থাকবেন।

কার্তিক চলে গেল।

হাসলাম। মৃদুভাবে বললাম, গ্রাম তো রূপকথারই দেশ। ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমি, পক্ষীরাজ, রাজপুত্র, রাজকন্যা, জিয়নকাঠি, মরণকাঠি, প্রাণভোমরা, মন পবনের নাও—সব কিছুই তো পাওয়া যায় গ্রামের মাটিতে। কিন্তু তোমাদের এই গ্রাম, যেন মৃত্যুপুরী। এখানে প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই। যেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই সেখানে আমিও নেই, আমার পক্ষে তা অসহনীয়। তোমাদের গ্রামে আর কোনো দিন আমি ফিরব না কার্তিক।

কুল শীল রূপ গুণ জীবন যৌবন ধন
বিধবার সকলি বিফল।
সন্ত স্বামীর সখা, মোরে আসি দেহ দেখা,
কুণ্ড কুড়ি জালিব আনল ॥

জীবনের অপচয় আমাকে পীড়িত করে। রতি'ও সরস্বতীকে বলেছিল,

আনলে পুড়িয়া নষ্ট না করহি তনু।
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু॥

নদী পার হই। সবুজ মাঠে গোরু চরায় রাখালরা। তারা গোরু নিয়ে ঘরে ফিরছে। রাখালিয়া বাঁশির মেঠো সুর মনকে উদাস করে দেয়। মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে। দেখি পুকুর, দিঘি, নদী-নালা খাল-বিল-ঝিল প্রকৃতির সব উপহারই সাজানো রয়েছে থরে থরে। নদীর জলে ছোটোরা সাঁতার কাটে। চিৎসাঁতার, ডুব সাঁতার সবতেই তারা পারদর্শী। গাঁয়ের বধূ স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে বাঁশ তলা দিয়ে হেঁটে ঘরে যায়। বউ-ঝি'রা কাঁখে কলসি নিয়ে দুলকি চালে হাঁটে। ওদের জলভরা কলসিতে আছে মূল্যবান তৃষ্ণার জল। তৃষ্ণা আমাদের বুকে। তৃষ্ণা মেটে না। মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই। আহারের সংস্থান নেই। পরনে এক বস্ত্র। এমনি করে কি দিন যায়? মনের কথা লিপিতে আসে?

গঙ্গাদাস সহৃদয় মানুষ। সাহায্য করেছেন। আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। কয়েক দিনের মতো আহার্যসামগ্রীও সঙ্গে দিয়েছেন। কিছু অর্থও দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন যখনই প্রয়োজন মনে হবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি। কোনো সংকোচ যেন মনে স্থান না দিই। এই ব্রাহ্মণের সেবা করতে পারলে নিজেকেই তিনি ধন্য মনে করবেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি। কন্যাসমা পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি আকুল। এদেশের নারীদের ভবিতব্য শিশুকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র। এই শৃঙ্খল কোথাও ছিন্ন হলেই দুর্ভাগ্য তাদের টুঁটি চেপে ধরে। মেয়েরা এদেশে কবে যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে কে জানে! এদের সীতা সাবিত্রী হয়েই থাকতে হয়। অথচ রূপমঞ্জরী সে তো এই দেশেরই মেয়ে? সে কি করে এমন হল?

একদল মানুষ সার দিয়ে চলেছে। কেউ মাথায় মোট নিয়েছে, বাকি আছে কয়েকজন, কেউ বা কোলে কাঁখে যে যেমন করে পেরেছে মোট নিয়ে চলেছে। ডুলিতে চলেছে অধিকারী। কোনো গ্রামে পদাবলি গান বা কীর্তনের আসর বসেছিল, ওরা এবার ফিরে যাচ্ছে। আবার নতুন কোনো গ্রামে ওদের আসর বসবে। জমিদারমশাই আসবেন দেখতে। বকশিশ দিয়ে যাবেন শিল্পীদের। আবার তারা চলে যাবে অন্য কোথাও। চলাই ওদের জীবন। গ্রামে কীর্তনের আসর যেন কুটুম বিদেয়-এর মতো ব্যাপার। পিছনে পড়ে থাকে বাসি ফেলে যাওয়া পাঁপর ভাজা, মাটির ভাঙা খেলনা। তখন মন যেন কেমন হয়ে যায়।

এমনি করে আমরাও এসে পৌছোই কোনো গ্রামে। এক বুড়ি ডাকছে তাঁর আদরের নাতি মণিকে। ডাকেন, অ মণি, নাড়ু খাবি আয়।

চমকে উঠি। এদিক ওদিক তাকাই। দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর। তার হাতের মুঠোয় ধরা আছে একটা ডিম। বোধহয় সদ্য পাড়া ডিমটার উষ্ণতা সে তার কচি হাতে অনুভব করছে। হয়তো ঘরের পোষা হাঁসে ডিম পেড়েছে, কেউ জানার আগেই সে গোপনে ডিমটি সরিয়ে ফেলেছে। বেড়িয়ে পড়েছে বাড়ির বাইরে, কোনো বাড়িতে বিক্রি করবে বলে। হয়তো একটি দুটি ঘর বাঁধা আছে তার। নিয়ে গেলেই সেখানে বিক্রি হয়ে

যাবে ডিম। বদলে সে পাবে খাবার। বড্ড খিদে তার। ঘরে হয়তো ছোটো বোন আছে। ভাই বোনের বড্ড খাইখাই স্বভাব। দুজনে তক্কে তক্কে থাকে কখন হাসে ডিম পাড়বে। ভারী খিদে ওদের। ওদের বাড়িটা সব সময় খিদেয় টানটান হয়ে থাকে। হাসে ডিম পাড়লেই সে নিয়ে ছোটে বেচার জন্য। গরিবের বাড়ি তাই সবসময় খিদেয় টানটান থাকে।

মনে হয় এমনি করে বাঁধা বাড়িগুলোয় সে প্রায়ই আসে ডিম বেচতে। খুব ডিম খায় এই বাড়ির মানুষগুলো। শুধু ডিম নয়, সব কিছুই এরা বেশি বেশি খায়। ফেলাও যায় কত। ফেলা ভাত খেয়ে খেয়ে এদের পুকুরের মাছগুলো মোটা হয়। বৃদ্ধা ঠাকমা হাতে করে নাড়ু খাইয়ে দিতে চায় ছেলেটিকে। ছেলেটির কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই। এক্ষুনি সে ডিম বেচতে যেতে চায়। নাড়ু খাবার দেরি সয় না।

এদিকে গ্রামে শীতলা পুজো হচ্ছে। ছোটোরা ছোটাছুটি করছে মণ্ডপে। কে কোন্ ধর্মের, কার কেমন আর্থিক অবস্থা পুজোর আনন্দের কাছে সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্য করি এই ছেলেটি কিন্তু মণ্ডপে যায়নি। সে এসে দাঁড়িয়ে আছে সম্পন্ন একটি গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে। এ বাড়িতে সে বোধহয় ডিম বেচতে চায়। ডিম বেচতে পারলে, সে দুটি খেতে পাবে। তার পেট ভরবে। তার যে বড্ড খিদে। কিন্তু বাড়িটার সবাই আজ খুব ব্যস্ত। মনে হয় সবাই শীতলা পুজোর অঞ্জলি দিতে যাবে। উপোস করে আছে সকাল থেকে। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে পড়ে ছেলেটি। কানের কাছে তুলে নিয়ে আসে ডিমটাকে। ডিমের ভিতরে হয়তো শুনতে চায় জীবনের শব্দ।

ছেলেটা কানে ডিম চেপে কী যেন শুনবার চেষ্টা করে। তার কিসের এত কৌতূহল জানি না। হয়তো ছেলেটা পাঠশালায় যায়, কি যায় না। হয়তো দু'বেলা দু-মুঠো নুন-ভাত ওর জোটে কি জোটে না। কিন্তু যা জোটে, ঝড়ের মুখে তা বোধহয় কুটোর মতো উড়ে যায়। তার খিদের কাছে তা খুবই সামান্য। তাই ডিম নিয়ে সে ঘোরে বাড়ি বাড়ি। তার মা, যে সংসারে খিদে মেটাতে হাস পোষে ছাগল পোষে। সে বেচতে এলে কিন্তু একটি ডিম আনে না। একসঙ্গে কয়েকটা জমলে তবেই সে আনে। তার কিছু পরিপক্ক বিপণন-কৌশল জানা আছে। এ বালক সে সবের খোঁজ শেখেনি এখনও। তার শুধু খিদে আছে, সে শুধু খেতে চায়।

মণ্ডপে ঢাক বাজে, ছেলেটার পা নেচে উঠতে চায়। কিন্তু মন নাচে না। হরেক পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানি। একটা ডিম আছে তার কাছে, অথচ এই ডিম খাওয়ার কথা সে ভাবে না। এই একটি ডিম তাকে পৌঁছে দিতে পারে না উৎসবের আঙিনায়। বাড়ি ফিরলে নিশ্চিত তার কপালে দুঃখ আছে। ডিমের সঞ্চয় কমে গেছে, মা খুশি হবে না। তবু ছেলেটা ডিম চুরি করবে। তার ঠাকুমা তাকে কিচ্ছু বলে না। কিন্তু মা, ছেড়ে কথা বলে না। মাকে যে সামলাতে হয় সংসারটা।

কিন্তু, আজ বুঝি তার ডিম বিক্রি হবে না। কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না তার দিকে। ছেলেটা ভালো করে কান পাতে আবার। সাদা খোসার অন্তর্গত কুসুমাভ তরল কি নড়ে উঠছে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মতো তার হাতের মধ্যে? গৃহস্থের উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে

প্রত্যাখাত ছেলেটি। সে এবার অন্য বাড়ি যাবে। দরজার মঙ্গলকলসকে অর্থহীন করে ফিরে যাচ্ছে ছেলেটা। তার হাতে একটি মাত্র ডিম। এই একটি ডিমকে ঘিরে ছোট্ট একটি স্বপ্ন আছে তার। সে স্বপ্ন খিদের স্বপ্ন, সে স্বপ্ন তার মেটে না।

ভাবি আমার স্বপ্ন কি এই ছেলেটার থেকে আলাদা? না। আলাদা নয়। আমার আশ্বস্ত মনে প্রশান্তি নেমে আসে। দেখি দুপাশে ঘন ধানজমি। জলস্রোত বয়ে চলেছে সজোরে। সবুজ ধানজমির মাঝে এই জলধারার রং লাল। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে। লাল মোরাম মাটির সারা বছরের ভঙ্গুর অংশ গুলে নিয়ে ছুটছে জলস্রোত। তাই বুঝি এত লাল। সেই স্রোতের বুকে ভাসছে ঝরে পড়া সোনালি হলুদ রঙের শিরীষ ফুল, আর সবুজ হলুদ গাছের পাতা। পাশ থেকে শোজনে, নারকেলের উঁচু মাথা আর পাতা বেয়ে ঝরছে জমে থাকা রোদের ঝিকিমিকি। আকাশের রং কেমন যেন শেষ রাতের, দূরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। রুক্ষমাটিতে বৃষ্টি নামছে ওখানে। অদ্ভুত একটা সোঁদা গন্ধ চারপাশে ভেসে উঠছে।

আমার মধ্যেও সেই গন্ধ ভেসে ওঠে। অবশ্য সেই গন্ধ সবাই পায় না, পায় কেবল বাইরের মানুষেরা, যারা ভবঘুরে। রুক্ষ দেশ থেকে তারা বর্ষা দেখতে আসে। যা দেখে তার চেয়ে কল্পনায় আরও রং লাগায়। শুনেছি খোয়াই-এর দেশে বর্ষা নাকি ভীষণ মাতাল করা। বর্ষার রং রূপে যাই অভিনবত্ব থাকুক না কেন, রুক্ষ দেশে বর্ষা যে নতুন জীবন আনে তা ভালোই বোঝা যায়। বর্ষার ভরসায় যেমন থাকে নদী তেমনি থাকে মাটিও। এক টুকরো কালো মেঘের জন্য সেও হাপিত্যেশ করে। বর্ষা তাই উৎসবের মেজাজ এনে দেয় মাটির মধ্যে। নীচু জমি জলে ভাসে। পুকুরের জল আর জমির জল সব একাকার হয়ে যায়। অনেকের ক্ষতি হয় আবার অনেকের লাভ হয়! অনেক জীবনের নিয়ন্ত্রক বর্ষা। বর্ষা এবার এসেছে দেরি করে। হাল-লাঙল মুখ গুঁজেই পড়ে আছে কৃষকের বাড়ির আঙিনায়। এতদিনে সেই আশা বুঝি বা পূরণ হল। পুথির পাতায় আমি লিখে চলি—

খরতর লহরী ধাইল গোদাবরী
কানা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া মন্তেশ্বর ॥
ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী ধায় গোমতী
সরমা কংসাবতী ॥

দুইয়ে পক্ষ

আমার মা দেবকীকে শিবরাম ডাকে অন্নমা বলে। একদিন হয়েছে কি মা শিবরামকে ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছে না। শিবরাম কিছুতেই যাবে না। ঠাকমা ডাকছে, আয় তোর সাথে গল্প করব।

শিবরাম যাবে না। ও এখন খেলায় মত্ত।

ওর গোলাটা ঢুকে গেছে পুরোনো খাটটার নীচে। সেখানে হাজার রকমের জিনিসে ভর্তি। ভাঙা কেদারা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বড়ো বড়ো পিতলের গামলা রয়েছে। আছে পিতলের কড়া, ভাঙা মগ, গাড়ু, কাপড়ের পুঁটুলি, পুরোনো জুতো। আর আছে পেল্লাই দুখানা কাঠের বাক্স। বাক্স দুটো বেশ বড়ো সাইজের। অনেক কালের পুরোনো। আমার ঠাকুমা ঠাকুরদার আমলের। একটাতে আছে কাঁসার বাসন। অন্যটাতে আছে নানা রকমের পুথি। পুথি পাণ্ডুলিপি সব আমার পূর্বপুরুষদের। আমারও লেখা কিছু পুথি আছে। এই সব পুথি নানা দেব-দেবী বন্দনার স্তোত্র। মাঝে মাঝে বার করি দেখবার জন্য। নানা জনে এসে নকল করে নিয়ে যায়। তাতে সামান্য কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। খাটের নীচে সেই জঞ্জালের মধ্যে শিবরামের গোলাটা ঢুকে গেছে। বার করতে পারছে না সে।

মা গল্প জানেন অনেক। শিরামকে গল্প শোনান। চারদিকে অন্ধকার কুসংস্কার। মা এমন এমন গল্প বলেন যাতে এই সমস্ত কুসংস্কার শিবরামের ছোটো বয়সেই কেটে যায়। শিবরামকে তাঁর হাতের তৈরি নানান খাবার খাওয়ান। খাইয়ে অপত্য স্নেহের সুখ অনুভব করেন। বলতে গেলে শিবরাম তাঁর গল্পের একজন ভক্ত।

ভাদ্র মাস থেকে কার্তিক অঘ্রান মাস পর্যন্ত একটানা গ্রামগুলোতে চলে অসুখবিসুখ আর মড়ক। প্রতি বছর মড়ক লেগেই থাকে। জ্বর যাকে একবার ধরে, তাকে একেবারে রক্তশূন্য পাংশুবর্ণ করে দেয়। তার উপর আমাশয়, বসন্ত, কলেরা এসব তো আছেই। জাঁকালো অসুরের মতো চেহারার মানুষও দুদিনের জ্বরে একেবারে প্যাঁকাটি হয়ে যায়, তারপর সব শেষ। গ্রামের চাটুজ্জে বাড়ি মুখুজ্জে বাড়ি পণ্ডিতের বংশ। সম্ভ্রম প্রতিপত্তি আছে, শিক্ষাদীক্ষায় ভালো খ্যাতি আছে। সেই চাটুজ্জে বাড়ির বড়ো ছেলে হচ্ছে ধন্বন্তরী। নানারকম গাছপালা খলনুড়িতে পিষে ওষুধ করে দেয়। সকালে এক মাত্রা, দুপুরে এক মাত্রা, সন্ধ্যায় আর এক মাত্রা। আর বলে দেয় ওষুধ শেষ হলে দই দিয়ে মেখে পান্তা ভাত খাবে।

দই পান্তা ভাতে ভালো কাজ হয়। রুগি ভালো হয়ে ওঠে।

মারাত্মক হচ্ছে কাঁপুনি দেওয়া জ্বর। কাঁপুনি দিয়ে এই প্রবল জ্বর এল আবার কিছুক্ষণ পরে তা ছেড়ে গেল। দু চার ঘণ্টা পরে আবার এল। এই ভাবে কোনো ক্ষেত্রে চোদ্দ দিন, কোনো ক্ষেত্রে একুশ বা কোনো ক্ষেত্রে চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলে একটানা। রুগি একেবারে

কাহিল হয়ে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মারা যায়। এমনই অবস্থা হয় যে বাড়ির মধ্যে গাছের ডালে কাক এসে ডাকলেই, বাড়িতে কান্নাকাটি পড়েছে। বাড়ির লোকজন ধরে নেয় যে রুগির এবার নিদানকাল উপস্থিত। কান্নাকাটির মধ্যে ঘটেও প্রায় সেই রকম।

গ্রামে শৌখিন মানুষ এককড়ি মারা গেল এই জ্বরেতেই। কত ভালোমানুষই না ছিল। ছেলেপুলে বলতে কেউ ছিল না। কবে একটা মেয়ে হয়েছিল, দু বছর বয়স হয়নি তখনই মেয়েটা মারা গিয়েছে। তারপর আর ছেলে মেয়ে হয়নি। স্ত্রী গত হয়েছে অনেক দিন আগেই। দেখতে সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় তাই-ই ছিল। মাথায় ঢেউ খেলানো কোঁচকানো চুল, গায়ের রং তেমনি ফরসা টকটকে। মেয়েরা সব আড়ালে বলত কার্তিক ঠাকুর। মনসার গানের ভক্ত। হইচই আর হুল্লোড়ের মধ্যে থাকতে ভালোবাসত। দশ পনেরো দিন বাদে বাদে খাসি অথবা পাঁঠা কাটত। নিজে সুন্দর করে রাঁধতে পারত। পাশে বসিয়ে শিবরামকে খাইয়েছে অনেক দিন। চর্বি বেছে বেছে বড়ো এক বাটি মাংস দিত। শিবরামকে খেতেই হত। এমনি ছিল তার ভালোবাসার অত্যাচার। মানুষটা ছিল যেমন বেপরোয়া, তেমনি গোঁয়ার। ওকে নিয়ে গ্রামে লোকে অনেক গালগল্প বলে আড়ালে আবডালে।

সব গ্রামেই সাধারণত এ ধরনের মানুষ থাকে যারা বাপ ঠাকুরদারা যা বলে গেছে তা মানে না। গণ্ডির বাইরে চলে যায়। জ্যোতিষীর কথাকেও পাত্তা দেয় না। এককড়ি ছিল এমনই একজন। আমাদের দামাল যেমন নিরেট বোকা। সব কথায় হে হে করে হাসে। আর যদু তেমনি চালাক। দামাল মোটাসোটা, মাঝারি মাপের. খাটো ধুতি পরে। তার বাবা জমিদারের লেঠেল ছিল। যদু লম্বা ছিপছিপে, মাথা ভরতি চুল। সেও খাটো ধুতি পরে, তবে তার গায়ে সব সময় একটা চাদর থাকে। আর তার গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ। তাতে মিশে থাকে বিদ্রূপের ছোঁয়া।

যদু মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। কোথায় যে যায় কেউ জানে না। সে রোজ দাড়ি কামায়। তার চোখে মুখে শহুরে ছাপ আছে। অনেক ধরনের কাজ জানে সে। বিভিন্ন শহরে সে নাকি ফুরন খাটতে যায়। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝিতেও আকাশে বৃষ্টির দেখা না দেওয়ায় ডিহিদারের পেয়াদারা ঠিক করল ব্যাঙের বিয়ে দেবে। তারা চাঁদা চাইতে বের হল গ্রামে সবার কাছে। ডিহিদারের পেয়াদা বালু আর গণেশ যদুর কাছে চাঁদা চাইতেই, সে ডান হাতের পাঞ্জা নাড়তে নাড়তে অবজ্ঞার সাথে বলে দিল, দূর হ মুখ পোড়া, চাঁদা দেবে! যত সব হারামজাদার দল।

গণেশ বলল, আরে হারামজাদা কাকে বলছিস? ডিহিদার বলে দিয়েছে, প্রত্যেককে পাঁচটা করে কড়ি দিতে হবে। যদু হাসতে হাসতে বলে, আমি হারামজাদা, তুই তাহলে হারমজাদার হারামজাদা। তোর বাবাও হারামজাদা। আমি ডিহিদারের খাই না পরি? আমি বাইরে থেকে রোজগার করে আনি, সেই পয়সায় খাই। কখনো মাঠে যাই না।

দামাল পিছনে ছিল। সে হে হে করে হেসে ওঠে এ সময়।

গণেশ চুপসে গিয়ে বলে, তুই যে পুকুরে স্নান করিস, সেটা জমিদারের তা জানিস?

যদু লাফিয়ে ওঠে। বলে, ওরে হারামজাদা, ওটা আমার বাবার পুকুর রে। সেটা তুই জানবি কি করে? তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস।

গণেশ একেবারেই চুপসে যায়। মনে মনে ঠিক করে রাখে, কথা বাড়াবে না। ডিহিদারের কাছেই যদুর নামে নালিশ করে দেবে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে যেন আগ্নেয়গিরির লাভা। আষাঢ় মাস পার হতে চলল, আকাশে তবু মেঘের কোনো দেখা নেই।

বালু পিছন ফিরে দেখল যদুও আসছে ওদের সঙ্গে। সঙ্গে দামাল রয়েছে কিছুটা পিছনে। বালু দাঁড়িয়ে পড়ল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই কোথায় আসছিস রে যদু?

যদু বলল, মজা দেখতে যাচ্ছি। দেখি তোদের কে কে চাঁদা দেয়।

বালু সেই কথা শুনে বলে, শালা, তুই ছাড়া সবাই দেবে। তোর মতন তো কেউ হারামি নয়! শালা নেড়ে কোথাকার।

যদু বলল, তুই তো শালা ডিহিদারের চামচে রে।

তর্ক করা কেউই পছন্দ করে না। দুটো একটা কথার পরই যুক্তি হারিয়ে ফেলে। বালু রেগে গিয়ে বলল, চলে যা বলছি। নইলে খুব খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের পিছনে পিছনে আসবি না।

যদু তবু সঙ্গ ছাড়ে না। দামালও পিছনে থাকে। খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল সহদেব। তার সারা শরীর তখন ঘেমে নেয়ে একশা। ফুটিফাটা মাঠে মাটি চষতে এসেছে। কপালে ঘাম। মাঠে পড়ে আছে তার কোদাল। এরকম সময়ে মাটি চষার কোনো মানে হয় না। সহদেবের গায়ের রং অন্যদের মতো নয়। ওর গায়ের রং অনেকের তুলনায় ফরসা। ফরসা শরীর রোদে তেতে লাল হয়ে গেছে।

গণেশের হাতে ছিল একটা থালা। থালাটা বাড়িয়ে সে বলে, সহদেব পাঁচটা কড়ি চাঁদা দিতে হবে।

সহদেব এদের ভালো করেই চেনে কারণে অকারণে এরা হাতে থালা নিয়ে বের হয়। শুধু সুযোগ খোঁজে থালা নিয়ে ঘোরার। ও তাই এদেরকে ঘাঁটাল না। তার মাথায় বাঁধা গামছার খুঁট খুলতে খুলতে বলল, তিনটে এখন নিয়ে যা। আর দুটো দু-চার দিন পরে দিয়ে দেব। মা মনসার দিব্যি। ঠিক দিয়ে দেব। ঘরে ভাত নেই।

গণেশ বলল, বৃষ্টি না হলে যে সব্বাইকে না খেয়ে মরতে হবে। কাল দিয়ে দিস বাকিটা।

যদু এগিয়ে আসে। বলে, দিস না সহদেব। একটাও কড়ি দিস না। যত্ত সব বুজরুকি।

গণেশ আর বালু দুজনেই ফিরে দাঁড়াল। এটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে দিচ্ছি। এটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তুই নিজে চাঁদা দিতে চাইছিস না, সেটাই ক্ষমার অযোগ্য, তার উপরে তুই অন্যদের বাধা দিচ্ছিস। ডিহিদারকে অপমান করছিস?

মুখখানা বালু হিংস্র করে বলল. মারব শালা এক থাপ্পড়!

বালুর গাঁট্টা গোঁট্টা পেটানো চেহারা। সে এরকম বলতেই পারে। কিন্তু সে কিছু করবার আগেই গণেশ ছুটে এসে এক চড় কষাল যদুর গালে। বেশ জোরেই মেরেছে। যদু টলে পড়ে গেল।

এসব ক্ষেত্রে কেউ বাধা দেয় না। দূরে দাঁড়িয়ে সবাই মজা দেখে। যদু কিন্তু প্রত্যাঘাত

করল না। হাত বুলোতে লাগল গালে। তার পেশিতেও আছে শক্তি, শরীরে আছে বিদ্যুৎ গতি। ইচ্ছে করলে সে গণেশকে দুহাতে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

কিন্তু যদু সে সব কিছুই করল না। সে ভাবল বেচারা, অবোধ। কেন মেরেছে তা ও নিজেই জানে না। কয়েক মুহূর্ত বাদে সব ভুলে যাবে। শান্তভাবে সে বলল, এমনি করে মারবি না কাউকে। মানুষকে মারলে তার খুব লাগে। তোকে মারলে তোরও খুব লাগবে। তখন কী করবি? মারলে পাপ হয়, পাপে বৃষ্টি হবে না। তখন বুঝবি।

দামাল কী বুঝল কে জানে, এগিয়ে এসে সে হেসে উঠল, হি হি করে।

এই সময় দেখা গেল জমিদার গোপীনাথ নন্দী হেঁটে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন রয়েছে। গোপীনাথকে এ গ্রামের সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সে সম্মান শুধু বয়সের কারণে নয়, ভালোবাসা শ্রদ্ধার। জমিদার হলে কি হবে, দুজনের চেহারাতেই দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। অপর জনের গায়ে জড়ানো গামছাটা শতছিন্ন।

সব বৃত্তান্ত শুনে, গোপীনাথ বললেন, কী কাণ্ড করেছিস বলত যদু? তুই চাঁদা দিবি না, তোর নাম আমি খারিজ করে দিচ্ছি। কিন্তু তুই অন্যদের বারণ করছিস কোন সাহসে?

যদু বলল, ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হবে? সব ধান্দাবাজি! আমি কিছু বুঝি না? সুলতান বিন তুঘলকের আমলেও পর পর সাত বছর বৃষ্টি হয়নি। এরকম হয়। তোমরা গরিবদের কাছ থেকে শুধু শুধু চাঁদা নিচ্ছ।

প্রবীণ মানুষটি এবারে মুখ খুলল। সে বলল, আলবত হবে। দু বছর আগে হয়েছিল মনে নেই? সবার মনে আছে!

যদু হেসে বলল, ব্যাঙের বিয়ে? মনে আছে নাকি কারো? আচ্ছা জমিদারমশাই, আপনি বলুন তো, কোনটা মর্দা ব্যাঙ, আর কোনটা মাদি ব্যাং আপনি চেনেন? এরা কেউ চেনে?

সবাই চুপ করে থাকে। এ সময় ব্যাং জোগাড় করাও সহজ কাজ এটা। বর্ষার সময় ব্যাং ডাকে, প্রখর গ্রীষ্মে তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। পুকুরগুলো শুকিয়ে এখন কাদা কাদা। সেখানে অনেক খুঁজে দুটো ব্যাং যদিবা পাওয়া যায়, ডাক শুনে কারো লিঙ্গ চেনার মতো জ্ঞান নেই। তবু দুটো ব্যাং তো পাওয়া চাই। একটা ব্যাং দিয়ে তো আর বিয়ে হয়না। ফুল দুব্বো দিয়ে পুজো শুরু হয়। যে কোনো বিয়ের মতই অনুষ্ঠান হয়। বেশ একটা বিয়ে বিয়ে ভাব তৈরি হয়। খরাক্লিষ্ট মানুষ একটা দিন ফুর্তির আমোদে মেতে ওঠে। উঠতি বয়সি ছেলে-ছোকরার দল বৃষ্টির আশায় বৃষ্টিবিহীন-খর-রাস্তায় গাগরি, কলসি কিংবা বালতি ভরা জল ছিটিয়ে 'ব্যাঙের বিয়ে'-র হুল্লোড়ে মাতে। মেয়েরা কলা বউয়ের বিয়ে দেয়। ঘরে ঘরে মুষ্ঠি ভিক্ষা করে চাল তুলে খিচুড়ির মচ্ছবে সামিল হয় গোটা পাড়া।

যেহেতু আষাঢ় মাস পার হয়ে গেছে, শ্রাবণ শেষ হতে চলল। তাই দেরি হলেও দু এক দিনের মধ্যে বৃষ্টি নামলেই মানুষ ধরে নেয় এই ব্যাঙের বিয়ের জন্যই বৃষ্টি নেমেছে। শত শত বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি।

অন্য কেউ যদি এরকম বেয়াদবি করত, তাহলে জমিদার তাকে কঠিন শাস্তি দিত। কিন্তু গোপীনাথ নন্দী সে-ধরনের মানুষ নয়। তাছাড়া যদুর ব্যাপারে সবাই একটু নরম। তার কারণ তার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। গরিব-দুঃখিদের জন্য তার মনে ছিল

অনেক দরদ। তিনি নিজের উদ্যোগে একটা পুকুর কাটিয়েছিলেন। গ্রামের ভেঙে যাওয়া মন্দির নতুন করে গড়ে দিয়েছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণবাবুর নাম উঠলেই এখনো অনেকে কপালে হাত ঠেকায়। তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন বসন্ত রোগে। যদু তার বাবার কোনো গুণই পায়নি। ও একেবারে উড়নচণ্ডী। ও যে কোথায় যায়, আর কেন বারবার ফিরে আসে তাও কেউ বলতে পারবে না। ওর মা এখনো বেঁচে আছে। সে বুড়ি এখন চোখে দেখতে পায় না। যদু তার মায়ের টানে গ্রামে ফিরে আসে বলে মনেও হয় না। মায়ের সঙ্গে ও মোটেই সময় কাটায় না। এদিকে ওদিক ঘুরে বেড়ায়, আর লোকের পিছনে লাগে।

শ্রীকৃষ্ণবাবুর প্রতি শ্রদ্ধাতেই তার ছেলেকে এখনো পর্যন্ত কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন চলবে বলে মনে হয় না। অল্পবয়সি ছেলে ছোকরারা যারা শ্রীকৃষ্ণবাবুকে দেখেনি, তারা যদুর আস্পর্ধা সহ্য করে না। গোপীনাথবাবু বললেন, তোকে চাঁদা দিতে হবে না। তুই যা এখান থেকে, আর ঝামেলা বাড়াস না।

যদু বলে, আমি মন বদলে ফেলেছি। চাঁদা দেব। তবে এখন নয়। ব্যাঙের বিয়ের দু এক দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি নামে তবে।

—যা যা, এখন তুই ভাগ। যদুর কথার উত্তরে গোপীনাথবাবু তাকে সরিয়ে দিলেন।

যাইহোক এমনি করে শনিবার বারবেলায় ব্যাঙের বিয়ে হল। কোথা থেকে একটা বড়ো কোলা ব্যাং জোগাড় হয়েছে। আর একটা খুবই ছোট্ট। ওদের কি এক জায়গায় বসিয়ে রাখা যায়? তাছাড়া বড়ো ব্যাংটার বোধহয় বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। বার বার সে কেবল লাফিয়ে পালায়। দড়ির টানে ছোটোটার অবস্থা কাহিল হয়।

এক কোণে মদের ঠেক বসেছে। সেখানে কয়েকজন ঢোল বাজাচ্ছে। মেয়েরা একটু দূরে গান গাইছে। এই গান তারা গাইছে বহু যুগ ধরে। নবীন-প্রবীণের দল আর এক জায়গায় খোল-করোতাল বাজিয়ে মিছিল করে মেঘদেবতাকে তুষ্ট করতে নামগানে মুখরিত করছে আকাশ-বাতাস। সারাদিন ধরে অনেক আমোদ ফুর্তি চলল। কয়েকজন এমনই মাতাল হল যে সেখানেই গড়াগড়ি দিতে লাগল। ওদের আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সারারাত ওখানেই শুয়ে থাকবে! কুকুর বেড়ালে গায়ে পেচ্ছাব করে দেবে।

বড়ো কোলা ব্যাংটা শেষ পর্যন্ত কোথায় পালাল। ছোটোটার অবস্থা মৃতপ্রায়। মাঝে মাঝে কেবল কোঁক কোঁক শব্দ করছে। বিয়ের আসরেই স্বামীহারা হয়ে বোধহয় কাঁদতে লেগেছে। এই উৎসবের আনন্দে যদুকে কেউ কোথাও দেখতে পায় না। শোনা গেল সে একটা বিশেষ গাছতলায় শুয়ে বসে দিনটা কাটিয়েছে। ওই গাছতলাটা ওর খুব প্রিয় জায়গা। ওদিকে মুসলমানেরা মাঠে সমবেত হয়ে অঝোর ধারায় চোখের জল ঝরাচ্ছে বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায়। ইমাম সাহেব দুহাত আকাশে তুলে উদাত্ত আহ্বানে ঈশ্বরের দোয়া মাঙছেন, হে আল্লাহ! দীন-দুনিয়ার মালিক তুমি। এই প্রকৃতির তুমিই নিয়ন্তা। আমাদের প্রতি করুণা ধারায় ঝড়ে পড়তে তুমি মেঘকে আদেশ করো প্রভু।

একদিন, দুদিন, তিনদিন গেল, বৃষ্টির দেখা নেই। সকাল থেকেই সূর্যদেব কটমট করে তাকিয়ে আছেন। যেন তিনি খুব রেগে আছেন, এদিকে কোনো মেঘকে ঘেঁষতে দেবেন না। সবার চোখ আকাশের দিকে। এই বুঝি মেঘ জমে, এই বুঝি বৃষ্টি হয়। তাকিয়ে থাকতে

থাকতে চোখ জ্বলে যায়। বীজতলা তৈরি হয়নি এখনও। কোথায় ধান ওঠার কথা, বীজতলা করতেনা পারলে ফসল হবার আর কোনো আশা থাকে না। গাছ তলায় বালুর সাথে যদুর দেখা হয়। মিচকে হেসে সে বলে, কি রে আমার চাঁদা পেলি না তো?

বালু বলল, যা যা। তোর চাঁদায় আমরা মুতে দিই। তোকে তো আর খেতের কাজ-কাম করতে হয়না? বৃষ্টির তুই কি বুঝবি? শালা নেমকহারাম, তোর জন্যই শালা বৃষ্টি হয় না।

—আমি শহরে চলে যাব। খবর পেয়েছি সেখানে বর্ষা নেমেছে। যদু বলে।

—জাহান্নামে যা তুই। বালু খুব রেগে গেছে।

বুড়ো বটগাছ তলায় কয়েকজন প্রবীণ মানুষ সব সময়ই বসে থাকে। শশী নামে একটা ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে সাংঘাতিক একটা খবর দিল!

পাশের গ্রামে কবি এসেছে। এই সময়ে কবি গান? যদু লাফিয়ে ওঠে। লোকের হাতে পয়সা নেই, সব বাড়িতে উনুন ধরে না প্রতিদিন। পানীয় জলে টান পড়েছে। পুকুর একেবারে শুকনো খটখটে। নদী শুকিয়ে কাঠ। মেয়েরা বালিতে গর্ত করে জল বার করে। এক ঘড়া ভরতেই বেলা কাবার হয়ে যায়। তাছাড়া সে জলও ঘোলা।

তবু কবি শুনতে যায় লোকে। যেমন শুঁড়িবাড়িতে মদের ঠেক এই দুর্দিনেও বন্ধ হয় না। একজন বলল, কবি এয়েছে না হাতি? নাচনি এয়েছে।

যদু ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, চোপ শালা, হাতি, মারব তোর পেছনে আমি লাথি। হাতি আমি তোর পোঙায় ঢুকিয়ে দেব।

—শালা কবি গাইতে এসেছে। কবি গাইবার আর জায়গা পেলে না? এক ফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই। কবি গাইবে!

কবি গানের সঙ্গে বৃষ্টির কী সম্পর্ক তা কেউ বুঝতে পারে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ততক্ষণে যদু সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে বলে, ঝড়-বৃষ্টি হলে কে কবি শুনতে যাবে? এ ব্যাটা তুক করেছে, বৃষ্টি রুখে দিয়েছে। ওর জন্যই বৃষ্টি আসছে না।

—ও কী করে বৃষ্টি আটকাবে?

—তুই জানিস না। ওই কবিয়াল গ্রামে ঢুকবার আগে 'বন্ধন' দিয়ে ঢুকেছে। এদিকে আর বৃষ্টি হবে না।

যুক্তিটা এবার সবারই অকাট্য মনে হয়। সত্যিই তো, বৃষ্টি হলে কে আর কবি শুনতে যাবে। তাই মেঘ স্তম্ভন করে দিয়েছে। এক পশলা বৃষ্টির জন্য গ্রামের মানুষগুলো যে ধুঁকছে, তাতে ওর কি এল গেল? কবিয়ালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমতে থাকে। কেউ কেউ বলল, কবিয়ালকে গিয়ে বলি চলো, মেঘ স্তম্ভন তুলে মেঘকে মুক্ত করে দাও।

—কবিয়াল যদি সেকথা না শোনে?

—শুনবে না মানে? আলবত শুনবে।

সবাই মিলে দলবেঁধে চলল পাশের গ্রামে। কতই বা দূর। ক্রমশ দল বাড়তে লাগল। কারুরই এখন কোনো কাজ নেই, সুতরাং যেতে অসুবিধা নেই। এরকম একটা ভর-ভরন্ত উত্তেজনা, কী হয় দেখা যাক।

কবিয়াল প্রথমে ওদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। তারপর শুরু হল তর্কাতর্কি।

আচমকাই শুরু হয়ে গেল মারামারি। সবাই থামাতে চায়, কিন্তু সবাইকে দেখা গেল রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। শেষে কবিয়াল চিৎকার করে একটা গান ধরল। গান শেষ করে জোড় হাত করে বললে, ঠিক আছে। আমি চলে যাচ্ছি। কতজনা আমাকে সাধাসাধি করে ডাকে গান গাওয়ার জন্য। আর তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। আমার কি গান গাওয়ার জায়গার কোনো অভাব আছে? এখানে দিলে না, অন্য কোথাও গাইব। ভেবেছিলাম এদিকটায় কোনো দিন আসিনি, একবার ঘুরে যাই। হল না। কিন্তু খবরদার, আমার লোকেদের গায়ে কেউ যেন হাত না তোলে।

কবিয়াল চলে গেল। তবু বৃষ্টি নামে না। কবিয়াল যখন চলে যাচ্ছে, কাছাকাছি তামাক টানছিল যদু। যেন একটা মজার দৃশ্য দেখছে, সেভাবেই সে দাঁড়িয়েছিল।

গোটা তিনেক মেয়েও ছিল কবিয়ালের দলে। তারা ঝলমলে শাড়ি পরে নাচ দেখায়। নিজেদের পুটুলিগুলো বুকে নিয়ে হাঁটছিল। ওরা যা তা গালাগালি দিয়ে গেল গ্রামের নামে।

দুদিন পরেও যখন বৃষ্টি হল না। যদু বালুকে ডেকে বলল, কবিয়াল কোথাও কিছু ফেলে গেছে কিনা ভালো করে দেখেছিস? ওরা রাগ করে মন্ত্র তন্ত্র করে কিছু তুক করে যায়নি তো?

—তাই তো, এ কথাটা তো ঠিক। অনেকেই দৌড়ে গেল সেই পরিত্যক্ত জায়গায়, যেখানে কবিয়ালের গানের আসর বসেছিল। শামিয়ানা খাটানোর জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর গোটা তিনেক গজাল পাওয়া গেল। দেখা দেল সেগুলো পোঁতা আছে মাটিতে। সেগুলো তুলে ফেলতে সবাই ভয় পেল। এগুলো কি মন্ত্রপুত? তুললে কারো কোনো ক্ষতি হবে না তো?

যাই হোক সেগুলো তুলে এক জায়গায় কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল গজালগুলোকে। আগুন সব কিছুকে নষ্ট করে দেয়, এমনকি মন্ত্রশক্তিকেও। ওদিকে মহাকাল শিবের মন্দিরে শুরু হয়ে গেল যাগযজ্ঞ। চব্বিশ প্রহর চলল আহুতি। এজন্য অবশ্য কাউকে চাঁদা দিতে হয় না। মন্দিরেরই যা দেবোত্তর সম্পত্তি আছে তাতে জুটে যায় সবকিছু। প্রতিদিন ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। বহু মানুষ সেখানে নিত্য পুজো দেয় অনেক সামগ্রী দিয়ে। কাঠ পোড়ে মন খানেক। তার মধ্যে থাকে চন্দন কাঠও। মোটা মোটা টিকি ও পইতে ধারী ব্রাহ্মণদের গুরু গম্ভীর মন্ত্রপাঠ শুনে উপস্থিত মানুষ ভক্তিতে গদগদ হয়ে পড়ে। পুজোর পর সকলে ভোগ খায়। এই ভোগের জন্যও বহু মানুষ জড়ো হয়।

তবু বৃষ্টি নামে না। গুজব শোনা যায় দূরের কোনো জেলায় মেঘ জমেছে। কিন্তু দামিন্যার আকাশে কালো মেঘের পাত্তা নেই। সারা আকাশ খাঁ খাঁ করছে। এরপর আর একটাই পুজো বাকি থাকে। তা করতে পারে শুধু মেয়েরা। বরুণদেবের পুজো। অনেকদিন আগে একবার এই পুজো করেছিল গাঁয়ের মেয়েরা। একজন বলে, ভগবানের কি বিচার একই দেশের উত্তরপ্রান্ত ভাসছে বৃষ্টিতে বন্যায় আর দক্ষিণে শুকিয়ে খটখটে।

—আরে ভগবানের তো অনেক কাজ আছে। তাই তো তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। বরুণদেবের পুজো করো। যদু বলে।

বয়স্কারা ঠিক করলে এবার তারা বরুণদেবের পুজার আয়োজন করবে। এটাই শেষ চেষ্টা। তবে সব কিছু সারতে হবে অতি গোপনে। পুজো হবে অমাবস্যার রাতে। গ্রামে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হল, সূর্যদেব অস্ত যাবার পর ওই বিশেষ রাতে যেন কোনো পুরুষ ঘর থেকে বাইরে না বেরোয়। যদি কোনো পুরুষ বের হয়, ওই পূজারিনিকে দেখে ফেলে তাহলে সেই পুরুষটির শাস্তি তো হবেই, নারীকেও দিতে হবে জরিমানা। নারীটি নিশ্চয় পাপিষ্ঠা, পুরুষটিকে যাদু করে টেনে এনেছে। নারীর জরিমানার পরিমাণ কম নয়, গোটা গ্রামের মানুষকে খাওয়াতে হবে একদিন। তাতে তার ঘটিবাটি চাটি হয়ে যাক রেহাই দেবে না কেউ।

গ্রামে ঢোকার একটাই রাস্তা। সাত আটজন গ্রামের মদ্দ যুবক সেই রাস্তার মুখে পাহারায় থাকবে। তারাও রাতে গ্রামে ঢুকবে না, কাউকে ঢুকতে দেবেও না। কেউ জোর করলে প্রয়োজনে লাঠি চালাবে। যেমন করে হোক গ্রামের ইজ্জত তারা রক্ষা করবে।

সমস্যাটা হতে পারে দামালকে নিয়ে। সে বোকা, সাতপাঁচ না ভেবেই রাত্রে বেরিয়ে পড়তে পারে। তাকে একটা ঘরের মধ্যে শিকল এঁটে বন্দি করে রাখা হল। হরি আর যোগেন বলে দুটো লোক, এক এক রাতে খুব বেশি নেশা করে ফেলে। বেশি নেশা করে ফেললে তারা যে তখন কি করবে আর কি না করবে তার ঠিক থাকে না। এক রাতে নেশায় চুর হয়ে হরি তো তার মামিকে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। মামির চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে এসে সবাই মামিকে উদ্ধার করে। হরিকে বেদম মার মারে। এদের দুজনকে চোখে চোখে রাখা হল।

আর যদু? তাকে কে সামলাবে? বাপের সুনাম ভাঙিয়ে সে একটা বেয়াদব তৈরি হয়েছে। কয়েকজন অবশ্য বলল, না না ওকে আগে থাকতে কিছু বলার দরকার নেই। দেখি না ও কি করে? মেয়েদের বলে দেওয়া হয়েছে, ওকে দেখলেই সবাই মিলে একসাথে চিৎকার করে উঠবে। তারপর মেয়েরাই সবাই মিলে ওর ব্যবস্থা করবে। একজন মেয়ের হাতে তো শাবল থাকছেই।

কিন্তু যদুর দেখা পাওয়া যায় না কদিন ধরে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় সে গ্রামেই নেই। কোথায় চলে গেছে। কোথাও গেলে সে মাস খানেকের আগে ফেরে না। প্রবীণেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আপদ বিদায় হয়েছে। মারামারি জিনিসটা ভালো নয়। আর যাই হোক সে তো শ্রীকৃষ্ণবাবুর ছেলে।

বরুণদেবের পুজো হবে নদীর ধারে সেই অশ্বত্থগাছের তলায় যেখানে যদু মাঝে মাঝেই বসে থাকে। বরুণদেবের কোনো মূর্তি নেই। একটা কালো পাথরের গায়ে সাদা তেকোনা একটুকরা কাপড় লাগানো। চিঁড়ে, গুড় আর কলা এই হচ্ছে দেবতার উপাচার। তিলের সন্দেশ থাকলে ভালো হয়। কিন্তু এবারে সবার অবস্থাই কাহিল। কারো ঘরে এক দানা তিল নেই।

যাই হোক পুজো শুরু হল। পুজো মানেই তো গান। গান আর স্তোত্র পাঠ। গান শেষ হওয়ার পর সকলে গড় হয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করে। এ সময় সকলে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে। এর পর আসল পর্ব শুরু হয়। বরুণদেবকে গান শোনানোর পর

পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হল। এরপর তাঁকে অন্যভাবে খুশি করতে হবে। পূজারিনিদের মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে পাঠাতে হবে কৃষির মাঠে। সেও রাত্তির বেলা। যাকে নির্বাচন করা হবে তার যেন শরীরে কোনো রোগ-ভোগ না থাকে। খোস-পাঁচড়া, দাদ, হাজা, ঘা, কাটা, ছেঁড়াও যেন না থাকে শরীরের কোথাও। স্বাস্থ্য ভালো হতে হবে। আগে থেকেই ঠিক ছিল পাঠানো হবে সবিতাকে। তার বয়স কাঁচা। কুড়ির নীচে। বিয়ে হয়েছে দুবছর। একটা ছেলে হয়েছিল কিন্তু ছেলেটা বাঁচেনি। আর কোনো ছেলে হয়নি। তাবিজ কবজ মাদুলি করছে, সে নিজেই এগিয়ে এসেছে এই পুজোয় নিজেকে অর্ঘ্য দেওয়ার জন্য। তার আশা বরুণদেবকে খুশি করতে পারলে তার ছেলে হবে।

—কিন্তু বরুণদেব তো ছেলেপুলে দেয় না?

তবু ওকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। লোকে বলে স্বামীটা বদ। অনেক দোষ আছে। জ্যোতিষী অনেক দিন আগেই বলেছিল, কেউ তখন শোনেনি। ব্যাটার আবার বিয়ে করার মতলব আছে। মাতাল বলে কোনো মেয়ে রাজি হয়নি তাকে বিয়ে করতে। সবিতা হাতে একটা শাবল নিয়ে এগিয়ে যায়। তার সঙ্গে চলে আরো দুজন। ঠিক মেপে মেপে পঞ্চাশ পা যাবার পর ওরা দুজন থামবে। তারপর আর কেউ সবিতার সঙ্গে যাবে না।

শাড়ি খুলে ফেলে সবিতা। ভিতরের কাঁচুলি সব খুলে ফেলতে হয়। সারা গায়ে তার কিচ্ছু থাকবে না। তার ছাড়া কাপড় নিয়ে চলে গেল মেয়ে দুটো। ওরা ফিরে গেলে সব মেয়েরা কয়েকবার উলু দিল। সবিতা একলা এগিয়ে চলে। মিশমিশে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। মেয়ে মানুষ নিভৃতে স্বামীর সামনেই সব বস্ত্র খোলে না। পুকুরে স্নানের সময়েও তাদের গায়ে কাপড় থাকে। এই প্রথম সবিতা পুরোপুরি নগ্ন হল। কেউ কোত্থাও নেই, কালো অন্ধকার। তবু হাঁটতে গেলে জড়তা আসে। ঠিক এই সময় সবিতা টের পেল একটা লৌহ-কঠিন মানব শরীর তাকে গ্রাস করে নিল। সে চ্যাঁচাতেও পারল না। দেবতার ভালোবাসার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করল নীরবে।

লোকে অবশ্য এ নিয়ে অনেক গালগল্প করে। বলে, হয় সেটা যদু ছিল, না হলে এককড়ি চাটুজ্জে। এই প্রশ্নের কোনো মিমাংশা হয়নি। এসব প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। সবিতার পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আর এসব প্রশ্ন তাকে করবেই বা কে? তবে নিন্দুকেরা ওসব বলেই থাকে। তারা ওই দুজনকেই সন্দেহ করে। সন্দেহ করে গ্রামের আরো অনেকেই। কিন্তু এককড়ি চাটুজ্জে মানুষটি চলে যেতে খুব দুঃখ পেলাম। মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা আমাকে অধিকার করেছিল বালক বয়সেই। জ্ঞান হওয়ার পর প্রথম দেখি মারা গেল প্রতিবেশী এক মামা। অতিসার রোগে। মা দেবকী কাঁদতেন তার বাবার জন্য আর দাদার জন্য। আমিও কাঁদতাম প্রিয়জন বিয়োগের ব্যথায়। কিন্তু মরণকে তো আটকানো যায় না, সে আসে।

মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবতাম তখন খুব। মৃত্যুর পিছনে কি কোনো রহস্য আছে? তখন আমার কাছে সবই ছিল ঝাপসা, অস্পষ্ট। মানুষ মরে ভূত হয়-এই একটা উদ্ভট চিন্তা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল পাড়া প্রতিবেশী আর বয়স্ক মানুষেরা। বাবার নিষেধ সত্ত্বেও আমি তাঁদের অনেকের কাছে ছোটোবেলায় অনেক ভূতের গল্প শুনেছি। তারপর

জীবনে প্রথম যেদিন শ্মশানে গেলাম শবযাত্রী হিসেবে সেদিন আমার ভূতের ভয় কিছুটা ভাঙল।

রাত্রে শ্মশানে দপদপ করে আলো জ্বলতে দেখলাম। আগে জেনেছিলাম ভয় দেখাবার জন্য পেতনিরা এই ধরনের আলো জ্বালে। ওই রকম আলো দেখিয়ে রাত্রিতে মানুষকে তারা ভয় দেখিয়ে বিপথে নিয়ে যায়। কিন্তু শ্মশানের ঘাটে দেখলাম সেই আলো জ্বলছে আর নিভছে। খুব কাছ থেকে দেখলাম একদল শেয়াল ফেলে দেওয়া আধপোড়া মড়া খেতে এসেছে। হাঁ করলে ওদের মুখে আগুন জ্বলে, সেই আগুনে পোকা মাকড় ছুটে আসে মুখের ভিতরে। মুখ বন্ধ করে সেই পোকা মাকড় শিয়ালে খায়। মুখ বন্ধ করলে আলো দেখা যায় না, মনে হয় তখন আলো নিভে গেছে। পেতনিদের আলো জ্বালাবার রহস্যটা এভাবেই আমার কাছে সেদিন ধরা পড়েছিল। কিন্তু তবুও সংস্কারের জট সহজে খোলেনি।

ভূতের ভয় তার পরও ছিল। এখন অবশ্য নেই। এখন বসে বসে ভাবি তাইতো ভূত গুলো সব গেল কোথায়? আত্মহত্যা করলে নাকি প্রেতলোকে বাস করতে হয় আত্মহননকারীকে। আশেপাশে তো আকছার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। শাস্ত্রবাক্য যদি মানতে হয় তবে প্রেতাত্মারা অবশ্যই আছে। সূক্ষ্মদেহে তারা ঘুরে বেড়ায় মুক্তির অপেক্ষায়। ক্রমশ তাদের সংখ্যা বাড়ে কিন্তু দেখা যায় না। তাহলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে তারা কি সব দেশত্যাগী হয়েছে? নাকি দিন দিন লোক বেড়েছে, এত লোকের ভিড়ে ভূতগুলো সব পালিয়ে গেছে? পোড়ো ভিটে পতিত জমি যেখানে যা ছিল সবই তো লোক বসতিতে ভরে যাচ্ছে। শ্যাওড়া গাছ সেও জ্বালানি হয়ে যাচ্ছে, পেতনিগুলোই বা এখন থাকে কোথায়?

ভূতের কথা এখন থাক। বিদেহীরা যে যেখানে আছে থাকুক শান্তিতে। এই অশান্তির জগতে এসে তাদের আর কাজ নেই। যেকথা বলছিলাম। দিন থেমে থাকে না। মহাকালের রথের চাকা ঘুরে চলে অবিরাম। মাস বৎসর ঘুরে যুগ, একের পর এক অতিক্রম করে চলে সে। মানুষের বিশ্বাস, কল্পনা ধ্যান-ধারণার রূপান্তর ঘটে অহরহ। মূল্যবোধেরও ঘটে পরিবর্তন। তে হি দিবসা গতাঃ। পুরোনো সে সব দিন কবেই চলে গিয়েছে।

বর্ধমান বহু কবি সাহিত্যিকের জন্ম দিয়েছে। এঁদের অনেকেই বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। যশোরাজ খান এমনই একজন কবি। তাঁর নিবাস কাটোয়া মহকুমার শ্রীখণ্ড গ্রামে। আগে এই গ্রাম বৈদ্যখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে বৈদ্যখণ্ড শ্রীখণ্ড নামে পরিচিতি পেয়েছে। এই কবি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। রসিক মিশ্র নামে আর একজনও মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এঁর নিবাস ছিল কাঁকুটে চন্দনপুর। কবি নৃসিংহ (নরসিংহ) এর জন্ম এই বর্ধমান জেলার শাঁখারিতে। শোনা যায় নৃসিংহ একবার যাচ্ছিলেন মুরশিদাবাদ। ঝড়বৃষ্টিতে আটকে পড়েন আউশগ্রামে। আউশগ্রামে সেদিন চলছিল গাজনের উৎসব। নৃসিংহের সাথে সেখানে দেখা হয় একজন সন্ন্যাসীর। সেই সন্ন্যাসীর আদেশে নৃসিংহ কাব্যরচনায় হাত দেন। সেই কাব্য ধর্মমঙ্গল নামে বিখ্যাত হয়। সংস্কৃত, পার্শি, হিন্দি, ওড়িয়া, বাংলা এই পাঁচ ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন নৃসিংহ। কবি হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছেন।

ভারুহা গ্রামের দ্বিজ গিরিধর সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখেছেন। পাটুলির কাছে নারায়ণপুর

নিবাসী মৌজিরাম ঘোষাল, কৃষ্ণকান্ত, নাসিগ্রামের কাশীনাথ ভট্টাচার্য, সার্বভৌম, দ্বিজ রামধন, দ্বিজ নন্দরাম এঁরাও সত্যনারায়ণের পাঁচালি লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। বোরাকুলি গ্রামের গোবিন্দ চক্রবর্তী, ভগবৎ প্রেমিক ভাবের জন্য তাঁর নাম হয়েছিল ভাবক চক্রবর্তী। বিপ্রদাস ঘোষ ছিলেন নামকরা বৈষ্ণব, কীর্তনের প্রধান ঘরানা রেনেটি ঘরানা-র উদ্ভাবক তিনি। তিনিও বর্ধমানের মানুষ।

কবীন্দ্র ভট্টাচার্য 'উদ্ভবদূত' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচনা করেছেন। ইনি ছিলেন তালিত গ্রাম নিবাসী। দ্বিজ শ্রীরূপচরণ বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা। তাঁর বাস ছিল গুসকরার কাছে মাহাতা গ্রামে। ভারত পাঁচালির রচয়িতা কাশীরাম দাস এবং তাঁর বড়ো ভাই শ্রীকৃষ্ণ দাস বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্যের রচয়িতা। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ গদাধর 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। পরশুরাম রচনা করেন 'মাধব সংগীত'। তাঁর বাড়িও বর্ধমানের কাছে চাঁপাই নগরে। ভবানী দাস রাধাবিলাস কাব্য রচনা করেন। তাঁর নিবাস নবদ্বীপের কাছে পাঁশুণ্ডা। বিখ্যাত সাধক এবং বিদগ্ধ কবি সাধবেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণির বাস বৈনান গ্রামে। ইনি। রচনা করেছেন 'সারাবলী সমুচ্চয়', সংস্কৃত ভাষায় ও বাংলায় 'হরিনাম তত্ত্ব-তরঙ্গিণী', 'কৃষ্ণতত্ত্বতরঙ্গিণী', 'পাষণ্ডদমন' প্রভতি কাব্য। কালনা-র সীতানাথ বসু 'স্কন্দপুরাণ'-এর অনুবাদ করেছেন। শ্রীনিবাস আচার্য যাঁকে চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় অবতার বলা হয়, তাঁর বাস ছিল বর্ধমানের মাজিগ্রাম। সমকালীন বৈষ্ণব সমাজের ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তি। এনার শিষ্য মনোহর দাস কাটোয়ার কাছে বেগুনকোলা গ্রামে বাস করেন। ইনিও বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম কবি। আর কত নাম করব। এই সব বিখ্যাত ব্যক্তিদের মতো আমিও হতে চাই।

বর্ধমানের প্রাচীন বর্ধিষ্ণু অঞ্চল মাড়ো মানকর। মানকর ভগবৎ প্রেমিকদের প্রাণকেন্দ্র। বীরভূম পরগনার অন্তর্ভুক্ত হলেও আসলে এই অঞ্চল বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই অঞ্চল তান্ত্রিকদের তন্ত্রসাধনার প্রধানকেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। মানকরকে 'গোপভূম' নামেও উল্লেখ করা হয়। মানকরের উত্তরপূর্বে অমরারগড়, একদা যা গোপভূমের রাজা মহেন্দ্রের বাজধানী ছিল। মানকরের উত্তর-পশ্চিমে ব্রহ্মডাঙা বা পৌষমুনির ডাঙা বলে একটা ডাঙা আছে। কথিত আছে এই পৌষমুনি হচ্ছে মহাভারত যুগের মুনি, এখানেই আছে পাণ্ডব ক্ষেত্রতলা। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস থাকাকালীন সময়ে কিছুকাল নাকি এখানে বসবাস করেছিল। বটবৃক্ষাচ্ছাদিত অবলুপ্তপ্রায় একটি মন্দির অতীতের এই কিংবদন্তির সাক্ষ্য বহন করে।

মানকরের ভট্টাচার্যপাড়ার উত্তরপ্রান্তে প্রাচীন একটি ভিটা সহ একটি পুষ্করিণী আছে লোকে যাকে বলে গোঁসাই পুকুর। আর ভিটেটাকে বলে গোঁসাই ভিটে। হতে পারে এই ভিটা বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি শ্রীজীব গোস্বামীর বাস্তুভিটা। শ্রীজীব গোস্বামী প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন বৈষ্ণব প্রেমধারায় প্রবাহিত হয়। শ্রীজীবের পুত্র শ্রীভাগবৎ অবশ্য এই গ্রামে বাস করেননি। তিনি থাকতেন পাশে মাড়ো গ্রামে। শ্রীকৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন তিনি। বর্ধমান নিবাসী জয়রামদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গঙ্গামঙ্গল'।

শোনা যায় মানকরে বৈষ্ণব ভাবধারা বহন করে আনেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম শিষ্যগণের অন্তর্গত যবন হরিদাস। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল' গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে, এই মানকরে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যবন হরিদাসের তর্কযুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণদের অশিষ্ট আচরণে বৈষ্ণবভক্ত অতীব রুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণদের বাক্‌শক্তি রহিত করে দেন। পরে ব্রাহ্মণরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলে তাঁর কাছে ক্ষমা চান। তখন তিনি তাঁদের ক্ষমা করেন। ব্রাহ্মণরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁরই প্রদর্শিত পথে বৈষ্ণব সাধনায় প্রবৃত্ত হন। গোপভূম পরগনার এই গ্রামের ভট্টাচার্য পাড়ার দুর্গামণ্ডপে একটি বিল্ববৃক্ষের নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। গৌরাঙ্গদেব এখানে তন্ত্রসাধনা করতে এসেছেন। পঞ্চমুণ্ডীর এই আসনে বসেই তিনি নাকি সিদ্ধি লাভ করেছেন। একদা মানকর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। দীর্ঘ বিশাল উন্নত সব বৃক্ষ আশেপাশে ছড়িয়ে আছে এখনও। পঞ্চমুণ্ডীর আসন ঘিরে মন্দির আছে। গ্রামের অভ্যন্তরে অজস্র মন্দিরের বেদিমূল যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। বনাকীর্ণ এই অঞ্চলে বহু সাধকের আনাগোনা ছিল। বেদিমূলে প্রতিষ্ঠিত আছে দেবী প্রতিমা। রাজবল্লভ কবিরাজ দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়ে ভাস্কর আনিয়ে এই প্রতিমা তৈরি করেন। বড়ো কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সাধক রামানন্দ। সিদ্ধিলাভের পর তিনি এই মন্দিরের ভার স্থানীয় পুরোহিতের হাতে অর্পণ করে চলে যান। গল্প আছে পুরোহিত বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য-কে দেবী কন্যারূপে দর্শন দিয়েছিলেন। বাণীকণ্ঠের কন্যারূপে দেবী নতুন পুকুরের ঘাটে কোনো এক ভক্ত শাঁখারির কাছে শাঁখা গ্রহণ করেছিলেন।

মাড়ো গ্রামেই আছে দেবী খড়েগশ্বরীর মন্দির। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে খড়ি নদী। নদী আর দেবীকে নিয়ে আছে সুন্দর কিংবদন্তি। মাড়ো গ্রামের জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ খড়েগশ্বরী দেবীর আরাধনা করতেন। দেবী সাধকের আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যার নাম রাখেন খড়েগশ্বরী বা খড়ি। শৈশবেই খড়ি মাতৃহারা হয়। ব্রাহ্মণ তখন দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করেন। কিন্তু খড়ির বিমাতা খড়িকে একেবারে দেখতে পারতেন না। তিনি ওকে উচ্ছিষ্ট খেতে দিতেন। খড়ি নিয়মিত সেই উচ্ছিষ্ট বাড়ির আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিত। একদিন অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে খড়ি আত্মহননে উদ্যত হয়। ব্রাহ্মণ তাকে নিবৃত্ত করার জন্য পিছনে পিছনে ছুটতে থাকেন। খড়ি দ্রুত গমন করতে থাকে। তার পদক্ষেপে নদীগর্ভের সূচনা হয়। শেষকালে খড়ি গঙ্গাবক্ষে আত্ম-বিসর্জন দেয়। এই ভাবে খড়ি নদী মাড়ো গ্রামের মধ্যভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে বর্ধমানের নাদনঘাটের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই ঘটনার পর ব্রাহ্মণ দেবাদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জানতে পেরেছিলেন তাঁর গৃহ সংলগ্ন আঁস্তাকুড়েতে একটি রক্তকমল ফুটে আছে। আর তার নীচেই আছে শীতলা মূর্তি। মাড়ো গ্রামে সেই শীতলা মূর্তি খড়েগশ্বরী দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

মানকরে মানিক নামে একজন ঘোষের বাস ছিল, সে রোজ গোরু চরাত। এক দিন লক্ষ্য করে তার একটি গাভী প্রতিদিন চুপি চুপি দল ছেড়ে বেতের জঙ্গলে ঢুকে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর সে ফিরে আসে। পরদিন সে গাভিটিকে লক্ষ্য করে অনুসরণ করে। দেখে গাভীটি বেতের জঙ্গলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দুধ দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার পর মানিক

দৈবাদিষ্ট হয়। জানতে পারে যে, গাভীটি যেখানে দুধ দিচ্ছে, সেখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। মানিক ওই শিবলিঙ্গকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করে। মানিকের নাম অনুসারে শিবলিঙ্গের নাম হয় মানিকেশ্বর। কেউ কেউ এমনও অনুমান করে থাকে যে মানিকেশ্বরের নাম অনুসারেই গ্রামের নাম হয়েছে মানকর।

বর্ধমান রাজের দীক্ষাগুরু মানকর গ্রামের শ্রীভক্তলাল গোস্বামী। তিনি 'শ্রীরাধাবল্লভজী' মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন ১২৫৬ সনের উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে। মহারাজা চিত্রসেন স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন যে গোবর্ধন পর্বতের গুহায় রাধিকা বিহীন কৃষ্ণের মূর্তি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। তা যেন তিনি শীঘ্র উদ্ধার করেন। সেই মূর্তিই প্রতিষ্ঠা হয় ভক্তলালের মন্দিরে। দেবাদিষ্ট রাজা যথানিয়মে দেবাদেশ পালন করে অষ্টধাতুতে রাধার একটি মূর্তি তৈরি করে ওই মন্দিরে কৃষ্ণের পাশে স্থাপন করেন। রাজা চিত্রসেনের অনুরোধে ভক্তলাল এক সময়ে তাঁর সাথে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনে যান। যাত্রাপথে মহানদীতে বন্যা হেতু তাঁদের যাত্রাপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। মহানদীর পাড়ে কিছুদিন তাঁরা অবস্থান করতে বাধ্য হন। রাজা এসময়ে একদিন গুরুকে পরিহাসছলে বলেন, ঠাকুর আপনি হলেন ভবনদীর কর্ণধার। সেই আপনিই বন্যার কারণে সামান্য এই মহানদীর পাড়ে আটকে আছেন?

গুরু ভক্তলাল ঘাবড়ে না গিয়ে, সোল্লাসে উত্তর দেন, কে বলে আমি আটকে বসে আছি? আমি তো অবিচলিত নেত্রে জগন্নাথকেই দর্শন করছি। এই তো প্রভু জগন্নাথ আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

এই কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে রাজাও বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে তিনি এবং অন্য সকলে সত্যি সত্যিই জগন্নাথদেবের সম্মুখে উপবিষ্ট রয়েছেন।

—হায় হায়, কি হেরিলাম, কি হেরিলাম! বলতে বলতে তাঁদের তখন প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা।

শ্রীভক্তলাল ছিলেন কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ। তাঁর দৌলতে মানকরে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে একটা সম্প্রীতির ভাব বজায় ছিল। মাড়ো এবং মানকর উভয় গ্রামেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। গোস্বামী বংশের দৌহিত্র শ্রীহিতলাল গোস্বামী রাধাবল্লভজির অন্যতম ভক্ত হয়ে ওঠেন। চারচূড়া যুক্ত মন্দির তৈরি হয়, তার ভিতরে কৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। তিনি নাকি ইচ্ছানুসারে বিগ্রহের সাথে কথা বলতেন। কবি চণ্ডীদাস নানুর থেকে মেদিনীপুব যাবার পথে মানকরের রামময় কবিরাজের গৃহে অবস্থান করেছিলেন।

গোপভূম কাঁকসা-ভরতপুর ও মানকর সংলগ্ন অমরারগড় এসব অঞ্চল সদগোপ বংশীয় সামন্ত রাজাদের অধিকারভুক্ত রাজ্য ছিল। গোপভূম পরগনার মানকরের ব্যবসা- বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। এখানকার রেশম সারা বাংলায় নাম করেছে। মানকরের বেনারসি চেলি খুব বিখ্যাত, তা সূক্ষ্ম রেশম শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। তাঁতশিল্প ছাড়াও মানকরে বিখ্যাত মাছ ধরার মুগা সুতো তৈরি হয়। মানকরের গহনারও খুব নাম। গহনা তৈরির জন্য এখানকার ডাইসের খুবই চাহিদা। এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি হচ্ছে কদমা, যা মানীর মান রাখে। এগুির কাপড়, রেশমের সুতো, লাক্ষার ব্যবসা, নীলের ব্যবসা, তালকাঁড়ি, মোড়া. চাটাই গৃহস্থালির নানা জিনিসের ব্যবসা ও শিল্পের জন্য মানকর জমজমাট নগর।

বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির জন্যও মানকরের নাম খুব। হিতলাল মিশ্র, মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, রঘুত্তম তর্কালঙ্কার, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম, অঘোরনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতের টোল ও ভাগবতালয় মানকরকে বিদ্যাচর্চার আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এখানকার কবিরাজরা পুরুষানুক্রমে বর্ধমান রাজের রাজবৈদ্য। শুধু তাই নয় হিতলাল মিশ্র মানকরের মুসলমানদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ করে দেন। ওদের জন্য তিনি একটি নিষ্কর জমি ও পুষ্করিণীও দান করেন। মানকর থেকে বুদ্‌বুদ পর্যন্ত তালগাছ শোভিত সোজা রাস্তা বাবুর রাস্তা নামে পরিচিত।

বর্ধমানের এই অঞ্চল শিক্ষা সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিরাজ করছে। এখানকার কবিরা প্রায় সকলেই দেবতা অথবা দেবীর আদেশে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন অথবা অগ্রজ কাউকে অনুসরণ করেছেন। শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল হিসাবে বর্ধমানের চারপাশে অনেকগুলি অঞ্চল পরিচিত। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, পূর্বস্থলী, ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, অম্বিকাকালনা, জামালপুর, জৌগ্রাম বিদ্যাশিক্ষার এক একটা নামকরা কেন্দ্র। এই অঞ্চলের বিদ্বান ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত সমুদ্রগড়ের বিখ্যাত বুনো রামনাথ।

মোগল সম্রাটদের মধ্যে হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গির, দারাশুকো সকলেই গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহী। বাংলায় জ্ঞানচর্চার একটা আবহাওয়া বিরাজ করছে। তাই সুবে বাংলা সম্পর্কে তাঁদের খুব আগ্রহ ছিল। মহিলা শিক্ষাচার্য হিসাবে উঠে এসেছে হটী বিদ্যালঙ্কার (সোঁয়াই) বা রূপমঞ্জরী দাস (হটু বিদ্যালঙ্কার, ইনি সোঁয়াই গ্রাম নিবাসী)। শিক্ষা দীক্ষার এই কেন্দ্রভূমিতে আমিও কাব্য রচনায় একজন দাস হতে চাইলাম।

তোমরা বলো মঙ্গলকাব্য, মঙ্গলকাব্য আসলে কী?

মঙ্গলকাব্যের উৎস সন্ধানে আমিও ব্যাপৃত হয়েছি। মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করতে শুরু করলাম। জানতে পারলাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আসলে একটি মধ্যবিত্ত বাঙালির গার্হস্থ্য জীবন রসের কাব্য। এই কাব্যে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেও একটা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব আছে। সমস্ত মঙ্গলকাব্যই এই রসে ডুবে আছে। মঙ্গলকাব্যগুলো আমার মনে হল সংসারে থেকেও সংসারে নেই এমনই এক একটা সন্ন্যাসী জীবনের কাহিনি। ভীষণভাবে আকৃষ্ট হলাম। তাহলে কী মঙ্গলকাব্যে এমন কিছু আছে, যা গৃহত্যাগীকেও আকৃষ্ট করতে পারে?

হাতের কাছে একটা পুথি পেয়ে গেলাম। পুথিটির দু-একটি পাতা ছাড়া সর্বত্র অখণ্ডিত। খুব ভালো ভাবে এটি সংরক্ষিত থাকায় লেখা খুব পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল ছিল। জানতে পারলাম পুথিখানি রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীধারার দ্বিতীয় আর একজন কবির নাম পেলাম, তিনি হলেন দ্বিজমাধব বা মাধবানন্দ। আমারই সমসাময়িক অগ্রজপ্রতীম ত্রিবেণি নিবাসী এই মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামাহাত্ম্য গ্রন্থে দেখলাম ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা আছে। এই কাহিনি তৎকালীন সময়ে খুব গীত হত। তবে অনেকে বলে আমার চণ্ডীকাব্যের মতো এর রচনা প্রণালি অত ভাবোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ না হওয়ায় এটি তেমনভাবে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

ভাবছ, নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছি।

আসলে তা নয়। আমি তোমাদের ওই সময়ের কথাটা বলতে চাই। মাধবাচার্য ও আমি দুজনেই আকবর বাদশাহের সমসাময়িক। মাধবাচার্য আপন কাব্যে দুর্গা মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌরমধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদার মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ দোষ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় শারদা চরিত॥'

মাধবাচার্য লিখেছেন ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে। আমার কাব্যের প্রায় দুই যুগ পূর্বে। এরও আগে চণ্ডীমঙ্গলের রচয়িতা হিসাবে পাওয়া গেছে আর একজন কবির নাম। তাঁর নাম মানিক দত্ত। তিনি সম্ভবত চণ্ডীগানের প্রবর্তক ছিলেন। মালদহ বা প্রাচীন গৌড়ের কোথাও তাঁর বাস ছিল। জন্মস্থানের নাম তিনি লিখে গেছেন ফুলুয়া (ফুলবাড়ি) নগর। আমি যত দূর জানতে পেরেছি ইনি অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ছিলেন। কথিত আছে দেবীর অনুগ্রহে তাঁর অন্ধত্ব ও খঞ্জত্ব নাকি ঘুচে গিয়েছিল। কিন্তু চণ্ডী ধারার প্রবর্তক মানিক দত্তের পুথি জোগাড় করা সম্ভব হয় না, কোথাও তা পাওয়া যায়নি।

মানিক দত্ত রচিত কাহিনিতে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের বিবরণে দেখি নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে চণ্ডী বলেছেন,

অন্য দেবতার পূজা মাসে ছয় মাসে।
হেন ব্রত করো পূজা দিবসে দিবসে॥

পদ্মাকে নিয়ে দেবী পার্বতী গিয়েছেন মহীমণ্ডলের মানিক দত্তের কাছে, উদ্দেশ্য চণ্ডীর ব্রতকথা সম্পর্কে অবহিত করা—

চিয়াও মানিক দত্ত শুন দুর্গার ব্রত
মুঞি দেবী জগতের মাতা।
রঘু রাঘব তোখে দুই পুত্র দিব
বেক্ত করহ ব্রতকথা ॥

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশে বৈদিক, বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক ও পৌরাণিক ইত্যাদি বিবিধ উৎস থেকে উদ্ভূত দার্শনিক মতবাদ ও দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনার একটি সমন্বয়সূচক সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুসংবদ্ধ সমাজজীবনে মাতৃপূজা পারিবারিক কেন্দ্রীয় শক্তি রূপে দৈবী-মহিমায় আত্মপ্রকাশ করছিল। এই দেবী পরিকল্পনা তন্ত্রশাস্ত্রের ধ্যানে ও ভাস্কর্যশিল্পে জাতীয় চেতনারূপে প্রকাশিত হচ্ছিল ধীরে ধীবে। এরই মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৈদিক সরস্বতী, পৌরাণিক গজলক্ষ্মী ও নানা তান্ত্রিক দেবীর সংমিশ্রিত একটি সত্তা এক সুষমাময় ঐক্যে সংহত হয়ে রূপ নিল চণ্ডীমূর্তিতে। কবিরা তাঁদের কাব্যে বিভিন্ন ভাবে দেবীর রূপ কল্পনার চিত্র অঙ্কন করতে লাগলেন। বিভিন্ন জায়গায় সেই রূপ কারিগররা গড়তে লাগল। আসলে ভক্ত মানসের অভিলাষ মূর্ত হতে থাকে সাহিত্যে শিল্পে।

আমিও চণ্ডীকে দেখতে চাইলাম নতুন রূপে।

বাংলাদেশের পল্লীসমাজ লোকসাহিত্যকে রূপ দিয়েছে। মঙ্গলকাব্য মূলত লোকসাহিত্য বা পল্লীসাহিত্য হতেই উদ্ভূত। মঙ্গলকাব্য মুখ্যত লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও লোক সাহিত্যের মৌলিক উপকরণ অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। আর লোকসাহিত্যের মৌখিক ধারাটি নিরক্ষর সমাজের মধ্যেই প্রবাহিত হয়েছে। মধ্য যুগে যেমন শত শত মনসামঙ্গল মুখে মুখেও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এদের কোনো বিবরণ বা তালিকা কোথাও লেখা নেই। বাংলাদেশে যেসব আদিম জাতির বাস ছিল তারা কৃষিভূমির সঙ্গে অতি সহজেই সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। কারণ বাংলা দেশের প্রকৃতি এবং তার পরিবেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা।

জলা জঙ্গল কেটে বসতি গড়বার সময় সর্পাঘাতে মৃত্যুর ভয়ে মানুষ মনসাকে পুজো করতে শুরু করেছে। মনসা গ্রাম্য দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত এই গ্রাম্য দেবী বা দেবতার পুজো করে থাকে ব্রাহ্মণেতর জাতি, মনসার পূজা করে অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ। শ্রাবণ মাসে খুব ঘটা করে এঁর পূজা হয়। এসময়ই সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। কোথাও ঘটের ওপর সর্পের মুখ অঙ্কিত করে, কোথাও বা প্রতিমা গড়ে মনসার পূজা হয়। গ্রাম্য দেবতা হিসাবে মনসার পরই শিবের স্থান। রাঢ় অঞ্চলে সর্বত্রই চৈত্র মাসে শিবের গাজনে মেতে ওঠে। চৈত্র মাস বৎসরের শেষ মাস। এর পরই বৈশাখ। নতুন বছরে উৎসব করার আর সময় থাকে না। চাষের কাজ শুরু হয়ে যায়। চাষের কাজের আগে শিবের পূজার একটা তাৎপর্য আছে। চাষিরা শিবকে নিজেদের দেবতা বলেই মনে করে।

মানুষ চাষ করে আনন্দে, মাঠে মাঠে ধান কাটে নৃত্যে এবং আনন্দে। নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে তাঁরা কবেই বিসর্জন দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বহুলাংশে সেই বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়ে গেছে। মিশে গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে। একটা মিশ্র জাতির সমাজ জীবন গঠিত হয়েছে, যা ক্রমে পল্লী সমাজের রূপ ধারণ করেছে বাংলাদেশে। বনবাসী মানুষ এমনি করে

বন কেটে বসত তথা সমাজ তৈরি করেছে। এই সমাজ হচ্ছে আজকের গ্রাম বাংলার পল্লীসমাজ।

—তাহলে কি, কী বংশে, কী ভাষায় বঙ্গবাসী বলতে আপনি যাদের বোঝাতে চাইছেন, তাঁরা নিকৃষ্ট, জাতি ছিল?

—নিকৃষ্ট কেন বলছ? উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট এসব তো আপেক্ষিক। তোমার কাছে যা নিকৃষ্ট, অপরের কাছে তাই উৎকৃষ্ট। এক-আধ ফোঁটা আর্য রক্ত কেবল হয়তো মিশেছে কোথাও কোথাও। কিন্তু সেটা যে আর্য রক্তই তা কে বলবে? সত্যি বলতে কি আমি যদি বলি, আমরা শুধু আর্যের ছোঁয়াচ পেয়েছি, ছাঁচ পাইনি। তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? আমাদের গায়ের রং কালো, কারো কারো তামাটে ধরনের ফরসা। এতে কি রক্তের আর্যত্ব প্রমাণিত হয়? আর তাই যদি হয় তাহলে তো একটা রক্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। নমঃশূদ্ররা উত্তরভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সমগোত্রীয়। উত্তর ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালি নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। কারণ ওদের মৌলিকত্য প্রমাণিত।

—বাংলা ভাষা স্রষ্টাদের মধ্যে আপনি অন্যতম। আপনার কি মনে হয় আপনার হাতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?

—না। তা একেবারেই মনে হয় না। আসলে ভাষা আর বংশকে মেলানো খুব কঠিন কাজ। অসাধ্যই বলা যায়। কারণ আর্য শব্দটা কখনও ভাষা হয়েছে, কখনও আবার জাতি। ভাষা বিভক্তি সম্পন্ন হলে আর্য নইলে অনার্য। এই একটা বিচার। আর্যের আবার প্রকার ভেদ দুটো। বৈদিক আর্য আর সংস্কৃত আর্য। বৈদিকরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটিকে আর্য বর্ণ বলেছেন। আর্যরা বলে আর্য ভাষা, অনার্যরা বলে অনার্য ভাষা। কিন্তু ব্রাহ্মণের বীর্যে শূদ্রীর গর্ভে যখন নিষাদের জন্ম হয় আর শূদ্র বীর্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যখন চাঁড়ালের জন্ম হয় তখনই, বেধে যায় গোলমাল। ভ্রংশতা বা বিকার ঘটে। আর বিকার ঘটলে তখন আর্যত্ব থাকে কি করে? বীর্য ছাড়া যেমন বংশ হবে না, তেমন ধাতু ছাড়া ভাষাও হবে না তাই ধাতু বীর্যই আর্যত্ব নির্ধারক নয়। ধ্বনি-বিকারের ফলশ্রুতি যেমন আজকের বাংলা ভাষা।

—হ্যাঁ। আপনার পরে রচিত ধর্মমঙ্গলের খ্যাতনামা এক কবি রূপরাম চক্রবর্তীও (১৬৪৯-৫০) আপনার মতো ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনিও দক্ষিণ দামোদরের মানুষ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। এঁরা ছিলেন চার ভাই। দামিন্যার তিনক্রোশ উত্তরপশ্চিমে যে কাইতি-শ্রীরামপুর নামে গ্রাম আছে সেখানে জন্ম হয়েছিল রূপরামের। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলে ইনি পরিচিত। বাড়ি ছিল যদিও কাইতি শ্রীরামপুর, কিন্তু তিনি থাকতেন উচালনের কাছে কাজি পাড়া নামে একটি অখ্যাত জায়গায়। পড়তে যেতেন শাকনাড়ার টোলে। জনৈক হাড়ি কন্যার প্রণয়াসক্ত হয়ে পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ায়, টোল থেকে গুরু তাড়িত হন। জ্যেষ্ঠ ভাই রত্নেশ্বরের শাসনে শেষে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। দুর্বল শরীরে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হন দীঘনগরে। গ্রামবাসীদের দয়ায় সেখানে তাঁর কিছু ফলার জোটে, তারপর আবার দীঘনগর থেকে যাত্রা শুরু করেন। শেষকালে এড়ালে এসে গোপভূম পরগনার রাজা গণেশ রায়ের আশ্রয় পান। তাঁর

আশ্রয়েই তিনি লিখতে শুরু করেন কাব্য, হয়ে ওঠেন ধর্মমঙ্গলের খ্যাতনামা কবি। আপনি হয়তো বলবেন, এও আর এক মুকুন্দরামের গল্প। যাকগে, থাক সে গল্প।

—এই বাংলা হচ্ছে প্রাচীন নিষাদভূমি, কিরাত কোল অস্ত্রালের জায়গা। আবার এই বাংলা পাখিদের দেশ। বাংলার আকাশে বাতাসে সুরের যাদু। তাই অনার্য জিহ্বায় আর্যত্ব কঠিন। বাংলা ভাষার ধ্বনি-বিকার দেখে বুঝে নিতে হয় এর প্রাকৃত স্বভাব কি ছিল। ধাতু সত্য, তবে শেষ সত্য নয়। এখানে কৃষিভূমির আকর্ষণে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বছরের পর বছর ধরে। আগেই বলেছি, প্রত্যেকটি গোষ্ঠী নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য পরিহার করে পরস্পরের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। তারপর একটা সময় বঙ্গবাসী অখণ্ড সমাজজীবন গঠন করেছে। তারই উপর ভিত্তি করে বাংলার লোকসাহিত্য রচিত হয়েছে। লোকসাহিত্যে যখন আঞ্চলিক রূপ ফুটে ওঠে তখন বুঝতে হয় বিবিধের মধ্যে ঐক্যসূত্র গ্রথিত হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় লোকসাহিত্য তার আঞ্চলিক রূপ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতেও পারেনি। সেখানে সে তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখেছে। যেমন ধান জিনিসটা গোড়ায় ছিল ঘাস বা তৃণ। তৃণকে কর্ষণ করে করে ধান্যে পরিণত করা হয়েছে। নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করার নাম কর্ষণ। এমন করে সেটা হবে যাতে পুষ্টি আসবে, লাবণ্য ফুটবে এবং সৌষ্ঠব জন্মাবে। যাতে সৌষ্ঠব নেই, তাতে কর্ষণ নেই, সংস্কৃতি নেই।

এসবই শুধু আমার কথা নয়, বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের কথা। বিভিন্ন দেশ জাতি-র মধ্যে, জিনিসের মধ্যে এই বিরোধী ও অচেনা ভাবের বিনিময় হয়। যদি তা সংঘর্ষমূলক হয়ও তাতেও কর্ষণ ব্যাহত হয় না। বরং সংস্কৃতি পুষ্ট হয়। বঙ্গদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে এই ধরনের কর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বারবার। বাংলাদেশের প্রাচীন গ্রামগুলি সংগঠন এবং সমাজজীবনের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল রাজত্বের সময় এটা ঘটেছে খুব স্পষ্ট ভাবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার গোষ্ঠীজীবনের রূপ এই সময় থেকেই শুরু হয়েছে।

তোমাদের ইতিহাসেই তো লেখা হয়েছে, পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে তারা হিন্দুমন্দির স্থাপন এবং ব্রাহ্মণ বসতির উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহিরাগত (হিন্দু?) ধর্মীয় আদর্শ বৃহত্তর সমাজ জীবনের উপর কোনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। ফলে কোথাও কোথাও মন্দিরের দেবতা অদৃশ্য হয়েছে, মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে, পূজারি ব্রাহ্মণ নিজের বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠী জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে একটা সময়।

আমি লিখেছি—

'আপনার অঙ্গ ব্রহ্মা কৈলা দুইখান
বামদিগে হইলা নারী দক্ষিণে পুমান।
মনুকে বলিল ব্রহ্মা শুন মোর কথা
প্রজা সৃজিয়া মোর ঘুচাহ ব্যথা।

সৃষ্টি করিবারে ভাল বলিলা গোসাঞী
কোথায় বসিবেক প্রজা এমত স্থল নাঞি।
যুগে যুগে প্রজা-সৃষ্টি আছিল ধরণী
অসুর হরিয়া লৈল পাতাল-সরণি।
এ বোল শুনিয়া ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত
নাসাপথে বরাহ হইলা আচম্বিত।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥'

আমার সময়ে রামায়ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে এসেছি আমি। ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে পণ্ডিতদের কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে এই মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হয়েছে। আবার দ্যাখো, এখানে চণ্ডীদাস লোচনদাস গোবিন্দদাস পদাবলিও রচনা করেছেন। অবশ্য কেউ বলেন, বড়ু চণ্ডীদাস বীরভূমের মানুষ ছিলেন, কেউ বলেন তাঁর বাসভূমি ছিল পুরুলিয়ার মানভূম অঞ্চলে। কিন্তু আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি যা বলতে চাই তা হল, সেগুলি যে সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট এই অভিযোগ কেউ করেন না।

—আপনার চণ্ডী বস্তুতন্ত্রভিত্তিক রচনা বলে আপনার গর্ব আছে, জানি। এদেশের সমাজ এদেশের জীবন আপনার কাব্যের মধ্যে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কালকেতুর বিবাহাচারের কথার বর্ণনা পড়তে গিয়ে আমরা জানতে পারি, তৎকালীন বিবাহব্যবস্থার পরিচয়ে শুধু অনার্য ব্যাধ সমাজের কথাই আপনি উল্লেখ করেননি, সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের কথাই তুলে ধরেছেন। এই জন্যই আপনার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে।

—ঠিক। যেমন পুরী নির্মাণের কথাই ধরো। কোনোও গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করে কিন্তু আমি এই বর্ণনার অবতারণা করিনি। পুরী হলেই যে তা বিশাল এবং স্বর্ণখচিত হবে তা কেন? কাদা দিয়ে এই পুরীর ভিত্তি রচনা করা হয়েছে। আসলে এ...তো অমরাবতী নয়, স্বর্ণলঙ্কাও নয়, এ হচ্ছে সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের মাটির ঘরবাড়ি। আবার দ্যাখো, রাজাদের গড় এমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে গড়ের চারদিকে বাঁশের বেউড় অর্থাৎ ছোটো ঘন কাঁটা বাঁশের ঝোপঝাড় থাকবে। পুরীর চারদিকে উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলে খড়ের ছাউনি থাকবে।

'সাতনাই বন্দে' অর্থাৎ নানা ধরনের ঘর থাকবে। অন্তঃপুরে সরোবর, সপ্তম মহলে দেবদেবীর মন্দির, পাষাণের নাছ-বাট, পাষাণের চতুঃশালা, পাকশালা ইত্যাদি কত নাম, এসব থাকবে। উত্তরে থাকবে খিড়কিদ্বার, পূর্বে সিংহদ্বার। পূর্বদিকে হবে বিষ্ণুর দেউল, বামভাগে দুর্গামেলা, সিংহদ্বারের পূর্বে জলাশয়। 'নগর চাতর' মাঝে শিবের মন্দির, অনাথমণ্ডপ ও অন্নশালা থাকবে। অতিথি জনের জন্য আলাদা মন্দির থাকবে। সেখানে প্রবাসী লোকেদের থাকবার জায়গাও হবে। রাজা নগর বসাবার জন্য বাছা বাছা প্রজাদের নিয়ে এসে ভূমি দান করছে। নানা জাতি নগরে বাস করে নিজের নিজের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হচ্ছে। অন্য দেশ থেকে আসে চন্দন, শঙ্খ, লবঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, নীলা, মানিক, মতি, পলা,

চামর, পামরী প্রভৃতি পণ্য। রাজার নিজস্ব সওদাগরেরা তা নিয়ে আসে। তারা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে সিংহল ও অন্যান্য দেশ হতে সেখানকার উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি করে।

রাজপুত, মল্ল, বাগদি ও ডোম এরা সাধারণত সৈন্য বাহিনীর সদস্য হয়। স্থান বিশেষে মুসলমান সৈন্যও থাকে। পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়া, হাতি ও রথ চালিয়ে চতুরঙ্গ দলে সৈন্যরা যুদ্ধ করে। যুদ্ধের সময় 'ব্যাল্লিশ বাজনা'র ব্যবহার হয়। হাতির পিঠে শূল—শক্তি-জাঠ নিয়ে মাহুতরা যুদ্ধ করে। কখনো কখনো হাতির শুঁড়ে লোহার মুগুব বেঁধে দেওয়া হয়। গাড়িতে করে কামান নিয়ে যাওয়া হয়। সৈন্যরা তির-ধনুক, খাঁড়া, ঢাল, ভিন্দিপাল, ভুগুি, গদা, তাক, বেলক (বন্দুক) ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে। এই সব অস্ত্রশস্ত্র দেশেই নির্মিত হয়।

—প্রকৃতির কোলে মানুষ সংগ্রাম করছে। শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করছে এ আপনি দেখিয়েছেন, কিন্তু মুক্তির পথ? চণ্ডীমঙ্গল কাব্য যে আদতে চণ্ডীর পুজো প্রচারের জন্য, তা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে।

—অস্বীকার করি কি করে, চণ্ডীমঙ্গল মূলত ভগবতীর পূজা-প্রচারের জন্য নিবেদিত। সংস্কৃত সাহিত্য আমাকে পড়তে হয়েছে। জানতে হয়েছে আমার আসার চারশো বছর আগে বাংলার সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল, কেমন ছিল মানুষের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি। চণ্ডীমঙ্গল লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ থেকে নানান উপাখ্যান, ভারতের নানা স্থানের নদ-নদী, নগর, গ্রাম, অরণ্য প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা আমাকে দিতে হয়েছে। পশুপাখি এবং নানাধর্মী বহুজাতীয় মানুষের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের বর্ণনা দিতে হয়েছে এতে।

কাব্যে বর্ণিত দুটি উপাখ্যানের স্থান দুটি আলাদা আলাদা জায়গা। একটি বাংলা থেকে বহু দূরবর্তী সিংহল দেশ। যে দেশে আমি কখনও গমন করিনি। যদিও সে দেশেব ভৌগোলিক বিবরণ সঠিকভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা আমি করেছি। সব জায়গায় হয়তো সেটা সঠিকভাবে করতেপারিনি। অন্য জায়গাটি বর্ধমানের মঙ্গলকোটের নিকটবর্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনী নগরী। কাব্যে এই নগরীর যা বিবরণ আমি দিয়েছি দেখবে, তা অনেক বাস্তবোচিত। খুঁজলে এখনও মঙ্গলকোটের কাছে উজানি নামে একটি জায়গা পাওয়া যাবে। এখন সেই জায়গা পতিত জমি বললেই চলে। কোনো মনুষ্যবসতি নেই। আসলে তা চলে গেছে মাটির তলায়। সে ইতিহাস খুঁড়বে কে? কাছাকাছি ভ্রমর নামে একটা খাল আছে যা অজয় নদে গিয়ে মিশেছে।

ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর অজয় নদ বেয়ে যখন সিংহল যাত্রা করেছে। দেখবে অজয় নদের উভয়কূলে হসনপুর, গাঙ্গড়া, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগাঁ, উদ্ধানপুর প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখ করেছি। সে সব গ্রামের এখনও কিছু কিছু অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাবে যদি অজয় নদের ধারে ধারে ঘুরে বেড়োনো যায়। এমনকী সওদাগরদের নৌকো যখন গঙ্গায় পৌঁছেছিল, তখন গঙ্গার উপকূল বরাবর যে সমস্ত স্থাননাম কাব্যে বর্ণিত হয়েছে তারও অনেক কিছুই আজও প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে। সুন্দরবনের নিকটবর্তী

অনেকাংশ পোর্তুগীজদের দখলে ছিল, আমি তাই কাব্যে সেই জায়গাকে ফিরিঙ্গার দেশ বলে উল্লেখ করেছি।

আমি দেখেছি, অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস আমাদের সমাজের মধ্যে সর্বব্যাপী, দেবতার নামে যা প্রচারিত হয়, সমাজ তা শ্রদ্ধায় হোক, ভয়েই হোক, বিশ্বাস করে, মেনে নেয়। এমনকি সমাজে যাদের অন্ন নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগ্যরাও দেবতার নামে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তারা ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে যে-চারদিককার গ্লানিকর অবস্থার মধ্যেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি এই শক্তির কৃপা পাওয়া যায়, যদি দেবীকে তুষ্ট করা যায়।

—এটাই আমার প্রশ্ন? আপনি মানুষের কর্ম প্রেরণাকে উৎসাহ দেননি। তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়েছেন। শিখিয়েছেন কোনো কাজ কোরো না। যেখানে যা আছে, যেমন ভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে রেখে দাও। কোনো কিছুকে নড়াবার দরকার নেই, কেবল করজোড়ে তারস্বরে মা মা মা বলো। তাহলেই সব কাজ হয়ে যাবে।

—না তা কেন হবে?

—তবে?

—আসলে একটা নতুন পরীক্ষা করতে চেয়েছি। আমি দেখেছি, কাপুরুষোচিত দৈব নির্ভরতা আমাদের জীবনে স্থিতি এনে দিয়েছে। আমাদের উদ্যমহীন জীবন দেবভক্তির উপর যতটা নির্ভরশীল তার চেয়ে বেশি নির্ভরশীল রাজশক্তির উপর। আমি তাই চেয়েছি নতুন ভাবে একটা নতুন কথা বলতে। লৌকিক ধর্মের ভূমিকা এখানে কৃষকদের মানসিকতাকে বিগ্রহমুখী করেনি। আমি দেখেছি ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম, চিন্তা ও চেতনার জগতে মানুষ ধর্মের নামেই চিন্তা করে। ধর্মকে আমি দুটো ভাবে দেখিয়েছি। এক, সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। দুই, প্রতিবাদী ধর্মমত।

—সমাজের যে বাহ্যরূপ মানুষ প্রবল করে দেখতে পাচ্ছে-তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। সেখানে দেবতা এসে সব করে দেবে? আর তাই মানুষ দিনের পর দিন বিশ্বাস করবে?

—ইতিহাসকে তৈরি করে অগণ মানুষ। মানুষের তৈরি ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেই হবে। পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যেতেই হবে। মরে গেলেও সব কিছু স্মৃতির আড়ালে চলে যায় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেও দোদুল্যমানতা থাকে, তার মধ্যেই জায়গা করে নেয় জীবনসংগ্রাম। ইতিহাসবোধ যদি না থাকে তাহলে কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। দেশে মোগল পাঠানের আক্রমণ আছড়ে পড়ছে। এসময় সোজা কথা সোজাসুজি বলা, চাট্টিখানি কথা নয়। নতুন কথা আমাকে শোনাতে হয়েছে নতুন ভাষায়।

—কিন্তু আপনার কথায় কোনো কাজ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

—সত্যিই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণার মধ্যে দেবতার পরিচয় আচ্ছন্নই থেকে গেছে। তবু আমার মনে হয়, এরই ভেতর থেকে কেউ যেন বলতে চায়, মানুষ যদি এখনো

সমস্ত দুঃখ এবং বরাভয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বলতে পারে "আমি সব সহ্য করব, তবু কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না" তা হলেই মানুষ জিতে যাবে।

—কিন্তু তা মানুষ বলতে পারছে কই? মানুষকে সেই কথা কি শেখানো হয়েছে?

—না সরাসরি তা হয়নি। তবু আমি চেষ্টা করেছি। তোমাদেরও চেষ্টা করতে হবে। এক জীবনের কাজ এ নয়।

—আসলে রাজশক্তিকে সকলেই ভয় করে এসেছে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালি সংগঠিত বিদ্রোহ করেছে বা যুদ্ধ করেছে সে ইতিহাস কোথায়? যদিবা দেখাতেন কালকেতু কিংবা ধনপতির মতো চরিত্র বিদ্রোহ করছে, তা হলেও একটা বিরাট কিছু করা হত। তা নয় মারের পর মার খেয়েছে, কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয়নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারদিক থেকে তাদের আক্রমণ করেছে তবু এতটুকু তারা নড়েনি। আপনিও দেখাতে পারেননি।

—আর কেউ কি পেরেছে?

—না। তা পারেনি। আর কেউ পারেনি বলে আপনিও ছেড়ে দিলেন? তাহলে আপনাকে কৃতিত্ব দেব কী করে?

—ভুল। ভুল এসব।

—ভুল। ভুল এসব? চণ্ডী দেবী হয়ে কিনা বলছেন, 'ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জর করে, ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে পুজো আমি আদায় করব'। এ কিরকম দেবী? একে দেবী বলতে লজ্জা হয়।

—এসব কী বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। এককালে শিব দেবতা ছিলেন। তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। হঠাৎ মেয়ে দেবতা এসে জোর করে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। আপনিও মেয়ে দেখে গলে গেলেন। এ কোন্ দেশী ভদ্রতা? গায়ের জোর? গায়ের জোর চণ্ডীর কি করে হয়? সে তো মেয়েছেলে। যেসব উপায়ের কথা চণ্ডীর মুখে আপনি বসিয়েছেন, সুস্থবুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলা যায়?

—এবার সত্যি আমাকে লজ্জায় ফেললে। অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে আমার লেখার এত খবরও তোমরা রাখো! সত্যি বলতে কি আমার ভালো লাগছে। একটু গর্বও হচ্ছে। আচ্ছা সত্যি করে বলো তো? সমাজে মেয়েদের আমরা কোন্ চোখে দেখি? তবে কী করব বলো, আমার উপর আদেশ হয়েছে।

—আদেশ হয়েছে না ছাই। সবারই ওই এক কথা। দেবী স্বপ্নে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই স্বপ্ন নির্দেশের স্বপ্ন আমাদের জাতটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

—না না। এভাবে বোলো না। দ্যাখো, দুঃখের যখন চূড়ান্ত হল, শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে মাথা হেঁট করেছে সদাগর।

—সে সদাগর তখন তো আধমরা।

—এছাড়া তার, আর কি করার ছিল?

—ঠিকই তো, তাহলে আর নীতির মান থাকল কোথায়?

—কি করে থাকবে তুমি আশা করো? আমাদের দেশের মানুষগুলোই তো সব আধমরা। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, চাঁদ সদাগর মনসার কাছে মাথা নত করেনি। বেহুলার প্রতি স্নেহবশত পুত্রকে ফিরে পাবার আশায়, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ এই কৌশলে, সে মনসাকে তাচ্ছিল্য সহকারে স্বীকার করেছে। আর বেহুলা তো আসলে মানবীকন্যা। তেমনি আমার ধনপতিরও সেই একই দশা।

—মানুষের জীবনে দৈব যে কত বলবান তা ধনপতি সদাগরের তথাকথিত পরাজয়ে আপনি ভালো করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু বেহুলাকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ। সাংসারিক দুঃখকষ্টে চির অভ্যস্ত, তবু নিজের আদর্শকে ধরে রেখেছে। হেরে যায়নি।

—পরজয় যে জীবনে মেনে নেয়, সেই তো দুর্ভাগা। নৈরাশ্যমথিত হৃদয়ে আশার একটি দীপশিখাকে অনির্বাণ রেখে দুস্তর সংসার গাঙ্গুরে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে বেহুলা। এ চাট্টিখানি ব্যাপার? তাঁর জীবনে বাঁচবার মতো বলেরও তো অভাব ছিল না।

—না। লক্ষ্মীন্দর বেঁচে উঠতেও পারে। এই আশার কথা, এই আশাই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ। বেহুলাকে বাংলার মানুষ তাই মনে রেখেছে।

—কিন্তু যে কাব্য আপনি লিখেছেন, তার থেকে বেহুলা বেঁচে থাকবে অনেক অনেকদিন।

—তোমার তিরস্কারই মাথা পেতে নিলাম। মন্দ লাগছে না তোমার সঙ্গে কথা বলতে। কবিকঙ্কণকে এইভাবে যদি পরাস্ত করা যায় মন্দ লাগবে কেন বলো? তবে দ্যাখো, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা বহুদিনকার পুরানো কাহিনি। চৈতন্যদেবের পূর্বেও বঙ্গদেশে মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া গেয়ে গেয়ে রাত্রি জাগরণের পালা চলত। চণ্ডীমঙ্গলের গীত যখন গাওয়া হত, গাইতে আট দিন লাগত। অষ্টদিনের মঙ্গল গান, তাই তার নাম হয়েছে 'অষ্টমঙ্গলা'। সাধারণত মঙ্গলবার দিবা হতে পরবর্তী মঙ্গলবার বত্রিশ প্রহর পর্যন্ত এই গান চলত। অবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালিয়ে রাখতে হত ঘৃতের বাতি। ঘৃতদীপ মঙ্গলসূচক অর্থে জ্বলত। চৈতন্য ভাগবতেই পাওয়া গেছে—

'মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাহে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে ॥'

এই রকম কোনো চণ্ডীর গান অবলম্বন করেই কবি মাধবাচার্য হয়তো তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই চণ্ডীর রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। বলরাম কবিকঙ্কণ ও আমি, মাধবাচার্যের সেই কাহিনিকেই আরো উজ্বল করেছি। বলরামের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে খুব প্রচলিত। মানিক দত্তের চণ্ডী, ভাষা দেখে মনে হয় যথেষ্ট প্রাচীন। মানিক দত্ত বর্ণনা করেছেন— 'ধর্মঠাকুর হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির উদ্ভব'। ধর্মমঙ্গলের উপর বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাব রয়েছে। চণ্ডীর গানে উল্লেখ রয়েছে শূন্যবাদেরও। ধর্মমঙ্গলের মতে ধর্মঠাকুর বা আদি নিরাকার বুদ্ধ হতে আদ্যাশক্তির উদ্ভব। আদ্যাশক্তি হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উদ্ভূত হয়েছেন।

—ধর্মমঙ্গলেও চণ্ডীর কথা রয়েছে। চণ্ডীকাব্যে রয়েছে ধর্মঠাকুরের কথা-এও এক অদ্ভুত

সংমিশ্রণ। জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য ও আপনার চণ্ডী তুলনা করলে বোঝা যায় জনার্দনের রয়েছে শুধু কাঠামো। মাধাবাচার্য্য এবং আপনার গল্পাংশে রয়েছে প্রচুর মিল। যদিও মাধবাচার্যের কালকেতু, আপনার কালকেতু অপেক্ষা বীর। কিন্তু মাধবাচার্যের ভাঁড়ু দত্ত, আপনার ভাঁড়ু দত্ত অপেক্ষা শঠতায় অনেক প্রবীণ। মোটের উপর আপনার চণ্ডী মাধবাচার্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলেই গণ্য হয়েছে। গণ্য হয়েছে এই বলে যে, আপনার চণ্ডীমঙ্গলই বাংলা ভাষায় প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

—মোগল পাঠান সিংহাসন দখলের জন্য লড়াইয়ে মত্ত, দেশের মানুষ বিব্রত। চৈতন্য শিষ্য বৈষ্ণবরা পাষণ্ড দলনে প্রবৃত্ত, তারা রাধাভাব প্রচারে উন্মত্ত। দেশের অন্য সংস্কৃতি, উপকথা, বৈষ্ণবীয় মাধুর্য-স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচিত হল। ধর্মবিপ্লব ও সাম্প্রদায়িক ধর্মবিরোধের সংঘর্ষে বাংলা সাহিত্য এতে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধশালী হল। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট ধারার মধ্যেই এর প্রমাণ রয়েছে প্রচুর।

—শৈব সম্প্রদায়ের শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, শাক্ত সম্প্রদায়ের ধর্মমঙ্গল এবং লৌকিক দেবদেবীদের উপলক্ষ করে রচিত মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি রচনায় দেবদেবীদের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিকাশই শুধু নয় সেখানেও তৎকালীন সমাজ ও ধর্মের চিত্র আঁকা হয়েছে।

—সেন রাজত্বের সময় এদেশে সংস্কৃত চর্চা এবং হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা সাধারণের সমাজকে আলোড়িত করেনি। এরপর যখন তুর্কি বিজয় শুরু হয় তখন বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠী জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেবল যেসব অঞ্চলে তুর্কি আক্রমণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিতান্ত গৌণ ছিল, সে অঞ্চলে প্রাচীন পল্লী যা অতি সামান্য সংখ্যায় অবশিষ্ট ছিল; সেখানে মূলত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু-মুসলমান এবং আদিবাসীদের মিলিত একটি সমাজ গড়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের একক আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে বাংলার সমাজের লৌকিক স্তর থেকে নতুন ধর্মমত আত্মপ্রকাশ করে।

—যার প্রকাশ ঘটে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মে?

—হ্যাঁ। বলতে গেলে এটাই বাংলার প্রথম লোকধর্ম। কোনো প্রামাণ্য শাস্ত্রের অনুশাসন নয়, সব ধর্মের মূল আদর্শকে নিয়ে কেবলমাত্র হৃদয়কেই শাস্ত্র বলে স্বীকার করে নেওয়া হল। তাই সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করল এই ধর্ম। এই ধর্ম প্রথম সমগ্র বাংলাদেশকে এক অখণ্ড যোগসূত্রে দ্রুত বেঁধে ফেলল। এই প্রথম বৃহত্তর পরিধিতে বাংলার লোকসমাজ গড়ে উঠবার অবকাশ পেল। বাংলার লোকসাহিত্যে যথার্থ পরিপুষ্টি নিয়ে বিকশিত হবার সুযোগ পেল। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ যেমন পদাবলি, জীবনী, অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্য শাখাপ্রশাখা নিয়ে পুষ্টিলাভ করল এই সময় থেকেই।

—বহরাম খাঁ যখন বঙ্গের শাসনকর্তা। তাঁর তরবারি রক্ষক ছিলেন ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ। বহরাম খাঁর মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতান 'শিলাহদার' ফখরুদ্দীনকে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। লক্ষৌতির শাসক কাদর খাঁর সঙ্গে ফখরুদ্দীনের মনোমালিন্য

হতে হতে সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ফখরুদ্দীন হেরে গেলেও গোপনে তিনি কাদর খাঁর সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। অভ্যন্তরীণ সেনা বিদ্রোহ কাদর খাঁ ও ইয়াহিয়া খাঁকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করে দেয়। ফখরুদ্দীন লক্ষৌতি ও সাতগাঁও দখল করে সাতগাঁওকে রাজধানী করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তারপর চর্তুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ের সিংহাসনের দখল পেয়েছিলেন লক্ষৌতির পূর্বতন শাসনকর্তা কাদর খাঁর সেনাপতি আলাউদ্দীন আলি খাঁ বা আলি শাহর পোষ্যপুত্র সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস শাহ প্রথমেই ফখরুদ্দীনকে শিক্ষা দিতে সাতগাঁওয়ে সেনা অভিযান করে দেন। সেই অভিযানে ফখরুদ্দীন পরাস্ত ও নিহত হন। ইলিয়াস শাহ লক্ষৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও তিন বিভাগেরই শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। বাংলায় শুরু হয় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন (১৩৪৬-১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ)। মূলত এই সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য নবরূপ পেতে শুরু করে।

—ঠিকই বলেছ। সাহিত্য একান্তরূপে মানস প্রক্রিয়ার বাঙ্ময় রূপ। বাস্তব জীবনধারার সঙ্গে তার অন্তর্গূঢ় যোগাযোগ। আত্মার রূপলাভের জন্য যেমন দেহ আধারের প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনি সাহিত্যেরও একটা বাস্তব আধার চাই। জাতির ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে সেই আধার গড়ে ওঠে। দেশ-কাল-পাত্রের সহযোগিতায় অনন্তকাল প্রবাহের কিছুটা অংশকে খণ্ডিত করেই রচিত হয় জাতির ইতিহাস। আর মানুষের গোষ্ঠী জীবনের অধিমানসের বিচিত্র বিস্ময়, অযুত চিত্তপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করে সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদি। দেশে-কালে পরিব্যাপ্ত জনজীবনের ধারা-উপধারার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উচ্চাবচতা পার হয়ে আমরা একটা ভৌগোলিক বেষ্টনীর মধ্যে নরগোষ্ঠীর যে জীবনযাত্রা লক্ষ্য করি, তা ব্যাহত মৃত্তিকাতলচারী হলেও তার মূল চৈতন্যের গভীরে আত্মগোপন করে থাকে, এর থেকেই জন্ম নেয় সাহিত্য সংস্কৃতি। চিত্র দেখে, কাঠ পাথরের মাপজোখ কষে, লিপিলেখনের পাঠোদ্ধার করে ঐতিহাসিক ও গবেষক একটা সংহত জনপ্রবাহের উৎসমূল আবিষ্কার করবার প্রয়াস পান। কখনও কখনও বা তার মোহনা খুঁজে পান। কিন্তু কোনো নরগোষ্ঠীর অন্তর্জীবনের সুগভীর পরিচয় পেতে হলে ইট-কাঠ-পাথরের বস্তুপিণ্ডের উপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করলেই শুধু চলবে না। তার আত্মার আকৃতি, প্রকাশের অকুণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং দেশে-কালে তার আপনাকে প্রসারণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে। একটা জাতির সুগভীর পরিচয় অনুধাবন করতে হলে সাহিত্যের ইতিহাসের তটে বসে, সাহিত্য সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করতে হবে।

—সেই চেষ্টাই তো করা উচিত।

—সেই চেষ্টাই তো আমি করেছি। তাই আমি লিখেছি—

> 'সপ্তগ্রামের বণিক কথাহ্ না জায় ॥
> দ্বার বসি নানাধন যথা মোক্ষ পায় ॥
> বাড়ি মধ্যে ক্ষাতি কীর্তি ক্ষিতি অনুপাম ॥
> সপ্তঋষি বসান ত্রহি সপ্তগ্রাম ॥

নহে ভরি সদগার নিনমি চাঁপানী ॥
বাহবাহ বলিয়া ডাকেন গুণমণি ॥
গিরিজা বহিয়া সাধু বাহে সরস্বতী ॥
করতোয়া বাহিয়া বাহেন ভাগীরথী ॥
রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম ॥
দিন দুই তিন সাধু করেন বিশ্রাম ॥
কিনি বিকি নানা ধন রাত্রদিন ভরা ॥
বাহবাহ করিয়া সেখানে পড়ে সাড়া ॥"

....

'সাতগ্রাম হৈতে আইসে বানিঞা কামদা ॥
বিষ্ণু থাকেক বানিঞা আইসা সমাপ্তিয়া ॥'

....

'কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট্ ।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥
বারেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সহর ।
উৎ-কল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর ॥
মথুরা দ্বারিকা কাশী কলাপুর কায়া ।
প্রয়াগ কৌরবক্ষেত্র গোদাবরী গয়া ॥
ত্রিহট্ট কাঙর কোঁচ হাটুপ শ্রীহট্টি ঃ
মাণিক ফরিকা লঙ্কা প্রলম্ব লাঙ্কট ॥
বাগান বলয়া দেশ কুরুক্ষেত্র নাম ।
বটেশ্বর আহু লঙ্কাপুর সপ্তগ্রাম ॥
শিবাহাট্টা বহাহট্টা হস্তিনানগরী ।
আর যত সফর তা বলিবারে নারি ॥'

লোহা, রৌপ্য ও সুবর্ণনির্মিত তৈজসপত্র থেকে বস্ত্র, খাদ্য সবই রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। ভৃঘু, কচ্ছ-সুরাট, পাটন, আরাকান, ব্রহ্মদেশ থেকে ইউরোপের রোম, এথেন্স থেকে এশিয়ার সুমাত্রা, যবদ্বীপ পর্যন্ত অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজারা বণিকদের সাহায্য করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন। কারণ বণিকরা রাজকোষ সমৃদ্ধ করছে। রাজার জন্য তারা নিয়ে আসছে বিদেশ থেকে মহা মূল্যবান উপহার সামগ্রী। ভারতে তৈরি বস্ত্রের মহিমা অপরিসীম। নানাধরনের, নানাদামের কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে। ফলে সব দেশের সব রকমের বাজারে তার চাহিদা রয়েছে। কাপড়ই এশিয়ার বাজারে জিনিসপত্র কেনার মাধ্যম। ইউরোপীয়রা সোনা দিয়ে ভারতের কাপড় কেনে, সেই কাপড় বেচে কেনে ইন্দোনেশিয়ার মশলা। এছাড়া কেনে খাদ্যশস্য। মালাক্কা বা লোহিত সাগরের মোখাকেও চাল সরবরাহ করে ওড়িশা ও বাংলাদেশ। বাণিজ্যে প্রধানত দুই ধরনের পণ্য

কেনাবেচা হয়। এক যেগুলির উঁচু দাম, কিন্তু হালকা। যেমন, হিরে, জহরত, আমেদাবাদ বা বায়নার নীল বা মালবের আফিম। দুই, কমদামি কিন্তু পরিমাণে প্রচুর। যেমন, কাপড় ও খাদ্যশস্য। বাণিজ্যের ধারার মধ্যে বন্দরের ভাগ্যের ওঠানামা হয়। মালাবারের কালিকট জমে উঠলে কুইলন হারিয়ে ফেলে তার প্রতিপত্তি।

—হ্যাঁ। রাজারা তখন খুবই সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণরা দাসপ্রথা চালু করেছে। শূদ্র জাতিভুক্ত চণ্ডাল, বাগদি, বাউরি, কৈবর্ত, গোপ ইত্যাদি জাতির পুরুষ ও নারীরা দাসরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রীতদাস ব্যবসা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা। বণিকেরা প্রকাশ্যেই দাসদাসী কেনা বেচা করে। ব্যাপক ভাবে অশ্বের ব্যবহার শুরু হওয়ায় অশ্বের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে অশ্বের মূল্য। সমাজে বাগদিদের পোয়াবারো। বাগদিরা পেশাগত ভাবে সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে। সৈন্যবাহিনীতে তাদের ভালো চাহিদা।

—প্রাক-আর্য যুগে উত্তর ভারতে অনার্য কিরাত ও নিষাদদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ এই যুদ্ধে র ফাঁকে আর্যরা এদেশের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে। অপেক্ষাকৃত উন্নত, কৃষিকাজে অভ্যস্ত দ্রাবিড়রা সংঘর্ষে লিপ্ত অনার্য সভ্যতার দুই স্তম্ভ কিরাত ও নিষাদদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই পটভূমিকায় কিরাত, কোল, ক্যাওড়া (ডোম), চামার, শুঁড়ি প্রভৃতি অনার্য জাতি তাদের অস্তিত্বের কথা ভাবতে শুরু করে। নিম্নবিত্ত এই শ্রেণির মানুষগুলো তখন রাজ আশ্রিত সৈন্যবাহিনীতে যোগদানই শ্রেয় মনে করে। সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সমাজে আলাদা সম্ভ্রম পাওয়া যায়, বীরত্ব প্রদর্শনে পুরস্কারও মেলে। সামন্তরা তখন দুর্গ নির্মাণ করে সৈনাধ্যক্ষ হিসাবে সসৈন্যে দুর্গের মধ্যেই বাস করছে।

—আপনার কাব্যের মূলরূপ কি তা কিন্তু আপনি বলতে পারেন নি। আপনার কাব্যে শুধু তার রূপ কেমন ছিল সেইটুকুই কেবল প্রত্যক্ষ করা যায়। আপনার কাব্য পড়ে এবং অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল ঘাঁটাঘাঁটি করে মনে হয় যে, আপনার আগে বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনায় এমন দক্ষতায় বাংলা ভাষাকে ব্যবহার আর কোনো লেখক করতে পারেন নি। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণ আপনি পেতে পারেন। আপনি বঙ্গের প্রাচীন কবি। জীবৎ-কালেই আপনার কাব্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাদরে বহুবার গীত এবং অনুলিখিত হয়েছে। আপনার পুথির শেষপাতা না থাকায় সঠিক লিপিকাল জানা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্লেষণ করে, ব্যাখ্যা করে বলা যায়। পুথির লিপিকাল নির্ণয় করে তিনটি বিষয় ১। লিপিছাঁদ ২। কাগজের প্রকৃতি ও উপাদান ৩। কালির রং ও তরলতা। আবার বাংলা অক্ষর বহুদিন পর্যন্ত একই ছাঁদের ছিল। তাই বাংলা পুথির লিপিকাল নির্ণয়ে লিপিছাঁদের উপর খুব বেশি নির্ভর করা যায় না। তবে কাগজের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করা যায়, কেননা পাতলা মাড়ের কাগজ এসেছে আপনার অনেক পরে।

"চণ্ডী" প্রাচীনতম পুথিটির লিপি সমাপনকাল ১৭১৭খ্রিস্টাব্দ। আপনার (কবিকঙ্কণের) চণ্ডী প্রথম ছাপা হয়েছিল ১২৩০ সালে অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে উল্লেখ আছে, কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী কৃত চণ্ডীর পুস্তক শ্রীযুক্ত রামজয় বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের দ্বারা শুদ্ধানুশদ্ধ করিয়া কলিকাতায় শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইল শকাব্দ ১৭৪৫। আপনার (কবি মুকুন্দ'র) পরিচয় উদ্ধারে প্রথম ব্রতী হয়েছিলেন দামিন্যা অঞ্চলের লেখক অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫২-১৯১৫ সালে)। দামিন্যা গ্রামে চক্রবর্তীদের ঘরে রক্ষিত পুথিটি

যে মূলপুথি এ ঘোষণা তিনিই প্রথম করেন। অম্বিকাচরণের আগে রামগতি ন্যায়রত্ন নামে একজন পণ্ডিত আপনার মূল পুথির খোঁজ করেছিলেন। তবে ইনি রঘুনাথ রায়ের রাজ্য প্রাপ্তিকাল উদ্ধার করে আপনার উপর গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

—উনি যে পুথি উদ্ধার করেন। সে পুথিটির পাঠ খুব ভালো। গীত হবার ধারাগুলি সুন্দর ভাবে নির্দেশ করা আছে। যেমন বলা আছে, 'চালান' অর্থাৎ একটানা সুরে গেয়ে যাওয়া। 'ঘানাড়ি' অর্থাৎ দ্রুতবেগে গাওয়া। 'ছুটা মান', 'ঝাঁপা মান', 'ছুটা জতি', 'পাঠ জতি' এগুলি হল বিভিন্ন তালের নির্দেশ। পদ-এর আছে একক শ্লোক। দুই অথবা চার চরণে শ্লোক। প্রত্যেক চরণে আছে অক্ষর সংখ্যা সমান এবং প্রত্যেক চরণে অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘতার ক্রম সুনির্দিষ্ট রাখতে হয়। শ্লোকের চরণে আসে মাত্রাবৈষম্য এবং তা আসে গানের জন্য, সঙ্গীতের জন্য। ছন্দের চরণেও খুঁজতে হয় অক্ষরসমতা। জোড়া জোড়া চরণের শেষে অক্ষরের ধ্বনিসাম্য রাখতেই হবে। এই অন্ত্যানুপ্রাস কবিতা ও গানের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ।

—বর্ণিত দুটি উপাখ্যানের মধ্যে, আপনার কোন্ উপাখ্যান বেশি জনপ্রিয় হয়?

—কালকেতু উপাখ্যানের তুলনায় ধনপতি-উপাখ্যান আমার বেশি জনপ্রিয় ছিল। ধনপতি-শ্রীপতির কাহিনিটিই প্রধানত গীত হয়েছে বেশি। আসলে এ তো সেই গরিব বড়োলোকের কাহিনি। কালকেতু উপাখ্যান অন্ত্যজ শ্রেণির গল্প। ওই গান শুনে মন ভরবে কোন্ বড়ো লোকের পোর? তাই শুনতে গেলে শুনতে হবে ধনপতি সদাগরের কাহিনি। সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অংশই চিরকাল সাহিত্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। শুক্ল পক্ষে গাওয়া হত ফুল্লরা কালকেতুর গান আর কৃষ্ণপক্ষে ধনপতি সদাগরের কাহিনি।

—ধীরে ধীরে এই ভাবেই তাহলে ছড়িয়ে পড়ছে ধনপতি সদাগরের কাহিনি, চণ্ডীর কথা, মনসার কথা। আর একই সাথে ধীরে ধীরে দেবী চণ্ডী অন্ত্যজ মানুষদের থেকে দূরে চলে গিয়েছেন।

—হ্যাঁ। যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে হিন্দু উদারবাদের সংঘর্ষ শুরু হল. তখন থেকেই চণ্ডী সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষের দেবী হয়ে গেলেন।

—কবিতা সুরের বাহনে মাটিতে এসে নামে। সুর ও তালের সঙ্গে এ দেশে বহু কাল হতে দেবদেবী পূজার চলন আছে। দেবতাদের মাহাত্ম্য কাহিনি সুর ও তালের সঙ্গে আবৃত্ত ও গীত হয়ে এদেশে বহুকাল ধরে। বৌদ্ধ বিহারের স্তূপমূলে অথবা বোধিসত্ত্বমূর্তির সম্মুখে সন্ধ্যাবন্দনায় স্তোত্র এবং উদাত্ত আখ্যায়িকা উদ্‌গীত হত কোরাসে।

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

মহাচিন থেকে আগত পরিব্রাজকবৃন্দের ভ্রমণ কাহিনিতে আমরা এর উল্লেখ পেয়েছি। উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে দেবদাসীদের দ্বারা শিবের ত্রিপুরবিজয় কাহিনি গীত হবার কথা লেখা আছে কালিদাসের মেঘদূতে।

—এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভালোই ছিল ভরতপুর তা প্রমাণ করে। শুনেছি বর্ধমানের কাঞ্চননগরের গুড়ের হাট সংলগ্ন ভুবনেশ্বর মন্দিরে জৈন তীর্থংকর ষষ্ঠী রূপে পুজো পেয়ে আসছেন দীর্ঘ দিন ধরে। এখানকার সর্বমঙ্গলা মন্দিরে রক্ষিত বর্তুলাকার মূর্তিকে অনেকে নিরাকার বৌদ্ধ মূর্তি বলেই মনে করে! স্বয়ং বুদ্ধদেব যে শেতক ও দেশক নগরে ভ্রমণ করেছিলেন তা হল বর্ধমানের আউশগ্রামের নিকটে সুয়াতা আর দেয়াশা গ্রাম। খুব প্রাচীন জনপদ সুয়াতা ভালকি। ত্রয়োদেশ শতাব্দীর শেষভাগে গোপ রাজাদের সময় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভালকি হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সুদূর ইরান থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন এখানে সৈয়দ বহমান শাহ্ (শাহ মাহমুদ) বাহমনি। সুয়াতা ও পাশাপাশি এলাকার বৌদ্ধদের তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এখানকার শীবাক্ষ্যা মন্দিরে তখন নরবলি দেওয়া হত। পীর বাহমান শাহ্ এই নারকীয় প্রথা বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। এই নিয়ে গোপ রাজাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। গোপ রাজারা তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি শহিদ হন। ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ের ঘটনা এটা। গোপভূম পরগনা ছিল আবার সুলতান হোসেন শাহের অধীন। পিরের প্রতি শ্রদ্ধায় সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) সুয়াতা গ্রামে এসেছেন। পিরের মাজার ও একটি মসজিদ তিনি নির্মাণ করে দেন। শ্রীহট্ট বিজয়ী পির হজরত শাহ্ জালাল ইয়েমেনের তিনশো একষট্টি শিষ্যের অন্যতম শিষ্য হজরত বহমান শাহ্। তাঁর সমাধির প্রবেশদ্বারে পাথরের গায়ে কোরান শরিফের আয়াত খোদিত আছে। বাংলায় লেখা আছে আবুল মুজফফর আলাউদ্দিন সন ৯১৬ হিজরি। অর্থাৎ হিজরি দশম শতকে বহমান শাহের মৃত্যুর পর সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ এই সমাধিটি তৈরি করান। সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সুলতান হোসেন শাহ্ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মৌজার মোট ৭৯৫.১০ একর নিষ্কর সম্পত্তি বরাদ্দ রাখেন। সুয়াতা ভালকির মানুষজনের কাছে পির বহমান শাহ জাগ্রত পির হিসেবেই স্বীকৃত। প্রতি বছর তাঁর আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে পৌষ সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণের দিন এখানে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে বহু পুণ্যার্থী মানুষের সমাগম হয়। পির বহমান শাহ্ নিহত হবার সংবাদে গৌড়ের সুলতান সৈন্যসামন্ত পাঠান গোপ রাজাদের ধৃষ্টতার উপযুক্ত জবাব দিতে। সুলতানি সৈন্যদের আসাব খবরে গোপরাজারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শীবাক্ষ্যা মন্দির থেকে তাঁরা দেবীকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান। অসতর্কতা বশত মূর্তিটির নাক ভেঙে যায়। সেই নাকভাঙ্গা দেবীমূর্তি নাকি এখন অমরারগড়ে পূজিতা হচ্ছেন।

—হ্যাঁ। ইতিহাসে পড়েছি গোপরাজারা গোপভূমের অধীশ্বর ছিলেন। ভালকি, ভরতপুর, কাঁকসা, দিগনগর, চুরুলিয়া, মঙ্গলকোট এগুলি গোপভূমের বড়ো বড়ো জনপদ ছিল। দশম শতাব্দীতে রাজা ভল্লুপদ গোপভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুসারেই রাজধানীর নাম হয় নাকি ভালকি। গোপচন্দ্র নামেও এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। গোপভূম পরগনার এড়াল গ্রামে রয়েছে 'বুদ্ধেশ্বর শিব'। বৌদ্ধ এবং হিন্দু দেবতার সমন্বয় এখানে ঘটেছে বহু বছর ধরে। জৈন ধর্মের আধিপত্য বিস্তারের সময় এ অঞ্চলে ধর্মরাজ উপাস্য দেবতা হিসাবে বিরাজ করত। উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে এই দেবতা ছিল অপাঙ্‌ক্তেয়। সাতদেউলিয়া, রায়না, বাবলাডিহি, কেলেজোড়া এই সব জায়গায় জৈন তীর্থংকরদের মূর্তিগুলো স্থানীয় মানুষ

ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজা করত। রাজারা ছিলেন শৈব, তাঁরা শিবের উপাসনা করতেন। বৌদ্ধদের প্রতি স্থানীয় রাজাদের একটা দুর্বলতা ছিল। হয়তো এজন্য যে বুদ্ধদেব একদা রাজপুত্র ছিলেন। রাজাদের এই দুর্বলতা বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক ও সংগঠকদের উজ্জীবিত করেছিল। তারই ফলস্বরূপ হয়তো রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ বিতাড়িত হয়ে সরস্বতী নদী দিয়ে জাহাজ যোগে তাম্রলিপ্ত বন্দরে উপনীত হয়েছিলেন। সেখান থেকে সমুদ্রপথে তাম্রপর্ণী (লঙ্কা) দ্বীপে চলে গিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে।

—দেব আরাধনায় গীত সঙ্গীত যা শুনলে শ্রোতাদের মঙ্গল হয়। যদি পুতুল নাচ অথবা ছবির মাধ্যমে পরিবেশন করা যায় তবে তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং লোকশিক্ষার সহায়ক হয়ে ওঠে। এই ধরনের লোকশিক্ষার চলনও এদেশে প্রচলিত বহুদিন ধরে। আর্য সাহিত্যেও লৌকিক স্তরে বিশুদ্ধ রোমান্টিক গল্প কিছু কিছু লেখা হয়েছিল। জৈন কবিরা এই রকম কয়েকটি কাহিনি ধর্মকথা ও নীতিকথারূপে তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে লিখে রেখেছেন। একটা ভালো উদাহরণ পাওয়া যায় ধনপালের রচিত "ভবিস্ সয়ত্তকহা" তে। সেখানে বলা হয়েছে, বিদ্যাবুদ্ধি র যা কিছু পরিচয় ঘটেছে তা উজাড় করে দাও। রাজসভা বর্ণনা, নগর বর্ণনা, অরণ্য বর্ণনা, জীবজন্তু, গাছপালা, দেশ বিদেশের হাটবাজার, নদী-নালা, সমুদ্র-পর্বত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান ভাণ্ডারের যা কিছু সামগ্রী অর্জন করেছ, সব উগরে দাও। তবে দেখতে হবে তা যেন শুধু বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞানের কথকথা বা কড়চা না হয়ে যায়। কথক ঠাকুরের ঝুলি যেমন থাকবে, থাকবে নানা উপকরণও। আমি তাই উপাখ্যানের পরতে পরতে এক একটা স্তর রেখেছি—কাঁচুলি নির্মাণ, বন কর্তন, নগর পত্তন এইসব। যাতে এর মাধ্যমে একটা সুস্থ সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার ছবি মানুষের চোখের সামনে সুস্পষ্টরূপে ভেসে ওঠে।

—ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১১)। ইনিও আপনার অঞ্চলের মানুষ। তবে অনেক পরের। দামোদর তীরবর্তী কইয়ড় পরগনার কুকুরা কৃষ্ণপুরে বাস করতেন। ধর্মমঙ্গলের এই কবি তাঁর কাব্যে গ্রাম কাইতি শ্রীরামপুরের পরিচয় দিয়েছেন। পাষণ্ডা গ্রামের রঘুরথী ভট্টাচার্যের টোলে তিনি পড়তে যেতেন। যাতাযাতের পথের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন—

আড়ুই পিছনে ফেলে, ডাহিনেতে বাঁশা।
পুরানো জঙ্গল নাহি জীবনের আশা।

দামোদরের দক্ষিণে বাঁশা গাঁয়ে থাকতেন বিখ্যাত আর এক জন মানুষ। তিনি হলেন আর্যা রচয়িতা পণ্ডিত রামদুলাল রায়। রাঢ় বঙ্গের সারস্বত এই গণিতবিদের আর্যাজাতীয় ছড়া ছড়িয়ে গিয়েছিল সারা বাংলায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শুভংকর তাঁর নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

শ্রী রামদুলাল দ্বিজ দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
ব্রাহ্মণ কৈল বাস খড়ির বর্ণন।

খড়ির বর্ণন কথার তাৎপর্য তাঁর গৌরকান্তি। আপনার মতো তিনিও ব্রাহ্মণ কিন্তু গৃহস্থ চাষি ছিলেন।

—ব্রাহ্মণ হয়েও চাষ করতে হয়, এ তো আমিও করতাম। চাষে অনেক কিছু হয়

ধান,আলু, সরষে, মুগ। চাষে উৎপন্ন হয় আরো অনেক ফসল, কিন্তু তাতে সংবৎসর পরিবারের পেট ভরে না। মূর্খ চাষা এ সব হিসাব রাখবে কি করে? তাই তাকে সহজভাবে হিসেব শেখাতে প্রয়োজন ছিল আর্যার।

—সেইজন্যই রাঢ়বঙ্গের সারস্বত এই গণিতবিদের নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। তাই নয় কি?

—হ্যাঁ। এদেশে শিক্ষার একটা পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে।

—পাটিগণিতের আর্যাগুলোই ধরুণ, দুরূহ বিষয়কে কেমন সুললিত কবিতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এমনভাবে যাতে সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। অঙ্ক না জেনেও মানুষ শিখেছে কড়া-গন্ডার হিসাব-নিকাশ। মন, সের, ছটাক, পাই, টাকা, কড়ি আনা, শুভংকরের ছড়ার জেরে অর্ধশিক্ষিত মানুষ শিখেছে গণিত। লেখাপড়া না শিখেও মানুষ হিসেব কষে দিয়েছে মুহূর্তে। কারণ সে জেনেছে—

মন প্রতি যত তঙ্কা নিবেক দর।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গন্ডা সের প্রতি ধর ॥

অথবা,

আনা প্রতি দুইকড়া গুনই সুশীল।
গন্ডা প্রতি ধরিয়া লইবে অষ্টতিল ॥

কাঠা, বিঘা ইত্যাদি সাবেক জমি পরিমাপের পদ্ধতির হিসাবও চাষি-বাসী মানুষের নখদর্পণে ছিল। মুহূর্তে সে জমির ক্ষেত্রফল কষে দিত মুখে মুখে। কারণ সে জানত—

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজজে।
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজজে ॥

কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ।
বিশ গন্ডা হয় কাঠার সমান।

গন্ডা বাকি থাকে যদি কাঠা নিলে পর।
ষোলো দিয়ে পুরে তারে গারা গন্ডা ধর ॥

কাঠা অর্থাৎ ক্ষেত্রফল। কালি নির্ণয়ের সহজ সূত্র ছিল বাংলার এই আর্যাগুলো। দৈনন্দিন কাজকর্মের পক্ষে যা ছিল অপরিহার্য।

—এর সবই যে শুভংকর নিজে রচনা করেছেন এমন ভাবার অবকাশ নেই। এর অনেকগুলোই দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তবে যে কথাটা তোমাদের বিশেষভাবে বলতে চাই, আমার সময়ে রাঢ়ের এই দক্ষিণাংশ শিক্ষাসংস্কৃতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে গণ্য হয়েছে। আজ সেই ইতিহাসকে তোমাদের প্রকাশ করার দায়িত্ব নিতে হবে।

তিনে নেত্র

নদীর ধারে বসে আছি এমন এক জায়গায় যেখানে সতী হবার ঘটনা ঘটেছে। ললাটে সিঁদুর ও চুলে চিরুণি আটকিয়ে তরুণী স্ত্রী বৃদ্ধ মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেছে। অনুমৃতা হয়েছে সতী। হায় সতী! এদেশের মেয়েরা আজও কত অন্ধকারে। কই বেহুলা তো বিধবা হিসাবে পরিচিত হয়নি। বেহুলা সতী হয়েছে। সে স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হয়েছে তবুও। হুগলি জেলায় সিঙ্গুর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে সিংহলপাটন গ্রাম, যা সিংহবাহু রাজার রাজধানী। সমুদ্রের অবস্থান তখন খুব নিকটেই। গঙ্গা খুব প্রশস্ত, প্রায় দশ মাইলের মতো। এই সিংহলপাটন গ্রামের পশ্চিমে বোলদা গ্রাম, যেখানে মৃত লখিন্দরের মালাইচাকি খেয়েছিল বোয়াল মাছে। বোলদার উত্তরে চণ্ডীতলায় চণ্ডীর মশান অর্থাৎ পুরোনো বেদী আছে। চণ্ডীতলা থেকে সদগরেরা বাণিজ্য যাত্রায় রওনা হয়। গ্রামে আছে যম পুকুর যার চারদিকে বাস করে বাগদিরা। আছে চাঁপাডাঙার মাঠ যেখানে 'কমলেকামিনী'র দর্শন পাওয়া গিয়েছিল। দক্ষিনে রাজা সিংহবাহু প্রতিষ্ঠিত ভোমরা পুষ্করিণী, যা কেবল সিংহবংশীয়দের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট।

আচ্ছা সব দেবী মূর্তিতেই অমন ভারী স্তন ও নিতম্ব প্রকট কেন বলতে পারেন? আপনার চণ্ডীও তো সেই একই ধরনের। আপনিও তো লিখেছেন—"পয়োধা পয়োভারে"?

—নারীর স্তন, যৌবন ও মাতৃত্বের আধাব। দেবী হচ্ছেন মা। তাই তাঁর মাতৃত্বকে পূর্ণতা ও অব্যর্থ করতে ভারী স্তন নির্মাণ কল্পনা করা হয়েছে। কারণ সন্তান মায়ের বুকের আশ্রয়ে যে শান্তি পায় সেটা বোধহয় আর কোথাও পায় না।

বিটপীর তলে নিদ্রালু হয়ে পড়েছিলাম। আধো ঘুম আধো জাগরণে এক আবেশে যেন স্বপ্ন দেখছি। ঘুমের তন্ময়তা কেটে গেছে অনেকক্ষণ আগে। স্বপ্নের মায়াটা রয়ে গেছে। ভাবছি বসে বসে, এক রকম ধরলে আমিও তো মায়াজাল বুনতে চাইছি পাঠকদের জন্য। কথার পৃষ্ঠে কথা রচনা করে এই পথঘাট, এই বসত, এই বনাঞ্চল, এই নদী, এই সবের মধ্যে একটা ঐন্দ্রজালিক স্বপ্নের বুনন পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। দেখাতে চাইছি সব যেন আমার নখদর্পণে। তবু মনে হয় যেন কত অচেনা, অচেনা কোনো দেশ। অচেনা কোনো মানুষদের গল্প লিখছি। মনে এই অসন্তুষ্টি কাটে না।

সামনে ওই যে আমের বাগান, ওই খানে ক্রীতদাসরা জড় হয়ে থাকে তাদের নতুন মালিকের হুকুমের অপেক্ষায়। সুদূর মরক্কো থেকে আসে কত বাণিজ্যপোত। তার সঙ্গে আসে কত মহামানব। স্থলভাগে নগরের মধ্যে ধনীরা বাস করে, বর্হিভাগে বাস করে দরিদ্ররা। বর্ষায় রত্নানু হয় ওঠে বিশাল সাগর। উত্তাল হয় তার ঢেউ। যমুনাও হয়ে ওঠে অতি বিশাল। ওদের বুকে সার সার পণ্য বোঝাই পোত নোঙরের জন্য অপেক্ষমান থাকে। বাইরের দেশগুলো থেকে এদেশে আসছে হস্ত প্রস্তুত কাগজ। নদীর বুকে পালতোলা

নৌকা, বজরার ইতস্তত ঘোরাঘুরি। জাহাজগুলোতে ভর্তি হয় সুতি, মসলিন বস্ত্র, লবণ, নানা প্রকার মশলা, চিনি, সোরা, কাঠ কত সব পণ্য।

নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোতে নৌকা প্রস্তুতের বিশাল বিশাল গোলায় কাজের জোয়ার। বড়ো বড়ো জাহাজ তৈরি হচ্ছে, নৌকো তৈরি হচ্ছে। চারদিকে চলে একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ। এরই মধ্যে আছে বানভাসি সমস্যা।

আমায় ভাসাইলি রে,
আমায় ডুবাইলি রে,
আমায় কাঁদাইলি রে— ।

সবকিছু নিয়ে নদীর এগিয়ে চলা। নদীর এক পাড় ভাঙে, আর এক পাড়ে চর জাগে। নদী এগিয়ে চলে সাগরের দিকে। নদীর এগিয়ে চলার মধ্যেই মানুষ খুঁজে নেয় তার জীবনের সঞ্চয়। সে-ও এগিয়ে চলে। চরৈবেতি চরৈবতি! অথচ অনেক দূরে সেই কোনো পশ্চিমের কোনো এক জায়গার (মধ্যএশিয়ার) প্রায় সমস্তটা জুড়ে আছে কেবল পাহাড় আর মরুভূমি। শুনেছি জনপদের অস্তিত্ব সেখানে খুব একটা নেই বললেই চলে। যেদিকেই দৃষ্টি যায় পাহাড়ের উচ্চাবচ রেখা আর ধূ ধূ মরুভূমি। বিশাল সেই মরুভূমি। একদিকে চিনের সীমানা শেষ হয়েছে, যেইখানে এর শুরু। মাঝখানে দুটো বড়ো বড়ো মরুভূমি পার হয়ে পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার মাইল এসে শেষ হয়েছে। পুবের মরুভূমিটির নাম গোবি, আর পশ্চিমেরটির নাম তাকলামাকান। দুটো মরুভূমিই ভীষণ দুর্গম আর ভয়ংকর।

মধ্য এশিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল যেখানে এলবুর্জ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে মাটি ফুঁড়ে। যার উত্তরে কাস্পিয়ান আর দক্ষিণে পারস্য উপসাগর। এখানে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি মেসোপটেমিয়ার অবস্থান। সুমের সভ্যতার পিতৃভূমি। আর নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা। এখানকার ভূমধ্যসাগরের উত্তরে অবস্থিত গ্রিসের ম্যাসিডনের সম্রাট দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি ভূষিত হয়েছেন বীর আখ্যায়। আর নাদির শা তিনি আখ্যা পেয়েছেন দস্যু। ইতিহাসের এটাই ট্র্যাজেডি।

—এত জায়গা থাকতে ভারতে কেন? তিনি তো ঘোড়ায় চড়ে সফর করছিলেন। তাহলে ইউরোপে না গিয়ে কেন তিনি সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার পথ ধরলেন?

—মধ্যএশিয়ার দেশগুলো থেকে, ইউরোপের স্পেন ও পোর্তুগাল থেকে নৌ অভিযানে ভারতকে খুঁজে বেড়িয়েছেন অনেকেই। আটলান্টিক মহাসাগরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এদেশে এসেছেন বহু মানুষ। সামুদ্রিক যাত্রা নির্ভর করে মৌসুমি বায়ুর গতিপ্রকৃতির ওপর। পূর্ব-এশিয়া থেকে পশ্চিম-এশিয়ার এক বছরের মধ্যে সমুদ্র যাত্রা করে প্রত্যাবর্তন করা কোনো জাহাজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ফলে সামুদ্রিক যাত্রা চলত ধাপে ধাপে। এর সঙ্গেই চলত বাণিজ্য। চিনা বণিকেরা চিন থেকে পণ্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কায় আসে। এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত চিনারাই। ওদের পণ্য এসে পৌঁছোত ভারতের পূর্বভাগের উপকূল বন্দরগুলোতে। এইভাবে এশিয়ার বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রভূমি হয়ে

ওঠে পূর্বভারতের উপকূল বন্দরগুলো। এখান থেকে ওই পণ্য আবার চলে যায় পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের কামবে, সুরাট বন্দর দিয়ে। এখানকার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে গুজরাতি মুসলমান বণিকেরা। আরব বণিকেরা পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে ভারতের এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে পণ্য পৌঁছে যায় পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বন্দরগুলিকে ছুঁয়ে। তার সাথে এই দেশকে ছুঁয়ে যায় পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ। ভারতীয় উপকূল বিভাগের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ জোরদার হয়। বাংলার প্রধান বাণিজ্যবন্দর হয়ে ওঠে হুগলি ও বালেশ্বর।

সামুদ্রিক পথ ছাড়াও ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার যোগাযোগ স্থলপথে। এই পথে লাহোর, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট সব বড়ো বড়ো বাণিজ্য কেন্দ্র। এই পথেই এসেছেন আলেকজান্ডার। তিব্বতের সঙ্গেও ভারতের স্থলপথে যোগাযোগ। নানা ধরনের শৌখিন বিলাসদ্রব্য আসে তিব্বত থেকে। গোটা বাণিজ্য পথে স্থানীয় ভূস্বামীরা নিজেদের অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে ছোটো ছোটো হাট বা গঞ্জ বসিয়ে দিয়ে বণিকদের বাণিজ্যে সহায়তা করে। বণিকেরাও বিনা দ্বিধায় সেখানে কাজ করে, তাদের যেমন বিশ্রাম হয় তেমনি বাণিজ্যও হয়। উৎপাদন শক্তির বিকাশের অপেক্ষা লাভের দিকে ঝোঁক থাকায় বণিকদের সঙ্গে ভূমিজ স্বার্থের সংঘাত হবার সুযোগ তৈরি হয় না। বণিকেরাও তাদের নিজস্ব বৃত্তে স্বতন্ত্রভাবে চলাফেরা করে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে নিজেরাই মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে নেয়। সাধারণত স্থানীয় রাজশক্তি বা কাজির দারস্থ হয় না। ফলে একটা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে ওঠে। আর এই ব্যবস্থা একটা উজ্জ্বল ধারণার জন্ম দেয় পৃথিবীর মানুষের কাছে এই দেশ সম্পর্কে। বাংলা মুলুক সোনার দেশ।

—আলেকজান্ডার তাহলে এসেছিলেন শুধু কি মনি, মুক্তো আর মশলার সন্ধানে?

—না একটা সোনার দেশ, একটা অলীক দেশ, স্বপ্নের দেশের সন্ধানে। এই সব প্রশ্নে আমি আলোড়িত হই। ভালো লাগে। আলেকজান্ডার হলেন সম্রাট। দেশ জয় করেছেন শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য নয়, নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করার জন্য। সংস্কৃতি ক্ষুধা মেটানো শুধু নয়, তার বিনিময় ও আদানপ্রদানও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি সঙ্গে করে শুধু সৈন্য বাহিনীই আনেন নি। এনেছিলেন কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ভূতত্ত্ববিদ, দিনপঞ্জী লেখক, ভূপর্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদেরও। তাঁর সঙ্গে যেসব পর্যটক এসেছিলেন ইতিহাসের পাতায় তাঁরা সব প্রণম্য ব্যক্তি; হেরোডোটাস, অ্যারিয়েন, স্ট্র্যাবো, ডিওজেরাস, জাস্টিন, প্লুটার্ক প্লিনি, টিসিয়াস, মেগস্থিনিস সকলেই এক এক দিকে দিকপাল।

মেগাস্থিনিস লিখেছেন, ভারতের পুবে এক পাহাড়ে বেরদাই উপজাতির বাস ছিল। এই পাহাড়ে বিশাল এক উপত্যকা আছে। সেই উপত্যকার নীচে আছে সোনা। এই সোনার এলাকা দাপিয়ে বেড়ায় এক ধরনের বড়ো বড়ো পিঁপড়ে। পিঁপড়ে যার পাখা গজায় মরবার জন্য। বুনো শিয়ালের মতো এই পিঁপড়ে সোনার গুঁড়ো তুলে নিয়ে আসে পাহাড়ের উপরে। হাসে যেমন ডিম পাড়ে তেমনি পিঁপড়েগুলো প্রথমে গর্ত করে, মাটির মধ্যে মিশে থাকা সেই গর্তে সোনা জমা করে। গরম পড়লে পিঁপড়েগুলো সরে যায়। গর্তে জমা সোনা তখন মানুষ চুরি করে। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সোজা নয়। ওই সোনা তুলে আনতে অনেক ঝামেলা।

কাছে পিঠে লোকেরা তক্কে তক্কে থাকে। ভরদুপুর বেলায় পিঁপড়েরা যখন বিশ্রাম নেয়। মানুষ সেই সুযোগে সোনা নিয়ে পালিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হয়, কারণ পিঁপড়েরা টের পেলেই তাড়া করে। ধরতে পারলে হুল ফুটিয়ে দেয়। আর ওদের হুলে থাকে ভীষণ বিষ। এভাবে সোনার মায়ায় মারা যায় অনেকে।

—এখন এধরনের গল্প বললে সবাই অবিশ্বাস করবে, নয়তো ধরে নেবে লোকটা সুস্থ মস্তিষ্কে নেই।

—ইন্ডিকা এক আজব বই। ঘটনাটা ইতিহাসখ্যাত 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে গ্রিকবাসীদের শুনিয়েছেন মেগাস্থিনিস। কিন্তু প্রায় ১৮০০ বছর আগে ব্যাপারটা সকলে বিশ্বাস করেছিল। সে বইয়ের কোন্‌টা আদি তা জানা যায়নি। পরবর্তীকালে টলেমি, এরিয়ান, পিলিনি, পলেমো, ম্যারিনেস, অ্যাপোলোডরসের মতো গ্রিক লেখকদের বিভিন্ন রচনায় মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকার উল্লেখ পাওয়া গেছে। সে সব উদ্ধৃতি খুঁটে খুঁটে পড়েই জানা যায় ইন্ডিকার কথা। এ পর্যন্ত মোটামুটি চারটে খণ্ডের নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে।

—মেগাস্থিনিস। টুকরো টুকরো কথায় জানা যায় তিনি ছিলেন গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারতে রেখে যাওয়া প্রতিনিধি। সেনাপতি সেলুকাস নেকটরের দূত। সেলুকাস শান্তির প্রয়াসে পাটলিপুত্রের শক্তিধর রাজা গ্রিকদের সন্তোকটো অর্থাৎ আমাদের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে জামাই করেছিলেন। সেই জামাইয়ের দরবারে দূত ছিলেন মেগাস্থিনিস।

—আনুমানিক তিনশো দুই খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে মেগাস্থিনিস অনেক ঘোরাঘুরি করেছিলেন। তা ছাড়াও ব্রাহ্মণ, রাজদরবারে সভাসদদের মুখেও প্রচুর তথ্য পেয়েছিলেন। সে সব তথ্যই তিনি লিখেছেন ইন্ডিকা গ্রন্থে। তাঁর বর্ণনার মধ্যে আছে ভারতের ভূগোল, সংস্কৃতি, সাম্যবাদী গণতন্ত্রের কথা। তৎকালীন জীবনযাত্রার বর্ণনা যেমন আছে তেমনই আছে আজব জীবজগতের কাহিনি। সোনা তোলা পিঁপড়ের কথা তো বললাম। এছাড়া আছে কান পেতে শোয়া উলটো পা মানুষ, উড়ন্ত সরীসৃপের কাহিনি। এসব কাহিনিতে হয়তো গ্রিক দৃষ্টভঙ্গিতে দেখা ভারতীয়দের বলা ঘটনায় কল্পনা আর বাস্তবের মিশেল ঘটেছিল। তিনি লিখেছেন এক অদ্ভুত প্রজাতি মানুষের কথা। সেসব মানুষ কেবল ভালো খাবারের গন্ধে বেঁচে থাকে। তাদের চোখ নাক ছিল না, শুধু ছিল মুখের গহ্বর। কিন্তু মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় ভারতে দাসপ্রথার কোনো তথ্য নেই। রাজবাড়িতে থেকেও দাস প্রথার বিষয়টা তাঁর চোখ এড়িয়ে গেল কী করে, সে এক রহস্য।

—ভারতীয়রা কি তবে প্রকৃত ঘটনা না বলে তাঁর কাছে কি শুধু উদ্ভট গল্পই করেছিল?

—সে কথা জানা যাবে কী করে? তেমনই অস্পষ্ট তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। কেউ বলেন আদতে তিনি ছিলেন পারস্য দেশের মানুষ। জানা যায় না তাঁর লেখা-পড়ার বহর কী রকম ছিল। তিনি জানতেন, ভারত ইথিয়োপিয়ার অংশ। অবশ্য মেগাস্থিনিস প্রথম ইউরোপিয়ান হিসাবে নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা ভারতকে ইন্ডিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন গ্রিকদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে। আবার দ্যাখো আলেকজান্ডারের ভারতে আসার ঠিক ন'শো বছর পরে একক প্রচেষ্টায় ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে চিনের প্রাচীর পেরিয়ে গোবি মরুভূমি, তিয়েনসান পর্বত, তাসখন্দ, সমরখন্দ, খাইবার পাস অতিক্রম করে আর একজন

পর্যটক এসে দাঁড়িয়েছেন সিন্ধুনদের তীরে বত্রিশ হাজার মাইল পথ শুধু পায়ে হেঁটে। তিনি এসেছেন বর্ধমানে, এখান থেকে আবার গিয়েছেন তাম্রলিপ্ত। ইনি হলেন চৈনিক পর্যটক হিউ-এন-সাং।

মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের কাছে ভারতকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আছেন এই মানুষটিও। তিনি যখন এদেশে এসেছেন তখন পূর্বমগধীজাত প্রাকৃত ভাষা এখানে কথ্য ভাষা। বাস করে সাঁওতাল-বাউরি-মুণ্ডা-মালপাহাড়ি-বাগদি-ডোম-মালো এইসব আদিবাসী, তপশিল জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। হাড়ি-মুচি-বাউরি-ডোম-জেলেদের সাথে উচ্চবর্ণের মানুষেরা তখন বিশ্বাস করে প্রাচীন দেবতা ধরম-করমকে। তারা ভাদু-টুসুর জাগরণ করে। গান গায় মনসাকে নিয়ে। তাঁকে ভক্তিভরে পুজো করে, গ্রামদেবতার থানে তাঁর নামে মানত হয়। রাঢ়ের সমস্ত অরণ্যভূমি জুড়ে তখন ছড়িয়ে এই দেবতা ও অপদেবতাদের অধিষ্ঠান। চারদিকে শাল-মহুল-পলাশ-কুচির জঙ্গল, জঙ্গলে বনশূয়োর, হায়েনা, সজারু ঘুরে বেড়ায়। গাছে গাছে নানা ধরনের পাখি, কত বিচিত্র তাদের রঙ, কত বিচিত্র তাদের ডাক। জঙ্গলের মধ্যে সাঁওতালদের বসতি। তাদের মাটির ঘরে পরিষ্কার দেওয়াল, নিকানো উঠোন, গ্রামের প্রান্তে শালগাছের তলায় মারং বুরু, শিঙবোঙা, টারবারো, দুয়ারসিনি, কুদরাসিনি এবং আরো অনেক অ-বৈদিক দেবতার অধিষ্ঠান। পাথরে সিঁদুর লেপে, পশুবলি দিয়ে তাদের পুজো হয়। কখনো অনাবৃষ্টির হাত থেকে জমিকে রক্ষা করার জন্য, কখনো জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করার জন্য, কখনো পশুশিকারের সাফল্যে অথবা কখনো মড়ক দেখা দিলে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আসলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার জলপথ যেদিন থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, ইউরোপের বণিকদের ভারতবর্ষে আগমনও সেদিন থেকে শুরু। বিদেশিদের মধ্যে, বিশেষ করে ইউরোপের বণিকদের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেছে পোর্তুগিজরা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশ পোর্তুগিজদের সংস্পর্শে এসেছে।

—হ্যাঁ। ইতিহাসে আমরা পড়েছি, এদের একটা বড়ো অংশই জলদস্যুগিরি করেছে। সাধারণের কাছে এরা 'হার্মাদ' নামে পরিচিত হয়েছে। এই বণিকদের সঙ্গেই এসেছে পোর্তুগিজ ধর্মযাজকেরা। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর হুগলি এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চল পোর্তুগিজদের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারে ফরমান দিলেন। পোর্তুগিজদের রমরমা বেড়ে গেল। ১৫৯৯ সালের ৭ জানুয়ারি-তারিখে জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত পাদরি ফ্রান্সিসকো ফারনান্দেজ ঢাকা জেলার সোনারগাঁর কাছাকাছি শ্রীপুর থেকে অধ্যক্ষ নিকোলাস পিসেন্তোকে চিঠিতে লিখলেন, খ্রিস্টান ধর্মের মূল কথাগুলি প্রশ্নোত্তরমালার আকারে তিনি দুটি পুস্তিকায় রচনা করে প্রকাশিত করতে চান। বই দুটির বাংলা অনুবাদ করে দেন তাঁর সহকর্মী দোমিনিক-ডি-সুজা।

—পঞ্চদশ শতকের পারস্য চিন পৃথিবীর সেরা দেশগুলোর অন্যতম। সেরা সৌন্দর্যের নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র তখন তাব্রিজ। এলবুর্জ পর্বতমালার প্রান্তদেশে কাস্পিয়ান সাগরের বন্য সৌন্দর্যের অলংকারে ভূষিতা হয়ে উরুসিয়া হ্রদের পশ্চিম-প্রান্তে আরব্য উপন্যাস ও রূপকথার নগরগুলি তখন একে একে দাঁড়িয়ে আছে। বাগদাদ এবং বসরা-ই এদের মধ্যে

অন্যতম। আরব্য উপন্যাসের নায়ক হারুণ অল রশিদের স্বর্ণপুরী বাগদাদ শহরের নাম তখন সবাই জানে। জগতের কাছে লোভনীয় এখানকার বুলবুলের গান আর গোলাপের সৌন্দর্য। দেশে দেশে এর সুষমার কথা ধনী মানুষদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।

তখন পৃথিবীর সেরা সওদাগরেরা ওখানে আসত জাঁকজমকে ভরা আকর্ষণীয় পসরা নিয়ে। চিন ও ভারত থেকে আসে রেশম, পশম, বস্ত্র, কস্তুরী, হিরেজহরত। মধ্য-এশিয়া থেকে আসে পদ্মরাগ, গোলাপ, হরেকরকম পাথরের কাজ করা দ্রব্য। রাশিয়া থেকে আসে মোম, মধু, নানা রকমের খনিজ সম্পদ, মূল্যবান পশুচর্ম। আফ্রিকা থেকে আসে হস্তীদন্ত। পৃথিবীর সেরা বাণিজ্য কেন্দ্র তখন বাগদাদ, ইতিহাসের নায়ক নায়িকাদের কাছে যা কিছু লোভনীয় সেই সব সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বিকিকিনির দোকান খুলে বসেছে সারা এশিয়ার মধ্যে সেরা সওদাগরেরা। প্রসাধন দ্রব্যের উপকরণে সাবা পৃথিবীকে টেক্কা দেয় হারুণ অল রশিদের এই স্বপ্ননগরী। আরব্য উপন্যাসের চোখধাঁধানো জৌলুসের রানি এই শহর। ইরানি মেয়েদের চোখ সারা বিশ্বের নজর কাড়ে। শুধু সৌন্দর্যের বিলাস নয়, এদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন রুমি, জামী, সাদী, ওমর খৈয়াম, হাফিজ, ফেরদৌসি প্রভৃতি পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত কবি। এখানে জন্মেছেন সোহরাব-রুস্তমের মতো দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বীরযোদ্ধা। সেই তাব্রিজ থেকেই বর্ধমানে এসেছেন সাধক কবি পির পয়গম্বর শাহ্ ওয়ার্দি বায়াত, যিনি পির বাহারাম সাক্কা নামে পরিচিত।

—ভারত সম্পর্কে এরকম সবার একটা কৌতূহল, সবার একটা আকর্ষণ যুগ যুগ ধরে কাজ করেছে। শুধু কি নতুন নতুন পণ্যসম্ভার এখানে পাওয়া যায় বলে?

—সোনার দেশ ভারত। কত কি সেখানে পাওয়া যায়। তুলো, চা, কফি, পাট, ধান কত কি। মখমলের মতো তুলো। আর সেই তুলো দিয়ে বয়ন করা হয় সুতিবস্ত্র। যা পৃথিবীর সেরা সুন্দরীদের অঙ্গে শোভা পায়। তাই ইরাক, ইরান, পারস্য, সমরখন্দ, মোঙ্গল প্রভৃতি এলাকা থেকে দলে দলে মউমাছির মতো বিভিন্ন জাতি এখানে আসে উত্তাল তরঙ্গের মতো। এদের বেশির ভাগটাই পেশিশক্তির অধিকারী। এরা ক্ষিপ্র, দুর্ধর্ষ কর্মঠ, ক্লান্তিহীন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বাবরও ছিলেন এরকমই একজন দুর্ধর্ষ সৈনিক। তাঁর দাদু তৈমুর লঙ ১১৪ বছরের বৃদ্ধ। তাঁর কাছে বাবর শোনে ভারতবর্ষের গল্প। ভারত হল সোনা ও রুপোর দেশ। অঢেল তার খাদ্য সম্পদ। তাই কাবুল কান্দাহারের পাহাড় ঘেরা মরুদ্যানে তাঁর মন ভরে না, আশ মেটে না। সেও স্বপ্ন দেখে ভারতে আসার। এই ভাবনায় বাবর দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এক সৈনিকের বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁকে গল্প শোনায়। বলে, কাবুলের ওপারে আছে একটা সোনার দেশ। বাবর আর দেরি করে না, যাত্রা শুরু করে দেয় হিন্দুস্থানের উদ্দেশে। তাঁর সঙ্গী তখন মাত্র কয়েকশো অশ্বারোহী ও গোলান্দাজ বাহিনী।

—১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে অলস, অকর্মণ্য অনভিজ্ঞ ভারতের সুলতান যুবক ইব্রাহিম লোদিকে বাবর পরাস্ত করে দখল করে নেয় দিল্লি। ভারতে তখন কামানের ব্যবহার কেউ জানে না। বাবরের সেনাদলের দুর্ধর্ষ পাঠান সরদার ফরিদ খাঁ বাহুবলে বিহারের সাসারামের জায়গিরদার হয়ে গেল। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর

পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন শাহ সিংহাসনে বসলেন। দুর্বল ও ভ্রাতৃবিরোধে কাহিল দিল্লির সম্রাট হুমায়ুনকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পাঠান বংশীয় ফরিদ খাঁ চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে নিল। ফরিদ খাঁ অর্থাৎ শেরশাহের তীব্র আক্রমণে তাঁর বহু সৈন্য গঙ্গাবক্ষে জলমগ্ন হল। নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালার কাঁধে চেপে হুমায়ুন গঙ্গা পার হয়ে কোনোক্রমে নিজের প্রাণে বাঁচলেন। হুমায়ুনের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা শেরশাহের হাতে বন্দি হলেন। পরাজিত হুমায়ুন সিন্ধুদেশের মরুপ্রান্তরে ও পার্বত্য গুহায় আত্মগোপন করে বেড়াতে লাগলেন। অমরকোটের হিন্দু নরপতি বীরশালের গৃহে আশ্রিতা হলেন হুমায়ুনের পারস্যদেশীয় বেগম হামিদাবানু। তাঁর গর্ভে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর আকবরের জন্ম হল। আকবরের যখন জন্ম হচ্ছে হুমায়ুন তখন বিধ্বস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সিন্ধুপ্রদেশের পাহাড়ে কন্দরে। কিন্তু দিল্লির সম্রাট শেরশাহ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে হামিদাবানুকে হুমায়ুনের কাছে চলে যেতে সাহায্য করলেন। ইতিহাসের এটাও একটা ট্রাজেডি।

লজ্জার মাথা খেয়ে হুমায়ুন ইরানে চলে গেলেন। তাঁর অভিলাষ অনুযায়ী কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শেষকালে তিনি তাঁর মাতৃভূমি পারস্যে গিয়েই উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ভালো ব্যবহার পেলেন না কারোর কাছে। তাঁর জ্ঞাতি মীর্জা আসকারী তাঁকে সাহায্যের পরিবর্তে পরিজনসহ আটক করলেন। নবজাত শিশু আকবরকে তিনি কাবুলের শাসনকর্তা কামরানের পত্নী সুলতানা বেগমের হাতে তুলে দিলেন। স্ত্রী-পুত্র পরিজন হারিয়ে হুমায়ুন তখন একেবারে ভেঙে পড়লেন। কিছুদিন পর তিনি বের হলেন ভাগ্যের অন্বেষণে। একে একে সাহায্য প্রার্থনা করলেন গরদিজ, বাঙ্গেশ, নাগাজের শাসনকর্তা শাহওয়ার্দি বায়াতের কাছে। হিন্দুস্তানের ভবিষ্যত সম্রাট আকবর তখন মানুষ হচ্ছেন হুমায়ুনের শত্রুর স্ত্রীর ক্রোড়ে।

—শাওয়ার্দি বায়াতই একমাত্র এগিয়ে ছিলেন হুমায়ুনকে সাহায্য করতে। হুমায়ুন নিজ রাজ্য পুনর্দখল করার লক্ষ্যে কাবুলের শাসনকর্তা কামরানের বিরুদ্ধে আরাকান্দিতে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু পরাস্ত হলেন। দু বছর পর তিনি ইরান থেকে প্রচুর সেনা নিয়ে আবার রওনা হলেন আফগানিস্তান। মির্জা আসকারী ও কামরান তখন ভীত হয়ে হুমায়ুনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। হুমায়ুন ফিরে পেলেন তাঁর হৃত রাজ্য কাবুল। আর মির্জা আসকারী দু বছর দু মাসের শিশুপুত্র আকবরকে তাঁর পিতা হুমায়ুনের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। হুমায়ুন ৯৫২ হিজরির ১০ রমজান (১৬ নমেভম্বর ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ) কাবুলে তাঁর স্ত্রী, ভগ্নী ও শিশুপুত্র আকবরের সঙ্গে মিলিত হলেন। শাহওয়ার্দিবায়াত এসময় সখ্যতা গ্রহণ করলেন হুমায়ুনের। সারা কাবুল উৎসবে মেতে উঠল। সমাধা হল শিশু আকবরের খাতনা উৎসব।

খাতনা উৎসবের সময় ঘটল এক অলৌকিক কাণ্ড।

শিশু আকবর তখনও চেনে না তাঁর প্রকৃত আম্মাকে। সে নিজেও জানে না যে পিতৃ-শত্রু কামরানের স্ত্রী বেগম সুলতানার কাছে সে মানুষ হচ্ছে। মজলিশ বসেছে। বেগম

মহলের মজলিশে হাজির বহু সুসজ্জিত সম্ভ্রান্ত ঘরের সব মহিলা। শিশু আকবরকে তাঁদের কেউ ঠাট্টা করে বলে, যাও মির্জা, তোমার মায়ের কোলে গিয়ে বসো। সরল শিশু চেনে না তাঁর আসল মা কে, তাই এই ঠাট্টা। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেয় শিশু আকবর। সে একবার সবার মুখগুলো দেখে নেয় ভালো করে, তারপর ঠিক গিয়ে বসে পড়ে নিজের মায়ের কোলে। মা হামিদাবানুর হৃদয় তখন উষর মরুপ্রান্তরের মতো শুষ্ক। দীর্ঘ দুটি বছর তিনি নিজ শিশুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শিশুকে কোলে ফিরে পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন।

এই ঘটনা শাহওয়ার্দি বাহারামের মনে দাগ কাটল।

শিশু আকবর যেভাবে তাঁর আম্মাকে শনাক্ত করেছেন তার মধ্যে তিনি ঐশ্বরিক বোধ অনুভব করলেন। তিনি ছিলেন কাবুলের ক্ষুদ্র একটি অংশের শাসনকর্তা। হুমায়ুনের আমন্ত্রণে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর রাজপ্রাসাদে। কিন্তু ধর্মীয় গানের আসরে তাঁর বাহ্যিক জ্ঞান লোপ পেল। নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েও তিনি রাজকার্যে মন দিতে পারলেন না। শেষে রাজবেশ ত্যাগ করে নির্জন পাহাড়ে, মরু-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জাগতিক কোনো কোলাহলই তাঁকে সচেতন করতে পারছিল না। পৃথিবীর সব কিছুই নশ্বর, মূল্যহীন মনে হচ্ছিল তাঁর। তিনি কি চান তা তিনি নিজেই বুঝতে পারেন না। উজির, ওমরাহরা রাজকার্যের জন্য তাঁর কাছে এলে তিনি সোজা বলে দেন, ও সব তোমরা দ্যাখো। আমাকে আর ওসবের মধ্যে যুক্ত কোরো না। ওসব আমার ভালো লাগে না।

তিনি শেখ জামু মহম্মদ খাবুসানী নিশাপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। গুরু খাবুসানী নিশাপুরী তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, বোকা, তুই আলোর পথ দেখতে পেয়েছিস। যা রাজকার্য ছেড়ে এবার তুই মানুষের সেবা কর। তৃষ্ণার্ত মানুষকে তুই জল দান কর। মনে আরাম আর শান্তি পাবি। জলদান করে তৃষ্ণার্ত মানুষের পিপাসা মেটানোর মধ্যে তুই পাবি আল্লার দোয়া। শাহওয়ার্দি ছিলেন শাসনকর্তা, হলেন ভিস্তিওয়ালা। রাজধর্ম ত্যাগ করে কাঁধে তুলে নিলেন চামড়ার তৈরি একটা ভিস্তি। পারসিক ভাষায় যার নাম সাক্কা।

লোহিত সাগরের কূলে মোখা ও জেদ্দা। জেদ্দাতে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মুসলমান তীর্থযাত্রীরা 'হজ' এর জন্য সমবেত হয়। তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে জমজমাট বাজারে অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে আসা ব্যবসায়ীরা গুজরাতি বণিকদের আনা ভারতীয় কাপড় কিনে নেয়। এই অঞ্চলে গুজরাতি বণিকদের রমরমা। নিত্য তাদের যাওয়া-আসা। প্রতিবছর ভারত থেকে বার্ষিক তীর্থযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা মাল ও লোকভর্তি জাহাজ নিয়ে আসে। যারা আসে স্থলপথে তাদের সঙ্গে আলাপ হয় শাহওয়ার্দির। ওদের সঙ্গে তিনি ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন।

রুক্ষ বালুময় কাবুলের পার্বত্য পথে কোথাও নেই একরত্তি ঘাস। এখানকার আবহাওয়া যেমন শুকনো তেমনি চরম। দিনে একবার রোদ উঠলেই বালির রাশি তেতে লাল হতে থাকে। তারপর পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়া বইতে সুরু করলেই একেবারে প্রলয় লেগে যায়।

ভৈরবের জটার মতো বালি দুপুরে রোদে আগুনের ফুলকি হয়ে উড়ে বেড়ায়। বাতাসের ঘূর্ণিতে তারা তাণ্ডব নাচ নাচে। দুপুরে মরুভূমির এই রূপ যে কত ভয়ংকর সে কথা কল্পনা করা যায় না। বৃষ্টি এখানে হয় না বললেই চলে। কোথাও এক ফোঁটা জলের চিহ্ন নেই। যদি দৈবাৎ কখনো বৃষ্টি হয়-তবে বুঝতে হবে দেবতার আশীর্বাদ ঝড়ে পড়ছে। কিন্তু তা তৃষার্ত উষরমরু বুকে তখনি শুষে বাষ্প হয়ে যায়।

কোথাও নেই একটা গাছ। বিস্তীর্ণ বালির বুকে নেই কোনো আচ্ছাদন। একটু ছায়া নেই কোথাও, আছে শুধু মায়া। নিষ্ঠুর প্রাণঘাতী মায়াময় মরুভূমি। দুপুরে সূর্যের তাপে এই ভীষণ অসহ্য মরুভূমিতে দেখা যায় মরীচিকা। এদের মায়ায় পড়লে তৃষার্ত পথিকের আর রেহাই নেই। একটু একটু করে সে এগিয়ে যাবে জলের আশায়-কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পাবে না। সব কিছু শুকিয়ে যাবে কণ্ঠ, তালু, বুকের রক্ত, প্রাণরস সব। রাত্রে এখানে আবার দারুণ শীত পড়ে। এত ঠান্ডা যে জল পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে যায়। দিনের সঙ্গে রাতের তাপমাত্রার আকাশপাতাল তফাত। শেষরাতে ভয়াবহ কুয়াশা দেখা যায়। এক হাত দূরের কিছুও দেখতে পাওয়া যায় না। কুয়াশা এতটাই ঘন আর অন্ধকার যে তা রহস্যময় আর প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে।

মধ্য এশিয়ার মরুভূমি। ন্যাড়া ন্যাড়া উঁচুনীচু সব পাহাড় মাথা উঁচু করে জেগে আছে। তার পাস দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ চলে গিয়েছে বহু দূরে। সেই পথ ধরে পরিচিত এলাকা ছেড়ে বাহারাম জলদানের ব্রত নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তিনি চলেছেন তো চলেইছেন। এই পথের যেন কোথাও শেষ নেই। এই চলারও যেন কোনো ক্ষান্তি নেই। বালির রুক্ষ ধূসর রূপে তাঁর অন্তর দিন দিন ভরে উঠেছে শ্মশানের বীভৎসতায়। যেন মনে হয় দুনিয়াতে বালির পাহাড় আর বালির সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নেই। সময়ে সময়ে অসহ্য বোধ হয় চারপাশের নিস্তব্ধতা। এ এক অদ্ভুত রাজত্ব। যেন প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই, প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই এখানে। শুধু নিজের হৃদপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় ধুপ্ ধুপ্। নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও ভারী হয়ে বাজে নিজের কানে। এমনি নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতায় ভরা এই অঞ্চল। সাধারণ মানুষ একা এখানে কিছুদিন থাকলে নির্ঘাত উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু বাহারাম সেই ভয়ংকর রাজ্যে চলতে থাকেন স্বীয় সংকল্পে স্থির হয়ে-হিন্দুস্তান।

দিন আসে রাত্রি হয়। আবার আসে দিন, তাও চলে যায়। এই ভাবে কত দিন যে এল আর কত দিন যে গেল বাহারামের মনে তার কোনো হিসাবই থাকে না। চলতে চলতে হঠাৎ-ই একদিন তিনি দেখেন দিগন্তে বালির রেখা আর আকাশের মাঝে যেন একটু ফাঁক হয়ে গেছে। আর সেখানে ভেসে উঠছে কয়েকটি প্রাসাদের চূড়া। তিনি যতই এগিয়ে যান, দেখতে পান ততই বালির স্তূপের আড়াল থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে একটা জনপদ। তাঁর মন আশার আলোয় ভরে ওঠে।

যাক এতদিন পর স্বাদু শীতল জলে শুকনো গলা ভেজানো যাবে। আতপ্ত শরীরকে করা যাবে শীতল। নিবৃত্তি করা যাবে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার। তিনি একটা জলের ফোয়ারা খুঁজে বার

করলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি জল পান করবার জন্য অঞ্জলি বাড়িয়েছেন অমনি ঘটল বিপদ। প্রহরীরা ছুটে এল। বাহারামকে ধরে নিয়ে গেল দুর্গাধিপতির কাছে। সেখান তিনি কিছু বলার পূর্বেই জানালেন তাঁর আকণ্ঠ তৃষ্ণার কথা। শীতল পানীয় আনা হল তাঁর জন্য। তাতে তৃষ্ণা মিটতে তিনি যেন নবজীবন ফিরে পেলেন। তারপর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে অধিপতিকে স্বস্তিবচন করে বললেন, শুনুন আমার অভিলাষ।

কেন আমি এখানে এসেছি। আপনি তো বুঝতে পেরেছেন আমি একজন মুসলমান। তবু আমার দ্বিধা রয়ে গেছে অন্তরে। আল্লার বাণী যদি অটুট তবে কেন মানুষের এত দুঃখ এত জ্বালা। স্বধর্মের কেন এই অবনতি। এর উপরও এসেছে এই ধর্মে ভেদ। আমি এর কারণ জানতে চাই। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমি এমন একজন জ্ঞানী পাইনি যিনি আমার চিত্তের এইসব দ্বন্দ্ব দূর করতে পারেন, আমাকে দেখাতে পারেন নিঃসংশয়তার আলো। আমি শুনেছি ভারতবর্ষে বহু প্রাজ্ঞ মানুষের বাস। আমার মনে হয় আল্লা আমার জীবনে তাঁর কোনো নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করতে চান। নইলে আমার পক্ষে তো বাসনা করা সাজে না, তবু আমি চাই এই দুস্তর মরুভূমি পাহাড় নদী পার হয়ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যেতে। আমি সেখানে যেতে চাই। সেখানকার জ্ঞানতপস্বী মহাস্থবিরদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। পেতে চাই নতুন পথে চলার নির্দেশ যে পথে ধর্মের মধ্যে থাকবে না কোনো ভেদ। আমার মহত্তর বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, আমি মানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই সমস্ত বাধা-বন্ধ অতিক্রম করে সেই দেশে যেতে চাই। আমি জানি আল্লা আমার চিরদিনের সহায়। আল্লা আপনারও সর্বাঙ্গীণ কুশল করুন।

বাহারামের এই অটুট আত্মপ্রত্যয় ভরা বাগ্মিতা দুর্গাধিপতির মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। তিনি নিজের আসন থেকে উঠে এগিয়ে এসে পরম ভক্তিভরে বাহারামের পাদবন্দনা করলেন। তারপর সাদরে আহ্বান জানালেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। বাহারামের শরীর আবার সতেজ হয়ে উঠল-বিশ্রামে আর আহারে। দু-একদিন পরেই তিনি আবার পথে নামবার সংকল্প করলেন। অধিপতি তাঁর সঙ্গে দিলেন খাদ্য। চামড়ার থলিতে দিলেন পানীয় জল। আর দিলেন তাঁর পরিচয়পত্র।

আবার শুরু হল তাঁর যাত্রা। আবার সেই অজানা মরুভূমি। অধিপতি যা রসদ দিয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। সঙ্গে আছে চামড়ার থলিতে কেবল জল। ধুধু বালির রাজত্বে বাহারাম একদিন দেখলেন তিনি পথের নিশানা খুঁজে পাচ্ছেন না। দিক আর পথের নির্ণয় করবার জন্যে তিনি লক্ষ্য রাখছিলেন সূর্যের উদয় আর তাঁর অতিক্রমণ পথ। দিনের বেলায় নিজের ছায়ার গতি লক্ষ্য করে পথ চলছিলেন। কিছুরই সঠিক নিশানা পাচ্ছিলেন না। পথের সবটাই তো অজানা। অজানার মধ্যেই বাহারাম তাঁর বজ্রকঠোর মনের শক্তিতে স্থির হয়ে এগিয়ে চলতে লাগলেন। মনের বলকে অটুট রাখতে তিনি গান গাইতেন।

এইভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। একদিন দুপুরের প্রচণ্ড রোদে মরুভূমির উপরে যখন চলছে আগুনের খেলা। বাহারাম ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গে চামড়ার থলিতে

তখন আছে সামান্য জল। সেই জল তখন তাঁর কাছে ভীষণ অমূল্য। সেটুকু কি যখন তখন মুখে দেওয়া যায়। যদি কোনো পথচারীর প্রয়োজন হয়, তিনি সঞ্চয় করে রাখছিলেন। কিন্তু তৃষ্ণার জ্বালাও তো আর সহ্য হয় না। তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে সব ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে চাইছে। কণ্ঠতালু গেছে শুকিয়ে, জিভ টেনে ধরছে ভিতর থেকে। জিভ দিয়ে বারবার তিনি ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু জিভও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। তখনও তিনি মনে করছেন শরীরকে নিয়ে পরীক্ষা করবেন। দারুণ কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর যেন অটুট থাকে। তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। আর পারলেন না। কম্পিত হাতে কোনোরকমে বাহারাম সেই ভারী জলের থলিটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন, ভালো করে তখনও ধরতে পারেন নি থলিটা। সেটা হাত ফসকে পড়ে গেল বালির উপর।

বাহারাম অবাক হয়ে দেখলেন এবং দেখে একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। দেখলেন, কেমন করে সেই জলটুকু, প্রাণের সেই রসটুকু মরুভূমির আতপ্ত বালি সোঁ সোঁ করে শুষে নিল। বাহারামের মনে হল মরুভূমির ওই বালি যেন এক নিমেষে শুষে নিল তাঁর শরীরের সমস্ত রস-রক্ত। শিরা ধমনিতে যেন সমস্ত স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর। হৃৎপিণ্ডটা পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠছে। আর যে পারা যায় না। সঞ্চয়ের শেষ জলবিন্দুটুকু চলে গেছে তপ্ত বালুর বুকে। এবার এই দেহের শেষ হবে। তাই শেষবারের মতো তিনি আল্লাকে ডেকে উঠলেন। হে সর্বতাপহারী, এই যদি তোমার ইচ্ছা তবে তাই হোক। কিন্তু তার শুকনো গলা দিয়ে একটুও আওয়াজ বের হল না। তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন বালির উপরে।

মূর্ছা ভঙ্গ হতে তিনি দেখতে পেলেন সামনে বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা নদী। স্ফটিকের মতো তার জলধারা স্বচ্ছ। নদীর চারদিকে সবুজের গালিচা পাতা। ঢল ঢল করছে ঘাস। গাছে গাছে ফলে আছে লাল খেজুর। জায়গাটা বড়ো মনোরম আর ছায়াছন্ন। এ কি স্বপ্ন না মায়া? না মতিভ্রম? না তা তো নয়। তবে নিশ্চয় মরীচিকা। কিন্তু তা যাই হোক ভাবলে আর চলবে না। মৃত্যুর আগে একবার পরখ করে দেখে নিতে হবে। দুর্নিবার আবেগে তিনি লাফিয়ে উঠতে গেলেন। পারলেন না। পা দুটো নিশ্চল। হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে চললেন। হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লেন প্রবহমান জল ধারার উপর। সারা অঙ্গ দিয়ে জল পান করতেলাগলেন। আঃ কি শান্তি! আঃ কী তৃপ্তি! হে ঈশ্বর, তোমার অপার করুণা সবই তোমার, আমার বলতে কিছু নেই। তোমার অপার করুণায় এই রুক্ষ মরুর বুকেও বয়ে যাচ্ছে জলধারা।

এইভাবে বহু বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। ভারতের দিক থেকে মক্কার পথে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের পিপাসা মেটান তিনি। ওঁরা যায় তীর্থ করতে আর তিনি যাত্রীদের জলদান করে তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় করে নেন। কাবুল কান্দাহারের পথে মাঝে মাঝে ঝরনা পাওয়া যায়। কিন্তু মক্কার পথ অতি রুক্ষ আর জল হীন। পথ চলেন আর জল দান করেন। জল দান করা আর পথ চলা। ওঁরা ওদিকে যায় তিনি এদিকে এগিয়ে আসেন। একদিন এসে পৌঁছোলেন দিল্লি।

কোথায় তাব্রিজ আর কোথায় দিল্লি। (১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ) হুমায়ুনের তখন মৃত্যু হয়েছে, আকবর বসেছেন সিংহাসনে। সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির খুব কাছেই হজরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি। এখানকার হুজরো শরিফে আস্তানা গাড়লেন বাহারাম। বাৎসরিক উরস উপলক্ষে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে সমবেত হয়। তিনি তাঁদের জলদান করেন। কিছুদিন পর তিনি চলে এলেন আগ্রা। আগ্রা দুর্গের সামনে একটি নিম গাছের নিচে জলদানের কাজ শুরু করলেন। প্রাতঃভ্রমণে বের হবার সময় সম্রাট আকবর প্রথম তাঁর কাছ থেকেই পানি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে জলদানের সঙ্গে অন্নদানের ব্রতও গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন।

বাহারাম রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সম্রাটের পাক ও ভোজনশালার পরিদর্শক হয়ে তাঁর মন শান্তি পেল না। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দ্বেষ তাঁকে পীড়িত করে। তিনি শায়েরিতে সব কিছু লিখতে শুরু করলেন। মানুষের বেদনার রসে জারিত তাঁর শায়েরি। সম্রাট সে শায়েরি শুনে মুগ্ধ। সম্রাট তাঁকে রাজসভায় বসালেন। তাঁর শায়েরির কথাগুলো এত সুন্দর যে সম্রাট তাঁকে অনুরোধ করলেন শায়েরিকে সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশন করতে। সেই মতো বাহারামের সঙ্গীত শুরু হল সম্রাটের রাজসভায়। নবরত্ন সভার একটি উজ্জ্বল রত্ন হয়ে তিনি বিরাজ করতে থাকেন। আবুল ফজল ও ফৈজি তাঁর কাব্য প্রতিভাকে ঈর্ষা করেন অথচ স্বয়ং সম্রাট বাহারামের গুণগ্রাহী। সম্রাট নিজে তাঁর ভক্ত, কি আর করেন তাঁরা, ভয়ে চুপচাপ থাকেন।

এই সব ঘটনাও বাহারামকে বিচলিত করে। ইসলাম ধর্মের শিয়া সুন্নি মতভেদ বাহারামকে বিচলিত করে গুরুতর ভাবে। মহরম মাসের প্রথম দশদিন কারবালা প্রান্তরের মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করে শহিদদের উদ্দেশ্যে যে শোক পালন করা হয়, সেসময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একদল মুসলমান তাঁকে র‍্যাফিদি (শিয়া সরদার) বলে ব্যঙ্গ করল। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। নিঃশব্দে একদিন আগ্রা ত্যাগ করলেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন বর্ধমান (তখন ৯৭০ হিজরি অব্দ, ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দ)।

দামোদর নদ নির্ভর নগরী তখন বর্ধমান। ছোটোনাগপুরের পার্বত্য এলাকা সোনাজুরিয়া ঝরনা থেকে উদ্ভূত দামোদর নদ। আদিবাসীদের কাছে এই নদ অতি প্রবিত্র। তারা বলে আদ্যের গঙ্গা হচ্ছে দামোদর। বাহারামের ইচ্ছে এখান থেকে তিনি দক্ষিণ ভারত ঘুরে চলে যাবেন সিংহলে। বর্ধমানে বাঁকা নদীর ধারে পুরাতন চকের কাছে গাছগাছালিতে ভর্তি ছোট্ট একটা জায়গায় হিন্দু যোগীর আশ্রম। সবাই বলে যোগী জয়পালের আখড়া। তার পাশেই আশ্রয় নিলেন পির বাহারাম সিক্কা। যোগী জয়পালকে চিনলেন আন্তরিক রহস্যের কৌতূহলে।

জয়পাল তাঁর পরিধেয় বস্ত্র বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখি তো গুরুর কেরামতি! শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া বস্ত্রকে দেখি কেমন নামিয়ে আনতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে বাহারাম বলে উঠলেন—গুরু? কে কার গুরু? গুরু তো কেবল একজনই। সে হচ্ছে আল্লা, তুমি যাকে

ঈশ্বর বল। আমরা সকলেই তাঁর শিষ্য। এই বলে তিনি নিজের লাঠিটাকে উপরে ছুড়ে দিয়ে বললেন, যা যোগীজির কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

মুহূর্তের মধ্যে লাঠি মিলিয়ে গেল শূন্যে কিছুক্ষণ পর সেই লাঠি কাপড়টাকে জড়িয়ে নিয়ে এসে শূন্য থেকে পড়ল তাঁদের সামনে। উপস্থিত সকলে সেই দৃশ্য দেখে চমকিত হল। সবাই ধন্য ধন্য করল। বাহারামকে নিজের আশ্রম দান করে দিলেন যোগী জয়পাল। বাহারামের খ্যাতি বেড়ে গেল। সকাল সন্ধ্যায় বাহারাম গান করেন। এই সঙ্গীতের নাম পারশি ভাষায় দেওয়ান সঙ্গীত। তাঁর সুললিত কণ্ঠের গান দীন-দুঃখীদের আনন্দ দেয়। হিন্দু মুসলমান সকলেই ছুটে আসে তাঁর কাছে। কিন্তু মাত্র তিন দিন। তিন দিন পব তিনি হঠাৎ পীড়িত হয়ে দেহ রাখলেন। তাঁর মৃত্যু হিন্দু ও মুসলমান সকলের মধ্যেই অলৌকিক ঐশ্বরীয় খ্যাতি ছড়িয়ে দিল।

যোগী জয়পালও দেহ রাখলেন এক বছর পর (৯৭৩ হিজরি ১৫৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ওঁদের ভক্তরা মিলে বাহারামের পাশেই তাঁকে কবর দিল। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে খোলামেলা বাতাসের বিভাবে ও অসীম দিগন্তের নীল চাঁদোয়ার তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন দুই বন্ধু। তারপর তো ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর পির বাহারামের মাজার এবং সংলগ্ন মেহেরউন্নিসার প্রথম স্বামী বর্ধমানের নবাব শের আফগান ও কুতবুদ্দীনের সমাধিভবন সুন্দর করে নির্মাণ করার ব্যবস্থা করলেন।

—আপনি খুব সুন্দর গল্প বলেন তো?

—গল্প? না না। এ গল্প নয়, এ হল ইতিহাস। এই ইতিহাসকে তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। এই সবই হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য। বহুদিন ধরে তিলতিল করে গড়ে উঠেছে। একে ধ্বংস করতে চায় পশুশক্তি। তোমাদের এসব সংগ্রহ করে সৃজন করতে হবে। ঐতিহ্যকে ভুললে জাতির অস্তিত্ব থাকে না।

নানা মতের মানুষের বাস এখানে। তারা সবাই বাংলায় কথা বলে। কৃষি-সভ্যতার উন্মেষের পাশাপাশি শিকারি যাযাবর আর গো-পালক প্রায় যাযাবর মানুষের নীড় বাঁধা কৃষি জীবনের সাথে সাথে শুরু হয়েছিল লোক-সংস্কৃতি। এই জনপদের এক শ্রেণির মানুষ ইসলামের সুফি ধারায় প্রভাবিত হয়। লোক-সংস্কৃতির অনেক ধারাকে তারা নিজেদের জীবনে লালন করে। তোমরা হয়তো জানো, মুসলমান মেয়েরা 'বিয়ের গীত' নামে একটি লোক সংস্কৃতির ধারায় কুশীলব। এই গান মুসলমান রমণীদের নিজস্ব একচেটে। এখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই। এর বিষয়বস্তু হল, বিশেষ কোনো ঘটনা, গ্রাম্য প্রেম-পিরীতের কথা, নানা গ্রাম্য কথা এবং অসবর্ণ বিবাহ কথা এই সব। গীতের সাথে সাথে 'কাপ' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয়ও এরা করে। ঢোল বাদ্যের বিচিত্র তালে, মেয়েলি নাচ নেচে, মেয়েলি বিচিত্র সুরে এরা গান করে। এদের অনেকেই স্বভাব গীতিকার।

এদের কেউ কেউ বেহুলা লখিন্দরের বহু চর্চিত কাহিনিকে নিয়ে নতুন করে গল্প ফেঁদেছে। রচনা করেছে 'বৈদেশী বেহুলা'-র মতো কাহিনি। এই কাহিনিতে বেহুলা লখিন্দর কৃষক কন্যা ও কৃষক যুবা। লোহার বাসর ঘরের পরিবর্তে মাঠে লাঙল চষতে চষতে সর্প

দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হচ্ছে। এখানে লখিন্দরের শব নিয়ে গাঙুরের জলে ভেসে যাওয়ার পরিবর্তে বেহুলা যোগিনী বেশে চলে গেছে কামরূপ। সর্পবিদ্যা শিখে ফিরে এসেছে সে। বাঁচিয়েছে পতিকে, শেষে দিয়েছে আত্মপরিচয়। মিলন হয়েছে দুজনার।

বাংলাদেশে মানব মানবী ও সাপ কেন্দ্রিক নানা কাহিনি ছড়িয়ে আছে। বাঙালি মুসলমান মহিলারা অসূর্যম্পশ্যা। বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি হিন্দু সমাজের কাহিনি তাদের কাছে কীভাবে এল? আসলে এই মুসলমান মহিলারা তো কেউ বহিরাগত নয়। তারা তো এই বাংলারই মাটির মেয়ে। একদা তারা ছিল বৌদ্ধ বজ্রযানী বা হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণিভুক্ত। একদা এদের পূর্বপুরুষ মনসা পুজো করত। এরা জানত বেহুলা লখিন্দরে কাহিনি, পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্মের সুফি সাধক পির আউলিয়াদের কাছে এরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়। এইসব মুসলমান রমণীদের পূর্ববর্তীরা প্রাক্ ইসলাম জীবনে মনসা দেবী ইত্যাদির ব্রত পালন করত। সেই কাহিনি আবহমান ধারায় চলে এসেছে এদের মধ্যে। লোকসংস্কৃতির ধারা ধর্মের বাঁধন মানে না। এ ধারা শাশ্বত চিরন্তন। এ ধারা নদীর মতো আবহমান, গতিপথ কখনো কোথাও বদলেছে।

—বাংলার মুসলমান মহিলাসমাজে মনসা-চাঁদ-বেহুলা-লখিন্দরের নানা কেচ্ছা-কাহিনি চালু আছে। মুসলমান মেয়েরা কথায় কথায় কিশোরীদের 'বেউলো ছুঁড়ি' বলে ডাকে। গ্রাম্য কোন্দলে কখনো একে অপরকে 'লখিন্দরের ফুপু', 'বেউলোর খালা' ইত্যাদি সম্বোধন করে। দুষ্টু পতি পুত্রহীনা বুড়িকে 'চ্যাংমুড়িকানি' বলে গালিও দেয়। আসলে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি তাদের আপন ঘরের কাহিনি।

—এইসব কাহিনির কথাই আমি বলতে চাই। এগুলো তোমরা সংগ্রহ কর। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তো দামিন্যায় কাটিয়েছি। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ, গানের আড্ডা, কবিগান। এখনকার এই ভিন্ন জীবন কল্পনা করতে পারি না। এর রকম অবস্থায় কোনো দিন পড়ব কখনো ভাবিনি। দিনের পর দিন যায়, সূর্যের উদয় দেখি, দূরের নীল সীমানায় সিঁদুরের রঙে রাঙা সূর্যকে ডুবে যেতে দেখি। এই দীর্ঘ সময় ব্যাপী দিন খাঁ-খাঁ করে শূন্য। কি করে যে *এই দিনগুলো কাটে, সে এক বিরাটসমস্যা। আফগানদের শেষ যুদ্ধ* আমাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দেয়।

আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ একটা রাজ্য। হিংস্র শ্বাপদ-সংকুল সেই জঙ্গলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। জঙ্গলের বাইরে চারপাশে পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখার চারপাশে আবার প্রতিরোধ প্রাচীর। আমার চোখের সামনে ছবিটা কেবল ভাসে কেবল ভাসে। আমি স্বপ্ন দেখি এরকম একটা দেশের, যেখানে কোনো ডিহিদার থাকবে না। থাকবে না কোনো শোষক। জীবজন্তু সমগ্র প্রাণীকূল নিয়ে মানুষ বিরাজ করবে সেই স্বপ্নের দেশে। রত্নানু নদী দিয়ে ভেসে যায় পাল-তোলা জাহাজ। সেই জাহাজ চলে যায় কত দূরে। কত রকম জাহাজ আসে কত দূর দূর দেশ থেকে। মনে হয় যদি চলে যেতে পারতাম ওই জাহাজে চেপে কোনো দূর দেশে। কত কী জানতে পারতাম। কিন্তু কোথায় যাব, কীভাবে যাব? আমার তো সেরকম কোনো অর্থবল নেই।

কতবার ভেবেছি একবার ঘুরে আসব শ্রীক্ষেত্র। জগন্নাথকে দর্শন করার বহু দিনের ইচ্ছে কিন্তু সাধ মিটছে কই?

বাংলার সর্বত্র চলছে অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলা। পরাজিত আফগানরা চারদিকে লুঠতরাজ করছে, মোগল সৈন্যরাও ঠিক তেমনি ভাবেই ধন উপার্জন করতে শুরু করেছে। সিপাহশালার, দেওয়ান, বক্সিশি, কাজি, কোতোয়াল, সবাই এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। দিল্লি থেকে যারাই আসছে সম্রাটের ফরমান নিয়ে তারাই এভাবে অর্থ উপার্জন করছে। এ যেন শাসন করার ফরমান পাওয়ার অধিকার মানেই, লুঠ চালাবার ক্ষমতা পাওয়া। একই ভাবে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা মানসিংহ এলেন বাংলার শাসনকর্তা হয়ে। তিনি রাজমহলকেই নতুন করে রাজধানী পত্তন করতে চাইলেন। এই রাজধানীর নামকরণ করলেন আকবরনগর। রাজমহল ক্রমশ আকবরনগর হিসাবে সমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করল।

ইতিহাসে সময় মাঝে মাঝে ধীর কদমে চলে। আবার কখনও ঝড়ো হাওয়ার দাপটে উত্তাল হয়ে ছোটে। প্রতিদিনের শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবনের মাঠঘাট ছাপিয়ে ছুটে যায় সময় কী ব্যক্তিগত, কী সামাজিক জীবনে। তেমনি মাঝে মাঝে আমি যেন চাঁদে পাওয়া মানুষ হয়ে যাই। ভালো না লাগলে হঠাৎ হঠাৎ বেড়িয়ে পড়ি। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে। কখনও সঙ্গী সাথি জুটিয়ে কখনও একা একা। যখন বাড়ি ফিরি প্রত্যেকটা নারীর শরীরে তখন আমি নেবু ফুলের সবুজ গন্ধ পাই। নদী জঙ্গল ঘুরে বেড়ায় তখন আমার মাথার মধ্যে। লিখতে বসলেই সেই মাথায় নামে বৃষ্টি। কয়েক দিন ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টি ঝরে । সারাদিন সারারাত বৃষ্টি ঝরে পড়ে আমার বুকের গভীরে, তালপাতায়, লেখার কাগজে। এমনি করে কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয় উটের পর উটের সারির মতো। যেন কোনো মরুভূমির উপর দিয়ে আমি চলেছি, চলেছে আমার সঙ্গে অনেক মানুষ। এদের সবাইকে নিয়ে আমি সেই স্বপ্নের দেশ গড়ব। সেই একটা দেশের উদ্দেশ্যে আমার পথ চলা। যেখানে মাটিতে সোনা পাওয়া যায়। যেখানে সবাই রাজা। কারুর দুঃখ, নেই, কেউ বসে থাকে না। সকলে কাজ করে, সকলে সুখে জীবন কাটায়।

জাগতিক সব কিছুর বদলে আমি শব্দের পর শব্দ চয়ন করি। যেন সারা দুনিয়া ছুটছে আর আমি ঘরের ভিতর ঘর সাজিয়ে বসে থেকেছি বদ্ধ ঘরে। লিখে চলেছি, লিখে চলেছি এক নাগাড়ে। সামনে খোলা থাকে আমার জাবদা খেরোর খাতা। আর পাশে পড়ে থাকে সেই অ-মূল্যবান আমার পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া কাঠের বাক্স। মাঝে মাঝেই মেজাজ খিঁচড়ে যায় যখন কোনো শব্দ আসে না মাথার মধ্যে। কল্পনার দড়ি ছিঁড়ে যায়। ধুত্তোরি বলে উঠে পড়ি। জল গড়িয়ে খাই, তামাক চাই। না পেলে বিরক্ত হই। বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে। নইলে চড়া মেজাজ নিয়ে বসে থাকি কাঠের পিঁড়ির ওপর কাঠ হয়ে। এই সময় কেউ আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। মাথার ভেতর তখন আমার পাগলাঘণ্টা বাজে। একটানা বেজে চলে একটা সুর-ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না; কিচ্ছু ভালো লাগে না। এমনি করে কেটে যায় দীর্ঘ সময়। এক সময় যখন খেয়াল পড়ে, তখন দেখি গাছেদের

মাথার ওপর দুধের বাটির মতো টলমলে চাঁদ উঠেছে। কত নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে আমার চারপাশে। আমার কুহক তখন কেটে যায়। নতুন কুহকে আমি আবার লিখতে বসি।

—মঙ্গলকাব্যের কবিরা সব এরকমই। শুধু আপনি নন, স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সবাই কাব্য প্রণয়ন করেছেন। বস্তুত যে কোনো ধর্মগ্রন্থের কবিরা কেউই স্বপ্রণেতা নন, আদি বাংলা কবিতা চর্যাপদ যেমন ধর্ম প্রণীত। তেমনি আপনিও, কোনো অলৌকিক শক্তিই তো আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। আপনার তো সেটাই বক্তব্য?

—সেই শক্তির স্বরূপ টের পাই নিজের মধ্যে। যেন কবিতার প্রণেতা আমি নই-কবিতাই বাধ্য করেছে আমাকে লিখতে। এই অর্থে বলতে পারো আমার রচনা ঈশ্বরীয় রচনাই বটে।

—ঈশ্বরীয় রচনাই বটে। অস্ফুট স্বরে কাকে বললাম কথাটা?

মনে মনে নিজেকেই কি প্রশ্ন করলাম আমি?

শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রায় আমি ব্যস্ত।

লিখছি—

"সিংহল পাটন এবে লোকশূণ্য ছিল যবে
করিলাম সেকালে সেবন,
দিয়া মোরে পদছায়া আপনি করিলে দয়া
বসাইলা সিংহল পাটন।"

"প্রথমে ভ্রমরা জলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডীকায়।
এছাড়া ভ্রমরা-পানী সম্মুখেতে উজাবনি
নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায়।।'

সুহ্ম বা রাঢ় দেশে জলপথ প্রধান পরিবহন। সরস্বতী, দামোদর ও গঙ্গা এই তিন নদীই ত্রিবেণী বা সপ্তগ্রামের কাছে মিলিত হয়েছে। সাগর সঙ্গম সপ্তগ্রামের অদূরেই। রাঢ়ের সীমান্ত এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈবর্ত ও বাগদি রাজাদের বাস। এরা এক একজনে মহাপরাক্রমশালী। জৈন ধর্মের পর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রসার ঘটেছে। সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত, গোপ, মাহিষ্য প্রভৃতি চাষি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচার সর্বস্বতায় বিরক্ত। তারা ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অন্যদের 'ম্লেচ্ছ', 'যবন' ইত্যাদি বলে ঘৃণা করা স্বভাব এবং এই অসম্মান সূচক শব্দ ব্যবহারের বদ অভ্যাসগুলো মেনে নিতে না পারার কারণে ক্রমে বৌদ্ধ দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ। গ্রিক চিন্তাবিদরাও বৌদ্ধধর্মকে দেখেছিলেন উন্নততর চিন্তা প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠারূপে। রাঢ়ী কায়স্থরা পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। পরবর্তীকালে যখন পূজারি ব্রাহ্মণ সহ সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ বণিক এবং সামন্তদের সঙ্গে মিলে একটা অশুভ

আঁতাত গড়ে তুলতে লাগল, যখন জাতিভেদ বর্ণভেদ প্রথার জিগির উঠল জোরালো ভাবে, যখন শোষণ ব্যবস্থার ভিত পোক্ত হয়ে উঠল, রাজাদের প্রশস্তিসূচক নানান কাব্যগ্রন্থ রচিত হতে শুরু করল; রাজা মহারাজাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী বহু গুণসম্পন্ন কবি, মহাকবিরা বিখ্যাত মঙ্গলকাব্যগুলো রচনা করতে শুরু করলেন এই সময়ে।

—গৌড় বা লক্ষ্ণৌতির রাজারা ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। রাজারা চেয়েছেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থেকে সমাজ মুক্ত হোক। কিন্তু বলতে গেলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই কট্টর ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রসার লাভ করেছে। সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধ ধর্মের উদারতার বিরুদ্ধে নিয়ে আসার প্রয়াসে ব্রাহ্মণরা চণ্ডীপুজো, কালীপুজো, মনসাপুজো, লিঙ্গপুজো, হরিপুজো প্রভৃতি পুজোর প্রচলন শুরু করেছে। রাঢ় বাংলার মাটি এভাবেই বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতি মুক্ত হতে শুরু করেছে।

—মনসা, শীতলা এই সব স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পেয়ে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছেন। দেবী চণ্ডী কম কীসে? নিজের পুজো প্রচলনের জন্য তিনিও অস্থির হয়ে উঠলেন। তাই কি বললেন, যেমন করে হোক, ছলে বলে কৌশলে মর্তে তাঁর পুজো প্রচার করতে হবে?

—আসলে বড়োলোকদের দিয়ে নয়, দেবীর পুজো যারা প্রচার করবে তারা সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষ। তারা একটা নতুন রাজ্য গঠন করছে। যেখানে মুসলমান আছে, বড়ো লোক আছে বণিক আছে। কোনো বিভেদ নেই। কিন্তু এমন বর্ণনা করতে হবে যেন, দেবীর শক্তির লীলায় তাদের দারিদ্র্য ঘুচে যাচ্ছে। তারা রূপবান হয়ে উঠছে এবং রাজকন্যাকে বিবাহ করে অবশিষ্ট জীবন যাপন করছে। কালকেতু ব্যাধকে তাই দয়া দেখাতে হয়েছে। না দেখালে যে বনের পশুকুল রক্ষা পায় না। আবার ব্যাধকে বড়োলোক না করলে তাকে পশু হত্যার কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। পশুকুলকে বাঁচিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা হল। আর ......

—ব্যাধ তো আর কেউ নয় স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র। সুতরাং..........।

—হ্যাঁ। ঠিকই তো।

—পশুবলির দ্বারা যে ভীষণ পুজো ব্যাধ জাতীয় নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রচলিত, তা উচ্চ বর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। নতুন এক সাংস্কৃতিক মেল-বন্ধন ঘটবে। বেড়ে লিখেছেন আপনি।

—তুমি জান না? নবাব বাদশাহদের বিশাল ক্ষমতা, তাদের খেয়াল মাত্র সব কিছু হয়ে যায়। তারা দয়া করলে নীচ মহৎ, ভিক্ষুক রাজা হতে পারে। তারা নির্দয় হলে ধর্মের কোনো দোহাই-ই কাউকে বিনাশ থেকে রক্ষা করতে পারে না। এতটাই তাদের শক্তি।

—তাই কি বলেছেন শক্তির প্রসন্ন মুখ হচ্ছে মা, অপ্রসন্ন মুখ হচ্ছে চণ্ডী? এঁর ক্রোধ বড়ো ভয়ংকর। সর্বদাই তাঁর সামনে করজোড়ে বসে থাকতে হবে। যতক্ষণ ইনি যাঁকে প্রশ্রয় দেবেন, ততক্ষণ তাঁর সাতখুন মাপ। যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র, ততক্ষণ তাঁর সঙ্গত অসঙ্গত সব আবদার অনায়াসেই পূর্ণ করেন তিনি। তাই প্রত্যাশারাও কোনো শেষ থাকে

না। সে বেড়ে যায়। অন্যায় করলেও সে জয়ী হতে পারে, পঙ্গু হলেও সে গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, অক্ষম হলেও তার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হতে পারে। তবে এটা ঠিক এই শক্তি ভয়ংকরী হয়েও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে সহজেই।

—দেব-দেবীদের পরিকল্পনা এই জন্য, যে এঁদের সেবায় হাতে হাতে ফল পাবার সম্ভাবনা আছে। জীবনের লাভ বৃদ্ধির সঙ্গে এঁরা জড়িত। বৈদান্তিক শিব তাই একালের দেবতা হবে কী করে? সে মদ খায়, ভাং খায়, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায় ভূত প্রেত সাথি নিয়ে। কারোর সর্বনাশ করতে পারে না। কাউকে অভিশাপ দিতে পারে না। তিনি নীলকণ্ঠ, সর্বোত্তম পুরুষ, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব, একমাত্র তাঁরই আছে ত্রিনয়ন। আর আছে উমার, তাঁর ঘরণির।

—তা-ই রাগ-দ্বেষ প্রসাদ অপ্রসাদের লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিনী শক্তিই এ কালের দেবতার চরমাদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল?

—মনসা শীতলা তাঁদের পুজো প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে অনায়াসে এইভাবেই।

—তাই আপনি দেখালেন চণ্ডী কেন পারবে না?

—অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস সমাজের মধ্যে সর্বব্যাপী। দেবতার নামে যা প্রচার করা হবে সমাজ তাই মেনে নেবে। শ্রদ্ধায় হোক, ভয়েই হোক, বিশ্বাস করবে সমাজ। সমাজে যাদের অন্ন নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই, সেই হতভাগ্যরা স্বপ্ন দেখবে তাঁর নামে।

—এইজন্য আপনি চারদিকের গ্লানিকর অবস্থার মধ্যে পরিত্রাণ পাওয়ার নাম করে চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠা দিলেন?

—আমি বাধ্য। এই শক্তির কৃপায় পরিত্রাণ, এই বিশ্বাস তাদের বুকের গভীরে প্রোথিত করে দিতে পারলেই আমার কাজ শেষ।

—সে আপনি যাই বলুন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, কেতকাদাসের মনসার ভাসান বাংলার পল্লীসাহিত্যের মালা। সে জায়গায় আপনার চণ্ডী, বড়ো একটা গুরুত্বপূর্ণ ফুল হতে পারে কোনো মতে।

—পল্লীসমাজের প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্যের উপকরণ নিয়েই আমাদের মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে।

—তা হয়েছে। কিন্তু শুধু বস্তুকে নিয়ে পড়ে থাকলেই তো হবে না তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে কল্পনার তরী বেয়ে বেয়ে। তবেই তো মহান সাহিত্য হবে, কালজয়ী সাহিত্য হবে।

—এ তুমি ঠিকই বলেছ। আমার চণ্ডী মহান সাহিত্য হিসাবেই স্বীকৃতি পাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

—স্বয়ং চণ্ডীর আদেশে লিখছেন বলে?

—না। শিবের মতো অমন গরিব দেবতা, অমন ফিকে রঙের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই, যে জোর করে কেড়ে নিতে পারবে। যেমন করে হোক নিজের কর্তৃত্ব জাহির করবে। নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে তার না

থাকবে কোনো ভয়, না থাকবে কোনো ব্যথা না থাকবে কোনো লাজ। আসলে আমিও সমাজ জীবনের দারিদ্র্য, অপমান, লজ্জা এবং হতাশা থেকে পরিত্রাণের পথের সন্ধান করেছি।

—পথের সন্ধান করেছেন। পথের সন্ধান দিতে পেরেছেন কি?

—তুমিও দেখছি হাসালে। পথের সন্ধান দেওয়াটা আমার কাজ নয়। দিশা দেওয়াটাই আমার উদ্দেশ্য।

—খামখেয়ালি একটা শক্তি, বিনা কারণে ব্যাধের স্ত্রীকে আংটি দিল। ব্যাস ব্যাধের ঘরে টাকা যেন আর ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যখন এই ব্যাধ লড়াই করল, তখন খামোখা কোথা থেকে হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যদের কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিল। এমনই হঠাৎ একটা কিছু না কিছু ঘটে যাচ্ছে। একে আপনি বলেন পথের সন্ধান?

—তুমি কি বলতে চাও?

—গাঁজাখুরি গপ্পো ছাড়া একে কি বলা যায়? একে সাহিত্য বলা যায় না। পথের সন্ধানে মানুষগুলো উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করছে। যে চণ্ডী ন্যায়-অন্যায় মানে না। নিজের সুবিধার খাতিরে সে সত্য-মিথ্যায় ভেদ করে না। সে যেনতেনপ্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে তোলে। তার জন্য যোগ্য হবারও দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবারও প্রয়োজন নেই। কেবল মা মা করে হাঁক ছাড়লেই হবে?

—হবে!

—তাহলে লেখালেখি না করে আপনিও অমনি করছেন না কেন? তবে তো সংসারের অনেক সুরাহা হত।

—মমতার মতো তুমিও খোঁচা দিচ্ছ আমায়?

—না। আপনার কথাই আপনাকে বলছি।

—আসলে চণ্ডী যে কি নেশা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মাথার ভিতরে, কে জানে! আমি মরেছি নিজের জ্বালায়।

কেবা চাহে সম্পদ ধন দিয়া কৈল বধ
ভগবতী আমারে বিড়ম্বে।

চারি বেদ

দামিন্যার কথা মনে পড়ে। আমি পুথি লিখি। শিবরাম সুযোগ খোঁজে। কখন কাঠের বাক্সটা খুলে আমি পাণ্ডুলিপিগুলো বার করব। ভাগ্যি কুলুপ দেওয়া থাকে, আর সে চাবি থাকে আমার কাছে। ওকে বলেছি অপেক্ষা করতে। বলেছি আগে বড় হতে হবে। লেখাপড়া শিখতে হবে। হাতেখড়ি হয়েছে, বর্ণপরিচয় হয়েছে। কড়াকিয়া শতকিয়া মুখস্ত বলতে পার। আরও অনেক লেখাপড়া শিখতে হবে! তোমাকে রামায়ণ মহাভারত পড়তে হবে। তবু ও তক্কে তক্কে থাকে।

একদিন একটা লোক এসে আমার কাছে পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইল। ঢ্যাঙা, রোগা, ন্যাড়া মাথার লোকটাকে দেখে বুঝতে পারলাম শিবরামের একদম পছন্দ হয়নি লোকটাকে। আসলে ভালো লাগেনি। লোকটার চেহারাটাই কেমন যেন। দেখি লোকটা আমার সঙ্গে যখন ঘরের মেঝেতে জাঁকিয়ে বসল। শিবরাম গিয়ে বসল দাওয়ায়। আড়চোখে দেখছিল সব। লোকটা ভুল করে একবার পাণ্ডুলিপির বাক্সের বদলে বাসনের বাক্সটা টেনে ধরেছিল।

বলল, হ্যাঁ মশাই, আপনি তো দেখছি আরো দশখানা মহাভারত লিখতে বসেছেন। আপনার সব লেখা যদি কিনে নেই, কীরকম নেবেন?

—ওটা বাসনের বাক্স। আমার কথায় লজ্জা পেয়েছিল লোকটি।

শিবরাম আড়াল থেকে হেসে উঠেছিল। ও তখন হয়তো ভাবছিল, কী বোকা রে বাবা লোকটা!

লোকটা বলল, একি রকম বাক্স রে বাবা, বাব্বা যা ভারী!

আমার সঙ্গে অনুচ্চস্বরে কথা বলছিল লোকটি।

এক সময়ে ঘরের ভিতর থেকে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম। শিবরামও আমাদের পিছু নিল। লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বের হলাম বাড়ি থেকে। শিবরাম আমাদের সাথে পুকুরঘাট পর্যন্ত এল।

তারপর আমাকে ফিরতে দেখে ওর মুখটা মনে হল ঈষৎ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল। ওর কাছে গেলাম। শুনতে পেলাম বলছে, সব পাণ্ডুলিপি কিনে নেবে বলেছে বাবা?

বললাম, হ্যাঁ। তবে দেরি আছে। একটু আঁটঘাঁট বেঁধে নামবে আর কি।

কপাল থেকে রুক্ষ চুল সরাতে সরাতে মমতা এগিয়ে এল। বলল, দ্যাখো কি হয়।

কিন্তু সেই রোগা ঢ্যাঙা লোকটা আর এলই না। আমি বৃথাই পাণ্ডুলিপি নকল করিয়ে রাখলাম। মমতা এরকম আপশোশ করে মাঝে মাঝেই।

বলে, শুধুমুদু অর্থের অপচয় করো। কাগজ কেনো রে, কালি তৈরি করো রে। কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না। ও সব ছাইপাঁশ, শেষকালে সব ফেলে দিতে হবে।

মমতা মাঝে মাঝেই এধরনের গঞ্জনা দেয় আমাকে।

বলে, এই সব কাগজপত্র বাড়ি থেকে না সরালে তোমার মাথা ঠান্ডা হবে না। কাকে ধরে এনেছিলে? সে পড়ল না, দেখল না, বলল কিনা সব কিনে নেবে। তোমার ঘটে যদি একটও বুদ্ধি থাকে। কই চণ্ডী তোমাকে স্বপ্নে মোহর দেয় না তো?

—মোহর। না চণ্ডী আমাকে স্বপ্নে মোহর দেয় না।

ওর কথায় আমি হাসি।

অনেকদিন বাদে আবার একজন লোক এল যখন শিবরাম তাঁর বসবার জন্য কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি, কাঁসার গেলাসে জল, দুয়েকটা বাতাসা দিয়ে গেল।

এ মানুষটা আবার বেঁটে, আধবুড়ো। মাথার চুলগুলো সব সাদা ছিল।

দেখেছিলাম এর মুখখানি ধূর্তামিতে ঢাকা। জুলজুলে চোখে লোকটা বারেবারে এদিক ওদিক দেখছিল। আমার সঙ্গে সে ফিশফিশ করে কথা বলছিল।

মমতার সাথে শিবরামও লক্ষ্য করেছিল সব। লোকটার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম ঘরের দরজা বন্ধ করে। মা ছেলে বাইরে আড়ি পেতে ছিল। লোকটাকে আমারও সুবিধার বলে মনে হয়নি। আবার চলেছিল বাক্স টানাটানির খেলা। একবার ভেবেছিলাম এবার তাহলে পাণ্ডুলিপি গুলোর একটা হিল্লে হবে।

অনেকক্ষণ পর আগের মতো এই লোকটিও বিদায় নিয়েছিল।

মমতা শিবরামকে বলেছিল, আমার কি মনে হয় জানিস খোকা? পোষা জীব বিক্রি করার মতো খদ্দের ডেকে আনছে তোর বাবা। তারপর ভাবে, যেন কসাই এসেছে বাড়িতে। তখন মায়া বেড়ে যায়। দেড়া দাম হাঁকে। লোকগুলো চলে যায়। সবাই দেখে যাচ্ছে, নিচ্ছে না কেউ। নেবে বলে মনেও হয় না, তুই কি বলিস?

—ছি, মা এসব কী বলছ?

—বড়ো হয়ে বুঝবি খোকা, বড়ো হয়ে বুঝবি। তোর বাবার আসলে মায়া পড়ে গিয়েছে লেখা গুলোর ওপর। কিছুতেই বেচতে পারবে না দেখবি। আগে কত লেখা বিক্রি হয়েছে, আর এগুলো বিক্রি হচ্ছে না?

দরে না পোষালে সত্যিই খদ্দের ছেড়ে দিই। দিনকাল খারাপ, কেউ দুটো টাকা বেশি বললেই দূরে সরে যায়। আমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারি না। মমতা একনাগাড় বকেই যায়। শিবরামের খুব জানতে ইচ্ছে করে, কি আছে ওই সব লেখায় যে লোকে বেশি মূল্য দেবে?

মমতা বলে, অর্থহীন প্রলাপ সব।

মমতার কথা আমার কানে বাজে। শিবরামের মাথায় ঢোকে না কিছু।

মমতা ওকে বলে, প্রথম দিকের লেখাতেই তোর বাবার গুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কত কী লিখেছিল জানিস?

—কী?

—আচ্ছা তুই বল, মানুষ এমন কোনো স্বপ্ন দেখতে পারে যে সে দেব-দেবীর সঙ্গে ঘর করছে? অরণ্যচারী ব্যাধ যার চাল নেই, চুলো নেই সে কিনা রাজা হচ্ছে! বনের জন্তুরা মানুষের মতো কথা বলছে। মানুষের সঙ্গে তারা খেলা করছে, মনের কথা বলছে। দাঁড়া সেই লেখাটা একদিন বার করব, তোকে দেখাব।

শিবরামের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। বুঝতে পারে, আসলে মমতা আমার লেখাগুলো বড়ো বেশি ভালোবাসে।

বলে, অদ্ভুত ব্যাপার তো! সত্যি, ব্যাপারটা কী একটু বলতো?

আড়ালে ওদের এসব কথা শুনি আমি। ওদের আলোচনা ভালো লাগে।

আবার এল একটা লোক। তার সাথেও দরজা বন্ধ করে অনেক আলোচনা হল।

একই ভাবে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল শিবরাম।

মমতা বুঝতে পারে শিবরামের মনে দুঃখ জমেছে। শিবরামকে কাছে ডেকে নেয়। বলে, তুই ও কি বড়ো হয়ে অমন স্বপ্ন দেখবি নাকি খোকা?

—মা তুমি চুপ করো। কথাগুলো বাইরের লোকের কানে যাবে।

—ঘরে দুমুঠো চাল নেই। দু-দিন উপোস চলছে। উনি রূপবতীকে নিয়ে কাহিনি ফাঁদছেন। এমন অদ্ভুত মানুষ দেখেছে কেউ?

—আহ মা, লোকে শুনতে পাবে।

—ঘরে দুবেলা ভাতের সংস্থান হচ্ছে না। ঘরে তো শিবের সোনার ত্রিশূল নেই, যে বাঁধা দিয়ে চাল ধার করে আনব? শিবরাম বুঝতে পারে, ওকে এবার থেকে সংসারের কথা ভাবতে হবে।

আমি অন্য রকম মানুষ। সাংসারিক ধ্যান জ্ঞান আমার কম। আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমি চিরকালই এমনি। আমি তখন লিখছি,

> আজিকাব মতো যদি বান্ধা দেহ শূল
> তবে যে আনিতে পারি নাথ পারি হে তণ্ডুল!

ওদিকে মমতার সঙ্গে শিবরামের কথা চলছে। মমতা বলছে,

—শুনুক। শুনতে পেল তো ভারি বয়েই গেল। কি করে দুটো ভাতের জোগাড় করতে হয় তুই জানিস?

মমতা'র এই রাগটা অমূলক নয়। কিন্তু আমি কি করব?

মনে মনে শিবরামও চণ্ডীকে ডাকে।

বলে, মা চণ্ডী আমাদের দুঃখ কষ্টটা ঘুচিয়ে দাও মা। বাবা তাহলে তোমার কথা আরো ভালো করে লিখতে পারবে।

লোকটা অনেকক্ষণ পর চলে যায়। লোকটার বয়েস খুব বেশি নয়। চালাক চালাক মুখ অবশ্য। এই লোকটা গান করে। বলে আমার পদগুলো গান করবে। বাড়ি ঘর দেখল ঘুরে ঘুরে। তারপর চলে গেল যেমন গিয়েছিল আর সবাই।

ভাদ্র মাসে চড়া রোদ পড়ে। বাক্স বার করি। পাণ্ডুলিপি মেরামত করতে হয়। নইলে

বেশিদিন টিকবে না। মাটির ঘর, বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়। তখন এসব নেতিয়ে যাবে। চাষের কাজ, ঘরের কাজ ফেলে দিয়ে ঠায় বসে থাকি। ঘরে কোণের তাকে, আমার জাবদা লাল থাতার পাশে ভুঁড়িদার গণেশ বসে থাকেন। বাবাজী তার হাতির চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। ভয়ানক ক্ষমতা তাঁর লেখনীর, ব্যাসের মহাভারতটা না থেমে লিখে গেছেন। হঠাৎ খেয়াল হয়, দেখি শিবরাম কাছে বসে আছে। পড়ছে না. খেলতেও যায়নি। অবাক কাণ্ড, শিবারাম চুপচাপ বসে আছে গম্ভীর হয়ে। কিন্তু আমার তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

আমি তখন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। পাণ্ডুলিপি কোথায় লালচে হয়ে পড়েছে। কোথায় অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় কলম বুলিয়ে সেগুলোর সংস্কার করি। তারপর পাণ্ডুলিপি সাজিয়ে গুছিয়ে ভাঁজ করে আবার বাক্সে তুলে রাখি। সকাল থেকে দুপুরভর এই কাজ চলে। নাওয়াখাওয়া তখন যেন ভুলে যাই।

সংসার চালানোর যাবতীয় ঝক্কি সবটাই মমতার ঘাড়ে। সংসারে আমি প্রায় কিছুই করি না। কথায় বলে না যে, কুটো নেড়ে দুটো করে না। সেই রকম।

আশ্বিন মাসে মমতা তাঁর বাক্স থেকে পেতলকাঁসার বাসনগুলো বের করে। পুকুরঘাটে নিয়ে গিয়ে তেঁতুল আর ঘুঁটের ছাই দিয়ে মাজে বাসনগুলো। দাওয়ার রোদে মেলে দেয়। তারপর শুকনো কাপড়ে মুছে তুলে রাখে। সোনা রঙে ওগুলো তখন ঝলমলে হয়ে ওঠে।

শিবরামকে দেখিয়ে বলে, এটা তোর ঠাকুমার বিয়ের বগি থালা, দেখ লেখা আছে ওঁদের দুজনের নাম। এক জোড়া গ্লাস দেখিয়ে বলে, আমার মাসি দিয়েছিল, কেমন ওজন দেখেছিস? এখন আর এসব করা যাবে না।

নিজের ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করতে করতে মমতা বাসন মাজতে থাকে। বগি থালা, কাঁসি, গেলাস, বাটি, গামলা, পিলসুজ, পিকদানি, হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরি খুন্তি কত কিছু। ঠিক যেন যজ্ঞি বাড়ির বাসন। দুশো লোকের রান্না হয়ে যাবে এতে। কত বড়ো হাঁড়ি, কড়াই। কী ভারী সব। নাড়া চাড়া করাই কষ্টের। কোনোটা দাদুর, কোনোটা তার বাবার আমলের, কোনোটা বা আরও পুরাতন।

শিবরাম এই সব দেখে আর ভাবে, তাহলে একদিন ওদের অবস্থা ভালোই ছিল বলতে হবে।

আর এখন সেই সংসার চলে কায়ক্লেশে।

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।

একদিন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধ ছাড়া লোকে আর কিছু বুঝত না। তারপর এল বিষ্ণু আর সূর্যের পালা। তাঁরাও গেলেন, এলেন শিব। দেবাদিদেব মহাদেব, ত্রিকালজ্ঞ। তিনিও টিকলেন না। এবার এসেছেন চণ্ডী। দেখা যাক ইনি কত দিন টেকেন।

রাতে আমি লিখতে বসি, বাক্স খুলি, বাক্স বন্ধ করি। আমার অনেক রচনাই তো অনেকে নিয়ে গেছে। এগুলো নেবে বলছে, নিচ্ছে না কেউ। এর মধ্যে মমতা খুঁজে বের করেছে একটা পুরোনো লেখা। একটি কাব্য পুস্তক যা লেখা হয়েছিল অনেক দিন আগে। হারিয়ে গিয়েছিল।

শিবরামকে দেখায়।

শিবরাম বোঝে, এটা খুঁজে বের করতে হয়নি মমতাকে। ছিল তাঁর কাছেই। যত্নে তোলা ছিল। ওকে দেখানোর জন্যেই বের করে এনেছে মমতা।

--এটা কী কাব্য? শিবরাম অবাক! কাব্যের নাম লেখা আছে অন্নদামঙ্গল.....। লেখকের নাম লেখা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বাবার নাম দেখে ওর ভালো লাগে। মমতার হাত থেকে সেটি সংগ্রহ করে।

বলে, দেখি মা দেখি পুথিটা।

মমতা বলে, তোর বাবাকে বলবি না যে এটা আমার কাছে ছিল। তোর বাবার আর মনে নেই, কবে এটা লিখেছিল।

পুথিটা খোলে শিবরাম।

আশ্চর্য! এই কাব্য বাবার লেখা! কত সুন্দর হাতের লেখা। কত সুন্দর এর ছন্দ। ও পড়ে পুথিটা, জানতে পারে, আমার অনেক দিনের সাধ শ্রীক্ষেত্র দর্শন করার।

ভাবে আমার এই সাধ, ছেলে হয়ে সে কি পূরণ করতে পারবে?

সংসারের চিন্তা শিবরামকে ক্রমশ পীড়িত করতে থাকে। বাবা হয়ে আমি সেটা বুঝতে পারি। 'সোম-বৎসর' চাষ হয় না। জমিতে যা আয় হয় সবটুকুই চলে যায় সংসারের পেটে। সুখের মুখ কি আর কোনো দিন দেখা দেবে না আমাদের? জমির খাজনা বাড়ে প্রতি বছর। রাজার খাজনা, জমিদারের খাজনা দিতেই শস্যের সবটা চলে যায়। যজমানি করে দুমুঠো পেট ভরে ঠিকই, কিন্তু তাতে আত্মসম্মান থাকে না।

আমি সংসারের কাজে উৎসাহ পাই না। অথচ আমি সংসারী। সংসার করেছি।

আর মমতা বলে, তোমার মতো লোকের সংসার করা উচিত হয়নি।

আমি হাসি। এখন আর এসব বলে কি লাভ আছে। মমতাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় জড়িয়ে ধরি। আদর করি। পঞ্চানন কাছেই ছিল। সে প্রতিবাদ করে ওঠে। মায়ের লাগবে। সে বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

মমতাও অবাক হয়। ওর ভালো লাগলেও দিনের বেলায় আমার এমন উচ্ছ্বাস কখনো দেখে নি। অবশ্য বিয়ের দু-এক বছরের কথা স্বতন্ত্র। তখন ওর বয়স ছিল ষোলো, আমার চব্বিশ। কিন্তু এতদিনের মধ্যে, বিশেষ করে পঞ্চাননের জন্মের পরে এমন হয়নি কখনও। আমি সাধারণত সংযমী। আমার এই অসংযম খুব ভালো লাগে মমতার। কিন্তু পঞ্চানন আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, সরে যাও। আমার মা মরে যাবে।

—সাংঘাতিক ছেলে তো? আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু দেখছি। আমি পিছিয়ে আসি।

মমতার কপোল রক্তিম হয়ে ওঠে। বলে, ও কিন্তু এ দৃশ্য ভুলবে না জীবনে।

—বলো কী? তাই হয় কখনো?

—আমার অমন দৃশ্য মনে আছে দু একটা।

—সর্বনাশ।

—হঠাৎ এত পুলকের কারণ?

—পুলক তো সব সময়েই জাগে। মনে হল তুমি যেন আগের থেকে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছ। স্বপ্ন না ভ্রম নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে হল।

—আমি জানি।

—কি?

—হিংসে।

—কিসের হিংসে? কার ওপর হিংসে?

—আমার ওপর। পঞ্চাননের ওপর। তুমি দেখলে, আমরা দুজনে দিব্যি গল্প করছি, হাসছি। তুমি ভাবলে, তোমার কোনো স্থান নেই মা আর পুত্রের মধ্যে।

হেসে উঠি হো হো করে। তারপর বলি, একেবারে মিথ্যে বলনি। আমাকে তুমি আজকাল যে চোখে দ্যাখো, তাতে আমি ভাবতেই পারি যে আমাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

মমতা আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়। বলে, এবারে বলোতো তোমার উদ্দেশ্য কী?

—উদ্দেশ্য আবার কী?

—আবার কোথাও যাচ্ছ নাকি?

মমতার কথা শুনে থ হয়ে যাই। আশ্চর্য!

—কি করে বুঝলে?

মমতা হাসতে হাসতে বলে, বুঝতে পারি।

—একবার চণ্ডীবাটী যেতে হবে কয়েকদিনের জন্য। আমি জানি ওখানে যাওয়া তুমি পছন্দ করো না।

—তাই আদরে সোহাগে ভুলিয়ে কথাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলে।

—যা বলবে।

—তোমরা চিরকাল আমাদের খেলনা ভেবেই গেলে।

মমতাকে তাড়াতাড়ি বুকের কাছে টেনে আনি। বলি, না না, আমি ঠিক তা ভাবিনি। কদিন থাকব না, তাই তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছা হল।

কিন্তু মমতাকে কাছে টানতেই, পঞ্চানন এবারে আমার হাঁটু কামড়াতে চেষ্টা করে।

—নাঃ আমাকে অস্থির করে তুলেছে। পঞ্চাননকে কোলে তুলে নিই। ও যেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, এমন ভাবে চেয়ে আছে। তারপর বলে, মাকে আর মারবে না তো?

—আমি বুঝি কেবল তোমার মাকে মারি? ওকে আদর করি গাল টিপে। মনে মনে বলি, যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর কোনোদিন তোমার সামনে অন্তত মমতাকে কাছে নেব না।

মমতা পরমাসুন্দরী। ষোলো বছর বয়সে সে এবাড়িতে এসেছে। বাড়ির সবাই বলতেন, ও এবাড়িতে আসার পরই নাকি এবাড়ির সমৃদ্ধি বেড়েছে। মমতা তখন নেহাতই বালিকা। তবে ও রাশভারী বরাবরের। নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রিয়, আচার অনুষ্ঠানে শাশুড়ি দেবকীকে হার মানিয়ে দেয়। ভোর চারটেতে স্নান সেরে জপ করতে বসত। মালার লক্ষ গুটি সকালেই অর্ধেক সেরে রাখত। গোঁড়া নিরামিষাশী এবং ধর্মীয় আচারে নিজেকে এমনভাবে বেঁধে ফেলেছিল যে কি বলব। শেষে মাকেই বারণ করতে হল। তোমার এত অল্প বয়েস, এত কৃচ্ছ্রসাধন তোমার না করলেও চলবে।

ঘরের বাইরে আমার তখন অনেক কাজ। সদর আর অন্দরের ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বিবাহের পর প্রথম কিছুদিন বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অর্থ ব্যয় হচ্ছিল প্রচুর, তবে তালজ্ঞান হারাইনি কখনও। সংসার খরচের অতিরিক্ত টাকা বিনিয়োগ করে অর্থ উপার্জন হচ্ছিল ভালো। অতিরিক্ত সুদে আয় ভালোই হচ্ছিল। সমাজে টাকা ধার নেওয়ার লোকের অভাব নেই। বাবুগিরি করে অনেকেই টাকা ওড়ায়। মাঝে মাঝেই তাদের হাতে টান পড়ে। তারা হাত পাতত। এভাবে অনেক বাড়ির বিচক্ষণ মেয়েরা সংসার খরচের টাকা থেকে কিছু উপরি রোজগার করে থাকে।

লেখাপড়া জানা শিক্ষিত বলে, অনেকেই আমার সাহায্য নেয়। রাজস্ব-সংক্রান্ত দলিল বা তেজারতি দলিলপত্র অনেকেই মুসাবিদা করিয়ে নিত। তাতেও কিছু অর্থ যোগ হত। এছাড়াও অন্য পথে কিছু অর্থ উপার্জনের সুযোগ এসেছিল। দু-হাতে অর্থ উপার্জন না হলেও পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। দেনার দায়ে বিকিয়ে যেত বাস্তুজমি। ঢ্যাঁড়া পড়ত। নীলামের সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু জমিজমা সংগ্রহ করেছিলাম। পরে দেখলাম এ পথ আমার নয়। এ পথ ত্যাগ করলাম।

আমি লিখতে চাই, নতুন একটা দেশের কথা, একটা স্বপ্নের কথা। গ্রামের সকলে উপহাস করে। বলে আমার সব কিছুই উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু মানুষের সব কল্পনাই কি মিথ্যে হয়?

আমার মনে হয় আমার এই কল্পনাগুলো যদি সব সত্যি হত! যদি সত্যি করা যেত। কত ভালো হত তবে! আর সত্যি সত্যি যদি এমন একটা দেশ পাওয়া যায় যেখানে সবাই সুখে থাকবে। আচ্ছা এমন স্বপ্ন তো সত্যি হয় যে, মানুষ বাঘের বাচ্চার সাথে খেলা করছে? তার পিঠের ওপর চাপছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যত লিখি তত অবাক হই। যা মনে আসে তাই লিখি। সব-ই কি বানিয়ে লেখা? না কি এগুলো সব দেব-দেবীদের আদেশ? নিজেই বুঝতে পারি না।

—মানুষ কি কখনও দেব-দেবীকে নিয়ে ঘর করতে পারে?

কেন পারবে না? সে কোন্ অংশে কম? মানুষ স্বর্গের দেবতা নয় ঠিক। মানুষ বনচারী অরণ্যবাসী, চালচুলো নেই, কোনো কিছু নেই। এক জোট হয়ে তারা বন কেটে বসত তৈরি করছে। তারাই আবার রাজা হচ্ছে। এসব যে কী লিখছি আমি, কোথা থেকে এই গল্প আসছে কিছুই বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয়, একটা শক্তি আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এসব।

নিজের লেখা নিজে পড়ি। যত পড়ি ততই অবাক হই।

মমতা শিবরামকে বলে, আগে আবোল তাবোল কত লিখে কত টাকা পেয়েছিল তোর বাবা। ফরমায়েশ হয়েছিল রাজকাহিনি লেখবার। তা সে তোর বাবা লিখলেনই না। তোর বাবা বলে কিনা ওসব লিখে কী লাভ?

পুথির একটা জায়গা মমতা শিবরামকে দেখায়। এমন ভাবে দেখায় যেন গোপন কিছু দেখাচ্ছে। ফিশফিশ করে বলে, এই জায়গটা দেখ, কি লিখেছে তোর বাবা।

অধ্যায়টির পাতা খুলে চমকে যায় শিবরাম।

দেব কাহিনি। তার সাথে আছে দুর্গার অষ্টোত্তর শতনাম।

সে যত পড়ে, তত মোহিত হয়।

বাড়িতে তখন আলতা পিসি এসেছে। ওর কি নাম জানে না সবাই, আলতা পিসি বলেই সবাই ডাকে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের আলতা পরায় আলতা পিসি। কেউবা বলে পরামানিক দিদি, কেউ বলে পিসি কিংবা মাসি। প্রতি বৃহস্পতি ও পূর্ণিমার দিনে বিকেল বেলায় বাড়ি বাড়ি আলতা পিসি হাজির হয়।

'কই গো, বউমা' হাঁক শুনলেই বাড়ির মেয়ে বউরা বেরিয়ে এসে পা বিছিয়ে বসে পড়ে আলতা পিসির সামনে। আলতা পিসির মাথার খোঁপাটি দেখার মতো। চপচপ করে তেল দিয়ে টানটান করে চুল উলটে আঁচড়ায় আলতা পিসি। মাথার পিছনে তার বড়ার মতো খোঁপা কাঁটা দিয়ে বেঁধা থাকে। আলতা পিসির চেহারাটা বেশ সুন্দর। রংটাই কেবল চাপা। পিসির হাতে থাকে ছোট্ট একটা পিতলের বাটি, তুলি আর আলতার ঘটি। শিল্পীর মতোই চৌকস তাঁর হাতের আঙুলগুলো। অবাক হয়ে শিবরাম দেখে আলতা পিসি তুলির এক এক টানে আলতার লাল রং দিয়ে সুন্দর করে রাঙিয়ে দেয় মমতার পা। যশোদার পা। যশোদা এখন কিশোরী। আলতা পিসি বলে, "কি গো মেয়ে, আলতা পড়বে নাকি?"

যশোদা খুব খুশি। মায়ের পাশে বসে পরে, পা মেলে দেয়। আলতা পরা হলে মমতা যেমন হাত জোড় করে পিসিকে প্রণাম করে যশোদাও মমতার দেখাদেখি ঠিক তেমনি ভাবে প্রণাম জানায়। আমরা যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের অন্য কারো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা মানায় না। যশোদারও এসব জ্ঞান হয়ে গেছে।

এক বাড়িতে দুজন খদ্দের পেলে পিসির বাড়তি রোজগার হয়। কতই বা সে রোজগার। মাথা পিছু চার কড়ি। তবু সারা মাসে গোটা গ্রামে বিশ-পঁচিশ ঘরে আলতা পরিয়ে যা উপার্জন হয় তাতে তাঁর বেশ চলে যায়। পুজো ও অম্বুবাচির সময় চাল, কাপড় নিয়ে বেশ কিছু কড়িও পায়। আলতা পিসির অবশ্য অন্য রোজগারও আছে। আছে আঁতুড়, শ্রাদ্ধ বাড়ির কাজ। নখ কেটে দেওয়ার জন্য ডাক পড়ে তার। কপাল ভালো থাকলে এসময় আরো ভালো কিছু বকশিশ জুটে যায় কখনও কখনও।

তবে আলতা পিসির কাছে থাকে গোটাগ্রামের খবর। কোথায় কি হচ্ছে, কার বাড়িতে কি দিয়ে রান্না হয়েছে এসব হাঁড়ির খবর থাকে তার পেটের মধ্যে। তারই দু এক আঁজলা ইচ্ছে মতো প্রতি ঘরে বিতরণ করে বেড়ায় আলতা পিসি। এভাবেই এক বাড়ির হেঁশেলের খবরের সঙ্গে অন্য বাড়িকে সংযুক্ত করে দেয় পিসি। একদিকে আলতা মাখানো তুলি হাতে পিসির আঙুল এগিয়ে চলে যে আলতা পড়ছে তার পায়ের সীমানা ধরে, আর অন্যদিকে তার মুখও চলে সমানে। মুখের মধ্যে ভরা থাকে খিলি পান। সেই পানের রসের সাথে কথার রস মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বাড়ির বউ-ঝি'রা তা খুবই উপভোগ করে।

কঞ্চিবেড়ার ডাল ঘেঁষে ঝাপালো গাছগুলোকে বেঁধে দিই। কালচে সবুজ পাতার ওপর গর্দান উঁচু ডাঁটাগুলোতে বড়ো বড়ো গাঁদা ফুল ফোটে। তার পাশ দিয়ে সূর্যটা টুপ করে

ডুবে যায়। দু-রকমের হলুদ রঙের গাঁদা ফোটে। ঝিঙেফুলের হলুদ আর পরল ফুলের হলুদ, আবার গাঁদা ফুলের হলুদ। সব হলুদ কিন্তু এক ধরনের নয়।

গাছে গাছে ফুল আর পাতার ওপর রোদের রঙের গলাগলি। বারান্দায় শীতের নরম রোদের মাখামাখি, এর কদরই আলাদা। উঠোনে রোদ রয়েছে। সেই আলোয় রাঙা মমতার পাদুটো রাঙা কনে বউয়ের পায়ের মতো মনে হয়। আর যশোদার আলতা রাঙা পা দুটো মনে হয় যেন চণ্ডীর পা।

পারুল গাছটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে এসময় রোদ সব চাইতে বেশি। সব চাইতে বেশি সময় ধরে রোদ সেখানে থাকে। বিকাল হলেই ওখানকার গাঁদা ফুলের গাছগুলো আমগাছের ছায়ার তলায় ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে যায়।

এ সব স্পষ্ট করে দেখি আমি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। দেখি আর ভাবি। মনের অনেক তলায় এই সবকিছু দেখা আর ভাবনাগুলো হেলেদুলে বেড়ায়। গহিন মন তখন হয়ে যায় সামনের ওই পুকুরটার মতো।

ঠাকুরদার ঠাকুরদা কাটিয়েছিলেন পুকুরটা। গ্রীষ্মে সেটা মজা দ হয়ে যায়।

এই পুকুরটা কাটা নিয়েও একটা গল্প আছে। পুকুর কাটার জন্যে স্বপ্নে শিবের নির্দেশ পেয়েছিলেন ঠাকুরদার সেই ঠাকুরদা। পুকুরটা কাটতে কাটতে টুকরি ভর্তি মাটি তুলে তুলে এনে পাড়ে ফেলতে ফেলতে কামলারা সব অস্থির হয়ে উঠেছিল। তবু পুকুরে জল উঠছিল না কিছুতেই। পাড় থেকে তলা পর্যন্ত মাটি ছিল খটখটে শুকনো।

পুজো আর্চা শুরু হল। তবুও কিছুতে কিছু হল না। তখন সেই তস্য তস্য ঠাকুরদাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

তিনি আদেশ দিলেন, পুকুর পাড়ে মন্দির করে দে আমার। দিয়ে পুজো কর। তাহলেই জল উঠবে তোর পুষ্করিণীতে।

যেই মতো বলা সেই মতো কাজ হলো। পুজো করার পরের দিন ভোরবেলা পুকুর পাড়ে সবাই এসে দেখে, জল টলটল করছে। আর ঘাটে ভাসছে মস্ত বড়ো একটা সিন্দুক।

মহাদেবের ধন।

মহাদেবের ধন পেয়ে জমিজমা বাড়ি-ঘর ফল-ফসালির বাগান নিয়ে বড়োলোকের অবস্থা হয় ঠাকুরদার। আরম্ভ হয় ধুমধাম করে মহাদেবের পুজো। প্রত্যেক বছর তিন দিন ধরে মেলা জমে যায় শিবরাত্রির সময়ে। দলে দলে লোক আসে বাড়িতে। পুজোর আগের দিন সন্ধ্যার পর কলার খোলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সকালে পুকুরে ভেসে ওঠে সিন্দুক ভর্ত্তি পুজোর বাসনপত্র। বিশাল ঘট, টাটি, তাম্রপত্র, ছিপ-কোশ এই সব। ভোগ রান্নার জন্য বিরাট বিরাট পিতলের মালসা, কড়াই, হাতা খুন্তি সব থাকে। পুজো হয়ে গেলে সব বাসন মেজে ধুয়ে আবার সিন্দুকে ভরে পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। রাতারাতি পুকুরের তলায় চলে যায় সিন্দুক।

একবার এক চাকরানি বাসন মাজতে মাজতে লোভে পড়ে একটি বড়ো থালা সরিয়ে নিয়েছিল। তারপর সেই যে সিন্দুক ডুবল. আর একবারও উঠে আসেনি।

ঠাকুরের বাসন চুরি করে চাকরানিটি মরেছিল তিন রাত্রি পোয়ানোর আগেই।

মার কাছে এসব গল্প শুনেছি।

শুনেছি ভর দুপুরে যখন লোকজন থাকে না ফাঁকা ঠাকুর ঘরে কারা যেন ফিশফিশ করে কথা বলে। ভালো করে সন্ধে নামার আগেই ওই ঘরের ভিতরগুলো অন্ধকার হয়ে যায়। সেজের দাম বেড়েছে বলে মমতা ইচ্ছে করে দেরি করে দীপ জ্বালায়।

আমি এসব বুঝতে পারি।

লক্ষ্য করি ইদানীং মাথার থেকে ঘোমটা পড়ে গেলেও মমতা সেটি ত্রস্ততায় তুলে দিতে ভুলে যাচ্ছে। দুঃখী পরিবেশ আর বয়সের দাঁতাল চাপে মমতা'র গোটা শরীরে হাড় মাংসের বিচিত্র সব ভূগোল দানা বাঁধছে।

ওদিকে মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না। রোজ শিবরাম আর যশোদার বায়না, গল্প বলো। রোজ রোজ এক বায়না। ঠাকুমার কাছে ভাই বোন রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। পঞ্চাননও থাকে তবে সে তখন ঘুমিয়ে কাদা। দেবকী কাঁপা কাঁপা হাতে ওদের ভালো করে শুইয়ে ঢেকে দেন।

সংসারে অভাব তো নিত্যসঙ্গী। স্বস্তি নেই। হাতে কোনোও কাজ নেই। সংসার টলোমলো, কাজের খোঁজে যাব, কোথায় যাব, কিই বা করব। বুঝে উঠতে পারি না। টাকা যাদের দাদন দিয়েছি তারা বাড়ির দিক মাড়ায় না।

এমনি একদিন মাথা গরম করে বের হয়ে গেলাম কাউকে কিছু না বলে।

সংসারে কি বিরক্তি এসে গেল?

অভাব থাকলেই মাথা গরম হয় বেশি। রাগে ক্ষোভে মা দেবকীও একদিন মমতা'র ওপর রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। যশোদা মমতার সাথে তখন ঘরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছিল। দেখল ঠাকমা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখল শাশুড়ি আর বউয়ের মেজাজ কেমন বিগড়ে আছে।

সংসারে এটা নেই, ওটা নেই, ছেঁড়া কাঁথার মতো ফুটো চারদিকে। কোথায় সেলাই করবে। তবু দেবকী দিনরাত সুঁচ সুতো নিয়ে পড়ে আছেন।

দেবকী যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, বেড়ার বাঁশের খুঁটির মাঝখানের কোনো ফোকর থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। তক্ষকেব ডাকটার একটা সুর আছে ক্ক-ক্ক-ক্ক। সুরটা বুঝিয়ে দিল যশোদাকে যেন তাবও কষ্ট হচ্ছে ঠাকমার এই বেরিয়ে যাওয়া দেখে। সন্ধের মুখে দেবকী বেরিয়ে গেলেন।

তক্ষকের ডাক শেষ হতে না হতে বাইরের গাছগাছালিতে ঝিঁঝিঁ রা গান ধরল। যশোদা লক্ষ্য করল আবছা অন্ধকারে মমতা-র লালপাড় শাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঠাকুরঘরের ভিতরে। অন্যদিন ঠাকমা তাকে সন্ধে দিতে বলে। মায়েরও রাগ হয়েছে। নিজেই সন্ধে দিচ্ছে।

তার কপালে চিন্তার ভাঁজগুলো কেটে বসে যায়। আগে হলে বুঝতে পারত না এইসব ব্যাপারগুলো। কিন্তু আমি বাড়ি নেই। মমতা'র উপরই গোটা সংসারটা চেপে বসেছে তাই মমতার চিন্তার কারণগুলো কিছুটা বুঝতে পারে যশোদা।

আমি গেছি কোনো কাজের সন্ধানে। সন্ধে হয়ে এসেছে। যশোদা মনে মনে ভাবে, আজ

যদি আমি ফিরে আসি খুব ভালো হয়। অন্ধকারে আমি বাড়ি ফেরার পথে যদি সাপের গায়ে পা দিয়ে ফেলি, এই ভয়ে যশোদার গায়ের লোমগুলো একটু একটু করে খাড়া হতে থাকে। অন্য দিন সন্ধে দেবার পর ঠাকমার পাশে গিয়ে স্থির হয়ে বসে যশোদা। গিয়ে ঠাকুমার পেটের কাছে মাথাটা সেঁধিয়ে দেয়। ঠাকুমার শাড়ির ভাঁজ থেকে পান-চুন-সাদা খয়েরের, আউশচালের মিষ্টি ভাতের এবং ধোঁয়ার এক মিশেল গন্ধ নাকে টেনে নেয়। গন্ধটা যে কি ভালো লাগে তার! যশোদার মাথায় হাত বুলিয়ে গল্প শোনায় তখন মা দেবকী।

বলেন, পশ্চিমের ভিটা, উত্তরের ভিটা, যেগুলো এখন শুধু ঢিবির মতন পড়ে আছে, সেখানে আগে বিরাট বিরাট চৌচালা ঘর ছিল। বাড়ি ভর্তি লোক গিজিগিজ করত। সেই কবেকার কথা। যশোদার জন্মনোর বহু বহু বছর আগেকার কথা। শিবের দেওয়া ধন আর পুথি লেখাব আয়ে সোনার সংসার ঝলমল করে। প্রতিটি দিন যেন পালা-পার্বণের দিন মনে হয। গল্প শুনতে শুনতে যশোদা ঘুমিয়ে পড়ে। আজ যশোদার ঘুম আসবে না কিছুতেই। তার প্রিয় ঠাকুমা আজ বাড়ি নেই।

ঠাকুমা রাগ করে চলে গেছেন। কোথায় গেছে জানে শিবরাম। এও জানে ডাকতে গেলে, ঠাকমা আসবেন না। ঠাকুমা বড়ো জেদি। এ বাড়িতে ঠাকুমারও এক দিন গেছে। আজ বয়স বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়েছে রাগ। ক'দিন পরে সেই রাগ কমে যাবে। ঠাকমা আবার গুটিগুটি পায়ে বাড়িতে এসে ঢুকবেন।

মমতা তখন কচি বউ হয়ে এবাড়িতে এসেছে। ঠাকুমা, জেঠিমারা মিলে রান্না করতো সকাল থেকে। মমতা ছোটো বলে চাল ডাল ধুয়ে আনা, তরকারি কেটে দেওয়া, এ সব পাতলা পাতলা কাজ করত। কে কতটা ভাত খাবে, আন্দাজ করা মুশকিল হতো। এককে দিন এমন ভাত টানত সকলে যে আবার ভাত চাপাতে হতো। টোকুই (চাল ধোওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়) ভরে চাল নিয়ে পুকুরে আবার গিয়ে ধুয়ে আনতে হয় মমতাকে। ভিজে চালের ওজন বইতে বইতে মমতার হাত দুটো ব্যথায় টনটন করে।

সন্ধেবেলায় মাছ ভর্তি খালুই হাতে নিয়ে এসে উঠানে দাঁড়ায় কিরষেণ বিরাজদাদা। মমতা লম্ফ জ্বালিয়ে খালুই ভর্তি মাছ রান্না ঘরের দাওয়ায় লেপা মাটিতে উপুড় করে ফেলে। তারপর একমুঠি আকার ছাই নিয়ে বঁটি ফেলে মাছ কাটতে বসে। লম্ফের ক্ষীণ লালচে আলোতে মমতার ফরসা অবয়ব, দ্রুত সঞ্চলমান হাত আর কম আলোতে চকচক করা মাছগুলো সব মিলিয়ে একটা পটে আঁকা ছবির মতো মমতাকে অদ্ভুত দেখায়।

কতদিন যশোদাকে সন্ধেবেলায় ঢুলতে দেখে মমতা মাছ কাটতে কাটতেই বলেছে, বাবা লক্ষ্মী সোনা আমার ঘুমোয় না।

এক্ষুনি মাছ ভেজে দেব.......।

যশোদা তবু ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমন্ত যশোদাকে বসিয়ে মুখ হাঁ করিয়ে এক দুই গরাসের বেশি ভাত খাওয়াতে পারে না মমতা। পঞ্চানন ঘুমিয়ে পড়ে।

মা যেভাবে হঠাৎ একদিন চলে গিয়েছিলেন। সেভাবেই হঠাৎ একদিন ফিরে এলেন। পোঁটলা পুঁটুলি রেখে কোনো রকম ধুঁকতে ধুঁকতে দাওয়ায় ধপ করে বসে পড়লেন। একটু

জল চাইলেন কাউকে উদ্দেশ করে। মমতা তখন খেতে বসেছে। উত্তর করলে, দেখছ না, খাচ্ছি। জল নিজে নিয়ে গড়িয়ে খাও।

দেবকী নিজে এলেন জল গড়াতে। লক্ষ্য করলেন মমতা খাচ্ছে। অনেকদিন তাঁর ভাত খাওয়া হয়নি। চাট্টিখানি চাল জোগাড় করে নিয়ে এনেছেন ফুটিয়ে ভাত খাবেন বলে। সবাই যাতে দুমুঠো খেতে পায় তাই চাল বাড়ি নিয়ে আসা। অথচ বাড়ি এসে দেখছেন মমতা খাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের নিশ্চয় খাওয়া হয়ে গেছে। মমতাকে খেতে দেখে, গড়ানো জল তাঁর আর খাওয়া হয় না।

এই সব ঘটনায় দুপুরবেলা ভাত খেয়ে মহদেবের ধন পাওয়া পুকুরের পাড়ে বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে যায় শিবরাম। শীত চলে গেছে। আম গাছটায় বোল এসেছে। গাঁদা ফুলগুলো কেমন যেন রোদের আঁচে ঝলসে গেছে। পুকুরের জল শ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একটুও নড়াচড়া করে না। গহিন পুকুরের তলায় হয়তো তখন মাছেদের সভা বসেছে। বিশাল বিশাল অতি প্রাকৃত মাছেরা তখন বিচার করার নামে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। তারা বিশ্রাম সেরে নিচ্ছে। ওদের দিবা নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে বলেই জল এমন নিথর হয়ে রয়েছে। এরপর মাছেরা সারা রাত জাগবে।

একবার মমতার ছোটো ভাই এসেছিল। শিবরামের মামা। মামার বাড়ি সকলেরই থাকে। কিন্তু এরকম মামা সকলের ভাগ্যে জোটে না। শিবরামের প্রায় সমবয়সী। যে ক'দিন থাকত এখানে হুলুস্থুল ফেলে দিত। মমতার আদর পেয়ে ও আব শিবরাম দুজনে একসাথে শুতে যেত আমার মায়ের কাছে।

ভোর না হতেই শিবরামকে ডেকে নিয়ে যেত চল, ড্যাংগুলি খেলব। শিবরামের আবার ড্যাংগুলি খেলার চেয়ে তির-ধনুক নিয়ে শিকার শিকার খেলতে বেশি ভালো লাগত। হয়তো রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনাব ফল। মামা ভাগনে দুজনে মিলে বাঁশের কঞ্চি কেটে তির ধনুক বানিয়ে নিত। বেলা বাড়লে একটু দূরে অভিযান। বাগদি পাড়া থেকে নদীর ধারে বড়োঘাটে যেতে মাঝে পড়ে মনসাডাঙা। ছোটোখাটো জঙ্গলই বলা যায়। বনশুয়োর আর শেয়ালে সেখানে দাপিয়ে বেড়ায়। দিনের বেলায় আড়ালে, কিন্তু সন্ধ্যা নামলে দাপটে। শিবরাম একটু পিছনে, মামা আগে আগে সেই মনসাডাঙার মাঠ ভেদ করে একদিন এগোচ্ছে, হঠাৎ গা ছমছম করা একটা 'ফোঁস' আওয়াজ শুনে থমকে গেল শিবরাম। মামা কিন্তু থামেনি। তীব্র বেগে এগিয়ে একটা প্রায় চার-পাঁচ হাত কালো সাপের লেজ ধরে নিমেষে সেটাকে মাথার উপর তুলে নিয়ে বনবন করে ঘুরিয়ে শূন্যপথে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।

বলল, কেউটে। তবে এখনো বড়ো হয়নি। বড়ো হলে ব্যাটা বাঘের বাচ্চা হবে।

তারপর অভিভাবকের কণ্ঠে বলে, শোন আমি সঙ্গে আছি তাই। কখনও একা একা এখানে আসবি না।

শিবরামের তখন তির-ধনুক খেলা হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফেরার পথে দেখে বাড়ির পাশে বড়ো আমগাছটায় একদল হনুমান উঠেছে।

মামা শিবরামকে বলে, যা দুটো আনাজ নিয়ে আয় তো।

শিবরাম রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঝুড়ি থেকে দুটো পটল নিয়ে এসে মামাকে দেয়।

মামা সে দুটি হাতে নিয়ে হনুমানদের দেখায়। সঙ্গে সঙ্গে গোটা দশেক পোড়ামুখো হনুমান আলম্ব লেজ তুলে গাছ থেকে নেমে আসে। নির্ভয়ে মামা দুটি হনুমানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। সবেগে থাবা মেরে পটল দুটি তারা নিয়ে যায়। কিন্তু এরপর যেটা হল সেটা অবাক করা কাণ্ড। বাকি হনুমানদের একজন এগিয়ে এসে দুহাতে মামার চুলের মুঠি ধরে নাড়িয়ে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে কিচিরমিচির শব্দ করতে করতে আমগাছে ফিরে গিয়ে উঠে বসল। পরে মামার উৎসাহে শিবরামও হনুমানদের আনাজ খাইয়েছে, তবে দূর থেকে ছুড়ে ছুড়ে।

সেই মামাকে খাওয়ানোর জন্য পলুই নিয়ে মাছ ধরতে নেমেছিল বিরাজদাদা। বারবার ডুব দিয়েও ধরতে পারছিল না একটাও মাছ। তখন বুক ভরে শ্বাস টেনে লম্বা একটা ডুব মেরেছিল। আরপর বিরাজদাদা আর উঠছিল না। পাড়ে সবাই খুব চিন্তা করছিল। বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর ভেসে উঠেছিল বিরাজদাদা। তখন তার কোঁচড়ে ভর্তি কইমাছ। আর একটা কচ্ছপ।

মাঝ পুকুরের একদম তলায় গিয়ে বিরাজদাদা নাকি দেখেছিল চারদিক আলোয় ভরে আছে। আর তার মাঝখানে বসে আছেন মহাদেব। এই বড়ো তাঁর জটা মাথায়, আর গলায় দুলছে সাপ। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাছ। কয়েকটা মাছ এত বিশাল আকৃতির যে তাদের গায়ে ভালুকের মতো লোম বেড়িয়েছে। বিরাজদাদা তো ভয়েই অস্থির।

তাকে অভয় দিয়ে মহাদেব তখন ডেকে বললেন, ভয় পেছিস ক্যানে? তু তো আমার কাছেই এসেছিস। আমিই তো তোকে ডেকে আনতে বললাম। এবার যা, মাকে গিয়ে বলবি আমার পুজোয় যেন খুব ধুম হয়। আর হ্যাঁ ভাসুরকে আমার প্রসাদ দিতে বলবি, সে বেটা আমার জন্য খুব কাঁদে।

প্রসাদ পাঠানোর আগেই বড়ো জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর খবর এসেছিল কাশী থেকে। অশৌচ পালন হয়নি, শ্রাদ্ধ শান্তি হয়নি। সব মিটে যাওয়ার পরে খবরটা এসে পৌঁছেছিল। মমতার আক্ষেপের শেষ ছিল না। খুব কেঁদেছিল।

পুকুর পাড়ে মহাদেবেব মন্দির। তার পাশে বিশাল বেলগাছ। ভৈরবের বাস সেখানে।

জ্যোৎস্না রাতে তালগাছ সমান লম্বা দুটি পায়ে খড়ম পরে তিনি হেঁটে বেড়ান পুকুর পাড়ে। অনেকেই দেখেছে। গভীর রাতে তাঁর খড়মের খটাশ খটাশ শব্দ শোনা যায়। সেই শব্দ শুনে বিরাজদাদারা ছোটোবেলায় বেড়ার ফাঁকে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত-মস্ত লম্বা ধপধপে ফরসা চেহারার এক পুরুষ পাড় বরাবর হেঁটে চলেছেন। গোটা পুকুরটা একবার ঘুরে আসতে তার সময় লাগে কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তাঁর বুকের লোমের উপর তেরছা হয়ে জ্বলজ্বল করে মোটা একটা উপবীত।

দুপুরবেলা বিরাজদাদার মুখে ভৈরবের গল্প শোনা পুকুরটাকে দেখে শিবরাম।

না পুকুরের জলে একটিও মাছ ঘাই মারছে না। মাছেরা নির্ঘাত মাঝপুকুরে একেবারে

তলায় মহাদেবের পায়ের কাছে নিশ্চিত আশ্রয়ে কিলবিল করে খেলা করছে। বেড়ার পাশে গাঁদা ফুলগুলোও যেন মাথা দোলাচ্ছে সায় দিয়ে।

আমি ঘরে ফিরি। আমার পরনের বস্ত্র তখন ছিন্ন, গালের ওপর অনেক দিনের না কামানো দাড়ি আর মাথায় এক ঝাঁক বাবুইয়ের বাসার মতো চুল। দেখে মনে হয় যেন জঙ্গল থেকে একটা গাছ হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভিতরে।

আমি ফিরে এসেছি ঠিক কিন্তু আমি তখন এজগতে নেই। আমি আছি তখন আমার নিজের অন্য এক জগতে।

মমতা দেখে বলে, ওমা তুমি কখন এলে? বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে শরীরে একি দশা করেছ?

—কেন আমি কি মুনিশ খাটতে গেছি নাকি? নাকি জমিতে ধান কাটতে গেছি? আমার তেজি উত্তর শুনে মমতা দমে যায়। গলা নামিয়ে বলে, সাত রাজ্যের গু-গোবর মাড়িয়ে সটান চলে এলে দাওয়ায়? যাও আগে ডোবায় হাত-পাগুলো ধুয়ে এস।

হাত-পা ধুয়ে এসে বসি। মমতা আর কিচ্ছু বলে না। আমিও কিচ্ছু বলি না। যশোদা হাড়ের চিরুনি নিয়ে এসে আমার মাথার চুল ঠিক করে দেয়। দেখি ও একটা পাথরের তৈরি পুঁতির মালা পরেছে।

শিবরাম জানে আমি এরকম দুদিন চুপ করে থাকব। তারপর আবার কথা শুরু হবে।

মমতা শিবরামকে বলে, তোর বাবা যা লিখছে এ সব তো স্বপ্নের কথা! সত্যি না হলে তো স্বপ্ন স্বপ্নই। আশ্চর্য কী জানিস, ব্যাধের রাজা হয়ে ওঠার কাহিনি-এতো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। রাজা বাদশাকে অস্বীকার করা। এতে রাজরোষ তৈরি হবে। এ সব প্রকাশ করা চলবে না। গোপন রাখতে হবে, নয় নষ্ট করে ফেলতে হবে। নইলে ঘোর অনিষ্ট হবে।

—কি বলছ মা? না না নষ্ট কোরো না।

শিবরাম আর্তনাদ করে ওঠে।

মমতা বলে, এই জন্যেই মানুষগুলো চুপচাপ আসে। চুপিচুপি কথা বলে, চলে যায়। পুথি কেউ নিতে চায় না।

—কিন্তু এ তো গল্প। এমন স্বপ্ন হয় নাকি? শিবরাম মমতাকে বোঝাতে চায়।

মমতা চুপ করে থাকে। হয়তো ভাবে ছেলেকে কি বলবে আর। হয়তো ভাবে ছেলেও কি বাবার মতো হয়ে যাচ্ছে নাকি?

শিবরাম মনে মনে শিহরিত হয়। বাবা কি তবে রাজদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছেন? বাবা চণ্ডীকে স্বপ্নে পান। প্রায়ই স্বপ্নে দেখা দেন চণ্ডী। তাহলে বাবা কি ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন কোনোও পুরুষ?

গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত এই ঋতুচক্রের ছক কষে দিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁরা যদি এই সময়ে থাকতেন তাহলে নতুন করে আবার ছক কষতে বসতেন ঋতুচক্রের। কারণ বর্ষার আসা-যাওয়া আর সময় ধরে চলছে না। এখন কালবৈশাখীতেও ব্যাপক অনিয়ম, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের সন্ধ্যাতেও দেখা দেয় সে। আর গরমে ঝলসে যায় আষাঢ়, শ্রাবণে আসে মেঘ ঘনঘোর ডম্বরু বাজিয়ে। তারপর আসে ভাদ্র ভরা বৃষ্টিতে কূলভাসানো জল নিয়ে।

শেষ আশ্বিনে বর্ষা আসে আরো একেবার কাশফুল ফোটার সময়। ঋতু বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্ষা যখনই আসে, আসে নতুনত্বের স্বাদ নিয়েই। সে স্বাদ সবার কাছে এক নয়। আমার কাছে তো নয়ই।

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর ।।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ।।

একটানা বৃষ্টি গ্রামকে সজাগ করে দেয়, গ্রামের পাশে তুচ্ছ হয়ে থাকা খালটার রূপও যখন নদীর মতো হয়ে ওঠে, সবাই চায় জল এবার থামুক। জমি ডোবা জল এটাই কাঙ্ক্ষিত গ্রামেব মানুষের কাছে। তারা চায় কেবল হলকর্ষণের দিনে বর্ষা আসুক স্বাভাবিক নিয়ম মেনে। তারা চায় না বর্ষার প্রলয়ংকরী রূপকে। কেবল পুকুর যেন নতুন বৃষ্টির জলে ভরাট হয়ে যায়। যেন উপচে না পড়ে। উপচে পড়লে অনেক মাছই ভেসে যাবে। ক্ষতির আশংকা থাকে সেখানে। একটানা বৃষ্টি হলেই পুকুরপাড়ে একদল মানুষ হইহই করে বের হয় মাছ ধরতে। ওই সময় জল ছেড়ে উঠে আসে মাগুর, কই, শোলের মতো মাছ। একটা নতুন আনন্দ একটা উপরি পাওনা যেন এই বর্ষায়।

বৃষ্টি, সৃষ্টির উপাদান হয় যেমন চাষির কাছে তেমনই আমার কাছেও। এক সময় আমিও তামাটে শরীরে বর্ষার নতুন জলে ভিজতে ভিজতে লাঙলের শানে জমি তৈরি করতাম চাষের জন্যে। ভোর না হতেই এক জমির এক পর্যায় সেরে আরেক জমিতে চলে যেতাম। কোথাও জমি তৈরি, কোথাও জমি থেকে জল বের করে দেওয়া। চাষের কাজ না থাকলে, লিখতে বসতাম। বর্ষা আমার কাছে বাস্তবের অনন্য উপাদান। হাঁচি, কাশি, সর্দি, জ্বর এসব তো আছেই। গ্রামের আলপথ থেকে সরু মেঠো পথ। খড়ের চালা থেকে ঝড়ে পড়া লাল খয়েরি জল, গোরুর পায়ের ছাপ, গোরুর গাড়ির চাকার দাগ, খড়পচা, গোবর সব মিলে কদাকার দৃশ্য। গ্রামের ছেলে-মেয়ের দল তার উপর দিব্যি দাপিয়ে বেড়ায়। এক চুল হড়কে না গিয়ে বৃষ্টির মতনই তীক্ষ্ণভাবে পিছল পথে তারা এগিয়ে যায়। চাষি সংবৎসরের খোরাক তুলে নেয় এই বর্ষা থেকেই।

সবাই বলে সারা বছরের খিদে মেটায় নাকি মাটি। কিন্তু পুরোটা তো মাটি নয়। জল আছে, তাই জলের আর এক নাম জীবন। তাই আকাশ ভরসা, ভরসা বর্ষা। রুক্ষ মাটিতে বর্ষা যখন প্রথম আসে। তখন অবাক লাগে, যেন তপ্ত ধাতুতে জলের ছিটে লাগছে। সেই তপ্ত মাটি আস্তে আস্তে নরম হয়। মানুষের সারা বছরের তৃষ্ণা মেটাতে মাটি সব জল শুষে নেয়। মাটিতে বিঁধে যায় লাঙলের ফলা। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়। ধরায় বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। বীজতলা তৈরি হওয়ার পর মাঠে যখন চারা পোঁতা শেষ হয়, তখন কৃষকের মন চায় এবার বর্ষা নামুক লাগাম দিয়ে। বেহিসেবি যেন না হয়। সব যেন ভাসিয়ে না দেয়। কিন্তু অনেক প্রতীক্ষার পর যার আসা, সেও কিন্তু সবাইকে খুশি করে না। অনেককেই কাঁদায়।

বর্ষার জলে সব ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে যায় অনেক মাটির ঘর-বাড়ি। ভেসে যায় সবুজ

শ্যাওলায় কালচে হয়ে থাকা গ্রামের এঁদো ডোবাগুলো। তবু বর্ষা মঙ্গল। ইতিউতি জমে থাকা বৃষ্টির জলে আঁশটে গন্ধ। মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বলে। ফের যদি আসে আর এক দফার বৃষ্টি। ভাসে জমি, ভাসে বনভূমি।

সেই বর্ষায় তৈরি হয় নতুন ছবি। গ্রীষ্মে আসা গাছের নতুন পাতা বর্ষার জলে ধুয়ে হয়ে ওঠে হালকা থেকে গাঢ় সবুজ। ঝরে পড়া শুকনো পাতার উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ নতুন গান বাঁধে। লক্ষ পাতার ফাঁকে বৃষ্টি ধারায় নতুন নতুন শব্দ জেগে ওঠে। মেঘমল্লারে ভেসে আসে সঙ্গীত, এ শব্দ হল শুভ শব্দ। এমনি করে গাছের ডালে লাগে নতুন রং। ঝিরঝিরে বর্ষায় বনের মধ্যে আলো আঁধারির খেলা জমে ওঠে। বুনো ফুলের দল আনন্দে পাঁপড়ি মেলে। জুঁই, কাঞ্চন, মাধবীলতা, হাসনুহানাদের নাচানাচি শুরু হয়। ক্রমাগত ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝিঁ পোকার কান্নায় জমে ওঠে অরণ্যের গান। সে গান আর ব্যাঙের কলতান না শুনলে বর্ষা যেন পূর্ণতা পায় না। বর্ষা হয় তখন প্রকৃতির সেরা দান, এর দৌলতেই সমৃদ্ধি আসে ধরায়।

আকাশজুড়ে বিরাট রামধনু। নদীর পাড় বরাবর গোধূলির বিস্তৃত মায়া। পাতার কুটিরে নারী, পুরুষ ও শিশুর বাস। দূরে আকাশের কোণে অশনির আনাগোনা। দূরে কোথাও তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ থেকে নেমে আসছে ধবল দুধের ধারা। নদীর এপারে গোধূলির রং। ওপারে ওই দূরে গাঁয়ের সীমানায় বৃষ্টি। বর্ষণসিক্ত নারী-পুরুষ ছেলে মেয়ের দল। সামান্য সম্বল তাদের মৃৎপাত্র, পশুর চামড়ার অংশ বিশেষ শিশুটির শরীরের বল্কল, আর সামান্য আহার্য নিয়ে অন্যত্র উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ পুরুষটি ভোলেনি প্রিয়তমার জন্য সংগ্রহ করা অজিনটির কথা। এ যেন সেই প্রাচীন মানব মানবীর জীবন। খুবই সহজ আর স্বাভাবিক এই দৃশ্য। গ্রাম নগর সভ্যতা কিছুই গড়ে উঠেনি। মানুষ ব্যবহার শেখেনি আগুনের। আছে ভয়, খিদে, জিঘাংসা আর নারী ও পুরুষের বক্ষপুটে বিস্তৃত প্রেম। সামান্য খুব সামান্য জীবনের সঞ্চয়। তবু ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু প্রকৃতির দয়ায় এখানে ওখানে সেখানে- এভাবেই গড়ে উঠেছে সভ্যতার শরীর। নদীকূল বরাবর।

নদী, নদীর পাড়ে বাস তাই ভাবনা বারো মাস। কিন্তু হাজার বছর আগে বা তারও কিছু আগে প্লাবনের ভয়, ভাঙনের ভয় ছাপিয়ে মানুষ আবিষ্কার করেছিল কৃষিকর্মের উপাদান। নদীর ধারেই কৃষিকর্ম। নদীর ধারেই জীবন। শেষে নদীই হল জীবন।

তখন গান বাঁধল মানুষ। আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে। আমুদে নাওয়ের মাঝি তার ভাষায় ও সুরে গেয়ে উঠল।

ও আমার গহিন জলের নদী—।

নদীর ধারে জমি। কৃষকের হাতে পাথরের বা হাড়ের নিড়ানি। চারদিকে ধান, তিল, তিসি দুলছে মাঠে ঘাটে। প্রকৃতির দান মাটির উপরে অজস্র মণিমুক্তো ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমার চোখের পাতায় নিদ্রাদেবী ভর করেন। স্নান করে এসে নৌকোয় চেপে বসেছি। বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম যখন ভাঙল। দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে এসেছি। খেয়া পার হবার সময় আমি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছি। ঘাটে নৌকো ভিড়লে শিবরাম আমাকে ঠেলে তুলে দিল। দেখলাম, হাতবাক্সটা নেই। সেটা কি খোয়া গেল? নাকি নৌকায় ওঠার

সময় ঘাটে ফেলে এসেছি? মনে পড়ে না। খেয়াপারানির কড়িটিও এখন কাছে নেই। যা কিছু লিখেছিলাম সব হারালাম। ঘাটের বুড়ো বটগাছটির তলায় গিয়ে বসি। এরকম হয় কেন আমার? বসলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু বসার অবসর নেই। হাঁটতে হবে। চরৈবতি চরৈবতি।

গঙ্গাদাস আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। গঙ্গাদাসের সাহায্যে নারায়ণ, পরাশর নদ পার হয়ে কুচুট নগরে এসে পৌঁছেছি। সঙ্গের আহার সামগ্রী যা ছিল সব শেষ হয় গেছে এখানে। শিবরাম যশোদার মুখ শুকিয়ে গেছে। খিদের জ্বালায় এখন তারা কান্নাকাটিও করে না। কিন্তু ওদের দিকে আমিও আর দৃষ্টি দিতে পারি না। খারাপ লাগে।

কি করব আমি।

মাথার গামছা খুলে ঘাম মুছি। আকাশ থেকে খসে পড়া বুড়ো পটের ছায়া বড়ো হতে হতে হনহন করে মাঠ পেরিয়ে নদীর ঘাটের কাছে এগিয়ে এসেছে। সেই কোথা একলক্ষীর হাট, পাঁচ ক্রোশ রাস্তা ভাঙতে সন্ধে। গেলে ফিরে আসতে রাত হয়ে যাবে। যা থাকে কপালে 'জয় মহাদেব' বলে উঠে পড়ি।

গাজনডাঙা পার হয়ে মেটেলের মাঠে নামি। দেখি সারাটা প্রান্তর জুড়ে সবুজ গালিচা পাতা। ধানের গাছগুলো হাওয়ার তালে তালে সাপের ফণার মতো নাচছে। সূর্যের নরম আলো আলের পাশে পাশে ভেঙে পড়ছে। এ হচ্ছে সাবেক কালের সেলিমাবাদ পরগনা। প্রায় জঙ্গল, কোনো বসতি নেই। বেদে-বেদেনি অস্থায়ী ডেরা বেঁধেছে। ছেলে মেয়েগুলো দেখতে বেশ সুন্দর। কেউ কেউ সাপ ধরেছে। শুধোলাম, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

বললে, উত্তরে।

মাঠ পার হয়ে বাগদিপাড়া, নাপিতপাড়া, বামুনপাড়া, কায়েতপাড়া মায় মুসলমানপাড়া কেউ কারও গায়ে গায়ে লেগে নেই। সব ছাড়া ছাড়া। মাঠ, পুকুর কিংবা খাল এক পাড়া থেকে আর এক পাড়াকে আলাদা আলাদা করে রেখেছে। এখানকার মুসলমানেরা নাকি ক'পুরুষ আগেও হিন্দু ছিল।

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয় ঘর বাড়ী,
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরে লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান,
পশ্চিম দিক্ বীর দেয় তারে ॥
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজি,
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিম পটী বসাইল হাসনহাঁটী
এক মুদ্-নী গৃহ বাড়ী ॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পগম্বরে,
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥

দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিসান ॥
বড়োই দানিসবন্দ, কাহাকে না কয়ে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপি মাথে,
ইজার পর্-য়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি ॥
আপন টবর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া,
ভুঞ্জিয়া ত গায়ে মুছে হাত।
সুর লোহারি পানী, কুড়ানি বটুনি হুনি,
পাঠান বসিল নানামত ॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি,
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেয় মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান
মখদম পড়ায় পঠনা ॥

যখন সেই গড়মান্দারণে কতলু খাঁর রাজ্যপাট তখন থেকেই এরা সবাই মুসলমান। চোখের সামনে পিরেরডাঙা। নামটা পিরেরডাঙা হলে কি হয়, এটা পিরের মাজার। ফকির আলির নাতিপুতিরা এই মাজারের হকদার। ফকির আলির কোনো পূর্বপুরুষ বেহেস্তে যাবার পর তার কবরে একটা সাপ বাসা করেছিল। মুসলমান মহিলারা সাপকে ছদ্মবেশী জিন মনে করে। সাপকে তারা পীরের মতো জ্ঞান করে। তারা বিশ্বাস করে প্রতি গৃহের নীচে 'বাস্তু সাপ' আছে।

প্রতি বৃহস্পতিবার পিরের মাজারে দশ গ্রামের মানুষ শিন্নি চড়াতে আসে। তেলেভাজা পাঁপরভাজা কিনে পিরপুকুরের জলে মুড়ি ভিজিয়ে খায়। চারপাশে ছড়ানো মাঠের মাঝখানে দেড়-দুশো বিঘে ঝোপঝাড় ভর্তি উঁচু ডাঙা। লোক বলে রাজার গড়। আগে

এখানে রাজবাড়ি ছিল। এখন শুধু খোলামকুচি। সে যাই হোক পিরপুকুরে পাতাল কুয়ো আছে। পাতাল কুয়ো মানে একটা বড়ো পুকুর। পুকুরের মাঝে একটা বড়ো কুয়ো আছে। এর সঙ্গে নাকি পাতালের যোগ আছে। পির বাবার নাম করে এই পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করলে শরীরের খোশপাঁচরা চুলকানি সব একদম সাফ!

পিরের মাহাত্ম্য বলে কথা!

চুন, সুরকি আর ছোটো ইটের গাঁথনি, রাজার দালানের ভগ্নাবশেষ। এখন জবরদখল পিরেরমাজার। অবশ্য একথা কেউ অস্বীকার করে না।

বলে, হেই রাজার বাড়ির নোকই তো পির-ফকির হয়েছে বাবা।

এদিকে পিরের ডাঙার পাশেই হিন্দুদের দেবীর আস্তানা, সে দেবী আসলে চণ্ডী।

বাঙালি আদতে ইতিহাস বিমুখ, মাটির তলায় কি আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে বয়ে গেছে তার। দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে বায়েনদের জমি। বায়েনরা চাষ করে রাজার জমি। মাইনে কড়ির চল নেই তাই নিষ্কর জমির বন্দোবস্ত আছে। রাজার বায়েন তাই, যেমন তেমন মুচির ঘরে ওরা মেয়ের বিয়ে দেয় না। রাজার বায়েন বলে কথা! বায়েন পাড়ার কাছাকাছি এসে থেমে যাই। একটা বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাড়িরই মেয়ে নিশ্চয়। বছর চারেক বয়স হবে। পেটটা উলটোনো ঘটের মতো, আসলে পিলে হয়েছে। এই রোগটা দেশ থেকে কবে বিদেয় হবে কে জানে!

কিরাত-শবর, হাড়ি, হোড়, বীরহোড় সম্প্রদায়ের এই মানুষগুলোই রাঢ়ের মূল বাসিন্দা। অন্ত্যজ হলেও এরা নম্র ভদ্র। বহিরাগত জনের প্রতি এরা সহিষ্ণু। বেতসলতা যেমন অবনত হয়ে নদীর স্রোতের বেগ হতে আত্মরক্ষা করে, সুম্মদেশীয় লোকেরাও তেমনি বিনম্র। রামের কাছে পরাজিত হলেও রাঢ়বাসীরা রামকে ফল-মূল দিয়ে আপ্যায়িত করেছিল। হিউয়েন সাঙ উত্তর পশ্চিম সীমান্তে দস্যু দ্বারা সর্বস্ব লুণ্ঠিত হলেও রাঢ় দেশে তিনি প্রচুর উপঢৌকন ও সম্মান দক্ষিণা লাভ করেছিলেন। তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় সাদর সম্মান জানানো হয়। আর আমি ছেলে-মেয়ের জন্য দুটো আহার্য সামগ্রী চাইলে দেবে না?

হাত পাতলাম অবশেষে। বললাম দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি। স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বিপদে পড়েছি, সাহায্য চাই।

গুরু বলেছেন, চাইলে পরে কাঙাল হবে। কোনো দিন চাইবে না, কাঙাল হবে না। তোমার প্রাপ্য তুমি ঠিকই পাবে। সাময়িক কষ্ট হবে, তা সহ্য করো, কেষ্ট মিলবে। গুরুর দেওয়া কথা রাখতে পারলাম না। কাঙাল হলাম।

উপস্থিত হলাম এভাবে বাতনগিরিতে।

খর্বাকার কালো রঙের মুণ্ডিতশীর্ষ একজন বৈরাগী নদীর ধারে তালগাছের নীচে ঘন ঘন দাড়ি নাড়ছিলেন। তারপাশে একজন কৃশকায়, কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার যুবক দাঁড়িয়েছিল। মনে হয় তার পরিচারক। ঘাটে যে কখানা নৌকো ছিল তার মাঝিমাল্লাদের প্রত্যেককে ওপারে নিয়ে যাবার অনুরোধ করছিল। কিন্তু তারা কেউ ওপারে যেতে রাজি হচ্ছিল না।

মাঝিরা বলছিল, বাবাজি, আজ কেউ ওপারে নৌকো নিয়ে যাবে না।

বৈরাগী একথায় খুবই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। কাতর কণ্ঠে বলছিলেন, কিন্তু আমাব যে বাপু ওপারে বিশেষ কাজ আছে।

একজন বৃদ্ধ মাঝি বলে, বাপু হে, আট আনার জন্য কে মরতে ওপারে যাবে? কাল রাত্রে পাঠানদের সঙ্গে ফউজদারের জোর লড়াই হয়ে গেছে। পাঠানেরা হটে গেছে বটে, তবে ওরা নদীতে নৌকো দেখলে আক্রমণ করতে পারে।

বৈরাগী এ কথা শুনে তাঁর দাড়ি নাড়লেন। ঘন ঘন তাঁর এই দাড়ি নাড়ার ফাঁকে আমরা ঘাটে উপস্থিত হলাম। তমাল বৃক্ষের নীচে আমাদের দেখতে পেয়ে বৈরাগীর মনে বুঝি ভরসা এল। এগিয়ে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরমশাই প্রণাম হই। আপনি কি ওপারে যাবেন?

অযাচিত এ প্রশ্নে আমি বিরক্ত হলাম। বৈরাগীর আপাদমস্তক ভালো করে দেখে মনে মনে বিচার করলাম। বৈরাগীর আবার জিজ্ঞাসার উত্তরে বিরক্ত হয়েই উত্তর দিলাম—কোথায় যে যাব, তা স্থির করতে পারিনি। তুমি কোথায় যাবে বাপু?

—আজ্ঞে সে প্রভুর ইচ্ছা। আপাতত নদীর ওপারে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নৌকা পাওয়া যাচ্ছে না।

—কেন বলো দেখি?

—গত রাত্রে পাঠানদের সঙ্গে ফউজদারের জোর লড়াই হয়েছে নদীতে। তা ঠাকুরের নিবাস কোথায়?

বৈরাগী বড়ো নির্লজ্জ। আমরা কোথায় যাব সে জেনে তোমার কী লাভ বাপু? বৈরাগী আবার জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুর কি তাম্রলিপ্ত যাবেন? সে সময় একজন মাতাল এসে উপস্থিত হল। সে বৈরাগীর কথা শুনে বলে উঠল—অমন কাজ কোরো না বাবাজি! তোমার মতো এমন একটা নধর পাঁঠা পেলে পাঠানেরা রেঁধে সুখে চিবিয়ে খাবে।

—রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ। ব্যাটা বেল্লিক!

—তবে রে ব্যাটা ন্যাড়া। তুই আমাকে গালি দিস?

মাতাল বৈরাগীর দীর্ঘ শিখা ধরে টানতে লাগল। আমরা সকলে তাঁকে মাতালের হাত থেকে বাঁচালাম। মাতাল টলতে টলতে চলে গেল। বৈরাগী মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুরমশাই সত্যি?

—কি?

—ওই মাতাল ব্যাটা যা বলল।

—আবার গালি দিচ্ছ? এখনই তো মরতে বসেছিলে?

—এখন তো চলে গেছে। শুনতে পাবে না।

—তা হোক। বৃথা গালি দিয়ে লাভ কি?

—ঠিক আছে গালি দেব না। কিন্তু ও যা বলল সত্যি?

—কি বলো তো?

—ওই যে চিবিয়ে খাবে? ওরা কি নরমাংস ভক্ষক?

—ও এই কথা—।

বুঝলাম নরবলির কথা শুনে বৈরাগী ভয় পেয়েছে। হেসে বললাম, দূর পাগল! ওরা কখনও নরবলি দেয়?

—দেয় না, না?

—না।

—আজ তাহলে আপনারা আমার অতিথি।

—কি রকম?

—আমার সঙ্গে ফলাহার আছে। গ্রহণ করবেন। উত্তম চিড়া, ঘন ক্ষীর, বাথানের দধি, মর্তমান রম্ভা এবং গোল্লা মিষ্টান্ন। সব আমার শিষ্য দিয়েছে। আমাকে খুব ভক্তি করে যে।

—তোমার শিষ্য কি জাতি?

—আজ্ঞে তন্তুবায়। এ বেলা ফলাহার করুন। কাল প্রভাতে অন্নপ্রসাদ পাবেন।

বৈরাগী তাঁর সঙ্গী কৃশকায় যুবাকে কাছে ডাকলেন। সে রাত্রে আমাদের ভালো আহার জুটল। গভীর রাত্রে এক বিজ্ঞ মাঝি নৌকো ছেড়ে দিতে রাজি হল। আমরা সকলে তার নৌকায় চুপচাপ চেপে বসলাম। রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর পার হয়েছে। নৌকো দক্ষিণ দিকে চলছিল। ঘন কুজ্ঝটিকায় নদীবক্ষ আচ্ছন্ন। নদীবক্ষ, শূন্য, পাঠান দস্যুদের ভয়ে নদীতে আর কোনো নৌকো নেই। সহসা আমাদের নৌকোর পিছনে বহু তরঙ্গের শব্দ শোনা গেল। মাঝি জানাল যে, একখানি বড়ো নৌকো আমাদের নৌকার দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছে। আমরা সকলে ভীত হলাম। দামালের মুখ কঠিন হল। দেখতে দেখতে পিছনের নৌকোটি আমাদের নৌকোর গায়ে এসে লাগল। মহাদেবকে স্মরণ করলাম আমি। বিপদে মানুষের মনে দেবতার কথা স্মরণে আসে। আমিও তেমন চণ্ডীকে স্মরণ নিলাম।

দেখা গেল পঞ্চাশ-ষাট জন অস্ত্রধারী পুরুষ নৌকোর দাঁড় টানছে। তাঁদের মধ্যে কেউ একজন আমাদের নৌকোর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, মাঝি, এ নৌকো কোথায় যাবে?

আমি বললাম, আমি দামুন্যার মুকুন্দ চক্রবর্তী। পরিবার নিয়ে চলেছি আড়রা যাব।

—আড়রা যাচ্ছেন, সঙ্গে পরিবার আছে। দ্রুত চলুন। পাঠানেরা ছিপ নৌকোয় লুঠ করতে বের হয়।

নৌকো ছেড়ে দিল। নদীতীরে কোনো গ্রামে দীপ জ্বলে নেই। নদীবক্ষ শূন্য, নিস্তব্ধ, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সমুদ্রের জলরাশি জোয়ারে নদীতে প্রবেশ করেছিল এখন ফিরে চলেছে। ভীষণ সেই স্রোতে নৌকো দ্রুত চলতে থাকে।

নদী পার হয়ে নৌকা ঘাটে ভিড়লে নদীবক্ষে বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। নদীবক্ষ আলোয় উদ্ভাসিত। দু-তিনটে তোপের গর্জন শোনা গেল। মা চণ্ডীকে আবার প্রণাম নিবেদন করে হাঁটতে শুরু করলাম। রাত ভোরে হাঁটতে শুরু করেছি। সকাল হয়েছে। সূর্য উঠেছে আকাশে. গাছে গাছে পাখিরা ডেকেছে। সকাল থেকে দুপুর। ক্লান্ত হয়ে থেমেছি। ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ থামিয়ে দিয়েছে পথ চলা। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে বিশ্রাম নিয়েছি। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু শস্যখেত আর বনভূমি। লোকালয়ের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। দামালকে জিজ্ঞেস করেছি, এ আমরা কোথায় এসে পড়লাম?

দামাল উত্তর দিতে পারেনি। সতর্ক দৃষ্টিতে সে শুধু চারধার দেখছিল।

বললাম, ছেলে-মেয়েদের খিদে পেয়েছে।

দামাল বলেছিল, খাবার কিছু সঙ্গে আছে, দরকার শুধু জল।

জলের সন্ধান করেছে দামাল। কিছুক্ষণ খোঁজার পরই দেখতে পেয়েছিল নদীটা। শান্ত একটা নদী। কুলকুল বয়ে চলেছে। নদীর ধারে সকলে বিশ্রাম করতে বসেছি। হাতমুখ ধুয়ে সামান্য আহার। আবার শুরু হয়েছে পথের চিন্তা। যেতে হবে দক্ষিণে। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করেছে সবাই। আকাশে অপরাহ্নের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার নামবে।

ডেকেছি, দামাল!

দামাল সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—আজ পথেই রাত কাটাতে হবে দেখছি। একটা রাত কাটানোর আস্তানা খুঁজতে হবে।

দামাল চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আর ঠিক তখনি দেখা মিলেছে মানুষের। এমনি করে কত জায়গা অতিক্রম করে অবশেষে শিলাই নদী পার হয়ে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমি আড়ড়া নগরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পশ্চিম দিকে বিরাট একটা আমবাগান। সেখানে জোনাকির মালা জ্বলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রশস্ত রাজপথে উঠলাম। একটা দ্বিতল অট্টালিকা থেকে সেতারের সুর ভেসে আসছিল। পুরবি, কেদারা, পুরিয়া, গৌরী ফিরে ফিরে বাজছে। দাওয়ায় বসে কয়েকজন প্রবীণ আড্ডা মারছেন। একজন চাঁদির বাটাতে পান সাজছিলেন, পাশে আর এক প্রবীণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদির কলিকায় ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাচ্ছেন। ক্রমে লোক-লস্কব দোকানপাট দেখতে পেলাম। বাজারের মধ্যে এসে হাজির হলাম। দেখি আফিমের দোকানের সামনে বেশ ভিড়। বিপণিতে বিপণিতে আলো জ্বলছে। রাজবাড়ি কোন্ দিকে ভাবছিলাম। এমন সময় রাজবাড়ির একজন পরিচারককে পেয়ে গেলাম, বাজারে সে আফিম কিন্‌তে এসেছিল।

উপস্থিত হলাম ব্রাহ্মণরাজ পালধি বংশজাত বাঁকুড়া রায়ের কাছে। নগরের মাঝখানে বিশাল রাজ অট্টালিকা। বিশাল অট্টালিকার একটা কক্ষে রাজা বাঁকুড়া রায় বিশ্রাম করছিলেন। পরিচারক তাঁকে গিয়ে আমার আসার সংবাদ দিলেন। একজন পরিচারিকা তাঁর পদসেবা করছিল। দু-জন ময়ূরপুচ্ছ পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছিল দু-দিক থেকে। এই সময় তাঁকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি বিরক্ত হলেন।

বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী চাই?

পরিচারক রাজাকে অভিবাদন করে জানাল, মহারাজ এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে সদরে অপেক্ষা করছেন। আপনি হুকুম করলে তাঁকে নিয়ে আসি?

—এই অসময়ে কেন?

—অনেক দূর থেকে আসছেন।

—কী চাইছেন?

—আমাদের কিছু বলেন নি। তাঁকে জানিয়েছিলাম আপনি বিশ্রাম করছেন। কিন্তু তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি নাকি বিপদে পড়ে এসেছেন।

—তিনি কোথায়?

—রাজবাড়ির অতিথিশালায়।

—ঠিক আছে। দেওয়ানখানায় অপেক্ষা করতে বলো, আমি আসছি।

পরিচারক তাঁকে অভিবাদন করে বিদায় নিয়ে এসে আমাকে রাজার কথা বলল।

রাজা বাঁকুড়া রায় আমার পাণ্ডিত্যের কথা আগেই অবগত হয়েছিলেন। রাজাকে কোনো রকমে কবিত্ব বাণী শুনিয়ে সম্ভাষণ করলাম।

রাজা তাঁর পাশে উপবিষ্ট রাজগুরুকে বললেন, এঁকে চেনেন গুরুদেব?

রাজগুরু বললেন, কিছুটা চিনি। বুঝতে পারছি, ইনি একজন কবি।

রাজা বললেন, শুধু কবি বললে মিথ্যা হবে গুরুদেব। ইনি একজন মহাকবি। কি ঠিক বলিনি চক্রবর্তী মহাশয়?

—রাজা কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি অনেক প্রকৃতির অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি। নির্বাচন করে মেশার মতো অবসর পাইনি। তবে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে লাভবান হয়েছি। আপনার মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝাব সেই ধৃষ্টতা আমার নেই।

—শুনেছি আপনি একটি মহৎ কাব্য রচনা করেছেন?

—মহৎ হবে কিনা জানিনা। চেষ্টা করছি। ভবঘুরে জীবন নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। মিশেছি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে, গৃহের দাসী, পরিচারক, লম্পট, চরিত্রবান সকলের সঙ্গেই। দুশ্চরিত্রাকে দেখেছি যেমন তেমনই সতী নারীকে দেখে কৃতার্থ হয়েছি।

—চমৎকার! আপনার চরিত্রকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছা করে।

মৃদু হেসে বলি, চরিত্র আমার নির্মল রাজা।

—বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শ্রদ্ধাবনত স্বরে বলি, শ্রাবণের কীর্তিকা নক্ষত্রে যাঁর জন্ম, যাঁর আতিথ্যে আশ্রয় পেয়েছি-তিনি তাঁর সমস্ত ঔদার্য যতই ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করুন না কেন, আমি প্রবঞ্চিত হব না। কারণ প্রকৃত রাজার গুণাবলির সমস্ত লক্ষণ আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি।

রাজা বাঁকুড়া রায় নির্বাক। রাজগুরু স্তম্ভিত। প্রথম আলাপে আমাকে কবি বলেছেন ব্যাঙ্গাত্মক উচ্চারণে। বুঝতে পারি বাঁকুড়া রায় যদি না টলেন, তবে আমার আড়ড়ায় বাস গোটাতে হবে। কিন্তু আমার ভাষার ইন্দ্রজাল উভয়কেই মুগ্ধ করল। উভয়েই রীতিমতো বিচলিত বোধ করলেন।

—কিন্তু কবি, রাজ-কাহিনি লিপিবদ্ধ হবে না, তা কি হয়? তেমন কিছু একটা রচিত হোক, এটাই রাজ আকাঙক্ষা। রাজগুরু আমাকে থামিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাঁকে থামিয়ে, পারিষদদের চমকে রাজা বললেন, মাপ করবেন গুরুদেব। ইনি অবশ্যই প্রতিভাবান। যাঁরা প্রতিভাবান হয়, তাঁদের মধ্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতেই পারে। কারণ জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক তাঁরা অনুভব করেন যে, তাঁরা অন্য সবার চাইতে উঁচুতে অবস্থান করেন। কবির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

—আপনার সঙ্গে পরিচয়ে আমি প্রীত। এঁরা আপনার প্রকৃত পরিচয় সেইভাবে আমাকে দিতে পারেনি। আপনি লিখুন, আপনার কাব্য মহৎ হবে বলেই আমি মনে করি।

রাজার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে এতটা কৃতকার্য হব কল্পনা করিনি। মনে মনে বলি, লিখব। অনেক কিছুই লিখব আপনার করার কিছুই থাকবে না।

—এত কি ভাবছেন কবি? আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

—না রাজা। আপনার কথা:. সামান্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।

রাজা প্রীত হয়ে আমাকে দশ আড়া ধান দিলেন। আমার কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হলেন। তিনি আমার গ্রাম ত্যাগ করার করুণ বিবরণ শুনে আমাকে আপন পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক ও তাঁর সভাসদ হিসাবে আমাকে তাঁর কাছেই থাকার অনুরোধ করলেন।

আরড়া উচিত ভূমিপুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবনে গোপাল কামেশ্বর।

হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। পেটের খিদে মিটল। মনের খিদে? সে তো মেটে না। খুঁজে বেড়াই। সবাই ভাবে পরমসুখে থাকি। নির্বিঘ্নে থাকলেও দামুন্যার জন্য মন কেমন করে।

জন্মভূমি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ক্লেশ আর সহ্য করতে না পেরে ভাই রামানন্দকে নিয়ে সাতপুরুষের ভিটে ত্যাগ করেছি। স্ত্রী, পুত্র, ভাইকে নিয়ে কত গ্রাম ও নদী অতিক্রম করেছি। পথে দস্যুর হাতে নিঃসম্বল হয়েছি। প্রায় নিঃসম্বল হয়ে হেঁটে চলেছি দিনের পর দিন। শেষে সাহায্য চেয়ে হাত পেতেছি।

শাস্ত্রে বলে, যদি বর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্যি রাজা পুণ্য দেশ।

পুণ্য দেশ, কিন্তু আমার জীবনে নেমে এসেছে অশনি-সংকেত। দুরবস্থার একশেষ। আমার কপাল এমনই যে সমস্ত ক্লেশ পরিবারের সকলকে সহ্য করতে হয়েছে। শেষে অন্যের কাছে পাথেয় পর্যন্ত ভিক্ষে করেছি। এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়? পঞ্চাননকে হারাতে হয়েছে। ওকে ধরে রাখতে পারিনি। পঞ্চানন চলে গেছে। সংসারে এত ক্লেশ। আর আমি কাব্য করেছি—

'তৈল বিনা করি স্নান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে।'

পথের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়ে দিয়েছে ডিহিদারের অত্যাচারের আতঙ্ক। আতঙ্ক এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বসতে পারিনি। কোথাও সামান্য এক পল চোখের পাতা এক করতে পারিনি। আতঙ্ক সব সময় তাড়া করে বেড়িয়েছে। এই বুঝি ডিহিদারেব লোক এসে ধরে নিয়ে যাবে।

রাজা বাঁকুড়া রায়ের নির্দেশে চণ্ডীর প্রচারে ব্রতী হলাম। তাঁর নির্দেশেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ করলাম। আমার অভিজ্ঞতার কথা আগেই লিখেছি।

'পথে চণ্ডী দিলা দরশনে'-
আশ্রয় পুখুরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা শ্রম পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।।'

সেই অভিজ্ঞতায় গুরুর নির্দেশে কথকথায় পালা সাজাতে শুরু করলাম এবার। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা এবং রঘুনাথকে পড়ানো, একই সাথে চলছে। সেই সঙ্গে বহু পূরাণ পাঠ করছি। সঙ্গীত সম্পর্কেও পড়াশোনা করতে হচ্ছে। বৈদিক শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কেও জানতে হচ্ছে। জানতে হচ্ছে রন্ধনকলা সম্পর্কেও। স্থানীয় রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে হচ্ছে। এক একবার মনে হয়, বংশানুক্রমে আমরা হলাম শৈব। আমার পিতামহ শৈব থেকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই হিসাবে আমি বৈষ্ণব বংশের সন্তান। সেই আমি কিনা লিখছি শাক্ত চণ্ডীর মঙ্গলকাব্য।

বাংলার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আবৃত। অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী মানুষ বন্যজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করে বাস করে। দেশে জমিদারের অত্যাচার। জঙ্গলে হিংস্র পশুর বাস। ধনীরাও সদাই শঙ্কিত। হিন্দু রাজ্য পাঠানরা লুঠ করছে। তারাও মোগল আক্রমণে বিতাড়িত। মোটের ওপর জনসাধারণের জীবন বিপন্ন। বিপন্ন আমি ও আমার পরিবার। আমি লিখছি—

'বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর ॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেল তরি।
আপনাব দন্ত দুটা আপনার বৈবি ॥'

সমাজ জীবন অরাজকতায় সমাচ্ছন্ন, ব্রাহ্মণরা অধঃপতিত, তাঁরা লোভী, তাঁরা ঠগ, প্রবঞ্চক এবং মূর্খ।

'মুর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরঅ্যা যাজন করে
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চালের পুটলী বান্ধে টান ॥
মোদকের ঘরে খণ্ড গোপ ঘরে দধিভাণ্ড
তেলির ঘরে তৈল কোপীভরি।
কোথায় মাগরা কড়ি কেহ দেই ডালী বড়ি
গ্রামযাজী সানন্দে সাঁতরি ॥'

ডিহিদাব মামুদ শরিফের নির্যাতনের চেহারা আমি দেখেছি, তার ইঙ্গিত করতে ভুলি না। আমি গরিব ব্রাহ্মণ। শুধু দরিদ্র জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিনি। লিখেছি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা। বড়ো দুঃখে দেবী লক্ষ্মীর বন্দনায় গেয়েছি—

'লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে।
লক্ষ্মী বাম হইলে ভাই কেহ না আদরে ॥'

লোকে বলে, আসলে সুখের কথায় নয়, দুঃখের কথায় আমি দড়। আমার বড়োমানুষি বর্ণনার ভিতর দিয়েও নাকি গরিবিয়ানী উঁকি মারে। স্বভাব বর্ণনায় আমার নিপুণতা নাকি অতুলনীয়। কিন্তু আমি জানি আমি কী, এ সব কথায় আমার হাসি পায়। তবু এই সবই আমি লিখি।

—তোমরা বলো আমার কালকেতুর গল্প, কি ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনি, উভয়েরই উদ্দেশ্য চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার। ঠিকই 'বৃহদ্ধর্ম্ম' পুরাণে 'একটি' শ্লোকে কালকেতুকে গোধিকারূপে দেবীর ছলনা এবং সপুত্র সদাগর, শালিবাহন রাজা ও সমুদ্রে হস্তীগ্রাস উদ্গীরণের কথা আছে। শ্লোকটা এইরকম—

'ত্বং কালকেতু বরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবাসি মঙ্গলচণ্ডীকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ বনিজঃ সসূনো
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং গ্রসন্তী বমন্তী ॥'

প্রথমে দেবীর পূজা করেন এক রাজা। পরে পূজা করে বনেব পশুগণ, তার পরে পুজো করে কালকেতু। দেবীর কৃপায় সকলের মঙ্গল হয়। রাজা প্রজা বা নিকৃষ্ট প্রাণী দেবীর ভক্ত হলেই সকলের শ্রেয় লাভ হয়। এই শ্লোক আমাকে অনুপ্রেরণা দিল। মাথার মধ্যে এল সেই রাজ্যের গল্পটা। যেটা আসলে নেই রাজ্য। নেই রাজ্যের গল্প, গভীর জঙ্গল যেখানে। যেখানে লোকজন বাড়ি-ঘর কিছুই নেই। সেই জঙ্গল কেটে বসত হবে। তৈরি হবে বিশাল একটা রাজ্য, যেখানে রাজা প্রজায় কোনো বিবাদ থাকবে না। থাকবে না কোনো ডিহিদার। সকলে দেবে সাধ্যমতো, নেবে প্রয়োজন মতো। করতে চেয়েছি এই। কি হয়েছে জানি না!

—না কিছুই হয়নি!

—হওয়া কি মুখের কথা! রাজাদের থেকে বণিকদের প্রভাব সমাজে কম নয়। মুসলমানদের সার্বভৌম আধিপত্যে রাজাদের শক্তি খর্ব হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যলক্ষীর সন্ধানে তৎপর উদ্যোগী মুসলমানদের উৎসাহে তখন দেশে প্রাধান্য পেয়ে যাচ্ছে বণিকরা। আবার শাস্ত্রচর্চা সমাজের নিম্নতম স্তর, এমনকী মহিলাদের মধ্যেও প্রসারিত। গ্রাম নগরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বসবাস করে। কুম্ভকারেরা কাঠের আগুন দিয়ে ইটের পাঁজা পোড়ায়। যে যার নিজের কাজে স্বাধীন। এই যে সমাজজীবন আমি দেখেছি। সেই কথাই লিখেছি দিনের পর দিন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাতায় পাতায়।

কোথাও একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে পড়ে। মনে পড়ে প্রিয়পুত্র পঞ্চাননের কথা। কত দিন আগে সে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছে। এরকম 'পরে এসে আগে চলে যাওয়া'— অনেকেরই অকালবিয়োগের বেদনা বহন করে আজও বেঁচে আছি। হঠাৎই পঞ্চাননের স্মৃতি জেগে উঠে মন খারাপ করে দেয়। এমনি করে মা যখন চলে গিয়েছিলেন পৃথিবী ছেড়ে, আপনজন হিসাবে পেয়েছিলাম বাড়ির কিরষান বিরাজদাদাকে। মায়ের কাজ সেরে আসার সময় শূন্য বাড়িটার দিকে তাকিয়ে হু হু করে চোখের জল এসেছিল। ওই মাধবী গাছ, পেয়ারা, শিউলি আর একরাশ সবুজ পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তুলসীমঞ্চে তুলসীগাছ। মা রোজ জল দিতেন। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাতেন।

বিরাজদাদা বলতেন, কাঁদছিস কেন মুকুন্দ মা কি কারো চিরদিন থাকে? বয়স হলে সকলকে যেতে হয়। আমি তো রইলাম। দিদি আমাকেই এবাড়ি দেখভাল করার ভার দিয়ে গেলেন। জমিজমা, পুকুর-মাঠের ফসল সবই তো তোর।

ছোটো ছোটো করে ছাঁটা একমাথা পাকা চুল। আঁটো চেহারা। তামাটে রং। গলায়

একটা রুদ্রাক্ষের মালা। জ্বলজ্বলে একজোড়া চোখ। সেই বিরাজদাদাও আজ নেই। তিন দিনের জ্বরে কাহিল অবস্থা। বাড়ি আসে না, খবর পেয়ে যখন দেখতে গেলাম। দেখি ঘরের মধ্যে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে।

—কী হয়েছে তোমার? নির্নিমেষে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখের জলে একাকার। তারপর ফিশফিশ করে বলেছিল, তোর সম্পত্তি তুই নিয়ে নে। তোর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বলতে বলতে বড়ো আদরে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিরাজদাদা। তারপর ক্রমশ শিথিল হয়ে গেল তার হাত দুটো। মুহূর্ত মধ্যে বিছানায় ঢলে পড়েছিলেন চিরনিদ্রায়। সে দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

বাঁকুড়া রায়ের ইচ্ছায় একদিন প্রাসাদে নিভৃতে গিয়ে দেখিয়ে আসতে হয়েছে কতটুকু লেখা আমার এগিয়েছে। বিরক্ত বোধ করেছি। কিন্তু উপায় নেই। রাজাদেশ লঙঘন করা যায় না। তবে রাজা খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে আমার গভীর জ্ঞান দেখে বারবার প্রশংসা করেছেন। জানতে চেয়েছেন আর কতদিন লাগবে?

বলেছি, খুব শীঘ্র শেষ করব।

—ভালো।

রাজাকে একা পেয়ে বলি, আমার একটা অনুরোধ আছে রাজা।

—বলুন।

—অনুগ্রহ করে আমাকে বারবার এই রচনা দেখাতে অনুরোধ করবেন না। এতে আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়। তখন আর নিজের সৃষ্টি বলে মনে হয় না। আমি নিজে আপনাকে শুনিয়ে যাব।

রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন কিছু। তারপর বললেন, বেশ। ভালো কথা। আপনি নিজে না দেখালে আমি আর দেখতে চাইব না। আপনি আপনার মতো লিখুন।

—বেশ, এখন তবে যাই।

—আসুন।

নিজের জন্মভিটে ছেড়ে রাজার অতিথি হয়ে আছি! থাকলে কী হবে. মন পড়ে রয়েছে বাড়ির দিকে। অশান্তির আগুনে পুড়ে না মরে শান্তির সুবাস পাওয়ার আশায় এখানে এসেছি। কিন্তু মন মানে না। মন পিছনে টানে। তবু সেখানে কিছু মানবিক গুণ ছিল। লোকের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবণতা ছিল। পারস্পরিক মিল ছিল। লোকেরা নিজেরা খেত, অপরকেও খাওয়াতে ভালোবাসত। মানুষের হৃদয় ছিল আকাশের মতো উন্মুক্ত। প্রশস্ত। তবু চলে আসতে হয়েছে। স্ত্রী পুত্রকে সুখে রাখার জন্য। কিন্তু সুখ কারে কয়? উত্তর মেলে না। মমতাকে দেখে মনে হয় সে খুব খুশি। বেশ জমিয়ে নিয়েছে। ভুলেও একবার দামিন্যার কথা মনে আনে না।

পুত্র স্নেহে মমতা কাতর। পাছে ওদের কোনো বিপদ ঘটে, এই চিন্তাতেই ব্যাকুল সব সময়। এক পুত্রকে যে ও হারিয়েছে! তাই আর কাউকে হারাতে চায় না। এর মধ্যেই চণ্ডীমঙ্গল লিখছি। বড়ো কাজে-বড়ো বিঘ্ন-বড়ো যন্ত্রণা। যেমন স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাই কেবল দাম্পত্য সুখ নয়। এক মন এক হৃদয়ের নাম দাম্পত্য সুখ। সেই সুখেও ফাটল ধরে। লেখার মধ্যেও আসে অনীহা।

কাব্য রচনা ভিন্ন আর কিছুকে মনের মধ্যে স্থান দিতে চাই না। কিন্তু স্ত্রী পুত্র পরিবার মনের আধখানা জুড়ে বসে আছে। আমার কাব্য রচনায় আমি যে একাই ব্রতী, তা তো নয়। মমতাও আছে, কিন্তু আর এক রকমে। এমনই শিবরাম আছে, আছে কন্যা যশোদাও। এখানে ডিহিদারের ভয় নেই। প্রাণপাত করে মমতা এখন পতিসেবা করে। মাতার মতো স্নেহ, কন্যার মতো ভক্তি, দাসীর মতো সেবা করে সে। কিন্তু সেই সহধর্মিণী কই? যে আমার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগী, কঠিন কাজের সহায়ক, সংকটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী! সে কই?

প্রেম কি তা আমি জানি না। দেখলাম আর মজে গেলাম, আর কিছু মানলাম না, এমন দাবানল সংসারে দেখতে পাই না। প্রেমের কথা কাব্যের পাতায় পড়েছি বটে, কিন্তু সংসারে 'ভালোবাসা', স্নেহ ভিন্ন প্রেমের কোনো সামগ্রী চোখে পড়ে না। প্রেম যা কাব্যে বহু বর্ণিত আকাশকুসুমের মতো কোনো একটা সামগ্রী। যুবক যুবতীদের জন্য কবিরা সৃষ্টি করেছেন কাব্যে। ভালোবাসা বা স্নেহ, যা সংসারে এত আদরের তা পুরাতনেরই প্রাপ্য। নতুনের প্রতি তা জন্মায় না। সংসারে যার সঙ্গে অনেক কাল কাটিয়েছি, বিপদে, সম্পদে, সুদিনে, দুর্দিনে যার গুণ বুঝেছি, সুখ দুঃখের বন্ধনে যার সঙ্গে বদ্ধ আছি, ভালোবাসা বা স্নেহ তারই প্রতি জন্মে।

তবুও নতুনের প্রতি একটা আদর জন্মায়। তার গুণ জানি না, কিন্তু চিহ্ন দেখে অনুমান করতে পারি। যা পরীক্ষিত তা সীমাবদ্ধ, যা অপরীক্ষিত তা কেবল অনুমেয়। তার সীমা দেওয়া না দেওয়া কেবল মনের ওপর নির্ভর করে। তাই নতুনের গুণ অনেক সময় অসীম বলে মনে হয়। এই নতুনের জন্য বাসনা দুর্দমনীয় হয়ে পড়ে। যদি একে প্রেম বলা হয় তবে সংসারে প্রেম আছে। এ প্রেম বড়ো উন্মাদ। নতুনের তা প্রাপ্য। তাই তার আকর্ষণে পুরাতন অনেক সময় ভেসে যায়, ভেঙে পড়ে।

গঙ্গাদাস বাবুর পুত্রবধূর কথা মনে পড়ে। এদেশের মেয়েদের কষ্টকর জীবন যন্ত্রণা আমার মনকে বড়ো পীড়া দেয়।

কোনো কাজে মন বসে না। মুখখানি মনে পড়ে বারবার। বড়ো সুন্দর মুখ। মিশমিশে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট-যেমন রাঙা, তেমনই পাতলা! কি গড়ন! সবই যেন দেবীদুর্লভ! মানুষ যে এত সুন্দর হয় তা আগে জানতাম না। একবার যা দেখেছি, যেন আমার জন্ম সার্থক করেছে। যে কটা বছর বাঁচব, এই মুখের কথা ভেবে সুখে কাটাতে পারব।

কিন্তু বিধি বললেন, তা কি পারা যায় রে মূর্খ! একবার যখন দেখেছিস, তখন আর একবার দেখতে দোষ কি? দুপুরবেলায় ভাবি একবার যা দেখেছি, তা ভেবে ভেবে সুখে সময় কাটবে। কিন্তু সন্ধে বেলাতেই মনে হয়, আর একবার দেখা হয় না?

মন খারাপ করা দুপুরগুলোয় জানলায় দাঁড়িয়ে এই সব কথা মনে আসে। রাস্তায় মানুষগুলোকে দেখি। এই মানুষগুলোকে কোনও দিনই দেখা হয়নি। এবার দেখি। ঘরের ভিতর থেকে রাস্তার মানুষগুলোকে ছোটো দেখায়। খুবই ছোটো ছোটো। জানলাটা ধরে যতদূর দেখা যায় দক্ষিণের এই কর্মব্যস্ত জনপদ দেখতে থাকি। বাড়ির কথা মনে পড়ে। ভেঙে পড়া পুরোনো বাড়িটার কথা। যেখানে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মূল্যবান সময় কেটেছে।

মন কেবলই সেই দিকে চলে যায়। গোপালবাবু এসে বসেন। বলেন, দিন-রাত কি

ভাবেন আপনি? কেবলই দেখি অন্যমনস্ক? আসুন একটু পাশা খেলি। আনমনে রাজি হই। এক বাজি খেলি। খেলাতেও মন বসে না। গোপালবাবু বুঝতে পারেন। তাই এক বাজি শেষ হওয়ার পরই তিনি উঠে যান।

মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করি। স্থির করি অন্য কিছুতেই মন দেব না। কাব্য রচনাতেই একমাত্র মনোনিবেশ করব। এ পর্যন্ত যা লিখেছি তাতে কবি হিসাবে স্বীকৃতি পাই নি। কবি স্বীকৃতি আমাকে পেতেই হবে।

এসব ভাবনার মধ্যে মমতা কখন যেন ভাত বেরে দিয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। বাড়িতে থাকলে মা ভাত নিয়ে বসে থাকতেন। শরীরের খবর নিতেন। এখানে কেউ জিজ্ঞেস করে না। করার কথাও নয়। তবে কেন বোকার মতো ভাবনা-চিন্তা করা? এতসব চিন্তা-ভাবনার মাঝখানেও মনটা কখন যেন শিশিরের মতো স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। প্রাণ ফিরে পায়। মমতা এসে কাছে বসে। বলে, দামিন্যার জন্য মন খারাপ করছে?

ওকে কিছু বুঝতে দিই না। চুপচাপ ভাতের থালা টেনে নিই। আমাকে একজন বড়ো কবি হয়ে উঠতে হবে। আমার মধ্যে একটা অস্থির ভাব দেখে মমতা বলে, বুঝতে পারছি তোমার বয়স হয়েছে।

—বয়স সবার বাড়ে।

—আমি বলছি, তোমাকে বার্ধক্য পেয়ে বসেছে।

—কেন? আমি কি কর্মক্ষমতা হারিয়েছি? তুমি বললে আমি মানব কেন? আমি আগের মতোই সক্রিয়। তাছাড়া আমার কাজই তো শুরু হয়নি।

—সেই কথাই তো বলতে চাইছি। এত দ্বিধা কেন? এগিয়ে যাও।

—তুমি কোন বিষয়ে বলছ?

—তোমার লেখা। তোমাদের ঘরে আসার পর থেকেই তোমার রঙিন স্বপ্নের কথা শুনে আসছি। তারপর টের পাইনি আমিও কবে সেই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছি। কিন্তু এখন এক এক সময়ে ভয় হয়, বুঝি বা সেই স্বপ্ন পূরণ হবে না। তুমি বলেছিলে অমর কাব্য রচনা করবে। কোথায় তোমার কাব্য? দু-চারটে গান রচনা করেছ কেবল। শুধু এইটুকু। এই কটা গানে তোমাকে কবি বলবে না কেউ। দেশের সমস্ত মানুষ এখনও তোমার গান শোনেনি। পড়েনি তোমার কাব্য।

—ভুল সব ভুল। দুদিন পরেই তুমি দেখতে পাবে। আমি শুধু ভাবছি কোথা থেকে শুরু করব। এখন দেখছি আর অপেক্ষা করা যাবে না। সবাই এবার দেখুক।

—শুনে আমার খুব আনন্দ হল।

মমতা কি আমাকে ব্যঙ্গ করল? না না। ও আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে। তবে এভাবে বলল কেন? নিজের মধ্যে জ্বলে উঠি। বললাম এখবার সেই মিলে জগন্নাথকে দর্শন করে আসি, তারপরই লেখা শুরু করব।

মমতা খুশি হয়। বলে, আমারও অনেক দিনের ইচ্ছে জগন্নাথ দর্শনের। এবার বুঝি শ্রীহরির মনে ধরেছে।

পুত্রশোকের আঘাত উপশমের জন্য শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণে যাব মনস্থ করেছি কত দিন আগে। রাজা বাঁকুড়া রায়কে বললাম নিজের ইচ্ছের কথা। তিনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

পাঁচে পঞ্চবাণ

রাত্রে লিখতে বসেছি।

সবাই নিশ্চুপ, মা তখনও বেঁচে। মা দুর্গার অষ্টত্তর শতনাম লিখে দিতে বলেছেন। ক'দিন ধরে তাই লিখছি। যশোদাকে নিয়ে মমতা পাশের ঘরে, এমনি সবাই ঘুমিয়ে আছে। শুক্ল-পক্ষ চলছিল। রাত্রির অন্ধকারে সব কিছু ঢেকে যায়নি। আবছা দেখা যাচ্ছিল ধুধু ধানখেত। ধানখেতের মাঝ বরাবর সোজা একটা মেঠো রাস্তা। ধান খেতটাকে মনে হল যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা, মেঠো রাস্তাটা যেন তাঁর মাথার সিঁথি। হ্যাঁ প্রতিমাই বটে। স্বপ্নে যে রকমটা দেখেছি। মুখ-চোখ সব নিখুঁতভাবে তৈরি। আর গায়ের রং ফরসা বললে ভুল বলা হবে। লালচে রং-মেশা ফর্শা। কুচকুচে কালো চুলের রাশে শোভা পাচ্ছে মুখমণ্ডল। চাঁদের টিপের মতো একটা অদ্ভুত রঙের বড়ো টিপ কপালে বন্যতা ছড়াচ্ছে। বন-জ্যোৎস্নায় মাঠটাকে দেবীর মতো লাগছিল।

এসব দেখতে দেখতে আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। কল্পনায় ভেসে ওঠা মুখটাকে ভালো করে দেখবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে ছিলাম। আমার চোখের সামনে দেখছিলাম শুধু একটা নারীর মুখ। সেই নারীর সুন্দর ছোটো ছোটো দাঁতে নিচেব ঠোঁটটা ঈষৎ কামড়ে ধরেছিল। কি যে মায়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারব না। মনে হয়েছিল এরকম একটি নারীর জন্য স্বর্গকেও অবহেলা করা যায় স্বছন্দে।

ভাবছিলাম জাত-ধর্ম এসব আর কত নিষ্ঠুর হবে? যখন স্বর্গের দেবী এসে ঘর করতে চাইছেন ব্যাধের সঙ্গে? কিন্তু না তা হল না। তারা দুজন দুজনকে চাইল না। সমাজ-সংস্কৃতির মাঝখানে বিশাল মহীরুহের মতো ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে বাধা। না বুক ফেটে যায়, তবু মুখ ফোটে না। প্রেমের ছায়াতে আছে শীতল বিশ্রাম, শান্তি, আবার বিভ্রান্তিও। তাই এখানে মানবিক প্রেম নেই। আছে দৈব প্রেম।

রাত্রি এক প্রহর পার হয়ে গিয়েছিল এই সব ভাবতে ভাবতে।

মাঠের চারপাশে কুয়াশা ছিল। হেমন্তকাল বলে ধীরে ধীরে কুয়াশা গাঢ় হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে ছিলাম একটা ঝাঁকড়া পাকুড় গাছের তলায়। আমার অবয়বের চারপাশে জোনাকিরা জ্বলছিল। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠে এসেছিল মাথার একেবারে উপরে। অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে অন্ধকারে মিশে আছে রাস্তাটা। আলাদা করে বোঝা যায় না। আলপথ নদীর ধার সব একাকার। নদী পার হয়ে বন জঙ্গলে ঢাকা পায়েচলা পথ। সব কিছু অন্ধকারে লীন।

একটা অশুভ ভাবনা তখনই বুকের ভিতরে গুলিয়ে উঠেছিল।

আমি কি পলাতক? আমি কি পালাতে চাইছি? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়ে জন্মভূমি ত্যাগ করতে চাইছি?

তবে কি?

কপালে ভাঁজ পড়ে। সারা শরীরে ঘাম দেখা দেয়। কেউ কি আক্রমণাত্মক হয়ে আমাকে বা আমার পরিবারকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে? টানটান হয়ে ওঠে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়। তাহলে কি এখান থেকে আমাকে চলে যেতেই হবে? শুরু হবে আবার সেই উদ্বাস্তু জীবন। জীবনের প্রতি পদে পদে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে? কুয়াশা ঘেরা প্রাক শীতের রাত্রিতে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার শরীরে ঝিম ধরে গিয়েছিল। সমস্ত জায়গাটা শুনশান লাগছিল। বাড়ির গাছগুলোর ছায়ায় নিজেকে মনে হচ্ছিল আমি যেন নিজেই কোনো অশরীরী একটা অস্তিত্ব। এই সব ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ পরে ফিরে দাওয়ার গিয়ে বসেছিলাম মনে নেই। তখন মনে হয়েছিল জীবনে কী বা নিশ্চয়তা আছে? পূর্ণিমা গেছে কয়েকদিন আগে, এরই মধ্যে রাত্রির অন্ধকার এত ঘন, আমার জীবনের মতো?

মমতার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। টের পেয়েছে, ডোবার পাড়ে তেলকদম গাছের তলায় সেজের সলতে কমিয়ে ভাঙা চাঁদ মাথায় নিয়ে আমি বসে আছি। পাশে এসে বসেছিল মমতা। সেদিন বুকের ভিতরে টের পেয়েছিলাম, 'যদিদং হৃদয়ং মম' মন্ত্র উচ্চারণ। অগ্নিসাক্ষী করে একদিন যাঁকে ঘরে এনেছি সে তখন আমার পাশে উপবেশন করে আছে।

মৃদু হেসেছিলাম।

—কী হল ঘুমুতে পারলে না তো? আমায় নিয়ে তোমার খুব অশান্তি না?

মমতা চুপ করতে বলেছিল। আঙুল মটকে, আমার দিকে জোড়া আঙুল বাড়িয়ে বলেছিল, একটা ধরতো। ঠিক ঠিক ধরতে পারলে তোমায় একটা উপহার দেব।

ওর কথায় হেসে উঠেছিলাম। পাগলি মেয়ে-মানুষ।

মরা চাঁদের আলো জায়গাটায় রহস্যের সৃষ্টি করেছিল। মমতার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম সেখানেও রয়েছে অপার রহস্য। বিয়ের এত বছর পরও সেই কমনীয়তা রয়ে গেছে। একটুও টসকায়নি। মমতা জাদু জানে।

সামান্য একটা সংসার নিয়ে মমতা কি খুশি। মেয়েদের চাওয়া পাওয়াগুলো কত না ক্ষুদ্র!

কিন্তু আমি কী করব? ভিতরটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। ঘুম আসে না। লেখাও আসে না। ভেবে ভেবে শরীর খারাপ হয়ে যায়। খাওয়া কমে গেছে, খিদে পাচ্ছে না। সেই দুপুরে খেয়েছি। সন্ধে পার হয়ে গেছে কখন টের পাইনি। হেমন্ত কালে সন্ধ্যা মানেই রীতিমতো রাত্রি।

ভালো করে খাওয়ার কথা ভাবি না। কিন্তু কিছু তো খেতে হয়ই। নইলে শরীর চলবে কি করে। দুপুরে সামান্য ভাত ও আলুর ছেঁচকি রান্না হয়েছিল। ডাল ভাত, আলু সেদ্ধ-এটাও কিন্তু বাঙালির খাবার নয়। বাঙালির ঝালে ঝোলে সর্বব্যাপী আলু এসেছে পোর্তুগিজদের হাত ধরে। আর ডাল? আর্যাবর্তের প্রসাদ। বাঙালির আসল খাবার ডাল নয়, আলুও নয়।

প্রাকৃত ভাষার কবি বলেছেন,

'ওগগরা ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা'

অর্থাৎ 'যে স্ত্রী কলাপাতায় রোজ গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালতে শাক পরিবেশন করবেন, তাঁর স্বামী পুণ্যবান'।

'ওগগরা ভত্তা'র যুগ চলে গিয়েছে কত দিন আগে। এখন নিরামিষ রান্না হয় নারকেল কোরা দিয়ে মসুরির ডাল, দুধ-লাউ, ঘি দিয়ে গিমে শাক, কুমড়ো দিয়ে পুঁইশাক।

আর আমিষ?

'রোহিত মৎ-স্য দিয়া রান্ধে কাতলার আগ'।

সেই সঙ্গে চিতলের পেটি, শোল মাছ দিয়ে কাঁচা আমের টক। কখনও বা

'ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম।'

ধনীর ভোজন হয় পাকাল মাছ দিয়ে তেঁতুলের অম্বলের সাথে। বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের প্রভাবে সারা ভারতের উচ্চবর্ণের সকলেই প্রায় নিরামিষাশী। প্রবাসের পথে রাঁধা বাড়ার অসুবিধা থাকলে ধনবান পথিক ক্ষীর, গুড়, দই, কলা ভোজন করেন। আর দরিদ্র নারীর সম্বল মেটে পাথরে বাসি পান্তা ভাত। তারা অন্যের ধান ভানে, হাটে নিজের চরকা-কাটা সূতা বেচে। তারা ছেঁড়া কানি, মূড়া বা খুঞা পড়ে আর কুঁড়েতে বাস করে।

মমতা আমাকে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসতে বলে। বলে, হিম পড়ছে তোমার আবার ঠান্ডার ধাত।

অনুভব করি জলতেষ্টা পেয়েছে। গলা বুক জ্বালা করছে। যেন পালিয়ে যাবার উত্তেজনায় সেরকম জলও খাইনি। সঙ্গেও আনিনি। এখন জলের তৃষ্ণা ও একই সঙ্গে ঘরে ফেরার তাগিদ বিপদে ফেলার জন্য শরীরের ভেতর থেকে আমাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। আমার ভিতরটা তোলপাড় হয়! ভাবনা চিন্তার মধ্যে গোল বেঁধে যায়। চমকে উঠি।

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। মুহূর্তে বুঝে যাই বেড়ার ধারে শিয়াল অথবা খটাশ এসেছে। হেট্ হেট। গ্রামের ছেলে আমি মাটির ঢেলা কুড়োবার ছল করি। আর মুহূর্তেই দেখি হাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশাচর জীবটি। পুকুরের ওপারে শুধুই চাপচাপ অন্ধকার আর কুয়াশা। উঠে পড়ি। মমতাকে বলি, চলো ঘরে যাই।

ঘুম আসে না এসব রাত্রিতে।

কখন শিবরামও উঠে পড়েছে এসে বসেছে আমার পাশে। অস্ফুট গলায় শিবরাম জিজ্ঞেস করে, বাবা, তুমি কি চণ্ডীকে দেখতে পেলে? আমায় একবার দেখাবে?

অবাক হয়ে পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে থাকি।

শিবরাম জিজ্ঞেস করে, বাবা তোমার কাছে চণ্ডী এসেছিল?

আমার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। মাথা নাড়ি আমি।

—কখন এসেছিল বাবা, একটু আগে?

থিরথির করে কাঁপতে থাকি।

—বলো না, বাবা?

আমার দুচোখ সজল হয়ে ওঠে।

—কখন এসেছিল? বলো না, বাবা?

আমি ওকে প্রশ্ন করি, তুই এসব জানলি কি করে?

—তুমি তাঁকে কীভাবে দেখতে পেলে, বলো?

—ওসব কথা থাক বাবা। তুমি এখন ঘুমোও।

—তোমার পুথি লেখা শেষ হবে কবে বাবা?

—ভাবছি এবার শেষ করব। নিজের মনেই কথা বলি যেন।

শিবরাম জিজ্ঞেস করে, তুমি এই পুথি লিখছ কেন বাবা?

ওঁকে কোনো রকমে বলি, স্বপ্নের কথা তো।

—কীসের স্বপ্ন বাবা?

—একটা দেশের স্বপ্ন।

—দেশ? কোন্ দেশ?

—ঘুমোবে চল। মমতা শিবরামকে নিয়ে ঘরে যাই। বিছানায় আশ্রয় নিই।

মনে পড়ে একদিনের কথা। পঞ্চানন তখন খুবই দুরন্ত। বছর পাঁচেক বয়েস হয়েছে। পুথি পেলেই ছিঁড়ে কুটি কুটি করে নষ্ট করে দেয়। বলি, ছি বাবা, পুথিতে পা দিতে নেই। পুথি হল বিদ্যা। সরস্বতী ঠাকুর। নমো কর, নমো করো।

পঞ্চানন খিলখিল করে হাসে। হাতের পুথিটা দলামলা করে দেয়। পুথির পাতার ঘর্ষণে, দোমড়ানিতে শব্দ ওঠে, পঞ্চানন সেই শব্দে আনন্দে খুশিতে চিৎকার করে ওঠে।

শরিকি বাড়ি তখন ভাগ হয়েছে। আমার ভাগে একফালি ঘর আর দাওয়া পেয়েছি। দাওয়াটার এক ধার ঘিরে রান্না করার ব্যবস্থা হয়েছে। দক্ষিণমুখো দাওয়াটায় রোদ আসে। এই দাওয়াটা ছাড়া বাড়ির আর কোথাও রোদ আসে না। বাড়িটাকে যেন মনে হয় অন্য ঘরগুলো চেপে ধরতে আসছে। ঘরটাতে কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকে সব সময়। দাওয়া পার হয়ে পুব দিকে যে গলি চলে গেছে। সে গলিও দিনভর ছায়ায় ঢাকা থাকে। গলি চলে গেছে কাঁকিখালের দিকে। শীতকালে বাড়িটা কি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দাওয়াটায় শুধু রোদ আসে বলে ভাদ্র মাসে বালিশ বিছানা, তোরঙ্গ সব রোদ খাওয়ানো হয়। এই জন্যই বোধহয় দাওয়াটা তৈরি করেছিলেন পূর্বপুরুষরা। আমিও এই দাওয়াতে পাণ্ডুলিপি রোদ খাইয়ে নিই। লালচে হয়ে আসা পাণ্ডুলিপি সাবধানে রোদ খাওয়াই। তারপর সারা বছর ধরে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলোকে যত্নে বাক্সে ভরি। ভাদ্র মাসে বাক্স সমেত পাণ্ডুলিপি সব ওই দাওয়াতেই থাকে। ওগুলো দেখতে দেখতে নিজের মনে কথা বলি। এই সব লেখার প্রশংসা পাই, কিন্তু ঘরে ভাত জোটে না। লক্ষ্মীর কৃপা মেলে না।

মমতা সান্ত্বনা দেয়। বলে, দেখবে একদিন তোমার খুব নাম হবে। অর্থ হবে। এই বাড়ি ছেড়ে আমরা অন্য বাড়িতে চলে যাব। আমাদের সে বাড়ি হবে অনেক বড়ো।

—রাজার বাড়ি? জিজ্ঞেস করে শিবরাম। বলে, আমি রাজার বাড়ি যাব।

শিবরামকে বলি, হ্যাঁ আমরা রাজার বাড়ি যাব বাবা। আসলে সে ভাবে কেউ এসব

বুঝল না বুঝলি? যে বুঝত সে আজ বেঁচে নেই। তুই বড়ো হ, বড়ো হয়ে এগুলোর ব্যবস্থা করবি। পড়ে পড়ে দেখিস তখন।

ওকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি। আর ভাবতে থাকি। ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে যায়। কাক কোকিল ডেকে ওঠে। লেখা হয় না। ওকে আর কিছু বলাও হয় না। তখন দেখি, শিবরাম গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুয়ে আছে, আমার কোলের কাছে পুথির উপরে। ধীরে ধীরে ওকে তুলে দিই বিছানায়। রাতে ভালো ঘুমোয় নি। সকালে একটু ঘুমোক। মমতা বাড়ির কাজ শুরু করে দিয়েছে তখন।

এমনি করে করে রাত ভোর হয়।

লোকজনের চলাফেরা কথার আওয়াজ পাওয়া যায়। কাক ভোরে বেরিয়ে পড়েছে কিষাণেরা। কেউ বাঁকে, কেউ ঝুড়িতে করে মালপত্র নিয়ে চলেছে। ডুলিতে চলেছে ব্যবসায়ীর দল। বড়োলোকেরাও হাট করতে চলেছে ডুলিতে চড়ে।

গন্তব্য গঞ্জের হাট। হাতা-কড়া-খুন্তি। আলু-পটল শসা সমেত নানা রকমের মাটি মাখা সবজি কেনা বেচা হবে সেখানে। মাটির তৈজস-পত্র। তৈজসের তালিকায় সরা, খুরি, মালসা আরো অনেক কিছু আছে। গোরু মোষের জাবনা ভেজানো পাদনা। আরো কত কী!

বিনিময়ের তালিকায় রয়েছে গোরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া-হাস-মুরগিও। গোরু ছাগল কেনার হাজার রকম-ফের। দাঁত দেখে বুঝতে হয় বয়স হয়েছে ক-ত। গর্দান দেখে বুঝতে হয় বলদ কতটা লাঙল টানতে পারবে।

দূরে দূরে গ্রাম মাঝে হাট বসে। সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালানোর কেউ থাকে না, তবে দিবসে ঝাঁট পড়ে, জমে ওঠে হাট। সেহারার হাটে শুধু গোরু-মোষ নয়, এই হাটের পসরার তালিকায় রয়েছে বাঁশ ও তালপাতার ঝুড়ি, পাখা, চ্যাঙারি, বর্ষাতি, মাথালি। মাছ ধরার সরঞ্জাম, মাছের চার, পলুই, হাঁড়ি, কলসি, মুড়ি ভাজার খোলা। গামছা-ধুতি-শাড়ি, শীতের পোশাক আরো অনেক কিছুই।

শুধু এইসব? এই হাট থেকে দাস-দাসীও বিকোয়।

জমিতে চাষের জন্য খেতমজুরের দল নিয়ে আসে দালালের দল। সম্পন্ন চাষি, জোতদাররাও হাজির হয় দলে দলে। সওদা চলে রীতিমতো। গোরু মোষ সবজির মতোই টিপেটুপে ভালো করে দেখে নেওয়া হয় তাদের। পরখ করা হয় জড়ো হওয়া খেতমজুরদের কর্মক্ষমতা। সেই মতো মজুরি নির্ধারিত হয়।

গ্রামের মেয়েরা দলবেঁধে খেলা করে—এলাটিং বেলাটিং সই লো। খেলায় দু'টি দল হয়। একটি দলের মধ্যে রাজার প্রতিনিধি হয়ে একজন দূতী হয়। সে খবর আনে যে রাজা একজন বালিকাকে চাইছে। প্রত্যেক বালিকার এক একটা নাম হয়। এইভাবে এক এক করে প্রত্যেক বালিকাকেই চাওয়া হয়। মেয়ের দল ছড়া পড়ে—

—এলাটিং বেলাটিং সই লো—

—কীসের খবর আইলো?

—রাজামশাই একটি বালিকা চাইল।

—কোন্ বালিকা চাইল?

—অমুক নামের (খেলায় যে নামটা রাখা হয়) বালিকা চাইল।

এইভাবে খেলা এগিয়ে চলে।

পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা যে ভোগ্যা—এই ব্যথার ছবি খেলাতেও বেরিয়ে আসে। হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে বেরিয়ে আসে মেয়েদের প্রতিরোধের ইচ্ছাও। হয়তো ভেবে নেওয়া হয় ভোগ্যা না হওয়ার মানসিকতা এই খেলার মধ্যেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে। এই খেলার মধ্যে দিয়েই তারা নিজেদের অবস্থান বুঝতে পেরে আগামী দিনে ভোগ্যা না হওয়ার জন্য লড়াইয়ে নিজেদের সক্ষম করে তুলতে পারবে। তবে এই খেলার মধ্যে মেয়েদের নাম নির্বাচনের ব্যাপারটার মধ্যে একটা সৃজনশীলতা কাজ করে।

এ যেন মেয়েদের চোখের জলের যুগ। মেয়েদের তো বটেই। এদেশের নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলেই বিকোয় দাস হাটে। এখান থেকে চলে যায় বিদেশের দাস হাটে বিক্রি হবার জন্য। নবাব সুলতান বাদশাহরা দাসী ক্রয় করে হারেমে রাখে। তারা নিজেরা হাটে গিয়ে দাসী ক্রয় করে না। তার নিয়োজিত লোক থাকে, মহিলা বাঁদিদের নিয়োগ করা হয়। এরা রাজার হয়ে দাসী ক্রয় করে আনে হাট থেকে। রাজার পছন্দ মতো দাসী ক্রয় করতে পারলে ভালো পুরস্কার মেলে। আর সেইজন্যই ওই খেলায় বলা হয়—'আমরা বড়ো সুখী হলাম'।

এদেশে এসে পোর্তুগিজ পর্যটক ইবনবতুতা নিজে পনেরো টাকায় অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণীকে কিনেছেন। বিদ্যাপতির সময়ে চুয়াল্লিশ বছর বয়সের এক দাসের দাম ছিল ছ'টাকা, ফরসা তিরিশ বছর বয়স্কা দাসীর দাম ছিল চার টাকা, ষোলো বছরের ছেলেদের দাম ছিল তিন টাকা, আট বছর বয়স্কা কালো মেয়ের দাম ছিল এক টাকা। ভারতীয় মেয়েদের নম্র আচার আচরণের এবং সৌন্দর্যের জন্য একটি মেয়ে বিক্রি করে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

সহজপুরে সোম-বৃহস্পতিবারে হাট বসে। এই হাটে গিয়ে একটা মজার ঘটনা দেখেছিলাম।

খালি গায়ে নগ্নপদে একজন ব্রাহ্মণ হাটে আসেন। তিনি এলেই হাসির রোল পড়ে যায়। তাঁকে দেখতে সবাই হুড়োহুড়ি করে। আসলে প্রথমে তিনি কার কাছে যাবেন, কোন্ চাষিকে ধন্য করবেন তা দেখতেই ভিড় জমে। পথে তাঁর ছায়া পায়ে মাড়ানো যাবে না। মাড়ালে বিপদ হবে। সেই ভয়ে সন্তর্পণে সরে যায় সবাই। সবার সঙ্গে হাসি মশকরা, কুশল বিনিময় করতে করতে ব্রাহ্মণ এসে থামেন ছিদাম পোড়েলের সামনে।

ডাঁই করা একরাশ লাউ কুমড়ো নিয়ে বসেছিল ছিদাম। তখনো তার বউনি হয়নি। সবে সাজিয়ে গুছিয়ে বসছে। হাটে খদ্দেররা সবে আসতে শুরু করেছে। সেই সকালে তারা রওনা দিয়েছে গ্রাম থেকে হাটে আসবে বলে। বাঁ হাতে ডাঁটি শুদ্ধ একটা লাউ তুলে ব্রাহ্মণ তাঁর ডান পা খানা ছিদামের মাথায় স্পর্শ করিয়ে দেয়।

দুই হাত জড়ো করে সেই "সৎব্রাহ্মণের" পদধূলি নিয়ে ধন্য হয় ছিদামের জীবন।

সে তখন চোখের জলে ভাসে। জীবন তার ধন্য হয়, লাউ বিক্রি হোক আর না হোক।

ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টিটাই হল তার সেদিনের পরম প্রাপ্তি। ছিদামের পসরা ছেড়ে ব্রাহ্মণ এবার পা বাড়ায় ঝুড়ির দিকে। হাট থেকে ফিরতে একটা ঝাঁকা কিংবা একটা ঝুড়ি তাঁর

খুব জরুরী। জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে। ধরতে হবে সুবিধে মতো একটা মুটে। বিনি মাগনায় বাড়িতে আনাজপত্রগুলো যাতে পৌঁছোয়। একটা ঝুড়ি পছন্দ হতে তাতে লাউটি রেখে ডান পা খানা তিনি আবার ঝুড়িওয়ালার মাথায় ছুঁইয়ে দেন।

—'পেন্নাম হই ঠাকুর। গাছের মোচা আর পাকা কলা এনেছি। আমায় ঠায়ে একবারটি আসুন।' বলে ঠাকুরকে ডাকতে আসে হলধর।

বাগান থেকে তুলে আনা কলা বা দুটো বেগুন কিংবা একটা মোচার বদলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ পেতে তার দেরি আর সয় না।

এই ভাবে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় হাটের মধ্যে।

আশ্চর্য! কি বিচিত্র মানুষের জীবন!

ঠাকুরমাশাইকে নিয়ে হাট জুড়ে 'বেচারাম'দের (বিক্রেতা) কাড়াকাড়ি দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে শিবরাম।

ওকে জিলিপি আর কাঠি ভাজা কিনে দিই। খেতে খেতে আমার সঙ্গে হাটে ঘোরে।

শিবরাম বলে, বাবা তুমিও তো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দুবেলা চণ্ডী পাঠ করো। গৃহদেবতার পূজা না করে জল স্পর্শ করো না। আচমন না করে মুখে আহার তোলো না। কই তোমাকে তো ওরা এরকম লাউ দেয় না! কই বাবা, তোমাকে তো ওরা এরকম করে না?

ওকে বলি, ওসব ভালো কাজ নয় বাবা।

ভালো কাজ, খারাপ কাজ বুঝে উঠতে পারে না শিবরাম। হাটে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেই পঞ্চানন বায়না ধরে। বাবা আমিও হাটে যাব।

পঞ্চাননকে আশ্বাস দিতে হয়, তা হয় না বাবা। তুমি দাদার মতো বড়ো হও। তখন হাটে যাবে। তখন আর আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি নিজেই যেতে পারবে।

পঞ্চানন বলে, আমার জন্যে গোল্লা এনে দেবে বাবা?

—হাটে ওসব পাওয়া যায় না বাবা। তাছাড়া ওসব খেলে না তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। অনেক বড়ো হতে হবে। বাড়িতে পিঠে তৈরি হচ্ছে! তুমি বসে বসে পিঠে খাও।

গোল্লা আনতে ভুলে গেলে পঞ্চানন কান্নাকাটি করে। কাঁদতে কাঁদতে তারপর পঞ্চানন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ভোজবাড়িতে আজকাল অনেক রকম মিষ্টি তৈরি হয়। হরেক রকম পিঠে মিষ্টি। পায়েস তো আছেই। ইদানীং তৈরি হচ্ছে সন্দেশ নামে একটা ছানার মিষ্টি। হাটেও পাওয়া যাচ্ছে। ময়রারা হাটে চিনি, নবাত লাড্ডু করে। কতদিন ইচ্ছে করেছে নতুন এই মিষ্টি কিনে নিয়ে এসে সবাইকে খাওয়াব। তা আর হয় না। ময়রার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, ছানা লাগে অনেকটা। দামটাও অনেক বেশি। কোঁচড় ভর্তি করে আলু পটল ঝিঙে নিয়ে আসি। গোল্লা আনা হয় না। গোল্লা আনার কথাও নয়। মিষ্টি পিঠে ভালোবাসে পঞ্চানন। তার জন্য একটা মিষ্টি পিঠে কিনে আনি।

সংসার এগিয়ে চলে এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢিমে তালে। শিবরামের পইতে হয়। সে বড়ো হয়েছে। যশোদা সেও এখন বেশ ডাগর হয়েছে। আর কিছুদিন পর তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

চৈত্র আসছে। বাসন্তী পুজা এসে গেল। নিজেদের কিছু না হলেও চলে। কিন্তু ওদের জামা-কাপড়গুলো একেবারে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। পুজোর আগে একটা পাণ্ডুলিপি যদি বিক্রি করা যায় তাহলে পুজোর সময় ওদের মুখে কিছুটা হাসি ফোটানো যেত। এই সব ভাবতে ভাবতে হাটে ঘুরি।

ঢ্যাঙা রোগা লোকটা এসে সামনে হাজির হয়। এও যেন চণ্ডীরই দয়া।

কী অদ্ভুত যোগাযোগ! একটা পাণ্ডুলিপি কিনে নিল। বিনিময়ে যা দিয়ে গেল তা খুবই সামান্য। তবুও তো পাওয়া গেল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য।

মমতা দুহাত জোড় করে বলে, মা চণ্ডী এবার সত্যিই মুখ তুলে চাইলে গো।

ফারসি ভাষা শিখতে শুরু করেছি আমি। ফারসি সরকারি ভাষা। রাজ্যপাট চলে ফারসিতে। সংস্কৃত বা বাংলায় কোনো কাজ হয় না। কিছু করে খেতে গেলে ফারসি শিখতেই হবে। কৃষিকাজকে এক সময় প্রধান উপজীবিকা মনে করেছিলাম। কিন্তু রাজার খাজনার ঠেলায় সেই কৃষিকাজ করে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ মিশতে শুরু করেছে। দিল্লির সিংহাসনে বসেছেন আকবর (১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। ফারসি রাজদরবারের ভাষা হিসাবে কাজ করছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করছে আরবি-ফারসি শব্দ। হিন্দু-মুসলমানের সংযোগের পরিণামে ওই সব শব্দ বাংলায় ঢুকছে এবং 'বাংলা' হয়ে যাচ্ছে। এই শব্দগুলির মূল যে আরবি-ফারসি তা না বলে দিলে বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু এর বাইরে, প্রধানত ধর্মীয় আচারবিচার ও রীতিনীতির সঙ্গে জড়িত এমন আরো কিছু আরবি-ফারসি শব্দ আছে, যা দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানেরা শুধু কথাবার্তায় নয়, তাঁদের লেখালেখিতেও ব্যবহার করে আসছে বস্তুত তার উপর নির্ভর করে 'মুসলমানী বাংলা' বলে একটা বস্তুও তৈরি হয়েছে। বাংলা ভাষায় মুসলমান লেখকরা এভাবেই বাংলা সাহিত্যের মূল ধারারই অংশ, আপামর বাঙালি তার পাঠক। মুসলমানদের জীবনের সঙ্গে অপরিচয়ের কারণে এই সব শব্দের অর্থ অনেকেরই জানা নেই, আমিও জানি না। অথচ তা মুসলমান লেখকদের লেখায় অনিবার্য ভাবেই উঠে আসছে।

মানসিংহ, বীরবল, তোডরমল্ল আকবরের রাজসভায় রাজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান কর্তা। তোডরমল্ল আকবরের রাজস্ব সচিব। রাজসভার প্রচলিত সরকারি ভাষা হিসাবে রাজা তোডরমল্ল হিন্দুদের উন্নতিকল্পে ফারসি শেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। নিয়ম করেছেন, সমস্ত প্রদেশে হিসাব বন্দোবস্ত কাগজপত্র এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়ের নিরুপনপত্র ফারসিতেই রাখতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য রাজ্যের সব কাজকর্মে ফারসির ব্যবহার হতে থাকলে দেশের মানুষ সকলে ফারসি শিখতে বাধ্য হবে।

ফারসি শেখাও শুরু হয়ে গিয়েছে দিকে দিকে। উত্তর ভারতের সব ভাষা রূপ বদলাতে শুরু করেছে। উর্দু বলে একটি নতুন ভাষার উদ্ভব হয়েছে। তুর্কি শব্দ শিবির থেকে তৈরি হয়েছে উর্দু। বঙ্গে মুসলমান শাসনের সুত্রপাত থেকে, সংস্কৃত শাস্ত্রশাসিত বঙ্গ সাহিত্যের ধারা শুকিয়ে যেতে শুরু করে চৈতন্যদেবের ভক্ত বাহিনীর হাতে যে বঙ্গ সাহিত্যের জন্ম হয় তাতেও ফারসি ভাষার মেলবন্ধন ঘটে। তাবপর থেকে বঙ্গ ভাষার তরণিতে ফারসি

ভাষা বোঝা হয়ে ক্রমেই বেড়েছে। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা ব্যাপারটা ভালো ভাবে মেনে নিতে পারেন না। তারা না পারলেও সাধারণ মানুষের নিত্যকর্মে, ব্যবসায়ে, শিল্প বিপণিতে, হিসেবপত্রে, জমিদারি সেরেস্তায় ফারসির ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।

লোকায়ত ছড়া বা গানে মনসার কাহিনি, ধর্মের কাহিনি, চণ্ডীর কাহিনি সব পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে ফারসি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলমান ধর্মে মানিকপির, সত্যপির, ওলাবিবি, বনবিবি এদেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ধর্ম-সংস্কারের পথে কবরেরও সংস্কার হয়েছে। কবরে মামদো ভুতেরা এসে জুড়ে বসেছে। বাঙালিব নয়ন পথে জিন পরি, জিনী হিসাবে আকাশ মার্গে বিচরণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাঙালি পুরুষদের উপরার্ধে চেপেছে পরিচ্ছদ। আহার পদ্ধতির উন্নতি ঘটেছে।

বঙ্গ সাহিত্যের ভক্তিরসে ফারসি ভ্রমর ডুব দিয়ে দিয়ে এই ভাবে সন্তরণ করেছে। আকবরের মৃত্যুতে বঙ্গ ভাষার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে।

ফারসি ভাষার সংস্রবেই আমি লিখলাম—

"শুনরে সভার জন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হইব যে মতে,
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির সিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজন রাজ,
নিবাসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাষ চসি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।
ধর্ম্ম রাজ্য মানসিংহ, ...তার সনে।"

এভাবেই ফারসি শব্দ আমার লেখার মধ্যেও চলে এসেছে। আমার তো মনে হয় বাংলা শব্দভাণ্ডার ফারসির কল্যাণীয় স্পর্শে সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। মাগধি লৌকিকেও গোড়ায় এই অসংকোচ চলেছিল-এটা প্রাকৃতের গুণ। নেওয়া-থোয়ার ব্যাপারে এমনই অদ্ভুত বাংলা যে, কী তার ভাষা, কী তার মানুষ আশ্চর্য বাংলার মিশ্রণ-বুভুক্ষা।

পোতুর্গিজরা যখন আতাফল এনে দিল, এনে দিল আনারস। তখন সে তো নিয়ে তুলে রাখল। বর্মার কাগজ কলে কাজ করা মুসলমান শ্রমিক যখন আনলো লেবু-বীজ, সাদরে তাও তুলে নিয়ে পুঁতে দিল বাঙালি। ফল হলে নাম দিল 'কাগজি লেবু'। বাঙালি চিন থেকে গোপনে নিয়ে এল রেশমের গুটিপোকা। তা থেকে ঢাকায় বানালো দুনিয়া খ্যাত মসলিন। শবনম যার নাম, যা বাগদাদ রোম পর্যন্ত চলে গেল।

আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এই সব মিশ্রণের কোনো সম্বন্ধই নেই। ভেতো বাঙালির যে ভাত, সেটাও সংস্কৃত নয়। সেটি প্রাকৃত ভত্ত, এরই অপভ্রংশ ভাত। সংস্কৃতে 'ওদনম' চাইলে গৃহিণী ভাত দেবে না, কটু কথা ভেবে তেড়ে মারতে আসবে। গৃহিণী খেতে দেবে

না, উপোসে মরবে বাঙালি। বাঙালির সাধের লুচি, যার নাম শুনলে জিভে জল আসে। সেটাও ফারসি শব্দ।

পোর্তুগিজরা ফল দিয়েছে, পারসিক দিয়েছে জামা। বাঙালির পোশাক-পরিচ্ছদ, গায়ের জামা এসব বিদেশি শব্দ। বাঙালির নিজস্ব খাস পোশাকের নাম হল পাঞ্জাবি। সালোয়ার কামিজ ফারসি। কামিজ-শেমিজ সবই তো পারসি শব্দ। বাবু ফারসি শব্দ। হাত'টা বাঙালি হাত, কিন্তু কলম'টা আরবি। বাবু শব্দটা ভাঙলে দাঁড়াবে এই রকম, 'বু' মানে গন্ধ। যেমন খুশবু, বদবু। সুগন্ধ-দুর্গন্ধ। 'বা' একটি ফারসি প্রত্যয়, যার অর্থ সহিত বা সঙ্গে। গন্ধের সঙ্গে যিনি রয়েছেন অর্থাৎ গন্ধ মেখেছেন, তিনিই বাবু।

বাবা, খোকা, জ্বালাতন, দাদা, ঠাকুর, দৌড়, মানা, পড়া, খুব, গোলমাল, ফের, শুরু, বাজার, দাঁ, হাবুল, আলু, ধস্তাধস্তি, গরম, ডিহি, রাস্তা, উশকোখুশকো, চেহারা, মনকষাকষি, ইস্তফা, একটা, জিনিস-এগুলো একটাও বাংলা শব্দ নয়। এরা সবাই বিদেশি। কেউ তুর্কিস্তানি, কেউ আরবি, কেউ ফারসি। এসেছে মুসলমান শাসনের যুগ থেকে। বাবা তুর্কি। খোকা তুর্কি কোকা। জ্বালাতনে বর্গীয় জ-এর ব-ফলা সংস্কৃত আভিজাত্য জুটিয়েছে বটে, আসলে কিন্তু সে ছিল আরবি জালা-ওয়াতন। জালা নির্বাসন, ওয়াতন বোঝাতে কাউকে উত্যক্ত করা বোঝাত। শব্দটি বাংলায় প্রজ্বলন ঘটিত জ্বালার সুবাদে ঠাঁই করে নিয়েছে। কিন্তু জ্বালানি/জ্বালানে খাঁটি স্বদেশী।

দাদা তুর্কি পিতামহ ঠাকুরও তুর্কি তাগ্রি। উশ্বর, ঈশ্বরের সেবক, সম্ভ্রান্তজন অর্থে। তুর্কিভাষী শাসকদের সঙ্গে শব্দটি এদেশে ঢুকেছে। পরে ঠাকুর হয়ে ওঠেন সামন্ত প্রভু। দৌড় এসেছে আরবি 'দোয়ার' থেকে-চক্রাকারে ছুটে যাওয়া। যুদ্ধের একটি বিশেষ অভিযানে ব্যবহৃত হয়। খুব ফারসি খুউব। গোলমাল, ফারসি গুল-হইহই এবং আরবি মাল—গবাদি পশুর চলা। গড্ডলপ্রবাহ। চ্যাঁচামেচি। ফের ফারসি থেকে হিন্দি ফির হয়ে বাংলায় ঢুকেছে। দাঁ পদবিটি ফারসি, দাঁ মানে জ্ঞানী, জ্ঞাতা। সংস্কৃত জ্ঞা এবং ফারসি দাঁ একই শব্দ।

হাবুল এসেছে আরবি থেকে ফারসি হয়ে। প্রাক ইসলাম যুগে কাবা মন্দিরের লাল পাথরের তৈরি দেবতা হুব্বল/হাব্বল ইসলামি যুগে নির্বোধ অর্থে ব্যবহৃত হত। তা থেকে ফারসিতে আব্বা/হাবা। বাংলায় লা প্রত্যয় জুটিয়ে হাবলা হয়েছে এবং বংশ বিস্তার করেছে ভ্যাবলা। ভ্যাবা ভ্যাবাকান্ত পর্যন্ত। আদরে সেই হয়েচে হাবুল। বোকা-হাবাতেও সে আছে।

ধস্তাধস্তি এসেছে ফারসি দস্ত-ওয়া-দস্ত্ থেকে। দস্ত হল সংস্কৃত হস্ত। বাংলায় হাতাহাতি আর কী। ডিহি সংস্কৃত ফারসি দুই-ই। ছোট্ট বসতি বা গ্রাম বোঝায়। রাস্তা ফারসি-সমতল পথ। উশকোখুশকো মজার শব্দ। মূল শব্দটি হল খুশকো। ফারসি খুশক্-শুকনো, রুক্ষ। সংস্কৃত শুষ্ক বাংলা নিয়মে আধিব্যাধির আধির মতো উটকো হয়ে চলে এসেছে। খুশক্ থেকেই মাথার খুশকি হয়। চেহারা ফারসি চিহরা-রূপ। মনকষাকষি দেখতে দারুণ দেশি লাগে। কিন্তু আরবি শব্দ। 'মানাকোয়াশা' ঝগড়া/বিতর্ক শব্দটির বঙ্গীয় রূপান্তর মনকষাকষি। কিন্তু দর কষাকষিতে ফারসি কশাকশি আছে-টানাটানি অর্থে। কষে বাঁধো-তে ফারসি কশ-টেনে ধরা।

ফারসি দুতা, তেনতা বাংলায় দুটো তিনটে। কঞ্চিকে আমরা বাঁশ বনে পাঠিয়েছি। কিন্তু কঞ্চি এনেছে তুরুক-সোয়াররা। অশ্বারোহী তুর্কিদের হাতে ছিল 'কোয়ামচি'-ছিপটি। কলমপেষা আসলে কলমপেশা। কলম আরবি, পেশা ফারসি। কলম যার পেশা, সে কলমপেশা। আড়তে ওজন করে যে, সেই কয়াল আরবি। একবার ফারসি 'ইয়াক-বার'। বার মানে সময়। অর্থ সম্প্রসারণে দিন হয়েছে। একরোখার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ফারসি ইয়াক-রুখা। রুখ হল মুখ। একদিকে মুখ করে যে দাঁড়িয়ে আছে। যদি বলো এর মানে কি? তখন মানের পিছনে থাকে আরবি মানা এবং ফারসি মানি। আচার খাও যখন, তখন সেটা নির্ভেজাল ফারসি আচার। আয়না-ও ফারসি আয়না। আস্তে এসেছে ফারসি আহিস্তা থেকে।

চুলে যখন কলপ লাগানো হয়, তখন চুলের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে ফারসি জুলফ্। যা থেকে জুলপি এবং আরবি কলফ। একই মানে কাগজ ফারসি কাগাজ। কাগজের কোনো প্রতিশব্দ কোনো ভারতীয় ভাষাতেই নেই। কাগজ যে তুর্কি আমলে ভারতে এসেছে, এ তার প্রমাণ। এদেশে কাগজ ব্যবহার অপবিত্র মনে করা হয় তার উপাদানের জন্য। পশ্চিম ভারতীয় জৈনরা প্রথম ছবি আঁকার জন্য কাগজ ব্যবহার অপবিত্র করতে শুরু করে। এদেশে কাগজ নিয়ে এসেছে আরব ব্যবসায়ীরা। কাগজ যখন কাঁচি দিয়ে কাটি, তখন কাঁচির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে তুর্কি কাঁইচি।

বাংলার সঙ্গে জোড়বাঁধা আরেক শব্দ কানাঘুসা। কানের সঙ্গে ফারসি গোশ—কান। দুটো কান না হলে কানাকানি বা কানাঘুসা হবে কী করে? কারচুপি ফারসি, কার—চুব হল কাপড়বোনার সময় সুতোকে যার উপর বিছিয়ে রাখা হয়। কারদানি হল দক্ষতা, কারসাজি সব্যসাচীর দক্ষতা—সবই ফারসি। যেমন বই। কোরানের ওহি অর্থাৎ খোদার প্রত্যাদেশ। খোদা ফারসি, আরবি নয়। ওহি-র ব হল অন্তঃস্থ ব অর্থাৎ উঅ। বাংলায় একটাই ব, এটাও প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য, তাই হল বহি। তারই স্খলনে, মানে জিভ খসে, বই বেরিয়ে এল বাঙালির। ওহি শ্রুতি, কিন্তু বই লিখিত। বাঙালি যখন বই রচে বা বেচে, তাতে কি মুসলমানি গন্ধ থাকে? বই তো প্রকৃত গুণে, ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ। তেমনি পুস্তকের আগমন পহ্লবীদের পোস্তক থেকে ফারসি পোস্ত/পুস্ত হয়। পার্চমেন্ট বোঝাত প্রথমে। ফারসি এবং সংস্কৃতের অতি নিকট সম্পর্ক। প্রচুর শব্দ দুটো ভাষায় প্রায় একই।

পাখিদের ডানার শব্দ আরবি ফরফর। ফারসি ফরফর হল দ্রুত কথামালা—যা থেকে বাংলা ফড়ফড় করা। চুলের ওরা বোঝাতে আরবি ফরফর বাংলায় ফুরফুরে। ফাঁস ফারসি। মাল্লা আরবি। তাদের বদর-বদর হাঁক আরবি বদরি থেকে, যার মানে শিগগির করো শিগ্-গির। বন্দি ফারসি যে শৃঙ্খলিত। বরফ ফারসি। বর্গী ফারসি বার-গির অর্থাৎ মোটবাহক। কুলি শব্দটা তুর্কি। বস্তা ফারসি থেকে এসেছে। বাজে কথার বাজে ফারসি। বাদাবনের বাদা আরবি জঙ্গল। বেদে আরবি বাদিয়া-যা থেকে বেদুইন। অর্থাৎ যাযাবর। বারবার ফারসি। এর সংস্কৃতায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাযাবর।

বাংলার সুজনিকাঁথা লোকশিল্প হিসেবে বিশ্বখ্যাত হয়েছে। সুজনি ফারসি সুজানি/সুজন থেকে—যাব মানে সূচ দিয়ে সেলাই। ইটের সুরকিতে আছে ফারসি সুর্খি-লাল। সরাসরিতে

ফারসি সরাসর-শুরু থেকে শেষ। বাংলায় মানে বদলে গেছে। সর্দি ফারসি। অবস্থা সঙ্গিন, ফারসি সঙ্গিন অর্থাৎ গুরুতর। শক্ত কিন্তু সংস্কৃত নয়, ফারসি কঠিন। সুদও ফারসি। সবুজ, সবজি ফারসি। লালও তাই। রং, রংবেরং ফারসি। পরনের লুঙিও। লাখির পেছনে আছে পারসি লাকাদ/আরবি লাকাদ্। সন আরবি, সাল ফারসি। হুবহু এসেছে আরবি হুবা-হুবা থেকে। যার মানে হল, 'আরে, এ তো দেখছি সেই লোকটা'।

এধরনের প্রচুর প্রচুর শব্দের উদাহরণ রয়েছে। বাংলায় বিদেশি ছদ্মবেশী শব্দের সংখ্যা কম নয়। কুচিতেও তারা আছে। ফারসি কুচক হল খু দে। বাংলা খুচ-খাচেও সেই কুচক লুকিয়ে আছে খসড়া খাতায় দুজন আরবি। খুসরা—ছোট্ট, সংক্ষিপ্ত। খুচরা/খুচরো এই থেকেই। খাতা আরবি, খত্ত/ফারসি খত। চিঠিও বোঝায়। কুঙ্কুম আরবি কুমকুমের সংস্কৃতায়ন। আরবিতে কুমকুমা হল সুগন্ধি। কুলুপে আরবি কুফ্-ল্ (তালা) বাংলায় ছদ্মবেশ ধরেছিল ফারসি—কুলুখ-এর সুবাদে! চাষি ফারসিতে কাস্তকার। ধানকাটা কাস্তে সেই সুবাদে বাংলার মাঠে পৌঁছোতে পেরেছে। গ্রীষ্মে জানালায় যে খসখসের পর্দা ঝোলে, সেই খসখস ফারসি সুগন্ধ ঘাস। জলের কুঁজোও ফারসি কুজা থেকে। ফলের খোসা ফারসি খোশা। খাসি আরবি। ঘিঞ্জি ফারসি গাঞ্জ থেকে বাংলায় হয়েছে গঞ্জ। মরিচ ফারসি, তা থেকে উর্দুতে মিরচা। গোঁড়া/গোঁয়ার দুটোই আরবি ফাসিল গুমরাহ্ থেকে। চকমকি/চকমক করা তুর্কি শব্দ। চরকা ফারসি। চরকিও। চর্বিও। এমন কী চর্মকারও-সংস্কৃত চেহারা সত্ত্বেও। ফারসি জুতো নির্মাতাদের বলা হয় চরকার। 'কার' কথাটা খাঁটি ফারসি। পেছনে তথকথিত ইন্দো-ইরানি কৃ ধাতু অবশ্যই আছে। চাকরও ফারসি। তেমনি চাঁদা, চাদর, চাপাটি, চাপর, চাবুক, চালাকও। চিক তুর্কি পর্দা-চুগলি তুর্কি চুগল—চর অর্থে। ফুল ফারসি গুলের বাংলা রূপ। ফুলের তোড়ায় আছে আরবি তুর্-রা। এক গুচ্ছ ফিতেবাঁধা চুল। বালাই ষাটের বালাই কিন্তু আরবি বালাই অর্থাৎ ব্যামো। মা ষষ্ঠী পাশে বসে বরাভয় দিচ্ছেন।

রেষারেষি সংস্কৃত মনে হয় বটে, কিন্তু এ হল ফারসি রিশ্/রেশ্-কে বাংলায় ঢুকিয়ে ভোল বদলে দেওয়া। রেশ মানে ক্ষোভ/রাগ। মূর্ধন্য ষ দিয়ে সংস্কৃত আভিজাত্যের চেকনাই দেওয়ার চেষ্টা। বঙ্গ ভাষার বৈতরণীতে এমনই কত কি শব্দ নাও ভাসিয়েছে। বাংলা ভাষা এই রকমের অথৈ রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। চোখের মতো, চোখ যেমন সব কিছু দেখে, অথচ নিজেকে দেখতে পায় না। ভাষাও তেমনি সব কিছু ব্যক্ত করে, কিন্তু তার নিজের সম্পর্কে কোনো বর্ণনা দেয় না। নিজের থেকে সে কিছুই বলে না। এই ভাষা জলধির কিনারা কোথায়? মূল জানলেই কি জানা হল তাঁকে?

—ভাষা যদি মূল হয় তবে মৌলিক বাংলা শব্দ কতগুলো?

—সেজদি-সেজ-র জ সংস্কৃত, 'জন' ধাতু, যা জন্ম বোঝায়। তার সঙ্গে ফারসির সেহ্ অর্থাৎ তিন জুড়ে সেহজ, এখানে হ্ লুপ্ত হয়ে সেজ। অগ্রজ বোনেদের তৃতীয় জাতিকা বোঝালে সেজদিদি। একই নিয়মে সেজজা, এখানে জায়ার জা বসেছে সংস্কৃত 'জ' এর পাশে, তার আগে মুখড়া ফারসি তিন। প্রাকৃত ভিজে সেজজা সেজজা হবে, উগ্র বর্গীয় ব্যাপার। পুরো ব্যাপারটা প্রাকৃত ঢলে পড়েছে, হয়ে উঠেছে বাঙালি লৌকিক। বোঝা

দরকার, এরকম করে ফারসি-আরবি-তুর্কি বাংলায় ভিড়ে পড়েছে। তাকে আর বিদেশি বা মুসলমানি বলা যাবে না। বলতে হবে ফারসি-বাংলা, আরবি-বাংলা, তুর্কি-বাংলা, সংস্কৃত-বাংলা।

লেখার উপর খুঁতখুঁতে স্বভাব সবসময় আমাকে অতৃপ্ত রাখে। যতক্ষণ না নিখুঁত করতে পারি, মানসিকভাবে কষ্ট পাই। এসব তাই আমাকে জানতে হয়েছে।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে। জলচৌকি পেতে লিখতে বসি। বসে বসে লেখা আমার অনেক দিনের পুরোনো বদ-অভ্যেস। সেজের বাতি জ্বলে। মমতা যশোদাকে নিয়ে শুয়ে থাকে খাটে। শিবরাম আলাদা শোয়। আমার বিছানা অন্য খাটে।

কখন ঘুমুতে যাই কেউ টের পায় না। সবাই শুয়ে পড়লে সেজের দীপ জ্বালিয়ে রাত জাগি, লিখি।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মমতা বিরক্ত হয় আমি জেগে আছি বলে।

বলে, জলচৌকিটা বিয়ের সময় বাবা দিয়েছিলেন। সেটা এভাবে কাজে লাগছে দেখে ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি ভেবেছ কী? বসে বসে রাত জাগছ। জানো? সেজের কত দাম হয়েছে? কিছু একটা কাজ করলে না হয় জ্বলতো।

—অ লেখাটা বুঝি কোনো কাজ নয়?

আমার উত্তরে মমতা অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

—তা বলে তুমি রাত জেগে জেগে লিখবে? তারপর বলে, যাতে কোনো আয় নেই, তা আবার কীসের কাজ?

—হ্যাঁ ঝুড়ি তৈরি করতে পারলে, মাটি কোপাতে পারলে কাজের মতো কাজ হয়। লেখালেখিতে তা হয় না। আমি হাসি।

—তুমি যে আবার একটা নতুন কাব্য লিখবে বলেছিলে, তার কি হল?

—কই আর হল।

—সেদিন যে মানুষটা খুব ভালো বলছিল। ওই যাকে তুমি পুথি নকল করতে দিলে। সেটা ফেরত পেয়েছ?

—না কত পুথি কত জনে নিয়ে যাচ্ছে। জীবনে অনেক কিছুই ফেরত পাওয়া যায় না। কোথায় কার ঘরে পড়ে আছে কে জানে। ওই পুথিটার কথা মনে পড়লে খুব দুঃখ হয়। একটাই কেবল ছিল। বুকের ভেতরটা গুমগুম করে ওঠে। ওঠা যে কেন লিখেছিলাম। তোমরা কেউ দ্যাখো নি। দেখলে মনে থাকত। সে যদি বেঁচে থাকত.......

—সে কে?

শিবরাম উঠে এসেছে।

—বাবা তুমি ঘুমোও নি।

কি বলব? চুপ করে থাকি। কলম থেমে যায়।

অঘ্রানের রাত। ঘরের মেঝে খুব ঠান্ডা। শীত পড়েছে বেজায়। ছেলেটা মাদুরের ওপর শুয়ে ছিল। মাদুর কি করে আটকাবে এই ঠান্ডা? কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত জমে যেন বরফ হয়ে যাচ্ছে।

ঠান্ডার জন্যই শিবরামের ঘুম ভেঙে গেছে। সে উঠে এসেছে চাদর গায়ে দিয়ে। আমার পাশে এসে বসে।

দেখতে চায় আমি নতুন কি লিখেছি।

—ঘুম ভেঙে গেল বাবা?

—কী লিখছ বাবা তুমি?

—কবিতা।

—কি হয় লিখে?

—মানুষ অমর হয়।

—আমি অমর হব বাবা।

—বেশ।

ম্লান হাসি ছেলের কথায়। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিয়েছি। তাতে শিখার তেজ ম্লান হয় বটে, কিন্তু দীপের আয়ু বৃদ্ধি হয়।

সংস্কৃতে বলে এড়ণ্ড। বাংলায় বলে রেড়ি। দীপ থেকে তেল গড়িয়ে পড়ে, সলতের ধোঁয়ার চারদিক ভরে যায়।

—এখনও লিখবে বাবা?

—না লিখে যে পারি না। কত দিনের অভ্যাস। যেদিন লেখা হয় না, শুয়ে পড়লে মনে হয় কলম ধরা আছে হাতে। কে যেন আমায় ঠেলে বসিয়ে দেয় জলচৌকির ওপর। কানের কাছে কেবল বলে, তুমি লেখো। তুমি লেখো।

হাতে লয়্যা পত্র মসী আপনি কলমে বসি
যে বোলান যেই বা লিখান।
না জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দমুখে
নিজ সংকীর্তন রস গান।।

জলচৌকির সামনে বসে বসে ঢুলি। দেখে শিবরামের কষ্ট হয়।

হঠাৎ কোথা থেকে দমকা হাওয়া আসে। সেই হাওয়ায় লেখার পাতাগুলো ঘরময় উড়তে থাকে সাদা পায়রার মতো। ফরফর করে শব্দ ওঠে। আমার ঘুমের আবেশ ছুটে যায়। কাগজগুলোকে মনে হয় ওরা যেন জীবন্ত, ওদের প্রাণ আছে। ঘরময় ওরা ওড়ে। শিবরাম ওগুলোকে ধরবার জন্য ছোটে। ঝিমুনি ভেঙে জেগে উঠি আমি। আমার তখন মনে হয়, ফরফর শব্দ যেন দাঁড়ের শব্দ। নৌকা চলছে ছপছপ। ছপছপ্‌।

বিশাল সে নৌকো। ঠিক যেন হাজার দাঁড়ের নৌকো চলেছে সমুদ্রে।

গায়ে পায়ে ঘরের বাইরে আসি। ভোর হয়ে আসছে। ঊষার প্রথম লগ্নে ভোরের আকাশ গভীর কালো। এই কালিমা ঘুচিয়ে ঊষার আলোর এবার প্রকাশ ঘটবে।

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশসং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌........। আবৃত্তি করি।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেলফুল দুলছে। তুলসীতলায় যশোদা পুণ্যিপুকুর কেটেছে। সে ব্রত পালন করছে।

আকাশে চারদিক ঘন হয়ে আসা পুঞ্জীভূত মেঘের মালা, সব মিলিয়ে যেন একটা কবিতা জেগে উঠছে।

পুণ্যি পুকুর করতে করতে যশোদা স্বপ্ন দেখে সুন্দর সুখী একটা ভবিষ্যতের। তার এই স্বপ্ন তৈরি হয় বাঙালি মেয়েদের আজন্ম লালিত স্বপ্নের ধারাবাহিকতায়। একটা ছোট্ট সংসার, একজন ভালোবাসার মানুষকে ঘিরে।

সে আবৃত্তি করে-

'পুণ্য পুকুর পুষ্পমালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা
আমি সতী লীলাবতী
ভায়ের বোন ভাগ্যবতী
স্বামীর কোলে পুত্র রেখে
মরণ হয় গো যেন গঙ্গা জলে।'

ব্রত শেষে যশোদা আয়নায় মুখ দেখে, কপালে টিপ পরে।

আবৃতি করতে ভালো লাগে সকালে নদীর পাড়ে।

নদীর পার ধরে হেঁটে চলি। আমার সকাল সন্ধে নদীকে নিয়ে।

প্রাক সন্ধ্যায় চাঁদের রহস্যময় আলোয় নদীকে যেমন মনে হয় সে নদী নয়। সকালে রোদের আলোয় সেই নদীর চেহারা অন্য রকম। সন্ধ্যায় নদী থাকে দুঃখের জলেভরা। আর সকালে সেই নদী নির্মল পতিত উদ্ধারিণী। চারদিকে তাকাই। কোথাও একটা ডিঙি নৌকো নেই। খা খা করছে নদীর বুক। ডিঙি নৌকাগুলো সব উধাও হয়েছে।

দিগন্ত বিস্তৃত ধানের জমি আকাশের নীচে সবুজ গালিচা পেতে দিয়েছে। সবুজের দিকে তাকাই। ধানের শিষে হাত বোলাই। এই ধান জিনিসটা গোড়ায় ছিল ঘাস, তৃণ। তৃণকে কর্ষণ করে করে ধানে পরিণত করা হয়েছে। নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করার নাম কর্ষণ। এমন করে সেটা হবে যাতে পুষ্টি আসে, লাবণ্য ফোটে এবং সৌষ্ঠব জন্মায়। যাতে সৌষ্ঠব নেই, তাতে কর্ষণ নেই, সংস্কৃতি নেই। এইভাবেই বিভিন্ন দেশ-জাতি-পণ্য, বিরোধী বা অচেনা ভাবের মধ্যে বিনিময় হয়েছে। বছরের পর বছর। তা কখনও কখনও সংঘর্ষমূলক হয়েছে, তাতেও কর্ষণ বিগড়োয় নি। বরং সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে।

—আচ্ছা, কী বংশে, কী ভাষায় বঙ্গবাসী বরাবরই কি নিকৃষ্ট ছিল? এটা কি আপনারও মত?

—এক আধ ফোঁটা আর্যরক্ত মিশেছে কোথাও কোথাও, কিন্তু তা যে আর্য রক্তই সে কথা কে বলবে? সত্যি বলতে কি, বঙ্গবাসী আর্যের ছোঁয়াচ পেয়েছে, ছাঁচ পায়নি। বঙ্গবাসীর গায়ের রং কালো, এবং তামাটে ধরনের ফরসা। একে কি রক্তের আর্যত্ব বলা যায়? তাই যদি বলা যায় তাহলে তো একটা রক্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য বের হয়ে আসে। নমঃশূদ্ররা উত্তরভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সমগোত্রীয় অর্থাৎ উত্তর ভারতের বর্ণ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থদের চেয়েও বাঙালি নমঃশূদ্রদের আত্মীয়তা বেশি। আসলে ভাষা আর বংশকে মেলানো বেশ কঠিন। অসাধ্যই বলা যায়।

বঙ্গদেশ বিভিন্ন তালুকে বিভক্ত হয়েছে। হিন্দু গ্রাম নগর যেমন আছে, মুসলমান নামেও গ্রাম আছে শহর আছে। উজির, কোটাল, সরকার, ডিহিদার, জমাদার, পোদ্দার, রাজকর্মচারীরা কাজ করে। তারা পুরস্কারের পরিবর্তে খিলাৎ পাচ্ছে। শ্রীমন্ত, গম্ভীর এদের উপাধি খাঁ। সমাজের সকল স্তরে এবং ভাষার অভ্যন্তরে মুসলমান রীতি-নীতি রীতিমতো দড় হয়ে বসেছে। ভাষা নিজের অজান্তেই নতুন মূর্তি ধারণ করছে।

—চণ্ডী আপনাকে স্বপ্নে আদেশ করেছে আপনি বলেছেন। তাঁর মহিমা গান আপনি প্রচার করতে চান। সেই মহিমাকীর্তন হল ক্ষমাহীন ন্যায়-ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অন্যায়কারিণী শক্তির সাথে তাকে মাথা নত করতে হচ্ছে। নিজের আরাধ্য দেবতাকে করছে অশ্রদ্ধেয়। আপনার চণ্ডী ভীষণ নিষ্ঠুর, ন্যায় ধর্মের দোহাই তিনি মানেন না। তিনি সব ধরনের দুষ্কর্মই করতে পারেন। নির্মম এই দেবীর কাছে নিজেকে হীন করে, ধর্মকে অস্বীকার করে তবেই ভীরুর পরিত্রাণ। এ আপনি কি লিখেছেন?

—এর কি উত্তর দেব?

চুপচাপ বসে থাকি। চুপচাপ বয়ে যায় নদী।

নদীর নীচে জলের তলায় পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়। সেই ঠোকাঠুকির শব্দ কানে আসে।

নদী মানুষকে বিপন্ন করে। ঘর ভাঙে, সংসার ভাঙে। বাসন কোষণ তৈজস-পত্র ঘর গৃহস্থালি গোরু বাছুর সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানুষকে আতান্তরে ফেলে। নদী আবার অনেক কিছু গড়ে দেয়।

রবি ও চৈতালি ফসলে গ্রামকে করে তোলে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয় হেমন্তের মাঠের সোনালি প্রান্তরে। আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো, লাউ, কাঁকুড়, তরমুজ সব কত রকমের ফসলে মাঠ ভরে যায় তখন। তারপর পাটের সময় পাট। বৈশাখ জৈষ্ঠ্যতে আম কাঁঠাল। আম কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ম-ম করে। সকালবেলাতেও আমগাছ তলায় মাছি ভনভন করে। হাঁটা যায় না, এত মাছি। বাদুড়ে খাওয়া আমের ওপর মাছি বসে থাকে। সোনালি রোদে পাকা আমের গন্ধ মাদকতা ছড়ায় চারদিকে।

বাংলা ছন্দকে সৌসাম্যের নিয়মে বাঁধবার চেষ্টা করছি। সংস্কৃত ও পারসিক ভাষার পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করি। ভাষাবিন্যাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য মানতে পারি না। বাংলা শব্দের সঙ্গে পারসিক শব্দের মিলন ঘটিয়ে সার্থক কাব্য রচনা করবার চেষ্টা করছি। দেবতাকে শুধু মানুষ নয়, নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করি। বাঙালি চিরকাল দেবদেবীদের একান্ত প্রিয়জন হিসাবে কল্পনা করে তার অন্তরের নিকটবর্তী আসনে বসিয়ে রেখেছে। তাঁদের সিংহাসনে বসিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেনি। রেখেছে—দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা করে।

—আচ্ছা, চণ্ডী তো নিষাদ শবরদের দেবতা, ছোটোনাগপুরের মৃগয়াজীবী বীরহোড় ও ওরাওঁদের পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁকে তুলে এনে ব্রাহ্মণ্য সমাজে দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন ছিল?

—প্রয়োজন ছিল বইকী?

—আপনি নিজে ব্রাহ্মণ অথচ ব্যাধের মতো অন্ত্যজ জাতিকে দিয়ে দেবীর পূজা প্রচারে গান করিয়েছেন? উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হয়ে আপনি কিনা—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥'

'ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়।'

অস্পৃশ্য ব্যাধ সন্তানকে আপনার কাব্যের নায়ক করে শৌর্যে বীর্যে মহত্ত্বে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আর শেষে কিনা জাতি নাশের আশঙ্কায়, ব্যাধ আসলে যে শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রের ছেলে একথা লিখে দিলেন? এটা কি আপনার আত্মসান্ত্বনা?

—না। আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি।

—আবার দেখুন, আপনি লিখলেন দারিদ্র্য নিয়ে শিবের সাথে ঘোর ঝগড়া পার্বতীর। অন্য দিকে তাঁর আদেশ মাত্র বিশ্বকর্মা মন্দির গড়ে দিচ্ছেন; সমস্তই যেন কেমন অদ্ভুত একটা স্বপ্নের মতো সঙ্গতিহীন। পাঁজির হিসেব দ্যাখো, কেমন পরপর পূজা-পার্বণগুলো সাজিয়ে দিয়েছে। ঘোর বর্ষায় রাস্তা ঘাট নদী নালা বন্যায় ভাসিয়ে ভেঙে চুরে সব তছনচ করে দিয়ে যায়। তারপরই আসে বিশ্বকর্মা, তিনি আসেন গড়তে। একদিনের জন্য, একদিনেই তিনি রাস্তা ঘাট সাঁকো সব মেরামত করে দিলেন। তাঁর বাহন সেই জন্যই হাতি। ভাবো তো তাঁর সঙ্গে যদি বাহন হিসাবে ইঁদুর বা অন্য কাউকে জুড়ে দেওয়া হত, সে কী পারত বিশ্বকর্মাকে সাহায্য করতে?

—না। এ সব তো পুরাণের গল্প।

—হ্যাঁ। গল্পই, কিন্তু গল্পের গোরু শুধু গাছে উঠে যায়নি। এগুলো মাথা ঘামাবার বিষয়। আমি যা লিখছি, এটা ইতিহাস নয়, কাব্য।

—সে আপনি যাই বলুন। আপনি নিজে বৈষ্ণব হয়ে শেষে কিনা একটা শক্তির আরাধনা করে বসলেন!

—তুমি ভুল করছ। মনসা, চণ্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্মঠাকুর এঁরা নামে দেব-দেবী হলেও প্রকৃতিতে মানুষ। মানুষের মতো ঈর্ষা, প্রতিহিংসাপ্রবণতা, লোভ ও কাপুরুষতা এই সব দোষগুলি এঁদের মধ্যে বর্তমান। আসলে কাব্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের প্রকাশ তা আসলে মানুষের সঙ্গে তৈরি মানুষের দ্বন্দ্ব। অদৃশ্য কোনো শক্তির বিরুদ্ধে অথবা অলৌকিক কোনো শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম নয়।

—কি জানি, হবে হয়তো। আমি তো পণ্ডিত নই। সাদামাঠা মাথায় যা মনে হয়েছে তাই বললাম আপনাকে।

—বাংলায় রামায়ণ মহাভারত পড়েছ তো? রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ তো আদতে পাঁচালি, মঙ্গলকাব্যও পাঁচালি। পয়ার ছন্দ এযুগের গদ্য।

—চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত-ও তো গতানুগতিক ছন্দ অর্থাৎ পয়ার ত্রিপদীর

কোনো ব্যতিক্রম করেন নি। কিন্তু আপনি এসব কি করলেন? এই যে আপনার কাব্য। এতে আপনি নতুন ছন্দের বিকাশ ঘটিয়েছেন, এই কাজটা কি ভালো হল?

—ভালো কি মন্দ জানি না, সেটা আগামীকাল বলবে। তবে গ্রাম্য ভাষায় যতটা পারি সহজ সরল করে গান বাঁধবার চেষ্টা করেছি।

দামিন্যায় থাকতে একদিন বেড়ার ধারে ভেরেণ্ডার ডালগুলো ভালো করে পুঁতে দিচ্ছিলাম। সব বসত বাড়িতেই বেড়ার জন্য লোকে ভেড়েণ্ডার ডাল লাগায়। ভেরেণ্ডার ডাল দাঁত মাজতেও ব্যবহার হয়, এ বড়ো কাজের গাছ। বাড়ির এই সব কাজকর্মে পঞ্চাননের উৎসাহ ছিল খুব। ফাঁক পেলেই ছুটে আসত। আমার তখন নিজেরও যেন শিশুর মতো হয়ে উঠতে ইচ্ছে করত। খেলা গল্প ছড়ার সঙ্গে পঞ্চানন শিখে নিচ্ছিল, দয়া-মায়া ভালোবাসার সহজ পাঠগুলো।

গাছের প্রাণ আছে, গাছও মানুষের মতো আঘাতে ব্যথা পায়। এ-কথা আমার কাছে শোনার পর থেকেই গাছের প্রতি পঞ্চাননের মমত্ব বেড়ে গিয়েছিল। গাছ কাটতে দেখলে বা পাতা-ফুল ছিঁড়তে দেখলে মনে মনে ও খুব কষ্ট পেত। এরই মধ্যে পঞ্চানন একদিন বাড়ির বাগানের বাইরে ফেলে দেওয়া আগাছার মধ্যে একটা ডালিম চারা বেছে বের করেছিল। আমার সাহায্য নিয়েই বেড়ার ধারে যত্ন করে লাগিয়ে দিয়েছিল। দু'বেলা জল দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছিল গাছটাকে। তারপর একদিন কাঁটা গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল গাছটাকে। ছাগলে যাতে খেয়ে না ফেলে। কিছুদিনের মধ্যেই ডালিম গাছটা ডালপালা মেলা আকাশমুখী হয়ে উঠেছিল।

এসব দেখে পঞ্চাননের শিশুমন খুশিতে ভরে উঠত। গাছেরও প্রাণ আছে, তারাও দুঃখ পায়। এসব জানে বলেই হয়তো নিজের হাতে বাঁচিয়ে তোলা ডালিম গাছটার প্রতি তার মমত্ব বেড়ে গিয়েছিল। অতি আপনজন ভেবে নিয়েছিল তাকে। সুযোগ পেলেই গাছটার সামনে এসে দাঁড়াত, কথা বলত গাছটার সঙ্গে। কখনও মমতার ধমক খেয়ে আমার কাছে চলে আসত। আমাকে নালিশ করত। কি করব সমবেদনা জানাতাম।

সেই দিনটা এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই। উঠোনের এক পাশে স্থলপদ্ম গাছে নীচের দিকে একটা ফুল ফুটেছিল। খেলতে খেলতে বারবার সেটির দিকে হাত বাড়াচ্ছিল পঞ্চানন। আমার ইচ্ছে ছিল না, ফুলটি তুলে সে নষ্ট করুক। তাই ওকে নানাকথায় ভোলাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে থাকতে আবার হাত বাড়াচ্ছিল পঞ্চানন। শেষে ওকে বললাম, ওটি ছিঁড়লে গাছ কাঁদবে।

—গাছ কাঁদবে? অবাক হয়েছিল পঞ্চানন।

—হ্যাঁ। গাছ কাঁদে।

—গাছ আবার কাঁদে নাকি?

—কাঁদে। কথাও বলে।

—কথা বলে?

—হ্যাঁ। শুনতে পাও না। সারা রাত ওরা নিজেদের মধ্যে ফিশফিশ করে কথা বলে। পঞ্চাননের চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে। সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে, আমি শুনব।

—তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ো।

—আমি ঘুমোব না।

—বেশ। এখন তবে চলো। রাত্রে শুনবে।

যেদিন শরিকি বাড়ি ভাগ হল। ঘুম থেকে উঠে পঞ্চানন দেখেছিল বেড়া তুলে দিয়ে লাগোয়া উঠোনে অচেনা দুজন লোক মাটি কেটে ঘরের ভিত, গড়ছে। অন্যান্য কিছু গাছের মতো তার প্রিয় ডালিম গাছটাও উধাও হয়েছিল। সেখানে উঁচু হয়ে জমে গিয়েছিল মাটির স্তূপ।

পঞ্চানন ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। ছুটে গিয়ে দুহাতে মাটি সরিয়ে তার আপনজনকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অনেক নীচে চাপা পড়ে থাকা তার বন্ধুকে সে খুঁজে পায় নি।

আমার চোখে পড়ে যায় ঘটনাটা।

ওকে কাছে ডেকেছিলাম। আশ্বস্ত করে বলেছিলাম, নতুন একটা ডালিম চারা এনে দেব।

মমতা এসে জোর করে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাঠশালার জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

ওর তখন খেতে মন নেই। চাটাই আর আঁক কষার শ্লেট থলেতে নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে পাঠশালায় চলে গিয়েছিল।

সংসারের এই সব খুঁটিনাটি আমার ভালো লাগে না কোনোদিন। আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। আমার পৃথিবী হল পাণ্ডুলিপির বাক্স। কলম, কালি লেখার সরঞ্জাম। আর মন? হ্যাঁ মনটাও চাই।

মমতা বিরক্ত হয়েছিল।

বলেছিল, আসলে তোমার কোনো ক্ষমতাই নেই। সদর দরজাটা কতদিন ভেঙে গেছে। না সারাচ্ছ নিজে, না ডাকছ মিস্ত্রি।

—মিস্ত্রিকে বলেছি, ছোটো কাজ বলে হয়তো আসছে না। সময় মতো ঠিক আসবে।

—তাহলে কি দরজাটা ভেঙে গেলে মিস্ত্রি আসবে? মমতার গলায় ছিল উষ্মা!

—অসুবিধে হয়নি তো। চলে তো যাচ্ছে।

—চলে যাচ্ছে বটে। তুমি তো আর লাগাও না। দরজাটা লাগাতে রীতিমতো কসরত করতে হয়। কখনো ঠিকঠাক লেগে যায়, কখনো অনেক চেষ্টা করেও লাগানো যায় না। কোনো কিছু দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখতে হয়। ঘরবাড়ির এরকম কত ধরনের খুঁটিনাটি আছে, আর তোমার এসব দেখার অবসর নেই। দিনরাত লেখা নিয়ে পড়ে আছ।

সেদিন পাঠশালার ছুটির পর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ঘরে ফিরলেও পঞ্চানন বাড়ি ফেরে নি। ছুটির পর কীভাবে যেন সবার চোখ এড়িয়ে উধাও হয়েছিল সে। মমতা যখন শুনল, মমতা-র মাথায় বজ্রাঘাত হল। সে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল।

খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম চারদিকে। অবশেষে উৎকণ্ঠার ছেদ হল। শিবমন্দিরে পাওয়া গেল ওকে। অসুস্থ পঞ্চাননকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল মহাকাল মন্দিরের পুরোহিত।

শেষে মাটির স্তূপ সরিয়ে ডালিম গাছটাকে বাঁচানো হল। পঞ্চানন তার প্রিয় গাছটাকে

দেখতে পেয়েই বিহ্বল হয়ে ছুটে গিয়েছিল তার কাছে। পরম আন্তরিকতায় তার ডাল-পাতায় হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম সব।

যদু কুণ্ডু পরামর্শ দিয়েছিলেন এই একচিলতে দালানকোঠা বাড়ি আগলে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। যদু কুণ্ডু আমার বন্ধুস্থানীয়। পাশের গ্রামে বাড়ি। তিনি আমার একজন গুণগ্রাহী। তবে সমালোচনা করতেও ছাড়তেন না।

দামিন্যায় ফিরে আসার পর বলেছিলেন, তা বাপু তোমার ফুল্লরাই বলো, ভাঁড়ু দত্তই বল, আর মুরারি শীল এ সব তো আমাদের পরিচিত মানুষ। নতুন কি তুমি দেখালে?

—নতুন আর আমি কি দেখাব? আমি তো এই সমাজের কথাই বলতে চেয়েছি। বোঝাতে চেয়েছি মানুষের জীবনের নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ কথনই তো সাহিত্য। এইসব আলোচনায় আমার বুকের মধ্যে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে পড়ে।

যদু কুণ্ডু বলেছিলেন, রাঢ় চিরদিনই বীরের ভূমি,—বীরভূম, মল্লভূম, শূরভূম এইসব নামকরণ তো এই জন্যই। দৈবশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এখানকার মানুষ। কোনো দৈব প্রলোভন এদের বহুকাল পর্যন্ত প্রলুব্ধ করতে পারেনি। কিন্তু তুমি লিখেছ মানুষ দৈবের বশ।

আমি বলেছিলাম, বঙ্গের এই রাঢ়ভূমিতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটা স্বতন্ত্র সামাজিক জীবনের আদর্শ গড়ে উঠেছে। আপনি ঠিকই বলছেন। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে এক অনার্য জাতির বাস ছিল। আমি বলতে চেয়েছি সেই অনার্য জাতি একদিন ভেবেছিল একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা। কালকেতুর গুজরাত বন কেটে নতুন নগর পত্তন শুধু রাজা হবার জন্য নয়। এই নতুন সমাজে কোনো ডিহিদার থাকবে না। এই ভাবনাটাই আমি শুধু সবার মধ্যে চারিয়ে দিতে চেয়েছি।

—হ্যাঁ। এই বিষয়টা তুমি ভালো তুলে ধরেছ। এটা খুব ভালো দিক। কিন্তু এটা তুমি বলতে চেয়েছ ব্রাহ্মণ্যবাদের জয় হোক এই মোড়কে।

—সে দোষে আমি যে দুষ্ট নই, একথা অস্বীকার করার সাহস আমার নেই। এভাবে না লিখলে ব্রাহ্মণরা আমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছেন? তবু এরই ভেতরে নতুন কথা আমি যা বলার তা বলবার চেষ্টা করেছি। আপনি ভাবুন তো এমন একটা রাজ্য কি হয় না? যেখানে সবাই ভালো—রাজাও ভালো প্রজাও ভালো। কি দরকার মারামারি কাটাকাটির?

—কিন্তু তা বলে আপনা-আপনি সবার মনে পরিবর্তন ঘটে যাবে তুমি বলতে চাও?

—না। তাও আমি বলিনি। কালকেতুকেও যুদ্ধ করতে হয়েছে, বিপদেও পড়তে হয়েছে।

—কিন্তু তোমার এসব কথা শুনছে কে? বিহার প্রদেশের দিক হতে আর্যসভ্যতা সর্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের দিকে বিস্তারলাভ করেছিল। ওই পথেই আর্য-সভ্যতা য়ুয়ান চুয়াঙের সময়ে কামরূপ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সেইজন্যই কি বহুকাল রাঢ় প্রদেশের অভ্যন্তর অনার্য জাতির বাসভূমি রয়ে গিয়েছিল?

কাছেই একদল ছেলে ঘোড়া ঘোড়া খেলা করছিল। মুখে মুখে তারা বলছিল- 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে'।

কথা বলতে বলতে আমার হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল।

যদু কুণ্ডুকে বলেছিলাম, ওদের খেলাটা লক্ষ্য করেছেন? লক্ষ্য করুন। দেখুন, ওদের একটা দল অগ্রবর্তী ডোম সৈন্য হয়ে খেলছে। ওরা 'আগডুম'। 'বাগডুম' বাগ অর্থাৎ পার্শ্বরক্ষক ডোম সৈন্যের আর একটি দল, পাশে খেলছে। ঘোড়াডুম অর্থাৎ আর একটা অন্য দল, যারা অশ্বারোহী সৈন্য। তারা পিছনে রয়েছে। আসলে ওদের এই খেলাটা যুদ্ধ। ওরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। ডোমেরা সৈন্য দলে কাজ করে। ওরা রণকৌশল সাজায়। ব্যক্তি চরিত্রের এই যে মহান আদর্শ, যা খেলার মধ্যে দিয়ে বালকচিত্তে প্রবেশ করছে, যা কিনা আগামী দিনে বালকদের ভবিষ্যৎ সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলায় সাহায্য করবে একে আপনি কি বলবেন?

যদু কুণ্ডু চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, এত তলিয়ে তিনি কিছু ভাবেন না। কিছু পড়া, কিছু শোনা। এর উপর ভিত্তি করেই তাঁর যত ধ্যান-জ্ঞান।

তিনি আমার জ্ঞানের বৃত্ত উপলব্ধি করে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

বলেছিলাম, মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব ও মনুষত্ব নিয়ে দেবতারও উর্ধ্বে উঠতে পারে। কিন্তু আমার কাব্যের নায়ক কালকেতু কি দেবতা হয়ে উঠতে পেরেছে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তাই সবার সঙ্গে আলোচনা করি। আপনি আমাকে বলতে পারেন?

—সে আমি কি করে বলব? সাহিত্যে অত জ্ঞান আমার নেই।

যদু কুণ্ডুর কথায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম আমি। ভাবছিলাম আমার লেখালেখির সব কিছুই কি তাহলে অলৌকিকতার হাত ধরে চলছে?

ছোটোবেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তখন আমি খুব ছোটো। মা আমাকে ঘাটে বসিয়ে রেখে স্নান করছিলেন। আমি কখন জলে নেমে পড়েছি। মা আমাকে ধরার আগেই নদীর সবুজ জলে আমি ডুবে গিয়েছি। মা চিৎকার করছেন। তারপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। কেউ আমাকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে জলের ওপর পদ্মপাতার মতো ভাসিয়ে রেখেছিল। মা-ও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় নদীতে কেউ ছিল না। অথচ...

—তিন বছর বয়সের সেই ঘটনা পুরোটা মনে থাকে? জিজ্ঞেস করেছিলেন যদু কুণ্ডু।

—থাকে না।

—পরে কিছুটা শোনা, কিছুটা অনুভূতি।

তবে নদীর সবুজ জল, দু ধারে গাছপালা জলে নুয়ে পড়েছে, আর আমি ভাসছি-সেই অনুভূতিটা মনে আছে। এখনও মনে হলে ভাবি, সেদিন সত্যিই ঠিক কী ঘটেছিল?

—ঘটনাটা সত্যি তাহলে?

—সত্যি।

—হাতটা কার ছিল?

—মা বলতেন, নদীর।

সবাই বলত, এটা অলৌকিক ঘটনা। বিশ্বাস তো যার যার নিজের কাছে। সবাই নিজের বিশ্বাসকেই সত্য বলে মানে।

নদী। নদী আমাকে জীবন দিয়েছে। আমি যে এমনি করে বড়ো হয়েছি মা বুঝতে পারত। মা জানত সব কিছু। সেই স্বপ্নমাখা নদী আমার চোখের সামনে ভাসে। নদী খিলখিল করে হেসে ওঠে। কখনো কখনো টলটলে হরিণচোখে মিটিমিটি আমার দিকে চায়। নদী আমার সাথে খেলা করে। কখনো ফিনফিনে, কখনো খুশির ঝলক আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। কখনো কথার ফুলঝুরি, কখনো উতল হাওয়া। নদী কখনো এলোমেলো ঝলমলে কাশফুল হয়ে ওঠে। আমার বুকের ভিতরে অনুভবের হামাগুড়ি দেয়। রোদ-বৃষ্টি-আলো-আঁধারে এমনি ভাবে বড়ো হই। নদীর কথা আমি বুঝতে পারি।

সময়টা বড়ো অচেনা। চেনা-অচেনার আঁকেবাঁকে নদী পাক খায়। তিরতির করে বুকে ঢেউ মারে চিতল মাছ, হারিয়ে যায় দুপুর। নদীতে যখন ইলশেগুঁড়ি ওড়ে, দোল খায় বাতাস। মুক্তির আনন্দ ঝরে পড়ে আকাশ থেকে। দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে যায় তখন নদীর কাছে এলে। মায়ের বকুনি, বাবার অনুশাসন সব তখন তুচ্ছ হয়ে যায়। মনের ভিতরে তখন শুধু ভেজা হাওয়া। ছেঁড়া ছেঁড়া জোছনার খুশিতে টইটম্বুর। এসময়টা বুঝি স্বপ্ন দেখার। স্বপ্ন মাখার। মনের ভিতরে চোরকুঠরি-শব্দহীন কথোপকথন, ঝরা বকুলের সুবাস। বুকের ভিতরে অজস্র কৌতূহল।

কালো মেঘ দেখে ভয় হয়, অথচ তার আড়ালেই সূর্য হাসে। শেষ দুপুরে ছোট্ট কালবৈশাখীর পর, নদীর বুকে পুরো আকাশের রামধনু। খুশির আভা। নদী তখন অপরূপ, রূপজৌলুসে রাজকন্যা। পাখির ডাক শুনে মুগ্ধ হই। নদীর চরে একটা দোয়েল। শেষ বিকালে নদীর গা বেয়ে উঠে আসছে। তারপর শান্ত গোলগাল পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ঢলঢলে আলো করা ফরসা একটা মুখ ভেসে ওঠে। ভিজে চুপচুপ। মেঘবরণ কেশ আর কুঁচবরণ কন্যা। বুকের ভিতরে ছোট্ট ছোট্ট কাঁপুনি ধুকপুক।

রোজ ভোরবেলায় আসি নদীর ধারে। কথা হয় নদীর সাথে। সকালে নদীর জল পবিত্র শুদ্ধ। স্নান করি। মাছরাঙা গাঙচিল আকাশে ওড়ে। গহীন দুপুরে ফিরে ফিরে ডাকে শঙ্খচিল। মুগ্ধতার এক অলখজালে জড়িয়ে পড়ি আমি। আমার কানায় কানায় উপচে ওঠে নদী। জল-মাটি-জীবন আকাশ চুঁইয়ে তখন অন্য অনুভূতি। তখন আমি ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ হয়ে আকাশে উড়ি। আকাশ জুড়ে পাখির মেলা তখন। কিচিরমিচির পাখির ডাক শুনি কেবল।

গরম পড়তে না পড়তেই শুরু হয় নদীর ঘাটে জটলা। সকাল বিকেল। নদী তখন প্রতিদিনই একটু একটু করে দূরে সরে যায়। ছায়া-ঘেরা ঝিকমিক বালুকা বেলায় নদীর আশ্চর্য রূপ তখন। বুঝি গরম পড়েছে। গাজনের শব্দ ভেসে আসে নদীর ওপার থেকে। নদীর ওপারে অচেনা গাছগাছালি। আবছা বাঁশবন। গাছের ছায়ায় আঁকাবাঁকা মেঠো পথ। তার পিছনে বসত। গ্রীষ্ম যত এগোতে থাকে নদী তখন বালি ভেঙে ভেঙে নামতে থাকে নীচে। শান্ত আশ্চর্য টলটলে নরম জলের নদী তখন। জলের নীচে ঢেউ খেলানো বালির জমি। ছোটো ছোটো মাছেরা খেলা করে। একটু একটু করে পা ভিজে যায়। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইত না, নদী আমার বন্ধু হয়েছে কখন। চতুর্দিকে

বুনো ফুলের গন্ধ। তার সৌরভের মোহে ঢাকা পড়ে যাই। মা ভয় পেতেন, আবার হয়তো চোরা বালিতে ডুবে যাব কখন। শীতকালে নদীর ওপর জমে কুয়াশা। স্বপ্নের ওড়না যেন। জল দেখা যায় না, দুহাতে কুয়াশা সরাতে হয়।

তেমনি মঙ্গলকাব্যগুলো সব ধর্মের মোহতে ঢাকা। পড়তে পড়তে সেই মোহ সরিয়ে নিতে হয়। মোহ সরাতে পারলেই আসল ছবিটা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন আর কোনো ধোঁয়াশা কোনো কিছুকে আড়াল করতে পারে না। বেরিয়ে পড়ে মানুষের কথা, এই সমাজটার কথা। তার কদর্যতা, তার ভালোবাসার কথা। এই সব মাথায় নিয়ে শিবরামকে পড়াতে বসি।

পড়তে বসে মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যেত শিবরাম। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চোখ রাখত সে। দেখত আকাশে পাখিরা ক্লান্তিহীনভাবে ডানা মেলে উড়ছে। দূরে দিঘির মতো বড়ো পুকুরটার বুকে পাতলা সরের মতো একটা কুয়াশা লেগে আছে। মমতা তখন গোবর-মাটি লেপা দিয়ে মেঝে মুছত। ঘরের দেওয়ালে মাটির ছেড়ে যাওয়া আস্তরণ ঠিক করত।

শিবরাম সব কিছু অবাক হয়ে দেখত। আঁক কষার শ্লেট থেকে ওর চোখ চলে যেত পাশের সরু রাস্তাটায়। ওখানে ওরই বয়সি বন্ধুরা সব খেলতো গোল্লা ছুট।

পড়াতে পড়াতে শিবরামকে দেখতাম। গলায় কিছুটা ঝাঁঝ মিশিয়ে বলতাম, কি হল? বসে আছিস কেন? জানিস না তোকে কত বড়ো হতে হবে? আঁক না কষে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছিস?

একদিন রেগে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করার জন্য উঠে পড়েছিলাম। তারপর আবার ভেবেছিলাম, জানলাটা বন্ধ করলে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই আবার বসে পড়েছিলাম। আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখি করেছি। তাই বোধহয় মেজাজটা ভালো ছিল না। অবশ্য ঘুম কোনো রাতেই ভালো করে হত না। লেখালেখির সব কিছু ছড়ানো ছিটোনো থাকে। পুথি, লেখার সরঞ্জাম সব পড়ে থাকত। এগুলো কেউ হাত দিত না। শিবরাম লেখাপড়া শিখে বড়ো পণ্ডিত হয়ে উঠবে। ওর ভবিষ্যত নিয়ে আমার মনে যে অনেক স্বপ্ন।

ওইটুকু ছেলে। পাঠশালায় যাবার আগে স্বস্তিতে খাবার সময়টুকুও নেই। ভাত দিতে না দিতেই মমতার তাড়া পড়ে। ওর চিন্তা, আজও বুঝি পাঠশালায় পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে শিবরামের। প্রথমে তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা, পরে মমতার গলা চড়ে। শেষ পর্যন্ত এক একদিন তাড়াহুড়োতে শিবরামকে অর্ধেক ভাত রেখেই উঠে পড়তে হয়।

আমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশীতে পণ্ডিতমশাই আসতেন শিবরামকে পুজো পাঠ শেখাতে। পুজো পাঠ শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে পণ্ডিতমশাই শিবরামকে বৃষ্টি, মেঘ আর নদীর গল্প বলতেন।

পুজো পাঠ শিখতে শিবরামের ভালো লাগত, একটুও ক্লান্তি লাগত না।

সন্ধ্যায় আমি বাড়ি থাকতাম না। মমতা রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকত। এই সময় পড়া ফেলে এক ছুটে দাদুর ঘরে গিয়ে শিবরাম হাতিদের রানি তিলোত্তমার দেশ জয়ের গল্প শুনতে চাইত। কখনো চলে যেত জেঠুমণির ঘরে। জেঠুমণির গলা জড়িয়ে আবদার করত গল্প শোনার।

ওর জেঠুমণিও ভালো গল্প বলত। জেঠুমণির কাছে শিবরাম শুনত জোনাকি আর প্রজাপতির সংসারের কথা। যশোদা চাইত দাদা শিবরামের সঙ্গে পুতুল খেলতে। শিবরামের ইচ্ছা হত না পুতুল খেলতে। ওসব মেয়েদের খেলা। তার ভালো লাগত না। শিবরামের তখন শুভংকর, কাঠা কালি, পুথি নিয়ে চলত যুদ্ধ।

ওকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতাম আর রাত বাড়ত। ওর চোখের কষ বেয়ে নেমে আসত ঘুম। কিন্তু ঘুমোতে পারত না আমার জন্য।

ভয় পেত ঘুমোলেই সপাং করে নেমে আসবে পিঠের ওপর আমার হাতে ধরা বেত। ওর কাছে এ ছিল এক অসহনীয় অবস্থা শিবরামকে তাই বারবার ছুটতে হত ছোটো বাইরে। বুঝতে পারতাম, আসলে সে চোখে জল দিতে যেত।

একদিন রাতে শিবরাম হাত ধরে আমাকে উঠোনের কামিনী ফুল গাছটার নীচে নিয়ে এসেছিল। ভরা পূর্ণিমার রাত ছিল সেটা। এক গাছ কামিনী ফুলে ভরে ছিল গাছ, কি তার সুবাস! আকাশ থেকে ঝরে পড়ছিল হেমবর্ণ জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নারই অন্যরূপ দেখছিলাম গাছের ওপর। আকাশের দিকে তাকিয়ে শিবরাম জিজ্ঞেস করেছিল, রাতে আকাশে এত আলো কেন বাবা?

বলেছিলাম, আজ তো শ্রাবণী পূর্ণিমা, তাই। আমার কানের কাছে মুখ এনে অস্ফুটে শিবরাম বলেছিল, আমি আজ সারারাত জ্যোৎস্না দেখব বাবা। আজ আমি একটুও পড়ব না।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, শিবরাম নয়, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেন আমারই শৈশব।

ফেলে আসা আমার সেই বর্ণ পরিচয়ের শৈশবকে আমি যেন অবিকল দেখতে পেয়েছিলাম শিবরামের মধ্যে। ওকে সেদিন কিছু বলতে পারিনি। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম পিতা-পুত্র জ্যোৎস্নার মধ্যে।

পুকুর পাড়ে শাল বসেছিল। এই সময় কয়েকদিন ধরেই সারা দিন সারা রাত শাল চলত। আখ। এই শর্করা বৃক্ষের অবদান বিশ্বের ইতিহাসে কম নয়। মানুষের এই মধু প্রীতির মূল্য দিতে অনেক গরিব মানুষের রক্ত ঝরেছে। তাইতো বলে আখের স্বাদ নোনতা। রক্তের স্বাদের মতো নোনতা। বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট ধরনের চিনি উৎপন্ন হয় এদেশে। মালাবার এবং কাম্বেতে এই চিনি ও এখানকার মসলিন চড়া দামে বিক্রি হয়। আখ মাড়িয়ে তার রসে গুড় তৈরি হয়। গোটা গ্রামের গুড়। গ্রামের ছেলেপুলেদের তখন খুব ফুর্তি। পেট ভরে আখের রস, গুড় খেতে পায়। তেমনি হয় কনকনে শীতের রাতে। রাত জেগে তখন খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হয়। গায়ে জামা

নেই ছেলের দল দাঁড়িয়ে আছে দূরে—যদি একটু পাওয়া যায়। পঞ্চানন গিয়েছিল আমার সাথে কেমন করে খেজুরগুড়ের পাটালি তৈরি হয় দেখবে। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল শীতের র‍্যাপার জড়িয়ে। চোখে একটুও ঘুম ছিল না। সে দেখবে কি করে খেজুর রস থেকে গুড় তৈরি হয়, পাটালি তৈরি হয়। অন্ধকার গাছতলায় কাঠের আগুনই তখন আলো, পশমের উষ্ণতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই উষ্ণতায় পঞ্চানন কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল আমার কোলের মধ্যে। ধীরে ধীরে ওকে বাড়িতে শুইয়ে রেখে এসেছিলাম।

বাড়ি যাবার পথে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে জানতে চেয়েছিল, কী হয়েছে বাবা? চণ্ডী এসেছে?

বুঝি, সব সময় ও চণ্ডীর ভাবনা ভাবে। শুঁড়ি বাড়িতে মদ তোলা হয়। সাহা-রা আখের রস, গম, গুড়, মধু, তালের রস থেকে মদ তৈরি করে। তারা ভাত পচিয়ে মদ তৈরি করার কারিকুরি জানে। জ্যোৎস্না রাতে তারা মদ তৈরি করছিল। সেই সঙ্গে চলছিল মদ খাওয়া। সঙ্গে চাট ছিল নাপাকেলা মানে কাঁচা কাঁকুড়। মদ খেলেই চিৎকার করে মানুষগুলো। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ওদের আওয়াজ ভেসে আসছিল। মানুষগুলো সারাদিন খাটাখাটনি করে এই মদের আমোদেই খুশি হয়। ওরা আর কিছু চায় না। ওদের জীবনের চাওয়াগুলো খুবই নগণ্য, খুবই সাধারণ।

পঞ্চানন জানতে চেয়েছিল, ওরা অমন করছে কেন বাবা? কোলে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম ওকে। শিবরাম খাট থেকে নেমে এসেছিল। শিবরাম আমাকে দেখল। দেখল আমি লিখছি না। চুপচাপ বসে আছি। শিবরাম কাছে এসে বসতে, আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম। বাইরে থেকে ক্ষীণ জ্যোৎস্নার আলো ঘরে ঢুকছিল। শিবরাম নরম গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি আজ লিখবে না বাবা?

প্রথমে সাড়া দিইনি। শিবরাম অবাক হয়েছিল। আমি তখন যেন আমাতে নেই। তাকিয়ে রয়েছি বাইরের দিকে। দেখছি, অথচ কিছুই দেখছি না। শিবরামও তাকায় কিন্তু কিছুই তার নজরে পড়ে না। শিবরাম আবার জিজ্ঞেস করে, বাবা তুমি লিখবে না? এবার উত্তর দিই। বলি, লেখা আসছে না রে।

—কেন?

—কি জানি। কেমন ক্লান্ত লাগছে।

—তোমার শরীর খারাপ বাবা?

—না রে।

কতকাল ধরে লিখছি। বাক্সটা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল প্রায়। তবু কত লেখা নষ্ট হয়ে গেছে। বন্যার জলে ভেসে গেছে কত লেখা। প্রতি বছর বন্যা হয়। ঘর বাড়ি ভেসে যায়। গ্রামের সব বাড়ি তাই উঁচু উঁচু টিলার উপর। রাস্তাগুলো সব নীচু। বর্ষায় অন্য কারো বাড়ি যাওয়া যায় খুব তাড়াতাড়ি। অন্য সময় তা ঘুরে ঘুরে। বর্ষায় যে ডোঙা চলে। হুস করে চলে যাওয়া যায় সোজাসুজি। অন্যসময় যা সম্ভব নয়।

কথার মাঝে মমতাও উঠে এসেছিল।

বলেছিল, তা কেন হবে। তুমি লিখতে চেষ্টা কর, তাহলেই হবে। খোকা চলে আয়, বাবাকে লিখতে দে।

মমতা শিবরামকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। লজ্জা পেয়েছিলাম। এসব কথায় কষ্ট পেতাম। বুকের ভিতর থেকে একটা ব্যথা দলা পাকিয়ে উঠে আসত। মমতা আমায় লেখার প্রেরণা দিয়েছে সব সময়।

ওকে বলেছিলাম, তুমিও একটু কাছে বোসো। কবে আমরা পাশাপাশি বসেছি মনে করতে পারি না।

—কী মনে করতে পার না? এসব তুমি কি বলছ?

—একটা দেশ, যেখানে সবাই সুখে আছে, কারোর কোনো দুঃখ নেই। বন কেটে বসত নয়, বনের মধ্যে বসত।

—বনের মধ্যে বসত?

—হ্যাঁ।

আমার মুখে মলিন হাসি। বলি, প্রায় রাতেই আমি স্বপ্নে দেখি। আর.....

—আর কি?

—আর তিনি আসেন।

—কে তিনি?

—দেবী.....

—দেবী?

—হ্যাঁ। দেবী চণ্ডী। আমি তাঁর আদেশেই লিখতে শুরু করি। দেবী আমাকে বলে যান।

মমতা পুত্র শিবরামকে জড়িয়ে ধরেছিল।

বলেছিল, এ সব কী অনাসৃষ্টি কথাবার্তা। তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

—না না। আমি ঠিক আছি।

মমতা কাছে এসে বসেছিল। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, তোমাকে বলেছি না একদিন তুমি স্বীকৃতি পাবে। খুব নাম হবে তোমার। যশ হবে। অর্থ হবে। দেখে নিয়ো।

বলতে বলতে থেমেছিল মমতা। শ্বাস-প্রশ্বাসে তার বুক ওঠানামা করছিল তখন। নাকের পাটা ফুলে উঠেছিল। জ্যোৎস্নার বিন্দু কাঁপছে তাতে তিরতির করে। শিবরাম এসবের কিছুই বুঝতে পারছিল না। সে বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে কেবল মায়ের কথাগুলো শুনছিল। একবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল আর একবার মায়ের মুখের পানে।

একটুক্ষণ চুপ করেছিলাম। তারপর ধীর গলায় বলেছিলাম, আসলে কী জানো, দেবী আমাকে একটা কাব্য লিখতে বলছেন। আমি সেটা সাজাতে পারছি না।

মমতা এসব বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন কাব্য আবার সেটা?

—ঠিক ধরতে পারি না। মনে হচ্ছে একটা দেশের কথা বলছেন। যেখানে সবাই সুখে বাস করছে, জীবজন্তু প্রাণিকুল কারো কোনো দুঃখ নেই। সবাই সুখে আছে। তারপর..........

—তারপর কী?

—সবটা শোনা হয়নি। দেবী চলে গেলেন।

শিবরাম চুপ করে বসেছিল। দেখছিল কেমন করে চাঁদের জ্যোৎস্না আমাব গা থেকে সরে চলে এসেছে মেঝেতে। কেয়া ফুলের গন্ধ জানলা দিয়ে ভেসে আসছিল তখন, আসছিল পাতলা ঠান্ডাও।

বিড়বিড় করে আমি যেন তখন বলেছিলাম, এবার অনেক দিন পর তাঁর দেখা পেলাম।

শিবরামের কানে সব কথা যায়নি, কিছুটা গিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, আবার কার দেখা পেলে বাবা? চণ্ডীর?

—আর কিছু মনে আসছে না রে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বের হয়ে এসেছিল আমার বুকের ভিতর থেকে।

—ভাবো বাবা ভাবো, খুব করে ভাবো। তীব্র কৌতূহলে শিবরাম জানতে চেয়েছিল।

—কী ভাবব?

—ওই স্বপ্নের কথা।

আমার তখন ঘাড় ঝুলে গেছে। স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম।

শিবরাম আর কিছুই বলতে পারেনি। তার খুব খারাপ লেগেছিল।

চুপচাপ বসে ছিলাম আমি।

আর কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। আমার তখন লেখা বন্ধ। সব কিছু সে ঠিকঠাক বুঝতে পারছিল না। হয়তো সে ভাবছিল, একটা দেশ যেখানে সবাই সুখে বাস করে। এমন হয় না কি? নিজের মা-কে সে দেখে প্রতিদিন। কি কষ্ট করেই না মমতা সংসারটা চালায়। মাত্র পাঁচ জনের সংসার আমাদের, তবু কত কষ্ট। আমি নিজেই লাঙল চালাতে পারি। ধান বুনতে পারি। ধান কাটতেও পারি। কিন্তু চাষের ফসলে এই ক'জনের পেট ভরে না। সংবৎসরের খাবার জোটে না।

ওকে বলেছিলাম, বাবা তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

কিন্তু শিবরামের ঘুমোতে যেতে ইচ্ছে করেনি। সে ঠায় বসেছিল। বলেছিল, তুমি আগে শোও।

রাত অনেক বাকি ছিল। শিবরাম বুঝতে পেরেছিল আমাকে জোর করে না শোওয়ালে, হয়তো সে রাত্রে আমার আর ঘুম হবে না। সে তাই জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি যাবে না বাবা?

—যাব বাবা যাব। তুমি আগে যাও। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

শিবরামকে সরিয়ে ছিলাম বটে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম আসেনি। আবার কবে দেবী আসবেন। কী বিষণ্ণ তাঁর মুখ। তারপর যে কী বললেন মনেই পড়ছে না। লিখতেও পারছি না। ভিতরে ভিতরে কষ্ট হচ্ছে। সময় বয়ে যাচ্ছে শুধু। আমার এই যে ভিতরে কষ্ট, দেবী কি সেটা বুঝতে পারছেন? দেবীরও কি কষ্ট হয়? তাই কি আসেন বারেবারে? এই সব ভাবছিলাম। শিবরাম ঘুমোতে গেলে, মমতা কাছে এসেছিল। জোর করে আমাকে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল, স্বপ্নের কোনো মানে নেই। তুমি শোও তো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ওসব নিয়ে বেশি ভেবো না। শরীর খারাপ করবে।

শিবরামকে দেখেছিলাম, ও তখনও শোয়নি। ওর গায়ে হাত বোলাচ্ছিলাম। মুখের কাছে এসে চোখের পাতায় হাত পড়েছিল। দেখেছিলাম শিবরামের চোখে জল।

—কি হয়েছে শিব? জানতে চেয়েছিলাম। শিবরাম তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়েছি। ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেছি। অদেখা সেই দেবীর জন্য তার চোখ ভিজে গেছে।

সে তখন জেনেছে, ভালো মানুষেরা দেহ রাখলে আকাশের তারা হয়ে যায়। মহাশূন্যের নীলিমায় তারা ভেসে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু এই দেবী আসেন কোথা থেকে? ওপরে আকাশের নীলিমা, পায়ের নীচে মাটি। এর মাঝে কোথাও স্বর্গ বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে পারিজাত ফুল ফোটে। মন্দাকিনী আর বৈতরণি নামে নদী আছে। সেই নদীর জল দুধের মতো সাদা। অমৃতের স্বাদ। মনে মনে খুঁজতে চেষ্টা করে, পায় না, এক সময়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিছানায় সে হাতড়ে বেড়ায় মা-কে। মা-কে খোঁজে।

ওকে বলেছিলাম, স্বপ্ন আছে বলে মানুষ বেঁচে আছে বাবা।

শিবরাম তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, এই স্বপ্নটা আছে বলেই তো তাঁকে দেখতে পাই রে। এ সব তুই এখন ঠিক বুঝবি না রে খোকা। আগে তুই বড়ো হয়ে নে। তারপর দেখবি সব বুঝতে পারছিস নিজে নিজেই।

সে রাতে আর আমার ঘুম আসে না। ঘুমের দফা গয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর লিখতে বসেছিলাম।

এইভাবে আমার লেখা এগিয়ে চলছিল।

রাতে কখনও কখনও পড়তে বসি। দেশটার ইতিহাস ভূগোল সব তথ্য জানতে হয়। না জানলে লিখব কেমন করে? তাই পড়তে হয়, মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে হয়। গল্প করতে হয় মানুষের সঙ্গে। এইভাবে কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হল এই জীবনে!

ছয়ে ঋতু

নিস্তব্ধ দুপুরে নদীর ধারে বুড়ো বটের ছায়া রহস্যময় দেখায়। কতবার ভেবেছি নদীর ওপারে গিয়ে ঘুরে আসব সময় হয়নি। শুনেছি ওপারে সাঁওতালদের গ্রাম আছে। দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখা দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। তখন ধূধূ সবুজ প্রান্তরের সবটাই আমার পরির দেশ বলে মনে হয়। এর জ্যোৎস্না, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, এর পশু-পাখি, পাখির ডাক, বন্য ফুলের শোভা সবই মনে হয় অদ্ভুত। মনে এমন এক গভীর শান্তি আর আনন্দ আনে জীবনে যা কখনো কোথাও পাইনি।

এতদিন এখানে আছি অথচ এর সৌন্দর্য আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। চুপ করে কতক্ষণ বসেছিলাম। নদীর জলের কলকল শব্দ দুপুরের নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। আমার চারপাশ কেবল ধূধূ সবুজ, কতকাল থেকে এই প্রান্তর এই রকম আছে। যেদিন পাঠান, মোগল, বর্গীরা বাংলার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে এসেছে; সেনরাজারা দাক্ষিণাত্য থেকে, পালরাজার এসেছে পশ্চিম থেকে। যেদিন তাম্রলিপ্ত বন্দর শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে, যেদিন গঙ্গা-সরস্বতী-যমুনার সঙ্গমে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বন্দরের সুবর্ণযুগ শুরু হয়েছে সেইদিনও। যেদিন মুসলমানরা সপ্তগ্রাম অধিকার করার পরে বহু হিন্দু দেব-মন্দির ধ্বংস করেছিল, সেদিনও বঙ্গবাসী চমকে উঠে দেখেছিল সূর্য আজকের মতো অস্তাচলগামী, আজকের মতোই নদীব কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়েছিল সেই দিনটিতেও। পশ্চিম দিগন্তের শেষে রাঙা আলোয় এই প্রান্তর ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হয়েছিল সেইদিন, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হয়ে আসছে। ঠিক যেদিন পোর্তুগিজরা সপ্তগ্রামে ব্যবসা করতে এল; আকবর তাদের স্থায়ী উপনিবেশ গড়বার সুযোগ দিলেন, আকবরের নির্দেশে তোডরমল বঙ্গদেশকে ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগনায় ভাগ করে দিলেন সেই দিনও এই প্রান্তর এমনি ছিল।

সপ্তগ্রাম ১৯ নং সরকার এবং ৪৩ পরগনার অন্তর্গত। ভাগীরথী নদীপথে পালতোলা নৌকার যাতায়াত বাড়ে। কিন্তু সরস্বতী নদীর মুখ ছোটো হয়ে যায়। পোর্তুগিজ বণিকেরা তখন আরো পিছিয়ে গিয়ে ভাগীরথীর তীরে নতুন এক জায়গায় তাদের নৌকো জাহাজ ভেড়াতে থাকে। পরে সেই জায়গাটির নাম হয় হুগলি বন্দর। সরস্বতী মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রাম বন্দরের নাম ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়। উত্তর ভারতের শিবালিক পর্বত থেকে নেমে এসেছে আসল সরস্বতী নদী। সরস্বতী গঙ্গার থেকেও প্রাচীন নদী। প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে সরস্বতী যুক্ত হয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমের কুম্ভমেলার মহাপুণ্য তীর্থ গড়ে তুলেছে। তার গতিপথে জন্ম দিয়েছে পুষ্কর, গয়া, কোশল, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার, ঋষভ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের।

আধুনিক মানুষের নাকি উদ্ভব হয়েছিল আফ্রিকা নামে কোনো এক মহাদেশে। এক লক্ষ পনেরো হাজার বছর আগের সেই মানুষ নাকি ভারতে এসেছিল ভারতের উত্তর পশ্চিমের সোয়াব অববাহিকার পথ ধরে ষাট হাজার বছর আগে। রোহড়ী পাহাড়ে তারা এসেছিল কুড়ি হাজার বছর আগে আর পাটনে এসেছিল চব্বিশ হাজার বছর আগে। খাদ্য সংগ্রহের কারণেই মূলত এই ভূখণ্ডে আমাদের সেই পূর্ব-পুরুষরা ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ঋগ্‌বেদে বলা হয়েছে ইন্দ্রের আর এক নাম ছিল পুরন্দর। যিনি পুর ধ্বংস করেন। নবাগত আর্যরা পশুপালন করে। বহু শতাব্দী পর তারা শহর তৈরি করতে শিখল। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন। বৃত্রাসুর কোনো অসুর নয়। তা আসলে বড়ো বাঁধ, নদীর বড়ো বাঁধ। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রের স্তুতি করে বলা হয়েছে জলস্রোতকে তিনি মুক্তি দিচ্ছেন। আর্যরা কৃষিকাজ জানত না। তারা জল ধরে রাখার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি কোনো সময়। বাঁধের প্রয়োজনীয়তা তাদের জীবনে উপলব্ধ হয়নি। এমনও হতে পারে এদেশে পৌঁছে তারা যে সভ্যতা দেখেছিল সেই সভ্যতা ধ্বংস করার জন্যই তারা নদীর ওই বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। আর এটাকেই বলা হল জলস্রোতকে মুক্তি দেওয়ার কারণ।

সভ্যতার ধারণা এক এক জাতির কাছে এক এক রকম। কেউ যত দিন যায় তত উন্নতি করে, কেউ হাজার বছর ধরে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। চার পাঁচ হাজার বছরে বর্বর আর্যরা কত কি লিখে ফেলল। তারা কত দেশ জয় করল। সাম্রাজ্য স্থাপন করল। আর আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডারা যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল এই চার পাঁচ হাজার বছর ধরে। প্রযুক্তি কৃৎকৌশলে পিছিয়ে পড়া অথবা জনসংখ্যায় খুবই কম এমন প্রতিটি মানব গোষ্ঠীরই নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। সামাজিক পরম্পরায় তারা কাজ করে, তাদের খাদ্যের অভ্যাস, বসবাসের ব্যবস্থা, ভাষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিয়ের প্রথা-পদ্ধতি, ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র ও তার ব্যবহার, মূল্যবোধ এ সবই তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। তাদের কাছে সভ্যতার ধারণা হল আলাদা। আসলে সভ্যতাই হল যেন এক দরজার ঘর থেকে জটিল বহু ঘর বিশিষ্ট এক আবাসন। তার স্থাপত্য আছে, যেমন গ্রামীণ আবাসন থেকে ভিন্ন নগর জীবন। পাথর থেকে ধাতু যেমন ব্রোঞ্জ, তামার ব্যবহার। মুখের ভাষা থেকে লিখিত ভাষা। বিশেষ ধবনের লেখার পদ্ধতি। সিল, ভাস্কর্যের সাধারণ রীতি-এরকম আরো বহু বিষয় আছে। আবার দেখতে হবে একটা নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে স্থানীয় এই গোষ্ঠী একই ধরনের লিপি, চিত্রকলা, সিল, ধাতুর ব্যবহার, ওজন যন্ত্র, কুটির শিল্পের উপাদান ও কৃৎকৌশল ব্যবহার করেছে কিনা।

আর্যরা যখন ক্রমশ তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাষবাস, উন্নতধরনের জীবনধারণের মানের সঙ্গে তথাকথিত এখানকার দলিতদের সাথে মিশে গেছে তখন বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্যে রাঢ়বঙ্গে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় অর্থাৎ ৩২৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে সমগ্র বঙ্গভূমি তিনটি প্রাচীন ভূভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন বঙ্গ (মধ্য পূর্ববঙ্গ), পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), তাম্রলিপ্ত ও সুহ্ম অথবা রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ)।

—এত ইতিহাস আপনি জানলেন কি করে?

—তোমাদের সুবিধা আছে। কিন্তু আমার সময়ে এত ইতিহাস আমি জানতে পারিনি। সামান্য কিছু পেয়েছিলাম, বাকি সব অনুমান করতে হয়েছে। এই সুবর্ণভূমিতে হাটের পত্তন হয়েছে। নদীপথে তেজপাতা, গাঙ্গেয় সুগন্ধি, অঞ্জন তেল, মুক্তো, উৎকৃষ্ট শ্রেণির মসলিন রপ্তানি হয়। খনি থেকে সোনা উত্তোলিত হয় আবার নদীর বালুকণাতেও পাওয়া যায় সোনা। বিনিময় চলে সোনার মুদ্রায় যাকে বলা হয় মোহর বা কলটিস। গঙ্গারিডির বসবাসকারীরা অনার্যবংশ সম্ভূত হওয়ায় রাঢ দেশের রাজারা খ্রিস্টপূর্বাব্দের বছরগুলিতে প্রথমে মহাবীর অনুসারী হয়েছিল। রাজারা মহাবীর জৈনের জৈনধর্ম গ্রহণ করলেন। পরে কোনো এক সময়ে তারা সকলে একসাথে শিবের আরাধনা শুরু করে দিলেন। পুণ্যার্জনের অভীপ্সায় তারা শিবিধর্মের অনুসারী হলেন। তার অনেক পরে রাজারা গৌতম বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম বা আরো পরে হিন্দুধর্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাঢ় বাংলায় মনসাদেবী হলেন শিবের কন্যা। মনসা ভক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আবার জৈন সম্প্রদায়ের নিবিড় যোগ আছে। এখানে শিক্ষা-দীক্ষা, বাণিজ্য-প্রশাসন সব বিষয়েই সামাজিক অবস্থান উজ্জ্বল। এখানকার অধিবাসীরা নাপিত, মাহিষ্য, কৈবর্ত, বাউরি, কুম্ভকার, কর্মকার ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণিগত পেশার সঙ্গে যুক্ত। এই জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেকে আবার ধন-সম্পদের জোরে উচ্চবর্ণে বা সামন্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়। যেহেতু এরা অনার্য জাতি, আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে ছিল ব্রাত্য। তাই এদের মানুষ বলেই আর্যরা বিবেচনা করত না। আর্যরা চেয়েছিল রাঢ দেশের অধিবাসীরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিক। কিন্তু 'গঙ্গারিডি' জাতি ঐক্যবদ্ধ ভাবে আর্য সভ্যতার আগ্রাসী অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিল।

—আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির বাহক পণ্ডিতেরা বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রে এখানকার অধিবাসীদের অভিহিত করলেন দৈত্য, রাক্ষস, ম্লেচ্ছ, শূদ্র এই বলে। খ্রিস্টের জন্মের অন্তত পাঁচশো বছর আগে জৈনধর্মের চব্বিশতম তীর্থংকর মহাবীর বা মহাবীর বর্ধমান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রাঢ়দেশে এসেছেন। ওনার নামানুসারেই নাকি বর্ধমানের নামকরণ হয়েছে।

—হতে পারে। জৈন 'আচরঙ্গ সূত্রে' যে আস্তিক গ্রামের উল্লেখ আছে তা হচ্ছে বর্ধমানের সুয়াতা আউশগ্রাম। যদিও 'বর্ধমান পুরম' বলে আর একটা পৃথক জায়গারও উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্ত্রহীন দিগম্বর মহাবীরকে এখানকার মানুষ উদ্ভট পাগল ভেবেছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের ছেলে মেয়েরা এরকম উলঙ্গ বয়স্ক মানুষ দেখতে অভ্যস্ত ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তারা একটা হল্লা করার সুযোগ পেয়েছিল। দিগম্বরের পিছনে পিছনে ছুটেছিল ওরা। ওদের পিছনে পিছনে ছুটছিল ওদের খেলার সাথী কুকুরগুলোও। তবু জৈন মহাবীর ১২ বৎসর কাল একটানা তপস্যা করেছিলেন এই অঞ্চলে। এখানকার মানুষ সেভাবে অসহযোগিতা করলে তা সম্ভব হত না।

—এখানকার ম্লেচ্ছ, শূদ্র মানুষগুলো, যাদের রাক্ষস বলে অভিহিত করা হয়েছে তারাই তো ধর্মের নামে 'উলঙ্গ সভ্যতা'র সরাসরি বিরোধিতা করেছিল? উলঙ্গ সভ্যতার বিরোধিতা যারা করে তারা নিশ্চয় আরো সভ্য সংস্কৃতির জনক ছিল। এরাই গ্রিক সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ রুখে দিয়েছিল। দুই আড়াই হাজার বছর পূর্বে যারা এই প্রদেশ থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যদ্রব্য গ্রিস ও রোমান নগরগুলিতে রপ্তানি করত, যে সব সুতি ও মসলিন বস্ত্রের জন্য

গঙ্গারিডি রাজ্যের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই গঙ্গারিডি জাতি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ছয়শত বৎসরের অধিক এই জাতির ইতিহাস। গ্রিক ও লাতিন ভাষায় লিখিত ইতিহাসের পর্বগুলিতে বারবার এই জাতির উল্লেখ রয়েছে।

—হ্যাঁ। সেই গঙ্গারিডি জাতি ইতিহাসে বিলীন হল কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর কি তোমাদের ইতিহাসে লেখা আছে? আর্য-সভ্যতার মানুষ তাদের ঘৃণা করেছে, গঙ্গানদীর দক্ষিণ এবং পশ্চিম অববাহিকা জুড়ে তাদের বাস ছিল। মাহিষ্য, কৈবর্ত, বাউরি ও বাগদি জাতির এই সব মানুষেরাই ছিল গঙ্গারিডি জাতির মেরুদণ্ড। পৌরাণিক যুগের সূম্ম দেশ পরবর্তীকালে হয়েছে রাঢ়। রাঢ় গঙ্গারাঢ়ী গঙ্গারিডয় গঙ্গারিডি বিভিন্ন নামে যার পরিচয় ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তাম্রলিপ্ত যার রাজধানী। যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের পর সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ বন্দর রাজধানী বন্দররূপে খ্যাতি লাভ করে।

যাক। সে সব কথা এখন থাক।

পাথুরে রুক্ষ লাল মাটির দেশ রাঢ়। যার সীমা বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে পূর্বে হুগলি, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, কলকাতা, নদিয়া, হাওড়া সবই তার অন্তর্গত। প্রাচীন গ্রিক ও রোমক ঐতিহাসিকেরা 'গঙ্গারিডয়' নামে এই স্বাধীন রাজ্য এবং তার রাজধানী 'গ্যাঞ্জেস রিজিয়া'র কথা লিখেছেন। লিখেছেন তার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থানের কথা। বিশেষ করে মেগাস্থিনিস, শক্তিশালী গঙ্গারিডি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। লিখেছেন তাদের সামাজিক শক্তির কথা। গঙ্গারিডি জাতির রণহস্তীর বিপুল সংখ্যা ও সুশিক্ষিত পদাতিক বাহিনীর অস্তিত্বের কথা দূত মারফত অবগত হয়েই গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার শেষাবধি আর এইপথে এগিয়ে আসার সাহস পাননি। ইতিহাসের এই সব পাতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। কিছুতেই খুঁজে পাই না। কোথায় ছিলাম, কোথা থেকে এলাম। কোথায় যাব আমি?

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড খরতাপ। শুয়ে আছি বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায়। বুড়ো বট। এই বটের ঝুরিতে, তার কন্দরে কন্দরে লুকিয়ে রেখেছে ইতিহাস। ইতিহাস আমি হাতড়ে বেড়াই। কতো পুরুষের এই বটগাছ, গাছটার মাথায় পাখির দল জায়গা দখল নিয়ে কোন্দল করে। দূরে ক্ষীণতোয়া নদীবক্ষ। চারদিক শুনশান। ভরদুপুরে কে কোথায় যাবে। সকলেই গাছের ছায়ার অপেক্ষমান। আমি অপেক্ষা করি ইতিহাসের জন্য।

নদীর চড়ায় ইটভাটার মজুররা কাজ করে। এই চড়া রোদেও ওদের কিন্তু বিশ্রাম নেই। বাড়ি হবে। রাজার বাড়ি। ইট চাই ইট। হাজার হাজার সহস্র ইট। ওরা কাজ করে। তাই ওদের কাজ করতে হয় মাথায় রোদ নিয়ে এই ভরদুপুরেও। নদী পারাপার হওয়ার বাঁশের পাটাতনে খেলা করে ওদের শিশুপুত্রের দল। পথচারী, যাত্রী, ইটভাটার শ্রমিক, নারী শ্রমিক, যুবা, বৃদ্ধাসকলেই-বাঁশের পাটাতনে সাবধানে পা ফেলে ফেলে নদী পারাপার করে। ওরা সেই বাঁশের পাটাতন থেকে জলে ঝাঁপ দেয়। ঝাঁপ ঝাঁপ খেলা করে।

ধূধূ মাঠ। জনমনিষ্যি নেই। রাখালরা গোরু ছেড়ে দিয়ে এসেছে। কালো গাই, ধলো

গাই, হালের হেলে, বাছুর, সারাদিন মাঠে চলে বেড়ায়। সন্ধে হলে আপনা-আপনি ঘরে ফেরে। আবার কাউকে খুঁজে পেতে মাঠ থেকে কঞ্চির লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়। কারণ তাদের খিদে মেটে না। আর মিটবেই বা কী করে। চোত-বোশেখের ঠা ঠা রোদ্দুরে মাঠের আলের ঘাস একেবারে শুকিয়ে যে কাঠ। বেলা বাড়লেই মাথার উপর চড়া রোদ। মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়ে চলে আসা। গোরু মাঠে নিজে নিজেই চরে বেড়াবে।

তারপর গায়ে সপসপ সরষের তেল ঘষে নদীতে নাওয়া। আর নদীর জলেরই বা কী অবস্থা। তিনভাগ জল মরে গিয়ে একেবারে বালি বেরিয়ে গেছে। ছেলেগুলো তার মধ্যেই সাঁতরে নদী এপার-ওপার করছে। জল ঘুলিয়ে যাচ্ছে। বাবা-কাকা-জ্যাঠারা যতক্ষণ না বকাবকি করবে ছেলেগুলো জল থেকে উঠবে না। যখন জল থেকে উঠে আসবে তখন ওদের চোখ লাল হয়ে যাবে।

স্নানের পর ভাত খেয়েই ওরা ছুটবে বাগানে। কোন্ গাছে কত আম ধরেছে, কোন্টা গোলাপখাস, কোন্টা মধু কুলকুলে, কোনটা সিঁদুরমুখী-টিলিয়ে পেড়ে আনা আমগুলো খেয়ে খেয়ে তর্ক চালাবে। তারপর যাবে তালশাঁস চুরি করে খেতে, নয়তো পাখির বাচ্চা পাড়বে। এইভাবেই কাটে ওদের চোত-বোশেখের শৈশব। এসব দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে মলয় বাতাসের মেলবন্ধন আমাকে গভীর নিদ্রায় ডুবিয়ে দেয়।

নর মানে মানুষ। মানুষ উন্নততর জীব। তার শরীরে আছে দেহ, দেহের অভ্যন্তরে আছে মন। দেহের কত অংশ। হাড়, মাস, রক্ত, মজ্জা কত কি। চামড়ার নীচে আছে মাস, মাসের নীচে হাড়। এই হাড়মাসের কোন্ খাঁজে থাকে মানুষের প্রাণ এবং মানুষের মন কেউ জানে না।

কবি কি তাই গান ধরেন?

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ও তোর ধরতে পারলে মন বেড়ি দিতাম পাখির পায়।'

আবহাওয়ার ভিন্নতায় মানুষের আকার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। তফাত গাত্রবর্ণে, মুখাবয়বে। তারপর আছে জাতিগত তারতম্য। দলীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও উজ্জ্বলভাবে লক্ষণীয়, দেশগত পার্থক্যও রয়েছে অনেক জায়গায়, রয়েছে আরও কত কী। এই সব নিয়েই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। অসভ্য মানুষ আর সেভাবে দেখা যায় না। সর্বত্রই কমবেশি সভ্যতার আলোক। পোশাক-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে, বোধে-বিদ্যায় গড়ে উঠেছে কেবল বিভেদ।

কী নরের, কী নারীর।

দৃষ্টিগ্রাহ্য বদল চালচলনে, আদব-কায়দায়, সৃষ্টি-কৃষ্টিতে, এমনকী মননেও। মানুষের বিশ্ব-বিচরণ আগেও ছিল, এখন আরও বেড়েছে। ফলে বেড়েছে বর্ণসংকর এবং সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। কালো আর কালো থাকছে না, সাদা থাকছে না সাদা। হলুদ হচ্ছে তামাটে, তামাটে হচ্ছে ময়লা। মানুষের এই বিবর্তন এই পথেই এগিয়ে চলেছে।

দামোদর অজয় বরাকর ভাগীরথী নদী বেষ্টিত ছোট্ট এই জনপদ। পশ্চিমপ্রান্তে পাহাড়ি বন্ধুর পার্বত্যভূমি। সেখানে মহুয়ার মিষ্টি গন্ধ আর সাঁওতালি বাঁশির সুরে মাতাল হাওয়া। পূর্বপ্রান্ত সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কীর্তন গানে মুখর।

এই যদি নরম মাটির নরম সুগন্ধ, তাহলে আর্যাকরণের প্রবল প্রতাপ থেকে এই অঞ্চল আত্মরক্ষা করেছিল কীভাবে?

রাঢ় বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র এই অঞ্চল। বৌদ্ধ, জৈন, আর্য প্রভাবের বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গমস্থল।

বেহুলা মনের দুঃখে কলার মান্দাসে ভেসে গিয়েছে শীর্ণতোয়া গাঙুরের জলে। এই বর্ধমানের উপর দিয়েই। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী আটন করেছেন মঙ্গলকোটের পাশে উজানিগ্রামে। আর ধর্মমঙ্গলের ধর্মঠাকুর গাজনে পশ্চিমপ্রান্তের রূপনারায়ণপুর থেকে পূর্বপ্রান্তের কাটোয়া পর্যন্ত প্রতিটি গ্রামে জমজমাট তার অধিষ্ঠান।

অজয়ের তীরে তীরে প্রাক আর্যযুগের গৌরবময় সভ্যতা ছড়িয়ে আছে। আউশগ্রামের উত্তরধারে পুবার গ্রামের পাশে আছে পাণ্ডুরাজাদের ঢিপি। চন্দ্রদ্বীপ, তেঁতুলদ্বীপ, ছোড়াধন কোড়ার বড়ো বড়ো জঙ্গলকীর্ণ ঢিবিগুলিতে রয়েছে চমকে দেওয়া সব অতীত কাহিনি। সেই সব কাহিনি অহরহ আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে।

বাংলা জয়ের বাসনায় বহুদিন ছাউনি ফেলে অবস্থান করেছে মোগলরা। তাদের এই অবস্থানের ফলে বাঙালির বুদ্ধি ও রাজপুত শৌর্য মিলে গেল। তৈরি হল নতুন জাতি। বর্গীর অত্যাচারের ফয়সালা হল মনকরার কাছে সন্ধিপুরে।

তাই নিয়ে লেখা হল কত গান।

বর্ধমান কবিশ্রেষ্ঠদের জায়গা। শ্রেষ্ঠ কবিদের জন্ম দিয়েছে। আমাকেও হতে হবে কবিশ্রেষ্ঠ। বাল্মীকি যেমন রামায়ণ লিখে গেছেন। ব্যাসদেব যেমন লিখে গেছেন মহাভারত। তেমনি মহাকাব্য না হোক একটা উৎকৃষ্ট কাব্য লিখতেই হবে আমাকে।

মহাভারতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীম দিগ্‌বিজয় করতে বেরিয়েছে। এসেছে এখানেও। বাংলার নানা জাতি-উপজাতিদের সঙ্গে তৈরি হয়েছে নানা মেল-বন্ধনের কাহিনি। পুণ্ড্রদের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদের একাতবদ্ধ করে মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে মিলিত হয়েছেন। মহাভারতের যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ হারিয়েছেন। পৌণ্ড্ররাজ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম ও সমুদ্র তীরবাসী ম্লেচ্ছদের ভীম পর্যুদস্ত করেছেন। কর্ণ অঙ্গ ও বঙ্গকে এক শাসনের অধীনে নিয়ে এসেছেন। পূর্ব-ভারতেব এই সমস্ত জাতি গোষ্ঠি কৃষ্ণ-বিরোধী দুর্যোধন ও জরাসন্ধের পক্ষে যোগ দিয়েছিল।

কত কাহিনির ঘনঘটা, এই সব পড়ি আর চমকে যাই। যতক্ষণ না শেষ হয় আমার অনুসন্ধিৎসা কমে না।

পৌরাণিক কাহিনি পড়ি আর ইতিহাসের সঙ্গে মেলাই।

সম্রাট শেরশাহ তার মাত্র চার বছরের রাজত্বকালে ঘুরে গিয়েছেন বর্ধমান। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেক বড়ো বড়ো কাজ করেছেন, তার মধ্যে একটি হল দেশে ডাক-ব্যবস্থার প্রচলন। দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে চিঠির বোঁচকা একপ্রান্ত থেকে দেশের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। অবশ্য তা যায় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অটুট রাখার জন্য। সাধারণ কোনো ব্যক্তিমানুষের চিঠির স্থান ওই বোঁচকায় হয় না। তবু তা না হোক, একটা নতুন প্রথার উদ্ভব তো হয়েছে। একদিন তা সাধারণের জন্য সম্প্রসারিত হবে। দেশে চিঠি লেখার চল আছে কিন্তু তা পৌঁছোনো সমস্যা। একদিন এর হাল হবে।

—আপনার কথায় মনে পড়ে গেল বিখ্যাত একটা চিঠির কথা। চিঠিটা ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের লেখা। লিখেছেন তিনি গৌড়ের রাজা নয়পালকে। 'বিমল-রত্ন-লেখা' নামে সে চিঠিতে দীপঙ্কর লিখেছেন তিনি তিব্বতে যাচ্ছেন কয়েক বছরের জন্য। কবে ফিরবেন বা আদৌ ফিরবেন কিনা তা জানেন না। তাই যাওয়ার আগে তাঁর প্রিয় রাজাকে প্রজাপালন ও রাজ্যশাসন বিষয়ে কয়েকটি জরুরি উপদেশ তিনি দিয়ে যেতে চান।

—দীপঙ্কর তিব্বত থেকে ফিরেছিলেন কিনা জানি নি। তবে চিঠির কাজ যদি হয় অন্যের কাছে নিজের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া, তা হলে আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্রগুলোও তো এক একটা চিঠি। তারা কেন চিঠির সুবিধা পাবে না? একদল মানুষ তাদের শিকারের কথা, তাদের জীবন যাপনের কথা, পাথরের গায়ে ছবি এঁকে লিখে রেখে গিয়েছে তা অন্য কারোর পড়ার জন্যেই তো? পৃথিবীর প্রথম চিঠি লেখার চেষ্টা বলা যায় গুহাগাত্রে অঙ্কিত এই চিত্রগুলোই। এই সব চিঠি হয়তো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়নি। কিন্তু তারা এক কাল থেকে আরও বহুকাল থেকে আরও বহুকাল পেরিয়ে অন্য কালে, কাল থেকে কালান্তরে সেই মানুষদের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে।

এই বঙ্গের পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগনা, ছোটোনাগপুর, মানভূম, ধলভূম, কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জের শৈলময় এবং অরণ্যময় মালভূমি। উত্তর পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি। উত্তরে হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য। উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা। পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জয়ন্তী-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি চলে গেছে একেবারে দক্ষিণ পর্যন্ত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যে গৌড়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম -তাম্রলিপ্তি-সমতট, বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ভাগীরথী, করতোয়া ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এবং আরো অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত পলিমাটিতে গড়ে উঠেছে। এখানকার গ্রাম-নগর, প্রান্তর, কান্তার সবই এই পলিমাটির অবদান।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গানদী রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়ে আরও উত্তরে প্রবাহিত হত। মহাভারতে সুহ্মের অর্ন্তগত গঙ্গার সাগরসঙ্গম পুণ্যতীর্থ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দু হাজার বছর আগে বর্ধমান ও হুগলি জেলার কাছাকাছি ছিল সমুদ্রের খাঁড়ি। দামোদর ও সরস্বতী দুই নদীর খাত-বরাবার গঙ্গার বারিরাশি প্রবাহিত হত। ত্রিবেণির কাছেই গঙ্গার মোহনা। নৌ-শিল্পী এবং নাবিকদের ঘনসন্নিবিষ্ট বসবাস সপ্তগ্রাম বন্দর ও পাণ্ডুয়া নগরীতে। এখান থেকে সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র, নানা প্রকার ইঁট ও তৈজসপত্র ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর শহরে রপ্তানি হয় জাহাজ ভর্তি হয়ে সমুদ্রপথে।

খ্রিস্টপূর্বে পঞ্চম শতকে গঙ্গা-সরস্বতী-দামোদর তীরবর্তী এই অঞ্চল মগরা, পাণ্ডুয়া, বর্ধমানের অদূরে গাঙপুরে (গাঙ অর্থাৎ নদী বা জল) ব্যবসা-বাণিজ্যের সদা ব্যস্ত অঞ্চল। ব্যবসার কারণে গঙ্গারিডি ও কলিঙ্গদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও মৈত্রভাব গড়ে ওঠে। গ্রীক সাম্রাজ্যবাদীর আক্রমণ এবং আর্য ঋষিদের উগ্র অনুশাসনে বিরক্ত হয়ে এরা একত্রিত হয়। গড়ে ওঠে যৌথ সংগ্রামের পটভূমি। যার ফলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিদেশ থেকে আগত আর্য ব্রাহ্মণ্য মতবাদকে তারা প্রতিহত করে ফেলে।

গঙ্গারিডিরা অত্যন্ত সুসভ্য, সুশৃঙ্খল এবং বহির্বাণিজ্য উন্মুখ নগরসভ্যতার মানুষ। তারা কৃষি-সভ্যতায় অনেক উন্নত, মূলত কৃষিজীবী হলেও শিকারে পারদর্শী তারা সেই সঙ্গে আছে ব্যবসা-বাণিজ্যে খাঁটি সওদাগরি মনোভাবাপন্ন। আর্য সভ্যতার ব্রাহ্মণেরা আচার-সর্বস্ব, যজ্ঞপরায়ণ আর রাঢ় বঙ্গদেশীয়রা 'হৃদয়রাজ', অতিথিপরায়ণ, তারা নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে চায়, জানতে চায় অন্য দেশের কথা।

খ্রিস্ট পূর্ব ৮০০-২০০ পর্যন্ত অনার্য সভ্যতার রাঢ়দেশ ছিল এই রকম। পশ্চিমাংশের পুরাতন গন্ডোয়ানা ভূমির অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য কয়েক শতাব্দী ধরে আর্যদের সঙ্গে লড়াই করেছে। এইভাবে তারা নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছিল অন্তত এক হাজার সাল পর্যন্ত।

—অথচ এই গঙ্গারিডিদের শৌর্য, বীর্য ও দেশপ্রেমকে আর্যজাতি গোষ্ঠী কখনও অভিনন্দন জানায়নি। তাই তাদের কথিত হিন্দু পুরাণাদিতে তা লিপিবদ্ধ করেনি।

—করেনি তো। রাঢ়ের দুটো অংশ-উত্তর এবং দক্ষিণ। অজয় নদ দুই রাঢ় অংশের সীমারেখা। রাঢ়ের দক্ষিণে তাম্রলিপ্তি (তমলুক), দন্তভুক্তি (দাঁতন) বিখ্যাত বন্দর ও জনপদ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোটোখাটো ব্যাপারে এখানে কড়িই মুদ্রার কাজ করে। স্বাধীন সুলতানি আমলে (দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) বাংলা মুলুক ধনেসম্পদে সমৃদ্ধ এক সোনার দেশ হয়েছে। বাংলা হয়েছে এক স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলার ধন-সম্পদ বাংলাতেই থাকে। বাংলা তাই আকর্ষণ করে বিশ্ববাসীকে।

সমুদ্রতীরে এবং দেশের অভ্যন্তরে তৈরি হয়েছে বহু জনপদ নগরী। ভিতরের নগর গুলিতে বাস সমৃদ্ধ হিন্দুদের। সমুদ্রতীরের বন্দরগুলিতে বাস করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষ। এদের জীবিকা সাধারণত জাহাজে করে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা। তারা চলে যায় কত শত দেশে আরব, পারস্য, আবিসিনিয়ায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বন্দরগুলিতে বাঙালি বণিকেরা ঘুরে ঘুরে বাস করে। এরা বণিকদের বড়ো বড়ো জাহাজে কাজ করে। জাহাজে নানান দেশের নানান দ্রব্য বোঝাই করা নামানো, জাহাজ সারানো ইত্যাদি কাজসহ। নানান কাজ তাদের করতে হয়। বোঝাই জাহাজ করমণ্ডল উপকূল হয়ে মালাবার, কাম্বে, পেগু, টেনাসিরিম, সুমাত্রা, লঙ্কা এবং মালাক্কায় যায়। কত দিন পরে নানান দেশ ঘুরে নানান দ্রব্যে ভরাট হয়ে বোঝাই-জাহাজ আবার ঘুরে আসে নিজের দেশে। আবার তারা নিয়ে যায় এদেশের উৎপাদিত তুলো, আখ, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ। সেদেশের মেয়েদের ওড়নার জন্য এদেশের মূল্যবান 'সরবতী' কাপড়ের খুবই চাহিদা। বাংলার ঘরে ঘরে মেয়েরা চরকায় সুতো কাটে, সেই সুতোয় এই কাপড় বোনা হয়।

রাঢ়ের উত্তরাংশে গৌড় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র আবার রাজধানী, ন-মাইল দীর্ঘ গৌড় শহর। প্রধান এই শহরে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষের বাস। বাণিজ্য দ্রব্যসম্ভারে রাস্তায় এত ভিড় লেগে থাকে যে মানুষের চলাফেরায় অসুবিধা হয়। এর পূর্বদিকে সপ্তগ্রাম, হুগলি, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও বন্দর। এগুলিও বাণিজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র। হুগলিতে পোর্তুগিজদের বাস। হুগলির অল্প দূরে দক্ষিণে আর একটা বন্দর নাম অঞ্জেলি। এখানে নেগাপটম, সুমাত্রা. মালাক্কা থেকে জাহাজ আসে। শহর ঘিরে বিদেশি বণিকেরা বাস করে।

শুধু বিদেশিরাই নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বণিকেরাও বাণিজ্য করতে আসে এই বাংলায়। এদের একটা বড়ো অংশ কাশ্মীরি, মুলতান, আফগান বা পাঠান, শেখ। পগেয়া বলা হয় যারা পাগড়িওয়ালা হিন্দুস্থানি। দিল্লি ও আগ্রা থেকে পাগড়িওয়ালা হিন্দুস্তানি ব্যাপারীরা প্রতি বৎসর এখানে আসে। তারা নিয়ে আসে আরবি ঘোড়া, আফিম ও সোরা। এগুলির বিনিময়ে তারা এখান থেকে সংগ্রহ করে সিসা, তামা, টিন, লংকা ও মূল্যবান কাপড়। কাশ্মীরি বণিকেরা আগাম টাকা দিয়ে সুন্দর বনে লবণ তৈরি করায়। কাশ্মিরী ও আর্মানিয়ান বণিকেরা বাংলা থেকে নেপালে ও তিব্বতে পণ্য সরবরাহ করে। তারা নিয়ে যায় চামড়া, নীল, মণিমুক্তো, তামাক, চিনি আর মালদহের সাটিন কাপড়। পাহাড় থেকে আসে ভুটিয়ারা। হিমালয় অঞ্চল থেকে আসে সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসীরা নিয়ে আসে চন্দনকাঠ, ভূর্জপত্র, রুদ্রাক্ষ, লতাগুল্ম যা ভেষজ কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই উপমহাদেশের সর্বত্র বণিকদের যাতায়াত স্থলপথে জলপথে।

হস্তিনাপুর, কর্ণাট, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, পাঞ্চাল, কম্বোজ, ভোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চি, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চিন, মহাচিন, কামরূপ সব প্রসিদ্ধ দেশ প্রসিদ্ধ নগর। এখানে উৎপন্ন আদা, কমলালেবু, বাতাবি লেবু এবং আরও অনেক ফলের চাহিদা খুব। এখান থেকে ঘোড়া, গোরু, মেষ ও বড়ো বড়ো মুরগি চালান যায় বিদেশের বাজারে।

বঙ্গদেশের এই ধনোৎপাদন তথা আর্থিক সঙ্গতির কথা প্রাচীন কাল থেকেই বহির্বিশ্বের মানুষ জেনেছে।

রাঢ় বঙ্গে একাদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সামন্ত রাজারা রাজত্ব করেছেন।

রাঢ় বীরভূমের কেঁদুলী (কেন্দুবিল্ব) গ্রামে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভোজদেবের পুত্র জয়দেব গোস্বামী বাসন্তী রসের বর্ণনা সম্বলিত সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছেন।

অক্ষর জন্মানোর ইতিহাসের পব, অক্ষর জুড়ে ছন্দোবদ্ধ হয় বৈদিক সংস্কৃত, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা।

চরৈবেতি বৈ মা....

চরণ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুম উদুম্বরম্।

কেবল চরে বেড়াও।....

অরণ্য থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ইন্দ্র বললেন, চরে বেড়ালেই মধু পাওয়া যায়। চরে মিষ্টি ফল পাওয়া যায়। সূর্যের ঐশ্বর্য দ্যাখো। সে চলতে চলতে ঘুমোয় না। কেবলই চলে, কেবলই চলে। ভারতীয় আর্য ভাষার পরে অবহট্‌ঠ ভাষা আসে। কিন্তু যাকে বলা হয় প্রাকৃত পৈঙ্গল, সেই ভাষায় গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করেন জয়দেব। গ্রামীণ উৎসব ও দেবপূজা উপলক্ষ্যে বাদ্যে নৃত্যে পাঁচালি রূপে পরিবেশিত হয় এদেশে নানা লোক কাহিনি। প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ও প্রাচীন বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়েছে এইভাবে লোকায়ত সাহিত্যের ধারা। দেব-দেবীর কাহিনি সম্বলিত গান লোকভাষায় পদচারণা করে গাওয়া হত। কিন্তু তার কোনো লিখিত পদবিন্যাস ছিল না। নাট্যকৃত এই গীতি কাব্যগুলোই জয়দেব এবং চণ্ডীদাসকে উদ্বুদ্ধ করে।

জয়দেব দেখলেন বিভিন্ন দেব-দেবীর কাহিনির মধ্যে কৃষ্ণলীলা সমৃদ্ধ কাহিনিই মানুষকে আকৃষ্ট করে বেশি। দিনের শেষে কাজের শেষেও রাখাল বালক হাসি মুখে রং মেখে কৃষ্ণযাত্রার আসর মাতিয়ে তোলে। তুর্ক অভিযান তাতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার পরিবর্তে বাংলায় সাহিত্য-চর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পক্ষে ভীষণভাবে সহযোগিতা করে জয়দেবের বাংলা ঘেঁষা সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ গীতগোবিন্দ। দ্বাদশ শতকের শেষদিকের এই বাঙালি কবি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষায় একমাত্র গীতিকাব্যের গ্রন্থ। জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড়ো কবি।

জয়দেব যখন নাকি গীতগোবিন্দ লিখছেন, তখন তাঁর ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে, পুথি খুলে 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' শব্দটি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। কবি তাঁর আরাধ্য রাধামাধবের বিগ্রহ পেয়েছিলেন অজয় নদের তীরে কদমখণ্ডীর ঘাটে। প্রতিদিন কবি কেঁদুলি থেকে ভোরবেলায় চলে যেতেন আঠারো ক্রোশ দূরে কাটোয়ায় গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে পুজো করতেন রাধামাধবের। কবির ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে একদিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে জানালেন, জয়দেবকে আর প্রত্যেকদিন কাটোয়ায় যেতে হবে না, বছরে একদিন মকরসংক্রান্তির কাকভোরে গঙ্গাদেবী আসবেন উজানে অজয়ে। ওই একদিনের স্নানেই কবির সারা বছরের গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন হবে।

কবি তখন জিজ্ঞাসা করেন, কী করে বোঝা যাবে সেই উজানী স্রোত?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, পৌষ সংক্রান্তির ব্রাহ্ম মুহূর্তে নদীর জল বেড়ে যাবে আর একটি পদ্মফুল ভেসে আসবে উজানে।

নাট্যরস সমৃদ্ধ কাব্য গীতগোবিন্দ পরিবেশনের জন্য দরবারি কবি জয়দেব একটি দল গঠন করেছিলেন। এই দলে তাঁর ভার্যা পদ্মাবতী নৃত্যগীতাদির মাধ্যমে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় গীতগোবিন্দের সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। জয়দেব রাজসভায় গীতগোবিন্দ গাইতেন আর পদ্মাবতী নাচতেন। এতে রাজসভার কবি হিসাবে জয়দেবের কোনো কুণ্ঠা ছিল না। একবার পদ্মাবতীর আগ্রহে রাজসভায় জনৈক দিগ্‌বিজয়ী সঙ্গীতনিপুণ কলাবিদের সঙ্গে জয়দেবের গানের প্রতিযোগিতা হয়। কলাবিদের গানে সভার কাছেই একটি গাছের সব পাতা ঝরে যায়! তখন জয়দেব বসন্ত রাগ ধরেন, অমনি গাছের ডালে ডালে নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। সেই দৃশ্য দেখে রাজা লক্ষ্মণ সেন কবি জয়দেবকে জয়পত্র লিখে দেন। গীতগোবিন্দের ধারায় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যও, নাট্যকৃত অবস্থায় বিভিন্নস্থানে গীত হয়। মানুষ তা মন দিয়ে শোনে। ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। নবদ্বীপের শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রে নৃত্যাদি সহ অভিনয় করতেন।

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি বীর ইখতীয়ারউদ্দীন বিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী নিয়ে নদিয়া দখল করে নেন। বৃদ্ধ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু তার ফলে বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়ল। তবে বাংলা চর্চার পথ উন্মুক্ত হল। বঙ্গভাষার ভাবে এবং সংস্কৃতি চর্চায় মুসলমান ঐতিহ্য অবাধে প্রবেশ শুরু করল। কবি জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পতনমুখী প্রশাসনকে দেখেছেন নিজের চোখে। কাব্যে

একটা সাম্রাজ্যের পতনকে তিনি ধরবার চেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু সেই ভাঙনকালকে তিনি ধরবার সুযোগ পাননি। রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁকে কেবল রাধাকৃষ্ণের কেলির বর্ণনা দিয়ে দিয়েই কাব্য লিখতে হয়েছে। তাঁর কলমকে চালনা করতে হয়েছে মানুষের মধ্যে ভক্তিভাব জাগিয়ে তুলতে। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। আমি লিখতে চাই মানুষের কথা। যে মানুষ মাঠেঘাটে কাজ করে, যে মানুষ গভীর জঙ্গলে মাটির রাজপ্রাসাদ তৈরি করে, যে মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি সভ্যতা তৈরি করে।

দিল্লির সিংহাসনে সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২২ খ্রিঃ) বসলেন। সোনারগাঁও ও লক্ষৌতি একত্রে বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত হল। (১৩২৫ খ্রিঃ) তুঘলকের নির্দেশে কাদর খাঁ (লক্ষৌতি), মালিক যাজুদ্দীন যাহিয়া (সাতগাঁও) এবং তাতার খাঁ বা বহরাম খাঁ (সোনারগাঁও) তিন বিভাগের কর্তা নির্বাচিত হলেন। (১৩২৫ খ্রিঃ) সাতগাঁওয়ে টাকশাল নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হল। শিক্ষা-সংস্কৃতি-বৈদেশিক বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে সাতগাঁও উন্নত হয়ে উঠল।

অতর্কিতে আক্রমণ করে বখতিয়ারউদ্দীন লক্ষ্মণ সেনকে তাড়িয়ে অধিকার করে নেয় সুখ ও সমৃদ্ধির দেশ গৌড়। তারপর অন্যান্য পাঠান সর্দাররা রাঢ়বঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে স্থানীয় সমস্ত রাজারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। রাঢ় অঞ্চলের মাটি ভিজে গেল বীরের রক্তস্রোতে। তারপর সেই বাংলাকেই ভালবেসে লুণ্ঠনকারী পাঠান সর্দাররা একে একে হয়ে গেলেন বাঙালি। বাংলার নরম পলি মাটির এমনই গুণ।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান শাসনের শুরুতে বঙ্গদেশের মানুষ কর, খাজনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মানুষকে খাজনা দিতে বাধ্য করা হয় পণ্যদ্রব্য আর কড়ির বিনিময়ে। দিল্লির শাসনকর্তারা অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বঙ্গদেশের অর্থভাণ্ডারের উপরই বেশি নির্ভর করে। বঙ্গদেশের আর্থিক উন্নতির জন্যই ভারতের বহু এলাকা থেকে এখানে বসবাস করতে আসে বহু মানুষ।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ ও চর্তুদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্য আর ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ফলে এখানে প্রচুর সোনা ও রূপার আমদানি হয়। এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। নতুন করে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। শুধু জলপথ নয় পশ্চিম ভারতের মধ্য দিয়ে স্থলপথেও বঙ্গদেশের পণ্য দ্রব্য আরব, পারস্য আর ইউরোপের দেশগুলিতে চালান যেতে থাকে। ফলে ইউরোপের বণিকেরা বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়ে। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বঙ্গদেশ তাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শাসক সম্প্রদায়ের কাছেও চোখের মণি হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

'ঐতরেয় আরণ্যক'-এ বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধায়নের 'ধর্মসূত্রে' জানা যায় বঙ্গ কলিঙ্গের প্রতিবেশী এক জনপদ। মহাভারতের ভীম পরাজিত করেছেন বঙ্গের রাজাকে। রামায়ণেও আছে বঙ্গজনপদের উল্লেখ। বঙ্গজনরা অযোধ্যার অভিজাত বংশীয়দের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মোটের উপর একাদশ শতক থেকে পাওয়া যায় 'বঙ্গাল' নাম। 'সদুক্তি কর্ণামৃত' যার সংকলন কাল ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ, সেখানে আছে বঙ্গাল কবির গঙ্গাস্তোত্র। তবে 'বাংলা' নামকরণ হয়েছে মোগল আমলে। মোগল আমলে বলা হল সুবে

বাংলা। আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরি'তে 'বাংলা' নামের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল'যুক্ত হয়ে 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গালা' হয়েছে। পোর্তুগিজ উচ্চারণে এটি দাঁড়ায় 'বেঙ্গলাহ্'।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব শুরু হলেও প্রথম থেকেই যে ইসলামের কাজ শুরু হয়েছে তা নয়। মুসলমান শাসনের একশত বছর পরও বঙ্গদেশে দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা খুব একটা বেশি হয়নি। বিদেশি মুসলমানেরা তখনও এখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচজন হয়ে উঠতে পারেনি। খ্রিস্টীয় চর্তুদশ শতাব্দীর শেষে বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা হয় মোটামুটি শতকরা কুড়ি জন। বিদেশি মুসলমানের সংখ্যা বাদ দিলে স্থানীয় ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের শতকরা পনেরোজনই ছিল শুধু নামেই মুসলমান।

বাকি শতকরা আশিজনই হল হিন্দু। এদেশের উন্নতির চাবিকাঠি তাই রয়ে গেল হিন্দুদের হাতে। কেননা নব মুসলমানেরা এসেছে প্রধানত এদেশেরই নিম্নতর ও অনুন্নত আর শিক্ষাহীন গরিব মানুষদের মধ্যে থেকে। আর এদের প্রধান পেশাই কৃষিকর্ম। এদের মধ্যে যারা খুব গরিব, তারা দিনমজুরের কাজ করতেও বাধ্য হত। যথেষ্ট পরিশ্রমী হলেও এরা যথেষ্ট উদ্যমী ছিল না। তবে যাবতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে শ্রমের প্রয়োজন, তার মূলে ছিল এই শ্রেণির মানুষরাই।

মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে উদ্যমী ও পরিশ্রমী হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে দূরে সরে ছিল। ক্রমে তারা যখন বুঝতে পারল যে মুসলমানেরা তো এদেশেই বসবাস করছে। তারা লুটেরা নয়। তখন তারা স্থির করল, তবে কেন আর ওদের সাথে বৈরিতা করা। হিন্দুরা তখন আর শুধু মেলামেশা করা নয়, মুসলমানদের সঙ্গে রাজকাজেও অংশ নিতে শুরু করল।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ অর্জনে অর্থাৎ ধনোৎপাদনে মুসলমানদের ভূমিকা তখনো খুবই গৌণ। কেননা তারা উৎপাদনশীল কর্ম, কৃষি আর শিল্পসামগ্রী নির্মাণে খুব বেশি আগ্রহ দেখায় না। প্রশাসন এবং সামরিক কাজকেই তারা তাদের উপযুক্ত কাজ বলে মনে করে। যথার্থ কায়িক পরিশ্রমের কাজকে তারা অপছন্দ করে। ওগুলোকে মনে করে ছোটো লোকেদের কাজ। তাছাড়া রাজকাজে সম্মান নজরানা আছে বেশি। এছাড়া ধর্মীয় কিছু কাজ যেমন বিচার করা অর্থাৎ কাজির কাজে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখানো মক্তব মাদ্রাসা এই ধরনের কাজের দিকে তাদের অনুরাগ তৈরি হয়।

সামান্য কিছু বিশেষ ধরনেব ব্যবসা তারা করে।

বাকি সব কাজই করে হিন্দুরা।

পরবর্তী একশো বছরে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুরা ক্রমশ মুসলমান শাসকদের রাজকাজে প্রবেশ করল। হিন্দুদের নতুন নতুন পেশা, কাজ ও জীবিকা তৈরি হল। ফলে তারা আরবি ফারসি নামের নতুন নতুন পদবি পেতে শুরু করে। বঙ্গদেশের জমিদারদের অধিকাংশ তখন কায়স্থ হিন্দু। তাদের অধীনে থাকে ২৩,৩০০ জন করে অশ্বারোহী। ৮,০১,১৫০ জন পদাতিক সৈন্য আর ৪,৪০০টি করে নৌকো।

তুর্কি আক্রমণের পটভূমিকায় বাংলার সমাজে আত্মরক্ষার তাগিদে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন ঘটতে থাকে। বৈশ্য সম্প্রদায় হয়ে ওঠে অভিজাত, তাদের মধ্যে শৈব ধর্মের প্রাধান্য। দামোদর নদের বন্ধনহীন দুর্বার গতি, উত্তাল তার জলরাশি। সপ্তডিঙা নৌবহরে পণ্যসম্ভার সাজিয়ে যখন বণিকেরা সমুদ্রযাত্রায় বের হয়, তখন মনে হয় যেন একখানি সুসজ্জিত নগরী নদীবুকে ভেসে চলেছে।

শাসক মুসলমান হলেও এই সব দেশীয় রাজারাই হয় প্রকৃত সর্বময় কর্তা। শাসকদের নির্ধারিত কর বা রাজস্ব দিতে পারলেই তাঁরা স্বীয় অধিকারের মধ্যে যথেচ্ছভাবে বাস করতে পারে। এমনই অবস্থা হয় যে মুসলমান কর্মচারীদের উপরেও স্থান পায় হিন্দু রাজকর্মচারী। 'ওয়ালী' অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হয় হিন্দুরা। মন্ত্রী বা সেনাপতির পদেও নিযুক্ত হয়। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি বিভাগেই থাকে হিন্দুরা। শুধু পদাতিক বাহিনীতেই স্থানীয় নিম্নশ্রেণির মুসলমান মানুষেরা অন্তর্ভুক্ত হয়। অশ্বারোহী এবং গোলান্দাজ বাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যাই থাকে বেশি। তেমনি নৌ-বাহিনীতেও স্থানীয় গরিব মানুষজনদের সংখ্যা থাকে বেশি। এদের মধ্যে যেমন মুসলমান আছে তেমনি আছে হিন্দুরাও।

পদ অনুযায়ী কোনো হিন্দু রাজ-কর্মচারী নিষ্কর সম্পত্তিও ভোগ করে। সর্বোচ্চ বেতন ভোগ করে শাসক হিসাবে। শিক্ষিত ও প্রতিভা সম্পন্ন লোকেদের সম্মান ও সাম্মানিক দেওয়া হয় পুরস্কার হিসাবে। কায়স্থদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের অংশগ্রহণে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটতে থাকে। বঙ্গদেশের একটি ভৌগোলিক সীমারেখা তৈরি হতে শুরু করে এই সময় থেকেই। বাঙালি জাতীয়তা, বঙ্গ-সংস্কৃতির ভিত্তি তৈরি হয়। হিন্দুদের মধ্যে একটি সংগঠিত শ্রেণি তৈরি হবার সম্ভাবনা খুলে যায়। ওদিকে "ফৌত" আইনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়। কেননা মৃত্যুর পরে মুসলমান রাজকর্মচারীদের ধন-সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়।

ভাষার বিকাশে মানব-মানবী ভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের গঠনও শুরু হয়। শুরু হয় বর্ণবাদী সমাজ ও শ্রেণি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভাবনা-চিন্তাও। বাঙালির খাদ্য, পোশাক, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটতে থাকে। উচ্চবর্ণের বাঙালিরা পরিধান করতে শুরু করে বড়ো ধুতি। ব্যবহার করতে শুরু করে শালকিরানি, চটক ও মটক, কোমরবন্ধ, মাথায় চল্লিশ পাকের পাগড়ি। ব্রাহ্মণদের গলায় শোভা পেতে শুরু করে ঝোড়া পইতে। সঙ্গে গয়নাও যুক্ত হয়। গলায় তারা সোঁনার হার, হাতে বালা পরিধান করে। কারোর কারোর কানে সোনার কুন্তল বা ওই জাতীয় কোনো ভূষণ শোভা পায়।

রোগা ডিগডিগে কোমরে ইয়া বড়ো লালরঙা কোমরবন্ধ পরে আমাকে মানায় না বুঝতে পারি। তবু পরতে হয় কাজে কর্মে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে গেলে। মমতা তো হেসে অস্থির হয়। ময়ূরপঙ্খী জুতোয় মসমস আওয়াজ ওঠে। ধুতি হাঁটু অব্দি পরাই ছিল নিয়ম, সেই ধুতি নেমে এল আরো নীচে। কোঁচার পত্তন হল। আদিযুগের ধুতি রীতিমতো খাটো ছিল, সেসব সেকেলে ব্যাপার হয়ে গেল। ধুতি এখন লম্বা দশ এগারো হাত।

মেয়েদের পরনের শাড়ির মধ্যে চিরকালীন খ্যাতি ঢাকাই মসলিনের। যার নাম 'শবনম'। এতই মিহি কাপড় যে ভোরের শিশিরের নামানুসারে তাঁতিরা নাম দিয়েছে—শবনম। একটা

মসলিনে বারোশো সুতো থাকে। চওড়ায় এক গজ। অথচ কাপড়ের ওজন মাত্র কুড়ি তোলা। অবশ্য এই কাপড় পড়লে মেয়েদের একেবারে বে-আবরু দেখায়। সেই কারণে অনেক শাসক সূক্ষ্ম কাপড় পড়া নিষিদ্ধ করে স্থানীয়ভাবে বহু জায়গায়।

জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আসবাব পালটে যায়। পোশাক, খাদ্য, আইন-আদালত, শিল্পকলা ও মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আগেই বলেছি আরবি ফরাসি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে। মুসলমান শাসকদের সকলেই যে অত্যাচারী বা অনুদার ছিল তা নয়। এঁদের সুশাসন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অংশগ্রহণে নতুন সংস্কৃতির সম্ভাবনা জাগাতে শুরু করে।

গরিব ও অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের হাড়ভাঙা শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ধন দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে। মুখের যে অন্ন ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারে না, তাই উৎপন্ন করে মেহনতি মানুষগুলো। মুসলমানদের মধ্যে আর্থিক সংগতিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সামরিক শক্তি তাদের হাতে থাকলেও যথার্থ আর্থিক শক্তি হিন্দু জমিদার ও কর আদায়কারীদের হাতে। সামরিক শক্তির মূলে থাকে আর্থিক শক্তি, যা সর্বশক্তির আধার। এই শক্তির জোরেই রাজা গণেশ (১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে) বঙ্গে মুসলমান শাসনের পতন ঘটিয়ে দিল।

হিন্দু রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহি বংশের শাসকদের আমির ছিলেন। বলখির অভিপ্রায় অনুযায়ী গিয়াসুদ্দিন রাজা গণেশ সহ সমস্ত হিন্দু আমিরদের পদচ্যুত করে রাজা হলেন। ফলে রাজা গণেশ গিয়াসুদ্দিনের শত্রু হয়ে দাঁড়ান। তিনি চক্রান্ত করে গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করালেন। বাংলার ইতিহাসে রাজা গণেশ অবিস্মরণীয় পুরুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

তিনিই একমাত্র হিন্দু, যিনি বাংলার পাঁচশত বৎসর ব্যাপী মুসলমান শাসনের মধ্যে কয়েক বৎসরের জন্য এককভাবে হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য গণেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই হিন্দু অভ্যুদয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়। রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী চতুর জমিদার। তিনি উত্তরবঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। ক্রমে নিজের পরাক্রম বাড়িয়ে ইলিয়াস শাহি বংশের শাসকদের আমির হন। তারপর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে স্বয়ং বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু বেশি দিন রাজত্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশ বিধর্মী এই রাজার সিংহাসন অধিকারে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা প্রচণ্ড বিরোধিতায় নেমে পড়ে। এদের নেতৃত্ব দেয় বাংলার দরবেশ সমাজ। গণেশের পুত্র যদু সিংহাসনের লোভে নিজের ধর্ম বিসর্জন দেয়। ১৪১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে পিতার বিপক্ষে দাঁড়িয়েই দরবেশের সাহায্যে তিনি সিংহাসনে বসেন। নাম নিলেন জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ।

বাংলায় হিন্দু প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে আবার মুসলমান প্রাধান্য ফিরে আসে। কিন্তু এই পরিবর্তনও স্থায়ী হয় না।

রাজা গণেশ সুযোগ বুঝে প্রত্যাবর্তন করেন। নিজ ক্ষমতা তিনি পুনরুদ্ধার করেন।

পুত্র যদু, জালালুদ্দিন নামেই কেবল সুলতান থাকেন। রাজা গণেশ নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করলে, পুত্র জালালুদ্দিনকে অপসারিত করে স্বয়ং 'দনুজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আবার বসেন। 'দনুজমর্দনদেব' বঙ্গাক্ষরে খোদিত মুদ্রা প্রচলন করেন। মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় রাজার নাম এবং অপর পৃষ্ঠায় টাঁকশালের নাম উৎকীর্ণ হয়। সেই সঙ্গে চণ্ডীচরণপরায়ণস্য শব্দও লেখা হয়।

প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী রাজা গণেশ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। চণ্ডীদেবীর প্রতি তাঁর আনুগত্য অপরিসীম। কিন্তু পরধর্ম বিদ্বেষ হতে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। রাজনৈতিক কারণেই তিনি কয়েকটি মসজিদ ও মুসলমান প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অনেক মুসলমানের ভালোবাসাও পেয়েছিলেন। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার কয়েকটি বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি তিনিই নির্মাণ করেন। গৌড়ের ফতে খানের সমাধি সৌধ এবং পাণ্ডুয়ার একলাখি প্রসাদ তাঁরই কীর্তি।

'দনুজমর্দনদেব' রূপে ১৪১৭-১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজা গণেশ রাজত্ব করে পরলোকগমন করেন।

রাজা গণেশ স্বল্প সময়ের জন্য হলেও উত্তরবঙ্গ-সহ পূর্ববঙ্গের সমস্তটা, মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ নিয়ে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলেই নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখি এই ধরনের ঘটনা। ধর্মের রঙে মানুষ খেলেছে রক্তের হোলি। কিন্তু, ধর্মের বর্ম চাপিয়ে অপকর্ম নয়, কর্মই মানুষের আসল পরিচয় একথা মানুষকে কে শেখাবে?

পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই ধর্মের গ্লানি, অধর্মের প্রাদুর্ভাব, অসাধু এবং দুষ্কৃতীদের প্রাধান্য ও নিপীড়ন হয়েছে তখনই সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্মের দূরীকরণ, অসাধু দুষ্কৃতীদের বিনাশ এবং যুগোপযোগী ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরকোটি অবতার পুরষেরা ধরণীর ধূলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীমদ্‌ভগবতগীতায় তার উল্লেখ আছে।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মাং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (জ্ঞানযোগ-অধ্যায় ৪, শ্লোক ৭)।

উপনিষদ সৃষ্টি হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতক পূর্বে। ঐতরেয় আরণ্যক উপনিষদের সংযোজন হলে এবং তার সময়কাল এক হাজার বছর ধরলে, ঐতরেয় আরণ্যকের জন্মকাল কম করেও তিন হাজার বছর আগে। এই "ঐতরেয় আরণ্যক" গ্রন্থেই প্রথম বাঙালি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যায় বাঙালি জাতি অন্তত পক্ষে তিন হাজার বছরের বেশি প্রাচীন। আজকের বাঙালি তাই কোনো একক গোষ্ঠীভুক্ত জাতি নয়, একটা মিশ্র জাতি। বাঙালিদের মধ্যে যুগ পরম্পরায় মিলিত হয়েছে বহুজাতিক সংমিশ্রণ।

—তাহলে আর কীসের জন্য জাতের বড়াই? জাত চলে যাবে বলে সদাই ভয় করে কেন সবাই?

—সত্যি করে বলতে গেলে, সেই তো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে আগত জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে এদেশের প্রাচীন জাতি অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর মিলন মিশ্রণে সৃষ্ট এই বাঙালি জাতি। আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশের পূর্ব থেকেই বাঙালি জাতি উন্নত সভ্যতার অধিকারী। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি উন্নত কৃষ্টির ধারক ও বাহক। দেশের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের থেকে বাঙালি স্বতন্ত্র ও উন্নত। বাঙালিরা যাগযজ্ঞ বিরোধী পূজা প্রণালীতে বেশি রপ্ত। পৌরাণিক দেব-দেবীদের সাধন ভজনের রেওয়াজ বাঙালির মধ্যে বিশেষ ছিল না। বাঙালি বৈদিক দেব-দেবীদের তেমন কদর করেনি কোনোদিন।

তাহলে কি আর্য প্রভাব এই অঞ্চলে বহু পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে?

বসে বসে এই সব ভাবি, ভাবি আর মাথার চুল ছিঁড়ি।

বৈদিক যুগে কোনো মূর্তিপূজা ছিল না। ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব এই চার বেদের মধ্যে, একমাত্র ঋগ্‌বেদেই রাত্রিসূক্ত ও দেবীসুক্তেই শক্তি বা মাতৃপূজার কথা বলা হয়েছে। বৈদিক যুগে প্রাকৃতিক শক্তি হিসাবে পূজিত ছিল জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। এদেরকে সূর্য, চন্দ্র, বরুণ বা সমুদ্রের দেবতা হিসাবে ভাবা হয়। সম্ভবত নিরাকার সাধনাকে সহজ ও মূর্ত করতেই বৈদিক পরবর্তী যুগে প্রাকৃতিক শক্তির বিশেষ বিশেষ রূপের আরাধনা করা হয়।

যেমন সূর্য সকল শক্তির। সূর্যের দৌলতেই মেঘের নীলিমা, ঋতু পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির লীলা, ঝড়-বৃষ্টি। সূর্যের কারণে গাছগাছালি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বতে অজস্র সবুজের খেলা, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। প্রাকৃতিক শক্তি, বসুন্ধরা, নদ, সিন্ধু ও অগ্নিকে দেবী পদে বরণ করা হয়েছে।

শাক্ত এই সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কোনোপনিষদের উপাখ্যান থেকে পাওয়া। বৈদিক আচার্যদের মতে বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা। শ্রীশ্রীচণ্ডীকে তাই বলা হয় "বেদমূলা"। চণ্ডীই রক্ষা সৃষ্ট করেছেন, তিনিই আদি শক্তিময়ী দেবী। তিনি দশ মহাবিদ্যার প্রতীক। বাঙালি ভক্তিপ্রবণ জাতি। দেবতাদের অস্তিত্বে তারা বিশেষভাবে বিশ্বাসী। তারা অন্তরের অন্তস্তল থেকে নিঃসৃত ভক্তি নিষ্ঠায় দেবতার পূজা করেছে। আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভক্তিই দেব আরাধনার প্রধান উপকরণ। বিনিময়ে দেবতারা যেমন তুষ্ট হয়েছেন, তেমনি বহুজনই অন্তরনিহিত ভক্তি শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠায় আরাধ্য দেবদেবীর কৃপাধন্য হয়েছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হতে ৯৩ এই তেরোটি অধ্যায় চণ্ডীর অর্ন্তগত। "দেবী মাহাত্ম্য" ও "দুর্গাসপ্তশতী" চণ্ডীর অপর দুটি নাম। সপ্তম শতাব্দীর 'পথমঙ্গলইড' অক্ষরে চণ্ডীর প্রসিদ্ধ শ্লোকে "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে" মন্ত্রটি লিখিত আছে। ভবভূতি ও বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মনীষী, এঁরা উভয়েই এরও পূর্বে চণ্ডীর অস্তিত্ব ছিল বলে বহু স্থানে মন্তব্য করেছেন। "জৈন পদ্মপুরাণ" রচয়িতা রবি সেন ৬৭৮ অব্দে শ্রীশ্রীচণ্ডীর উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে নাগার্জনী গুহায় শিলালিপিতে, দেবী কৃর্তক মহিষাসুর নিধনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এদেশে শক আগমনের পূর্বেই চণ্ডীর অস্তিত্ব ছিল। দেবী চণ্ডীর বাস্তব মূর্তির বয়স সেই হিসেবে দু হাজার বছর। বাঙলাদেশ চণ্ডীর জন্মস্থান। ভারতে প্রচলিত গৌড়ীয় কেরলীয়, কাশ্মীরি ও বিলাসী এই চার তন্ত্রের মধ্যে গৌড়ীয় তন্ত্রই প্রাচীন। এই তন্ত্রে আছে, গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা (তন্ত্র) অর্থাৎ গৌড়বঙ্গেই তন্ত্রবিদ্যার প্রথম প্রকাশ। এই

অঞ্চলের আদিমতম অধিবাসী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর কিরাত, শবর, বোড়ো (বাউরী), ডোম জাতি গোষ্ঠীর উপাস্য দেবী চণ্ডী।

চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বলা হয়েছে বঙ্গেই দেবী চণ্ডীর জন্ম।

"স চ বৈশ্য স্তপস্তেপে দেবী সুক্তং পরং জগন।

তৌ তস্মিন, পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীমহীন।"

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীর পূজা হয়। নাটাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, অবাক চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, খেলাই চণ্ডী ইত্যাদি বত্রিশ রকমের নাম করা যেতে পারে। আবার প্রতিটি লৌকিক চণ্ডীর মাহাত্ম্য এক এক ধরনের। আমিও তাই পৃথক ভাবে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে চাইলাম।

সূরথ ও সমাধি জগন্মতার সম্যক দর্শনলাভ মানসে নদীতীরে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, দীপ (বা হোম) ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পুজো করেন। ভারতের মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রের সন্নিকটে ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা) অদূরে উদয়গিরি গুহার পর্বতগাত্রে আর উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের পোরষগ্রামে প্রস্তর নির্মিত অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্তির সন্ধান মিলেছে।

বেদোক্ত চণ্ডী প্রাগার্যকালের আদি বাসিন্দা। তিনি কিরাত, শবর, কোড়া ও ডোম প্রমুখ নিম্নবর্গীয় মানুষদের দ্বারা পূজিতা হন। পরবর্তীকালে উচ্চবর্গের মধ্যে দেবী স্থান করে নিয়েছেন। আর্যরা এই দেবীকে শাস্ত্রীয় দেবীতে পরিণত করেছেন। আর্যদের এই দেবী আত্তীকরণের কাহিনিই আমি লিখতে চাইলাম কবিতার ভাষায়।

বৃক্ষপুজো, ধ্বজাপুজো, চড়কপুজো, পাহাড় নদী পশু পাখির পুজো সব কিছুই অনার্য সংস্কৃতির দান। মনু নিষিদ্ধ গ্রাম্য দেবদেবীর দল সীমান্ত বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। দুর্গা-কালী-শিব অথবা যে কোনো পুরাণসম্মত দেবদেবীর পূজা অর্চনার পূর্বে গ্রাম্য দেবদেবীর সম্মানজ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য। বাংলার আদি অনার্য দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর এক মানব উপজাতি হল ওঁরাও সম্প্রদায়। এরা কৃষিজীবী হওয়ার পূর্বে শিকার করাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। এঁদেরই আরাধ্য দেবতা হল চাণ্ডী। চাণ্ডী স্ত্রী দেবতা। তিনি শিকারের দেবী। চণ্ডী মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবী। গোলাকার একখণ্ড প্রস্তরের মধ্যে এর পূজা হয়। ওঁরাও যুবকেরা শিকারে বের হওয়ার সময় চাণ্ডীশিলা নিজেদের সঙ্গে রাখে। তাদের বিশ্বাস, এই চাণ্ডীশিলা সঙ্গে থাকলে শিকারে সাফল্য আসে ও যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। প্রত্যেক ওঁরাও পল্লীতে কোনো পর্বতের গায়ে বা উঁচুস্থানে চাণ্ডীশিলা রাখা থাকে। মাঘিপূর্ণিমার দিন চাণ্ডীর বাৎসরিক পুজোর আয়োজন করা হয়। স্থানটিকে গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে যুবকদের মধ্যে একজনকে 'হাছান' বা পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। এরপর পাহান যুবক সঙ্গীদের সাথে নিয়ে পূজা ও ভোগের উপকরণ এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে চাণ্ডী শিলার কাছে আসে। পাহান যুবক চাণ্ডীশিলায় তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে দেয়। আতপ চাল ছড়িয়ে দিয়ে, বলির জন্য নিয়ে আসা ছাগ শিশুটি আতপ চাল যখন খেতে থাকে তখন এক কোপে তাকে কেটে ফেলা হয়। সেখানেই তার মাংস রান্না করে ভোজ নিষ্পন্ন করা হয়। সন্ধ্যার পর সকলে গ্রামে ফিরে আসে। যুবক-যুবতীরা গ্রামের আখড়ায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নৃত্য করতে থাকে। এই দ্রাবিড়-ভাষী

জনগোষ্ঠীর সাথে আর্যভাষীদের যোগাযোগের ফলে আর্যীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ায় আর্যভাষীরাও অন-আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং অন-আর্যভাষীদের পূজিতা মঙাম্মা হয়ে যান মনসা, চাণ্ডী হয়ে যান চণ্ডী। ওরাওঁদের চাণ্ডা যেহেতু অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাই দেবী, দুর্গারও বাহন অরণ্যের রাজা সিংহ। সিংহবাহিনী হয়ে তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা পূজিতা। আমি তাই আমার কাব্যের আখেটি খণ্ডে ব্যাধ কালকেতুকে দিয়ে এই চণ্ডীর পূজা করালাম।

ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, ডোম, চণ্ডাল সবাই দেবীর পূজায় মেতে উঠবে। ইচ্ছাপূরণের দেবী হবেন চণ্ডী। প্রতিটা গ্রামেই তার পূজা হবে। এতো মানুষের পৃষ্ঠপোষণা, কবিদের উৎসাহিত করবে কাব্য রচনা করতে। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারাও উৎসাহিত হবে দেবীকে মণ্ডপে মণ্ডপে আবাহন করতে।

বাঙালির স্বভাব নম্র। পেলব, নদীবহুল মৃত্তিকায় যুগ যুগ ধরে অবস্থান হওয়ায় বাঙালি জাতির অন্তর কোমল প্রকৃতির। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা শুধু নয়, এই জাতির মধ্যে দয়া-মায়া স্নেহ-প্রেম প্রীতি-ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো অতিমাত্রায় বর্তমান। গুপ্তযুগের সময়কালে রচিত বিভিন্ন পুরাণকাব্য এবং রামায়ণ মহাভারতেও দেখা যায়, বাঙালি জাতি আপনজন সহ বহু জাতি গোষ্ঠীর পরিবার পরিজনদের নিয়ে মিলেমিশে যৌথ পরিবারের আওতায় সন্নিবেশিত থেকেছে। ফলে এই সময় থেকেই বাঙালি যৌথ পরিবারের চল তৈরি হয়েছে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকলেও বাংলায় কৃষিই জনসাধারণের প্রধান উপজীব্য। আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কৃষিকাজই প্রশস্ত পেশা। বাণিজ্যে মূলধন প্রয়োজন। তারপর সেখানে অনেক জাল প্রতারণা করতে হয়। চাকরিতে আত্মমর্যাদা থাকে না। যজমানি কিংবা ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থলাভ হয় না। বাংলার অতুলনীয় কৃষিজ সম্পদ। নানাবিধ শস্য, ফল, শাক-সবজির চাষ হয় এখানে। সুতরাং কৃষিই একমাত্র মহৎ পেশা। কৃষির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই শ্রেয়। আমিও তাই যজমানির চেয়ে চাষাবাদকেই জীবনধারণ ও পরিবার পালনের শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করেছি।

বঙ্গদেশে মুসলমান আধিপত্যের আগে এখানকার মানুষ কথা বলত চর্যাপদের ভাষায় (১২০২ খ্রিস্টাব্দ)। যাকে অবজ্ঞা করে অবহট্ঠ বা অপভ্রষ্ট বলা হয়। তার সঙ্গে থাকত প্রাকৃত, মৈথিলি ও পূর্ব মাগধীর সংমিশ্রণ। সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বঙ্গদেশে ছিল না বললেই চলে। বাংলা ভাষা ক্রমশ বাঙালির অন্তরের ভাষা হয়ে উঠেছে। বাঙালি তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য এই ভাষাকেই ব্যবহার করেছে। এই ভাষাই ক্রমে বঙ্গ-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

মহাভারতে চণ্ডী শক্তিদেবী হিসাবে উল্লেখিত। দেবী চণ্ডী, দুর্গা, শিবের পত্নী এ কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমারী রূপে পরিগণিতা হবার পরই শিবসঙ্গিনী উমা রূপে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। 'চণ্ড' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ পাওয়া যায় রামায়ণে। 'চণ্ড' শব্দটি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর, সংস্কৃতেও চণ্ড শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হরিবংশে রোগের জনক, অপদেবতার নাম হল 'চণ্ডী'। এর জন্যই হয়তো চণ্ডী বৈদিক দেবী হয়েও লৌকিক হয়েছেন।

অন-আর্য দেবদেবীদের পূজার জন্য কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। মঞ্জাম্মা যখন আস্তিক মুনির মাতা এবং জরৎকারু মুনির পত্নী মনসায় রূপান্তরিত হয়ে শিবের মানস কন্যা হিসাবে পরিগণিত হলেন, তখন কিন্তু তাঁর পুরোহিত গ্রামবৃদ্ধ লয়ারা। বাউরি, জেলে, বাগদি যে কেউ এই লয়ার কাজ বা দেয়াসির কাজ করতে পারত। তাঁরা আর্য পুরোহিতদের মতো উপবীত ধারণ করত। কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্রে এই দেবদেবীদের পূজো করার রীতি ছিল না। আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার পরবর্তী স্তরে যখন সম্পত্তি ও ব্যক্তি মালিকানার উদ্ভব হল, তখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। প্রতিটি রাজবংশ নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের উদ্ভবের পেছনে এক একটি লৌকিক কাহিনির প্রচলন করতে শুরু করে দিল। এই সময় থেকেই বলতে গেলে আর্যভাষীদের অনুকরণে তাঁরাও সংস্কৃতমন্ত্র, দুর্গা-কালী-শিব ইত্যাদি দেবতার পূজার প্রবর্তন ঘটাল এবং স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা নিযুক্ত হয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা নিজেদের নিজেদের গর্বিত মনে করলেন। তবে, সবটাই অর্থের লোভে নয়। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা ভক্তিতে।

কৃত্তিবাস কৃত বাংলা রামায়ণে রাবণ ও রাম উভয়েই দেবী ভক্ত, দেবীর পূজা করেছেন। এই দেবী চণ্ডী সিংহবাহিনী ও মহিষমর্দিনী। বঙ্গে ইনিই হলেন দুর্গাদুর্গতিনাশিনী। রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র শরৎকালে এই দেবীর আরাধনা করেন যা অকালবোধন নামে খ্যাত। রামের আরাধনায় প্রীতা হয়ে দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। সুরথ ও সমাধি শরৎ-কালেই দেবীর পূজা করেন। ভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি।

শ্রীরামচন্দ্র একশো আটটি পদ্মের দ্বারা দেবীপূজার সংকল্প করেন, কিন্তু দেবী ভক্তকে পরীক্ষার নিমিত্ত একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। পূজা সম্পূর্ণ ও সিদ্ধ হবে না জেনে শ্রীরামচন্দ্র পদ্মের পরিবর্তে নিজের একটা চোখ উৎপাটিত করতে চান। শ্রীরামচন্দ্র যখন নিজের একটা চোখ উৎপাটনের জন্য শর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন, ঠিক তখনই দেবী আর্বিভূতা হয়ে অভীষ্ট বর দিতে চাইলেন শ্রীরামচন্দ্রকে।

এর মধ্যে আবার সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে ইতরজনের ভাষা জ্ঞান করেছেন। তারা বলেন,

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়ং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"

অষ্টাদশ পুরাণ রামচরিত যারা মানব শ্রবণের যোগ্য করে ভাষায় প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ অনুবাদ করেছেন তাদের স্থান রৌরব নরকে। এখানে ভাষা বলতে তারা ওই ইতরজনের বা বাংলার নিম্ন শ্রেণির সাধারণ মানুষদের মাতৃভাষাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁরা আরো বলেছেন,

"কৃত্তিবেশে, কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে, এই তিন সর্বনেশে।"

কারণ এরা বাঙালির মাতৃভাষায় সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও আরো কিছু সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদ করেছেন। সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বা রাজভাষা। এ ভাষা শুধু উচ্চশ্রেণি এবং

সাহিত্যের জন্য। উচ্চ শ্রেণি ছাড়া অন্য কেউ এই ভাষার ধারে কাছে আসতে সাহস পায় না।

ফুলিয়া-নন্দন কৃত্তিবাস ওঝা ভারতীয় ঐতিহ্যের বাহক রামায়ণ মহাকাব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ছন্দে রসে সিক্ত করে সংস্কৃত ভাষার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে দিলেন। এই বন্ধন মুক্তির মাধ্যমে তিনি রামায়ণকে পৌঁছে দিলেন বাঙালির ঘরে ঘরে। দীর্ঘদিন বাংলার সাধারণ মানুষ রামায়ণের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল। সাহিত্যের ভগীরথ কৃত্তিবাসের সহযোগিতায় বিদগ্ধজনের ঘর ছেড়ে সংস্কৃত না-জানা বঙ্গবাসীরা অন্তরে রামায়ণ স্থানলাভ করল। বাংলায় রামায়ণ রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন কৃত্তিবাস। বাংলার কথা ভাবতে বসলেই বারবার তাঁর নাম চলে আসে সামনে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির জাতীয় কাব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সমগ্র জাতি এই কাব্যকে ঘরে এনে মাথায় তুলে রেখেছে। কোটিপতির প্রাসাদ থেকে দীনদরিদ্রের পর্ণকুটির এই কাব্যের জনপ্রিয়তা সমান। অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় এ কাব্য রচিত হলেও কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকিকে সরাসরি অনুসরন বা অনুকরণ করেননি। কৃত্তিবাস আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই কাব্যকে করে তুলেছেন বাঙালির রামায়ণ। পয়ার ছন্দে রচিত এই কাব্যটির নামকরণ তাই তিনি প্রথমে করেছিলেন "শ্রীরাম পাঁচালী"।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর বহন করছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষসদের রামভক্তি প্রদর্শন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক শক্তিপূজা করার অংশবিশেষের মধ্যে বাংলার বৈষ্ণব এবং শাক্ত প্রাধান্যের সাক্ষ্য বহন করছে। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এক রবিবারে ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের জন্ম। বারো বছর বয়সে তিনি গুরুগৃহে পড়তে যান। নানা দেশে নানা গুরুর কাছে অধ্যয়ন করেন। শেষে উওরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে পাঠ সাঙ্গ করে সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে ওঠেন।

ঘরে ফিরে তিনি গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে যান। গৌড়েশ্বর তখন বারবক শাহ।

রাজসভা সমাপনের অল্পক্ষণ পূর্বে তিনি সেখানে প্রবেশ করেন। দেখেন জগদানন্দ, সুনন্দ, কেদার খাঁ, কেদার রায়, নারায়ণ, তরণী, গন্ধর্ব রায়, সুন্দর শ্রীবৎস, প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত সভাসদেরা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। এছাড়াও আছেন বহু জ্ঞানী গুণী মানুষ। কোলাহল এবং নৃত্যগীতে ভরপুর রাজপ্রাসাদ।

কৃত্তিবাসকে রাজা সংকেতে আহ্বান করেন।

কৃত্তিবাস রাজার সামনে গিয়ে সাতটি শ্লোক উচ্চারণ করেন।

রাজা খুব খুশি হয়ে ওঁকে তাঁর ইচ্ছেমতো যে কোনো বস্তু দান করতে চাইলেন।

কৃত্তিবাস তা প্রত্যাখান করে বললেন, যে তিনি কারোর নিকট অর্থ চান না। গৌরব ভিন্ন তাঁর আর কিছু কাম্য নেই।

কৃত্তিবাস এরপর রাজপ্রাসাদের বাইরে এলে বিরাট জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে। সমবেত বিশাল জনতা কবিকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাতে থাকে।

রাজা বারবক শাহ তখন তাঁকে আবার বিপুল ভাবে সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়ে চলে। কৃত্তিবাস শুধু বাংলা

রামায়ণের রচয়িতাই নয়, শ্রেষ্ঠ রচনাকারও বটে। সাধারণত সাহিত্যের কোনো ধারাব প্রবর্তক ওই ধারার শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক হন না। কিন্তু কৃত্তিবাস তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

রামায়ণ কাহিনির অন্তরালে কবিবর সমাজবেত্তার ভূমিকার কথাকেই তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যের রাম-সীতাকে মনে হয় যেন বঙ্গভূমির কোনো গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রী। মনে হয় রামচন্দ্র কোনো আর্যপুত্র নন, তিনি একজন বাঙালি গৃহকর্তা। নেমে এসেছেন বাংলার উঠোনে। রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলো এবং তাঁদের জীবনযাত্রা অবিকল যেন বাঙালি চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাঁচে ঢালা। সমস্ত কাহিনি উত্তর ভাবতের ও দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এই কাব্য যেন কৃত্তিবাসের কলমে বঙ্গজীবনের কথকথাই হয়ে উঠেছে।

রামায়ণ পড়ি আর মনেপ্রাণে বলি আমার কাব্যও পৌঁছে যাক এই রকম বাংলার ঘরে ঘরে।

সুলতান বারবক শাহের সময়ে আর এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বৃহস্পতি মিশ্র। ইনি হলেন গীতগোবিন্দটিকা, কুমাসম্ভবটিকা, রঘুবংশটিকা, শিশুপালবধটিকা, অমরকোষটিকা, স্মৃতিরত্নহার প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর সব থেকে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অমরকোষটিকা 'পদচন্দ্রিকা'। বারবক শাহ তাঁকেও নানা উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। ছত্র ও অশ্বের সঙ্গে 'রায়মুকুট' উপাধি দান করেন। একথা বৃহস্পতি মিশ্র তাঁর 'পদচন্দ্রিকায়' নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন।

বারবক শাহ নিজে শুধু বড়ো পণ্ডিত ছিলেন না, বিদ্যা ও সাহিত্যের বড়ো গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই অনেক কবি ও পণ্ডিত তাঁর কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। বারবক শাহ সত্যিকারের সৌন্দর্যরসিক ছিলেন। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপিগুলো সুন্দর। তাঁর প্রাসাদের উদ্যানেও সেইমতো শান্ত ও আনন্দদায়ক পরিবেশ ছিল। প্রাসাদের নীচ দিয়ে বয়ে যেত একটি পরম রমণীয় জলধারা। প্রাসাদে 'মধ্য তোরণ' নামে একটা বিশেষ সুন্দর প্রবেশপথ ছিল। এছাড়া 'দাখিল দরওয়াজা' নামে একটি বিশেষ ধরনের সুন্দর তোরণ ছিল। যার ভগ্নাবশেষ এখনোও দেখা যায়।

বর্ধমানের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু (১৪৫৯-১৪৮০খ্রি) অনুবাদ করেন শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। জাতিতে তিনি কায়স্থ ছিলেন। ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা শুরু করেন। সূর্যোদয়ের আবির্ভাব পূর্বাকাশে যেমন আকাশ লালিমায় জানিয়ে দেয় দিবাকর আসছেন। তেমনি মালাধর বসু তার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই গ্রন্থ রচনা করে তিনি সুলতানের কাছ থেকে উপাধি লাভ করেছেন গুণরাজ খান। কাব্যের প্রথমেই তিনি ভণিতা করে লিখেছেন একথা। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর কাব্য আস্বাদন করে মুগ্ধ হয়েছেন। মহাভারত তখন সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুদিত হচ্ছে।

সাতে সমুদ্র

পিতার সঙ্গে সুলতান হোসেন ও তাঁর ভাই তুর্কিস্তানের তারমুজ শহর থেকে বাংলায় এসেছেন। তাঁরা প্রথমে রাঢ়ের চাঁদপুর মৌজায় বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানকার কাজিসাহেব তাঁদের দু-ভাইকে শিক্ষা দিতেন। পরে কাজি সাহেব হোসেনের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

বঙ্গদেশ তার সীমারেখা নিয়ে স্বাধীন রাজ্য। বঙ্গ-সংস্কৃতির সাথে বাংলা ভাষার চর্চা ক্রম-বর্ধমান। দোল পূর্ণিমার এক সন্ধ্যায় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করলেন। নবদ্বীপ তখন ভারতবর্ষের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। কাশীর পরই এর স্থান। ভারতবর্ষ তো বটেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসে। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বেই নবদ্বীপের নিকটবর্তী গ্রামের মুসলমান প্রজাদের আশংকা হয় যে গৌড়ে কোনও ব্রাহ্মণ সিংহাসনে বসবে। তাই তারা গৌড়েশ্বরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। একথা শুনে স্বাভাবিক ভাবেই গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হয়।

আসলে হিন্দু রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের ইতিহাস জলালুদ্দিন ফতেহ শাহ-কে অহরহ বিচলিত করত। ক্রমশ তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নবদ্বীপকে উচ্ছন্নে পাঠাবার নির্দেশ দেন তিনি। মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। নবদ্বীপের মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়। তুলসী গাছ উপড়িয়ে ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি লুঠ করে তাদের পইতে ছিঁড়ে দেওয়ায় চারদিকে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম সন্ত্রস্ত হয়ে সমগ্র পরিবার সহ ওড়িশায় চলে যান। পণ্ডিত গঙ্গাদাসও সপরিবারে গঙ্গা পার হয়ে পালিয়ে যান। তাছাড়া চৈতন্যদেবের জন্মের আগের বছর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। আবার চৈতন্যদেবের জন্মের পরে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই সব ঘটনা মানুষের মনে অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ বোধের জন্ম দেয়।

ভক্ত যবন হরিদাস শ্রীচৈতন্যের অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছেন। হরিদাস যবন হয়েও কৃষ্ণ নাম নিয়েছেন।

কাজি এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে 'মুলুক পতি' অর্থাৎ আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছে অভিযোগ করেন।

মুলুকপতি তাঁকে কৃষ্ণনাম ত্যাগ করে কলমা উচ্চারণ করার নির্দেশ দেন। তবু তিনি কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করতে ছাড়েন না। হোসেন তখন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছেন। রাজা হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই হোসেন রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কবতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর রাজত্বকালেই পোর্তুগিজরা বাংলার মাটিতে পদার্পণ করে।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্-কে আমার ভালো লাগে বেশ।

হোসেন শাহ্ অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন। অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে তাঁর রাজ্যের সীমানাও ছিল অনেক বড়ো। তাঁর সফল ঐতিহাসিক কীর্তির মধ্যে আছে "বাদশাহি সড়ক"। যা যোগাযোগের পথপ্রদর্শক স্মারক হিসাবে তাঁকে অমর করে রেখেছে। বাংলার অভ্যন্তরে সবচেয়ে সুপ্রাচীন সড়ক বলতে এই বাদশাহি সড়ককেই বোঝায়। বাদশাহ হোসেন শাহ নির্মিত এই বাদশাহি সড়ক উত্তরে গৌড় মালদহ থেকে বীরভুম, বর্ধমান, মুরশিদাবাদ এবং হুগলি জেলার মধ্য দিয়ে তার সীমানা বিস্তৃত করেছে দক্ষিণে মান্দারণ পর্যন্ত।

বাদশাহি সড়ক দুপাশে বিশালবৃক্ষচ্ছায়াপূর্ণ পথ, যে পথ ধরে বণিকেরা পণ্য নিয়ে যাতায়াত করে, যে পথে নবকুমার তার প্রিয়তমা কপালকুণ্ডলার সঙ্গে বহির্গমনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, যে পথে মারাঠা বর্গিরা এদেশে এসেছে সে পথের দুপাশে বৃহদাকার আমের বাগান। শাল, সেগুন, বটবৃক্ষ আর বাঁশঝাড়ের জঙ্গল।

সেই মাটির উপর গাছে গাছে পাখির ডাক শুনতে শুনতে তন্ময় হই।

হঠাৎ কোনো গ্রামবাসী হাত তুলে যেন বলে, ওই তো ওইখানে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের বাড়ি ছিল। কিছুদিন আগেও আমি দেখেছি সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

পথচারীদের সঙ্গে আমিও অবাক হই!

শঙ্খনগরের মাটিতে অনেক শঙ্খ পাওয়া যায়। এখানেও খুঁজলে মিলতে পারে আরো অনেক কিছু। কিন্তু কে খুঁজবে সেই ইতিহাস?

এই বাদশাহি সড়কের ওপর দিয়ে বৈষ্ণব সংকীর্তনের মহামিছিল একদিন বঙ্গের উত্তর থেকে দক্ষিণ পরিক্রমা করেছে। তাই এই সড়কের বিভিন্ন জনপদগুলিতে বৈষ্ণব, পির-ফকির-আউলিয়া, আউল-বাউলদের মাজার বা আখড়া দেখতে পাওয়া যায়।

ব্যারাকপুর বিস্তৃত জনপদ। বীজপুর, কাঞ্চনপল্লী, নৈহাটি, কুমারহট্ট, গরিফা, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মুলাজোড়, গারুলিয়া, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, দিগঙ্গ, চানক, বুড়নিয়া, খড়দহ, আগরপাড়া, সুখচর, কামারহাটি এবং আড়িয়াদহ সবই ব্যারাকপুর জনপদের অন্তর্গত। সব কাব্যেই এই জনপদগুলির উল্লেখ রয়েছে।

বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসা বিজয়' কাব্যে (১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ) চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রাপথের উল্লেখ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন চানক, বুড়নিয়া (বর্তমান টিটাগড়) ও শ্রীরামপুরের মাহেশ'র।

"চানক বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।"

তার নৌকা কুমারহট্ট (হালিশহর) গিয়ে হাজির হয়। ত্রিবেণিতে অবস্থানের পর চাঁদ সদাগর আবার সিংহল অভিমুখে রওনা দিয়েছেন।

'মনসাবিজয়' এর নবম পালার চতুর্থ পরিচ্ছেদে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিপ্রদাস লিখেছেন—

'চাপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর।
বাহ, বাহ বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর ॥
বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
চাপদানি বাহি রাজা প্রবেশে দিগন্তে ॥'

হুগলি জেলার মৌজা তালিকায় 'চাপদানি'-র নাম 'চাপাদানি' (ভদ্রেশ্বরের কাছে) হিসাবে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের আশেপাশে ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে আর কোনো 'চাপদানি' বা 'চাপাদানি' নামে কোনো জায়গা নেই। বিপ্রদাসের প্রথম 'চাপাদানি' এই 'চাপদানি-হবে। আবার বাকিবাজারে দক্ষিণেও কোনো 'চাপাদানি' নেই, অর্থাৎ দ্বিতীয় 'চাপাদানি-র কোনো সন্ধানই নেই। পাঁচশো বছরেরও বেশি আগে রচিত এই কাব্যগ্রন্থটির নকল হতে হতে এমন অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাংলা ভাষার বানান, উচ্চারণ বদলে তো গেছেই, সেই সঙ্গে বিপ্রদাস বর্ণিত ভৌগোলিক অঞ্চলের অবস্থান, নদীপথেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেকখানি।

বর্তমানে 'বাকিবাজার' বা বাঁকিবাজার বলে কোনো মৌজা বা গ্রাম ২৪ পরগনায় নেই।

বিপ্রদাস যেখানে 'দিগন্তের'-র স্থান নির্দেশ করেছেন তা ভাগীরথীর পশ্চিম পাশে শ্যাওড়াফুলি, বৈদ্যবাটির নিকটে কোনো স্থান। এখানে 'দীর্ঘাঙ্গ' বলে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। তিনি লিখেছেন—

'ফিরিঙ্গির দেশখানা বাহে কর্ণধারে।
বাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে ॥'

সুলতান হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন কবি আবদুল আলিম। দীর্ঘ একবছর সময় ধরে তিনি রচনা করেন প্রেম নির্ভর এক কাহিনি যার নাম 'মৃগাবতী' কাব্য। কবি লিখেছেন—

"বছর ধরিযা রচি মৃগাবতী
আলিমা শুনিতে মন
হিজরী সনেব ন শ কুড়ি হল
মৃগাবতী সমাপন।"

এই বর্ণনা থেকে জানা যায় সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালেব সময় ৯২০ হিজরি অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে মৃগাবতী কাব্যখানি রচিত হয়।

মৃগাবতীর কাহিনি এমনই জনপ্রিয় হয় যে অন্তত আরো আটজন কবি মৃগাবতী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়। বর্ধমানের আউশগ্রামের সুয়াতা গ্রামে কবির বাস ছিল। এ হচ্ছে সেই সুয়াতা গ্রাম যেখানে একদা করুণাময় বুদ্ধ এসে উপস্থিত হয়েছেন। কাব্যের ভণিতায় কবি আবদুল আলিম লিখেছেন—

"আবদুল আলিম গায় বসি গ্রাম সুয়াতায়
মৃগাবতী কন্যার আখ্যান
আলিমা শোনে এ কথা অপরূপ রূপকথা
স্মরিয়া রহিম রহমান।"

পংক্তিগুলির মধ্যে যে আলিমার উল্লেখ আছে তিনি কবির বোন। আর রহিম রহমান অর্থে করুণাময় ঈশ্বর।

সুয়াতা গ্রামে সুফি পির রহমান শহিদের মাজার আছে।

সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) পিরের এই দরগা পরিদর্শনে এসেছিলেন। তখনই আবদুল আলিম মৃগাবতীর কাহিনি তাঁকে শোনান। সুলতান সেই কাহিনি শুনে মুগ্ধ হয়।

মৃগাবতী কাহিনি কাব্যে রূপায়িত হলেও মূলত এটি হল-রূপকথা।

আবদুল আলিম তাঁর পিতামহীর কাছে গল্পটি শুনেছিলেন।

ইন্দ্রাণী নামে এক রাজ্য ছিল। রাজা রূপ সেখানে রাজ করতেন। তাঁর রানির নাম রূপা। দেবতার আশীর্বাদ ও পিরের দোয়ায় রাজা রানির কোল জুড়ে একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম হয়।

শৈশবে সেই কন্যা মৃগশিশু নিয়ে খেলা করে। রাজা-রানি তাই তার নাম রাখেন মৃগাবতী।

মৃগাবতী কাহিনির মধ্যে বেশ কিছু মূল্যবান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যে রাজ-বন্দনায় আবদুল হালিম হোসেন শাহের পিতার গৌড় আগমনের বর্ণনা দিয়েছেন।

হোসেন শাহেরই সেনাপতি ছিলেন পরাগল খান। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। পরাগল খানের আদেশেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। পরাগল খানের পুত্র নসরত খান। তাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। পরাগল খান ও তাঁর পুত্র নসরত খান মহাভারত পাঠ শুনতেন নিয়মিত।

গৌড়ের খুব কাছেই রামকেলি গ্রাম। গ্রামের সকলেই প্রায় বৈষ্ণব। অনেক ব্রাহ্মণেরও বাস এই গ্রামে। ত্রিপুরা অভিযানের সময় হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যরা এখানে পাথরের দেবী প্রতিমা পূজা করেছিল।

হোসেন শাহের রাজ দরবারে জ্ঞানী-গুণী কবি পণ্ডিতদের আনাগোনা। কবি যশরাজ খান, শেখ কুতবন, ইয়াজদান বখশ, কেশব মুকুন্দ, রামচন্দ্র খান, বিদ্যাপতি প্রমুখ সকলে এই সময়ের মানুষ।

এঁদের মধ্যে যশোরাজ খান বাংলা পদাবলির রচনা করেন। ইয়াজদান বখশ ছিলেন ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি বুখারি শরিফ হাদিস হোসেন শাহের রাজধানীতে বসে নকল করেছিলেন।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক এই সময়ে বর্ধমান এসেছেন। বর্ধমান শহরে গড়গড়াঘাটে তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস ও গুরুপদে ব্রতী হওয়ার গৌরব এই বর্ধমানের। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের নেতৃত্বে হিন্দু নবজাগরণ শুরু হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে গৌড় ব্রজভূমি কলিঙ্গ ক্রমশ উত্তাল হয়েছে। ঘরে ঘরে সন্ন্যাস নেবার উৎসাহ দেখা গিয়েছে। অনেক দিন আগে ঠিক এরকমই ঘটনা ঘটেছিল

বুদ্ধের সময়ে। তখন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে শ্রমণ ও ভিক্ষুণি হবার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। ফলে দেশের জনসংখ্যায় সমস্যা হয়েছিল। বলতে গেলে বর্ধমান সুবর্ণযুগে উপনীত হল। এই সময় সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) সপ্তগ্রামের উন্নতির জন্য মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। দেশজ সংস্কৃতিতে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনেক উন্নতি হল।

উন্নত ধরনের বস্ত্র তৈরি হচ্ছে। বহু মানুষ এই জীবিকার উপর নির্ভরশীল। ইরাক, আরব, ব্রহ্মদেশ, মলাক্কা ও সুমাত্রায় ঢাকার মসলিনের খুব চাহিদা। সূক্ষ্ম এই বস্ত্র নস্যির ডিবায় ২০ গজ ভরে দেওয়া যায়। সূক্ষ্ম মসলিন বাঁশের চোঙায় ভরে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। ইউরোপের মানুষের কাছে এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তারা অবাক হয়ে ভাবে, হাতে কি করে এই কাপড় বোনে বাংলার তাঁতিরা! মসলিন ছাড়া আরও কত রকমের কাপড় তৈরি হয় বাংলায়। যেমন সরবতী, মলমল, আলাবাল, তজীব, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি), ডুরিয়া, জামদানি। ঢাকা ছাড়াও নদিয়ার শান্তিপুর, ধনেখালি, ফুলিয়া, নবদ্বীপ কাপড় বয়নের প্রধান কেন্দ্র। এছাড়া হুগলির বেগমপুরেও কাপড় তৈরি শুরু হয়েছে। এখানকার সুতো ও রেশম বস্ত্র চিন, ম্যানিলা, জাপান প্রভৃতি দেশগুলোতেও চালান যায়।

নৌকায় নদীর বুকে আপন মনে বসে থাকি। গঙ্গা দেখিনি কোনোদিন। হয়তো আর দেখা হবে না। নৌকা ভাসিয়ে মাসের পর মাস নদী বা সমুদ্রের জলে বাস করার যে জীবন, এই জীবন আমাকে টানে খুব বেশি করে। বর্ষাকাল। জ্যোৎস্না রাত্রি। উজ্জ্বল নয়, জ্যোৎস্না বড়ো মধুর। একটু অন্ধকারমাখা একটা স্বপ্নময় আবরণের মতো। বর্ষার জলপ্লাবনে দুকূল পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীর স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ হয়ে জ্বলতে থাকে। আঁধারে আঁধারে সে বিশাল জলধারা পাখির বেগে ছুটতে থাকে। কূলে কূলে শব্দ ওঠে কলকল, মধ্যে মধ্যে ওঠে গর্জন, সব মিলিয়ে একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠতে থাকে। নানাবর্ণে চিত্রিত নৌকা ঘুরে বেড়ায় নদীতে। তাতে কত রকমের মূর্তি আঁকা। পিতলের হাতল ডাণ্ডা তাতে আবার রুপোর গিলটি করা। পাটাতনের ওপর মাঝিমাল্লারা পাল ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকে। এভাবেই তারা চলে যায় বন্দর থেকে আর এক বন্দরে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে, নদী থেকে সাগরে তারপর অন্য কোনো দেশে পাড়ি। নতুন মানুষ নতুন জীবনের গল্প। খোলাছাত কামরা-ওয়ালা বড়ো নৌকা এগুলোকে বজরা বলে। চলে দাঁড় বেয়ে, আবার পাল খাটানোরও বন্দোবস্ত আছে। এই বজরায় চেপে নদী উজিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে দূর দেশগামী বড়ো জাহাজে চাপে কেউ কেউ। এই বজরার মতো জলযান পৃথিবীর নানা দেশে দেখতে পাওয়া যায়।

এ দেশ থেকে সমুদ্রগামী বাণিজ্যের রমরমা। অন্তর্দেশীয় নৌ-বাণিজ্য ভীষণ গুরুত্ব পেয়েছে, কেবল গঙ্গার উজান বেয়ে সেই বাণিজ্য নির্ভরশীল থাকে না। সব নদীতেই বর্ষাকালে বড়ো বড়ো নৌকা চলাফেরা করে। এতে কোনো অসুবিধা হয় না। বজরার আকর্ষণ ছিল অন্য। ধনী এবং জমিদারদের বজরা রাখবার একটা রেওয়াজ ছিল। নদীর বুকে ফূর্তির আসর জমাতে বজরার জুড়ি ছিল না। অল্প জলে চলতে পারে বজরা। সাধারণ নৌকার নীচটা ছুঁচোলো, শঙ্কু আকৃতির। তাই জল অগভীর হলে আটকে যায়। বজরার

আকার চওড়া, তলদেশ চ্যাপটা। তার ফলে অল্প জলেও দিব্যি ভেসে যায়। চড়ায় আটকে গেলেও ঠেলে জলে ভাসাতে সমস্যা হয় না।

নৌকার অনেকটা বেশি অংশ জলের নীচে থাকে। জলে নৌকার ভারসাম্য নিশ্চিত হয় অনেকটা অংশ জলের নীচে থাকবার জন্য। বজরার তুলনায় নৌকা আকারে তাই ছিপছিপে। বজরার অল্প অংশ জলের নীচে থাকলেও তার চেহারা চওড়া বলে সহজে কাত হয় না। এটাই তার ভারসাম্যের রহস্য। নৌকা নির্মাণ একটি বড়ো শিল্প। নদীর ধার বরাবর নৌকা নির্মাণকারী সূত্রধরেরা বাস করে। দিন-রাত চলে ঠোকাঠুকি। নৌকা তৈরি হয়. আর জলে ভাসে। ভেসে যায় এদেশের পণ্য বোঝাই হয়ে দূর দেশের উদ্দেশে। সেই সঙ্গে ভেসে যায় এদেশের মাঝি মাল্লারা। তারা গান বাঁধে—

ও আমার গহিন জলের নদী
তোমার বুকে নাও ভাসাই
কেবল একটি আশায়
সুখের ঘর পাই যদি।

শঙ্খশিল্প-ও বাংলার একটা বিখ্যাত শিল্প। সোনা-রূপাই শুধু নয়, দামি পাথরের অলংকারও এখানকার ধনী মানুষেরা ব্যবহার করে। তাও বিদেশে রপ্তানি হয়। বীরভূমে লোহার খনি হয়েছে। মুল্লারপুর পরগনায় এবং কৃষ্ণনগরেও লোহার আকরিক পাওয়া যায়। সেখানেও খনি আছে। দেওচা এবং মুহম্মদবাজারে লোহা তৈরির কারখানা হয়েছে। কাঞ্চননগরে ছুরি-কাঁচি শুধু নয়, ঢাল-তরোয়াল-সহ যুদ্ধের উপকরণ তৈরি হচ্ছে। বাংলায় রীতিমতো লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছে।

গাছের বাকল থেকে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। এর রং সাদা এবং মৃগ চর্মের মতো মসৃণ। লাক্ষার চাষ শিল্প হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার চিনি রপ্তানি হয় দক্ষিণ ভাবতের গোলকুণ্ডা, কর্ণাটক রাজ্য পার হয়ে আরব, পারস্য সাগর হয়ে মেসোপটেমিয়া, খোরাসান, তুরস্ক ও আফ্রিকার উপকূলের দেশগুলোতে। প্রতি বছর ৫০,০০০ মন চিনি রপ্তানি হয়। জল ও স্থলপথে এগুলি চলে যায় বিভিন্ন দেশে। বিদেশের মানুষের কাছে এদেশের আফিম, মৃগনাভি, লংকা, ঘি, মাখন এবং লবণের চাহিদা খুব।

আবার বাণিজ্যের মাধ্যমে এখানে অনেক পণ্য আসছে।

—উৎকৃষ্ট তামাক, আলু, পাট, চা এভাবেই এসেছে আমেরিকা থেকে ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে। এগুলি এখানে উৎপন্ন হয়ে আবার উৎপাদিত পণ্য হিসাবে বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এদেশে চাষ হয়েছে আবার তা বিদেশে ব্যবহারের জন্যই রপ্তানি হয়েছে। এছাড়া গুড়, সুপারী, তেল, আদা, ফল, তাড়ি এগুলি এখান থেকে রপ্তানি হয়েছে। নানা প্রকারের মশলা, ওষুধের সঙ্গে খোজা প্রহরী ও ক্রীতদাস এখান থেকে জল ও স্থলপথে বিদেশে যায়। বঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারাবহিক উত্থান-পতনের সঙ্গে ভাগীরথীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভাগীরথীর শাখা নদ-নদী অজয়-কুনুর-এর জলপথ দিয়ে ভাগীরথীর মধ্য দিয়ে বিহার ও উত্তর-ভারতের সঙ্গে মঙ্গলকোটের বণিজ্যিক-সংস্কৃতির যোগ। বীরভূমের মধ্যে দিয়েও স্থলপথে বিহারের সঙ্গে যুক্ত বঙ্গদেশ।

—শ্রীজীব, মুরারি, দামোদর কবি জয়দেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব গ্রন্থকর্তা বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান দুই স্তম্ভ রূপ এবং সনাতন, এঁদের নিবাসও বর্ধমান। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রামের অধিবাসী লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। প্রথম বৈষ্ণব গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত। রচনাকার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর। দ্বিতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল হল কতকগুলি সুরচিত গীতির সমষ্টি। লোচনদাসের জন্ম বৈদ্যবংশে ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী। প্রথম জীবনে তিনি মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত'র কাছে পড়াশুনা করেছিলেন। শ্রীখণ্ডে তিনি নরহরি ঠাকুরের কৃপালাভ করেন। বাংলা ভাষায় গৌরাঙ্গলীলা মাধুর্য বর্ণনায় প্রথম উদ্যোগী পুরুষ লোচনদাস। চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, রূপলহরী, রাম পঞ্চোধ্যায় এবং পদ্যানুবাদ প্রভৃতি কাব্য তিনি রচনা করেছেন। বর্ধমানেরই গঙ্গাটিকুবি গ্রামের সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সর্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। চৈতন্য চরিতামৃতকে তৃতীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ বলা হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন নিবাসী হয়ে বৃদ্ধাবস্থায় এই বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের অরণ্যে রাজা হাম্বির কর্তৃক বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর গ্রন্থখানি লুণ্ঠিত হলে শোকে কৃষ্ণদাস দেহরক্ষা করেন।

নীলাচলে যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্যদেব তন্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্যে মানকর আসেন।

তাঁর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সঙ্গী কড়চা কবি গোবিন্দ দাসের বাস বর্ধমান শহর সংলগ্ন কাঞ্চননগর এলাকায়। তাঁর ভিটেতেও চৈতন্যদেব এলেন। এখানেই রূপ ও সনাতন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। হোসেন শাহের মন্ত্রী ও সভাসদদের মধ্যে 'দবীর খাস' ছিলেন সনাতন। হোসেন শাহ তাঁর উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করতেন। সনাতন ক্রমশ চৈতন্যদেবের অনুরক্ত হয়ে পড়েন দেখে বিরক্ত হয়ে সুলতান তাঁকে বন্দি করেন। সনাতন কারারক্ষীদের উৎকোচ দিয়ে মুক্ত হয়ে যান। কেউ কিছু বোঝবার আগেই তিনি বৃন্দাবন রওনা হয়ে যান।

এরকম রূপ-ও সুলতান হোসেন শাহের আর এক 'দবীর খাস' ছিলেন। সুলতানের খাস শাগরেদ। সংসাব ধর্মে বিরাগ জন্মানোয় তিনিও চৈতন্যের উপদেশে ব্রজবাসী হন।

তারপর একদিন চৈতন্যদেব বর্ধমানের ওপর দিয়ে নীলাচলে প্রস্থান করলেন।

বর্ধমানের শ্রীখণ্ড তখন এক তীর্থক্ষেত্র। কি ধর্মালোচনা, কি সাহিত্য সৃষ্টি উভয়দিকেই শ্রীখণ্ডের স্থান তুঙ্গে। চৈতন্যদেবের প্রধান ভক্ত উত্তর রাঢ়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক নরহবি দাস সরকাবের জন্মভূমি এই শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ডকে ঘিরে বৈষ্ণবধর্ম আবর্তিত হয় গোটা ভারত ভূখণ্ড। রামগোপাল দাস এই শ্রীখণ্ডেরই আর এক জন সুসন্তান। তাঁর রচিত 'রসকল্পবল্লী' বৈষ্ণব সীহিত্যের একটি চিরন্তন গ্রন্থ। ইনি আরো অনেক বৈষ্ণবকাব্য রচনা করেছেন। জগদানন্দ নামে এক বিখ্যাত কবি সংস্কৃত পদ রচনা করে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর বাসও ছিল শ্রীখণ্ডে। তিনি 'ভাষা শব্দার্ণব' নামে একখানি শব্দকোষ রচনাতে হাত দিয়েছিলেন।

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তার মধ্যে একজন হলেন বলরাম দাস। রসমধুর পদ রচনা করে ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। এঁর বাড়ি দোগাছি। চৈতন্যদেবেরে অনুচর নিত্যানন্দের বাড়ি বীরভূম এবং অদ্বৈতপ্রভু হলেন নদিয়া শান্তিপুরের অধিবাসী। তাছাড়া অন্যান্য ছোটো বড়ো সব পদকর্তাই বর্ধমান জেলার মানুষ।

কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জ্ঞানদাস সকলেই বর্ধমানের মানুষ। যে সব পদকর্তার অমৃত পদাবলি বাংলার মানুষকে যুগ যুগ ধরে তৃপ্তিদান করেছে, জ্ঞানদাস তাঁদের অন্যতম। তিনিও কাঁদরার অধিবাসী। 'প্রেমবিলাস' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, কালনা, দেনুর, ঝামটপুর, বাগনাপাড়া সবই বর্ধমান জেলার মধ্যে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্ধমান জেলায়, ভারতচন্দ্র ভুরশুটে। মাধব আচার্য সপ্তগ্রাম, বিপ্রদাস পিপিলাই কেবল চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত নাদুড়্যা বটগ্রামের মানুষ।

তেমনি মনসামঙ্গলের প্রধান কবিরা প্রধানত পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হলেও পদ্মপুরাণের অন্যতম প্রাচীন কবি নারায়নদেব ব্রহ্মপুত্র তীরে বোরগাঁও-এর অধিবাসী হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ একদা রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি নিজেই লিখেছেন—

'বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ।
রাঢ়দেশ ছাড়িয়া সে আসিলা আপন।'

মনসামঙ্গলের আর একজন কবি বিষ্ণু পাল রানিগঞ্জের নিকটবর্তী কোনো গ্রামে বাস করতেন। তাঁর কাব্য বর্ধমান বীরভূমে সুপ্রচলিত ছিল দীর্ঘকাল। মনসামঙ্গলের আর এক কবি বাণেশ্বর রায় রাইপুরে জন্মালেও বসবাস করেছেন চম্পক নগরে। সেদিনের চম্পকনগর আজকের চাঁপাই।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসের বেশির ভাগ কবিই রাঢ়দেশে আবির্ভূত হয়েছেন।

রত্নগর্ভা দক্ষিণ রাঢ়ের মাটি জন্ম দিয়েছে অনেক মঙ্গলকবির।

এখানে ধর্মঠাকুর পূজিত দেবতা। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে বলা হয় রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য। ধর্মপূজার বিধি ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে শুধু বাংলা নয়, ওড়িশার সীমান্তের অধিবাসীদের ধর্ম আচরণের সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা ধর্মপূজা করেন তাঁরা পৈপ্পলাদ শাখার অথবা কোনো পঞ্চম বেদের শাখার পুরোহিত।

পাঠানযুগে গৌড়বঙ্গ বলতে গেলে নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করে নেবার কিছুকাল পরে নীলাচলে চৈতন্যদেব দেহ রাখলেন।

সুতপ্ত কাঞ্চন গৌব ভুবন লোচন চৌর
করঙ্গ কৌপীন দণ্ডধারী।
নয়নে গলয়ে লোর গলে দোলে নামডোর
সতত বোলেন হরি হরি ৷৷

চৈতন্য মহাপ্রভু না থাকায় দেশে আবার অরাজকতা নেমে এল। মোগল এবং পাঠানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল।

মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকা ও উত্তর ভারত থেকে অসংখ্য মুসলমান ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বাংলাদেশে এসেছেন। এরা কেউ এসেছেন ভাগ্যান্বেষণ করতে, কেউ বা এসেছেন ধর্মপ্রচার করতে, কেউ বা বাণিজ্য করার জন্য। ধানকাটা সারা হলে শীতকাল

জুড়ে এখানে-সেখানে নানা মেলা বসে। অন্ত্যজ হিন্দু-বাগদি, মুচি, ডোম, হাড়ি, দুলে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ কোনো না কোনো পার্বণ উপলক্ষ্যে কোনো প্রান্তর বা নদীর ঘাটে অথবা নদীর চরে মিলিত হয়। সমাজের নিম্ন শ্রেণির এই সাধারণ মানুষগুলো এই মেলার মাধ্যমে সম্প্রীতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মেলায় আলকাপ, লেটোর আসর বসে। আসর বসে কবিগান, কৃষ্ণযাত্রার। কৃষ্ণকে নিয়ে গ্রাম্যজীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার কুরুচিপূর্ণ কাহিনি শ্লেষের সঙ্গে কিছু বাঁধা গানের মধ্যে গীত হয় আলকাপ ও লেটো গানে। আলকাপ এবং লেটো দুটোই অলিখিত অথচ মানুষের হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা লোক-সংস্কৃতি। 'আল' শব্দটি শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত। পরিচালককে বলা হয় 'কোপ্যা'। এক কথা সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে নাট্যলক্ষণযুক্ত ভালো অভিনয় অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অভিনয়। কিছু বাঁধা গান, যা অশ্লীলতায় আকীর্ণ গীত হবার সময় উপস্থিত বুদ্ধিতে তা প্রাত্যহিক ঘটনায় মুড়ে পরিবেশিত হয়। নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষেরা দিনের শেষে কাজের শেষে তা শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে উপভোগ করে।

মুসলমান শাসনের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্থানীয় মানুষদের যখন ফারসি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু হয়। এক শ্রেণির মুসলমানেরা সেটা অতি উৎসাহের সঙ্গে শিখতে শুরু করে হিন্দু উচ্চ শ্রেণির বর্ণাশ্রম ধর্মের ছুঁৎমার্গের বিপরীতপন্থী হয়ে। এই কাজ মুসলমান শাসক শ্রেণি খুব বেশি পরিমাণে না করলেও তা করছিলেন তাঁদের ধর্ম প্রচারক সুফি শ্রেণির মানুষেরা। ছোঁওয়াছুঁয়ির কোনো তোয়াক্কা তাঁরা না করে, মানুষের মধ্যে বর্ণ, জাত এসব বিবেচনা না করে তাঁরা ধর্মপ্রচারের জন্য ডেরা বাঁধতেন প্রতিটি বড়ো গ্রামের গরিব ও নিম্ন শ্রেণির মানুষদের পাড়াতে গিয়ে। তাঁদের নিজ বাসভূমি ছিল পারস্য, মধ্য এশিয়া, আরব ও আফগানিস্তান। তাঁরা দেখতে ছিলেন এদেশের মানুষদের তুলনায় অতি সুন্দর, গৌরবর্ণের এবং স্বাস্থ্যবান। এঁদের অনেকেই বিবাহ করেন স্থানীয় নারীদের, যেহেতু তাঁদের কেউই প্রায় নিজ দেশের নারীদের সঙ্গে করে এদেশে নিয়ে আসেন নি।

স্থানীয় নিম্ন-শ্রেণির উপেক্ষিত মানুষরা এই সুফি মানুষদের পছন্দ করতেন খুব বেশি করে। এদের উদারতা, স্থানীয় নারীদের সঙ্গে এদের বিবাহ এবং দীক্ষিত মানুষদেব মর্যাদা দান সমাজে খুবই কার্যকর প্রভাব ফেলেছিল। নব দীক্ষিতরা অন্ত্যজ মানুষ হলেও সুফিরা তাদের সঙ্গে খেতেন, নামাজ পড়তেন, মেলামেশা করতেন আর সময়ে অসময়ে ছোটোখাটো উপকার করার জন্য পাশে থাকতেন সব সময়। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশা ছিল অবাধ। যেমনটি দেখা যায়নি উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের মধ্যে।

সুফি ভাষা আদতে ফারসি। তাতে আছে বহু আরবি শব্দও।

সুফি মানুষ গাইছেন—

'তুমি এমন চিন্তা কর
যেন চিন্তার আসনে বসতে পার।'

[হাফিজ আলি শাহ (জামার, বর্ধমান)। মূল বাড়ি কুলচৌর, খণ্ডঘোষ। নজীর হোসেন উদগড়া, বর্ধমান মহাশয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি—লেখক।]

মানুষ শুনে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে পড়ছে। গায়কের চোখে যেমন জলধারা নেমে

আসে। তেমনি চোখ ভিজে যায় শ্রোতাদের। এই সব মরমিয়া ধর্মমতের সমর্থক ও অনুগতরা ছিল বিভিন্ন নিম্নজাতিভুক্ত কারিগর, খুদে ব্যবসাদার ও কৃষক: ধর্মের বাহ্যিক আচার এবং সামাজিক বহু রীতিনীতির বিরুদ্ধে এইসব ধর্মগুলির প্রতিবাদ ছিল। তবে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে এইসব প্রচারকেরা সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।

ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতান সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ অনেক সুন্দর সুন্দর গজল রচনা করেছেন। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করান নবাব সিকন্দর শাহ। স্থাপত্য-কৌশলের দিক দিয়ে অতুলনীয় এই মসজিদটি ভারতে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে আয়তনে দ্বিতীয়। পরবর্তী নবাব মুজাফফর শামস বলখির উপদেশ অনুসাবে শেষ জীবনে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ থেকে বিধর্মী হিন্দুদের অপসারিত করতে শুরু করায় রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। এই সময় উত্থান হয় রাজা গণেশের, যার কথা আগে বলেছি।

রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে দু-দফায় রাজত্ব করেন।

পাণ্ডুয়ার একলাখি প্রাসাদে তাঁর সমাধি আছে। সুশাসক ও ন্যায় বিচারক হিসাবে ইতিহাসে তাঁর নাম আছে। জনাকীর্ণ পাণ্ডুয়া নগরীর পরিবর্তে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করার পরিকল্পনা তাঁরই। পাণ্ডুয়া এবং এদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ আদিনার অসংখ্য অলংকৃত বৈভব দেখলে বুঝতে পারা যায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল। টেরাকোটা আব পাথরের বুকে খোদাই করা নকশার সমারোহ সকলের দুচোখে শিল্পসুষমার আবেশ ছড়ায়। আদিনা মসজিদের উলটোদিকে সামান্য দূরত্বে সুলতানের প্রাসাদ।

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ গৌড়ে তৈরি করিয়েছেন ফিরোজ মিনার, মসজিদ ও একটি বিশাল জলাশয়। দাঁড়িয়ে আছে এখনও নিঃসঙ্গ সেই মিনার আর আছে অভাবিত আকৃতির সেই স্নানাগার, যার তুল্য স্থাপত্য নির্দশন সারা বঙ্গদেশের আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুলতান এই স্নানাগার তৈরি করিয়েছিলেন দিল্লির হাউজ-ই-শামসির অনুকরণে। যা ছিল একদা দিল্লির হারেমের গৌরব। কিন্তু স্নানাগার নয়, সাতাশঘরা দিঘি এই নামেই সকলে এই স্নানাগার প্রাসাদকে চেনে। অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাণ্ডবেরা নাকি কিছুদিন এখানে ছিলেন। কেউ কেউ এই প্রাসাদকে তাই পাণ্ডবরাজার দালানও বলে, আর সাতাশঘরা দিঘিকে বলে অর্জুন দিঘি। দিঘি কিন্তু সাতাশঘরা কেন?

দিঘির পাড়ে স্নানাগারটিতে সাতাশটি প্রকোষ্ঠ আছে। বিরাট দিঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে ছোট্ট একটি অট্টালিকাব মধ্যে এই স্নানাগার। দেয়ালে আছে পোড়া মাটির নলের সাহায্যে জল চলাচলের ব্যবস্থা। রাজপ্রাসাদের গোসলখানা, যাকে বলে টার্কিশবাথ। আটকোনা এই দালান। অনেকগুলি ঘর। বাংলার এই বৈভবকে দিল্লির শাসকরা কোনোদিনই ভালো চোখে দেখতে পারেনি। তাঁরা একে স্পর্ধার ঔদ্ধত্য বলেই গণ্য করেছেন। এই তুচ্ছ কারণেই বাংলাকে পর্যুদস্ত করার বাসনা জেগেছে দিল্লির সম্রাটদের মনে বারবার। যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বারবার বেজে উঠেছে রণডঙ্কা। যুদ্ধের দামামায় সচকিত হয়ে উঠেছে বাংলা।

যেমনটা ঘটেছিল শাহি সুলতানের সময়ে।

দিল্লীশ্বর বাবরের তখন দেশ জয়ের নেশা। তিনি প্রচার করে দিলেন বাংলার সুলতান

অতীব অত্যাচারী। প্রজারা দুর্দশাগ্রস্ত। অতএব প্রজা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি গৌড় অভিযান করতে চান।

বাংলার সুলতান ভাঙের নেশায় কুখ্যাত হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। অন্তত প্রজাপীড়ক ছিলেন না। আশ্রয় নিলেন একডালা দুর্গে। বর্ষাকালে গৌড়দেশে পশ্চিমের মানুষদের পক্ষে অবস্থান করা খুবই কঠিন। জলজঙ্গলে ঘেরা কাদামাটির দুর্গ, তবু এই দুর্গই দুর্ভেদ্য ঠেকল বাবরের কাছে। কিন্তু তিনি তখন মরিয়া। সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঘিরে ফেলেছেন দুর্গ।

হঠাৎ-ই একডালা দুর্গের মহিলারা মাথার কাপড় খুলে শোক প্রকাশ করতে থাকলে বাবর ঘাবড়ে গিয়ে বেদনাহত হয়ে সৈন্যদের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। আর সেই সময় ইলিয়াসের সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাদশাহ বাবরের সৈন্যদের উপর। ইলিয়াস দশ হাজার অশ্বারোহী, পঞ্চাশটি হাতি এবং দু লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করল বাবরকে। চূড়ান্ত লড়াই চলল।

যুদ্ধে বাবর হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সুলতানের! ভুল সংবাদের শিকার হয়ে শাহি সৈন্যেরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। আর তখনই শুরু হয়ে গেল সামনাসামনি যুদ্ধ। হাতাহাতি বললেই চলে। ইলিয়াসের রাজদণ্ড, তূর্য, পতাকা আর রণহস্তী দখল করে নিয়ে গেলেন বাবর।

ইতিহাসের এই সব ঘটনা আমাকে অনেক কিছু শেখায়।

আসলে ঠিক কি হয়েছিল?

ভাবতে বসি আমি।

সিংহাসনে বসবার জন্য একের পর এক হত্যা বাংলার মসনদ ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে বারবার। হত্যার দ্বারা বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে হত্যাকারীকে দুর্বল প্রজারা সুলতান বলে স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলার ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য অধ্যায় যা আমাকে ভীষণ-ভাবে আকর্ষণ করে।

আফগান নায়করা বাবরের হাতে মার খেয়ে পূর্ব-ভারতের দিকে পালিয়ে আসতে থাকে। তারা আশ্রয় প্রার্থনা করে নসবত শাহ-এর কাছে। নসরত শাহ বাবরের সঙ্গে প্রথমে যুদ্ধ করলেও পরে সন্ধি করে নিলেন। নসরত শাহ গৌড়ে অনেকগুলো মসজিদ তৈরি করেন। এদের মধ্যে 'বারদুয়ারি' বা সোনা মসজিদ অন্যতম। গৌড়ের বিখ্যাত কদম রসুল ভবনের একটি প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করে তার উপরে হজরত মুহম্মদের পবিত্র পদচিহ্ন সম্বলিত একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মরবেদি স্থাপন করিয়ে দেন।

নাসিরুদ্দীন নসরত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসলেন।

তাঁর আদেশে কবি শ্রীধর কবিরাজ 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করলেন। প্রথম বাংলা কাব্য বলতে গেলে এই 'বিদ্যাসুন্দর'।

ততদিনে দিল্লিতে হুমায়ুনের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন শেরশাহ। বাংলার

সুলতান মাহমুদ শাহ প্রথম পর্যায়ে ১৩ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে শেরশাহের সাথে সন্ধি করে নিয়ে স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল শেরখানের পুত্র জলাল খান ও সেনাপতি খাওযাস খানেব নেতৃত্বে আসা এক বিশাল সৈন্য বাহিনীর কাছে তিনি পরাজিত হলেন। গৌড় নগরী লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করে জলাল খান ষাট মন সোনা হস্তগত করে দিল্লি নিয়ে গেলেন।

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসেই হুমায়ুন আবার পরিত্যক্ত মৃত গৌড় নগরী পুনরুদ্ধার করলেন।

জাহাঙ্গির দিল্লি থেকে কুলি বেগ-কে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত কবে পাঠালে তবেই হুমায়ুন গৌড় ত্যাগ করেন। চৌসায় হুমায়ুনের সঙ্গে শেরখানের যুদ্ধ হল (১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হলেন এবং কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেলেন। হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে যাওয়ায় শের খান সূর বাংলার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেন। এখানে এসে তিনি আবার গৌড় দখল কবে নিলেন।

বিহার ও বাংলা অধিকার করবার পরে শের খান ফরিদুদ্দিন আবুল মুজাফফর শেবশাহ নাম নিয়ে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। গৌড়ের শাসনকর্তা হিসাবে কিছুদিন বাস করার পর তিনি কনৌজেব যুদ্ধে হুমায়ুনকে আবাব পবাজিত করে হলেন দিল্লির সম্রাট। দিল্লিতেই রাজধানী স্থাপন করলেন।

শেরশাহ বাংলাদেশকে অনেকগুলি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে, প্রতিখণ্ডে একজন করে আমির অর্থাৎ শাসকর্তা রাখলেন। দেশের শাসন পদ্ধতিরও তিনি অনেকগুলি সংস্কার করলেন। গোটা রাজ্যটাকে ১১৬০০ পরগনায বিভক্ত করে, প্রতিটি পরগনায় পাঁচজন কবে কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। পশ্চিমে সেই সিন্ধু নদের তীর হতে পুবের সোনারগাঁও পর্যন্ত তিনি একটি রাস্তা তৈরি করার উদ্যোগ নিলেন। অবশ্য এই রাজপথের মধ্য অংশ অনেক দিন ধবেই বর্তমান ছিল। শেরশাহ এই রাস্তাব মধ্যে মধ্যে চটি, আস্তাবল ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করলেন।

শেবশাহের মৃত্যুব পব তাঁর পুত্র জলাল খান সূর ইসলাম শাহ নাম নিয়ে সুলতান হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁব দ্বাদশ বর্ষীয পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু কিছুদিন পবই শেরশাহেব ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ খানেব দ্বারা তিনি নিহত হন। মুবারিজ খান মুহম্মদ শাহ আদিল নাম নিয়ে দিল্লির সিংহাসনে বসলেন।

তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের জন্য এখানকার আফগান নায়করা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আফগানদের মধ্যে আত্মকলহও বেড়ে গেল। তারা প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হল। অনেক প্রাদেশিক শাসন কর্তাই নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করে দিলেন। দুর্বল মুহম্মদ শাহ আদিল তা কোনো মতেই দমন করতে পারলেন না। বাংলার শাসনকর্তা হলেন আফগান মুহম্মদ খান। নিজেকে তিনি স্বাধীন বলে ঘোষণা করে দিলেন। তারপর সুলেমন কররানীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বায়াজিদ সিংহাসনে বসলেন। বায়াজিদ নিহত হলে সুলেমনের দ্বিতীয় পুত্র দাউদ সিংহাসনে বসলেন।

দিল্লিতে তখন সম্রাট হয়েছেন আকবর। আকবরের নির্দেশে রাজা তোডরমল দাউদকে জব্দ করতে বাংলায় এলেন। দাউদ পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। রাজা তোডারমল বর্ধমানে এসে শুনলেন দাউদ মান্দারনে। সেখানে গিয়ে শুনলেন মান্দারনের ২০ মাইল দূরে দেবরাকসারী গ্রামে দাউদ শিবির করে আছেন। তোডারমল আরও অনেক সৈন্য নিয়ে কাছাকাছি কোলিয়া গ্রামে গেলেন। দাউদ তখন হরিপুরে (দাঁতনের ১১মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোনে অবস্থিত) পালিয়ে গেলেন। তোডবমল আবার মেদিনীপুর গেলেন। কিন্তু মোগল সেনাপতি কুলী খান বরলাস পবলোকগমন করায় মোগল সৈন্যরা খুবই হতাশ ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। একরকম বাধ্য হয়েই বিফল মনোরথে তোডারমলকে মান্দারনে ফিরতে হল।

অন্য আর এক মোগল সেনাপতি মুনিম খান নতুন একদল সৈন্য নিয়ে বর্ধমান থেকে এসে মিলিত হলেন। তোডারমলও সসৈন্য রওনা হলেন আবার। চেতো-তে এলে দেখা হল দুজনের। তাঁদের কাছে খবর এল যে দাউদ হরিপুরে লুকিয়ে আছেন। সেখানে পরিখা খনন করে প্রতিরোধ প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং বনময় পথের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে দাউদ এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

কিন্তু মোগল সৈন্যরা এইসব সংবাদে এত ভয় পেয়ে গেল যে তারা আর যুদ্ধ করতে চাইল না। মুনিম খান ও বাজা তোডাবমল অনেক চেষ্টা করে তাদের রাজি করালেন। স্থানীয় মানুষের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘুরপথ আবিষ্কার কবা হল। সেই পথে মোগল বাহিনী চেতো-র দক্ষিণ পূর্বে দাঁতনেব ১১মাইল পূর্বে অবস্থিত নানজু গ্রামে পৌঁছোল। দাউদকে পিছন থেকে আক্রমণ কবার পরিকল্পনা নেওয়া হল।

এদিকে দাউদ কামান সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নদীর পাড়ে। কার সাধ্য নদী পার হয়? হেঁটে এ নদী পার হবার নয়।

গুপ্তচররা সংবাদ বাখে মোগল সৈন্য কবে কোথায় কীভাবে নদী পার হবে। ঝাঁপিয়ে পরবে দাউদের বাহিনী। সবাই প্রস্তুত। বয়স্ক সব পুরুষদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া চলছে। আশে-পাশের অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। দাউদ এবার ভাবলেন মোগলদের সঙ্গে এবার একটু ছলনা করা যাক। এতে তার লাভ বই ক্ষতি নেই। মোগল সেনাপতির কাছে দূত পাঠালেন দাউদ। বললেন, রাজ্য মায় এই কেল্লা তিনি ছেড়ে দেবেন ভালো অর্থ পেলে। কত টাকা দেবেন বলুন? যুদ্ধে কাজ নেই। টাকা দিয়ে নিয়ে নিন।

দূত এ সংবাদ মোগল সেনাপতির কাছে পৌঁছে দিলে তিনি তো রেগে আগুন। ব্যাটার লেজ কাটা গেছে, এখনও তড়পাচ্ছে? এত বড়ো কথা?

পরক্ষণেই মোগল সেনাপতি ভাবলেন, কী দরকার মারামারিতে লোকক্ষয় করে? সৈন্যরা অনেকদিন গৃহ-ছাড়া। টাকা নিয়ে দাউদ যদি পালায়, ভালোই তো। তিনি উত্তর পাঠালেন, যদি অল্প-স্বল্প টাকা নিয়ে মুলুক ছেড়ে দিতে রাজি থাকো, তবে রাজি আছি। কিন্তু তোমায় দিল্লীশ্বরকে স্বীকার করতে হবে।

দাউদ উত্তর পাঠালেন, রাজি আছি। তবে অল্প টাকায় হবে না।

মোগল সেনাপতি বলে পাঠালেন, কত টাকা চাও? দাউদ একটা চড়া দর হাঁকলেন। মোগল সেনাপতি মুনিম খান একটা নরম দর পাঠালেন। দাউদ কিছু নামলেন। মুনিম খান তার উত্তরে কিছু উঠলেন। দাউদ এভাবে মুনিম খানকে ভুলিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। কিন্তু তোডারমল ভুললেন না। তিনি অনুসন্ধান করে জানলেন দাউদ আসলে সময় নিচ্ছেন যুদ্ধের কৌশল সাজাতে।

দাউদের সৈন্যবাহিনীতে একরাম আলি নামে একজন সিপাহি ছিল। প্রথম জীবনে সে মোগল বাহিনীতেই কাজ করত। মোগল এক ফৌজদারের মেয়েকে সে ভালোবেসে নিকাহ্ করেছিল। ফলে ফৌজদার কুপিত হয়ে তার মেয়েকে তার কাছ থেকে নিয়ে বাপের বাড়ির দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে তাদের ছাড়াছাড়ি। একরাম আলিও মোগল বাহিনী ছেড়ে দাউদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। দাউদ এ সংবাদ জানতেন। তিনি একরামকে বড়ো বিশ্বাস করতেন।

তোডারমল গোপনে একরাম আলিকে তার সাথে যোগাযোগ কবতে বললেন। একরাম জানাল, সে স্বয়ং ফউজদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে, কিন্তু সে ফেরারি ফউজ-প্রাণ ভয় আছে তার। ফউজদার যদি নিজে অভয় দেন, তাহলে সে আসতে পারে।

তোডারমল স্বহস্তে একরামকে পত্র দিলেন, তোমার সকল কসুর মাফ করা গেলে। কাল রাত্রিকালে হুজুরে হাজির হও।

কথামতো একরাম ফউজদারের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করল। তোডারমল তাকে ভয় দেখালেন না। কাজের কথা সব ঠিক হয়ে গেল। তোডারমল সৈন্য নিয়ে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হলে, একরাম দাউদের কেল্লার দ্বার খুলে দেবে।

সবশেষে কূটবুদ্ধি তোডারমল বললেন, কেল্লার দ্বার তো তুমি খুলে দেবে। আমার কাছে খবর আছে, দাউদের অনেক সিপাহি আছে। নদী পার হবার সময় তারা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে আমরা যদি জিতি, তবে তোমার সাহায্য ছাড়াই কেল্লা দখল করতে পারব। আর যদি পরাজয় হয়, তবে তোমার সাহায্য আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। তাহলে কী উপায়?

একটা উপায় আছে। একরাম বলে। কেল্লা যাবার দুটো পথ আছে। উত্তর দিকে একটা, আর একটা দক্ষিণে। উত্তরে নদী পথ। কেল্লার সামনে নদী পার হওয়া অসম্ভব। আপনি দক্ষিণের পথে সৈন্য নিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করবেন। কেল্লায় তখন সৈন্য থাকবে না। থাকলেও অল্প থাকবে। অতএব আপনি অনায়াসে কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করতেপারবেন।

—কিন্তু দাউদ যদি উত্তর পথে শুনতে পায়, আমরা দক্ষিণের পথে সেনা অভিযান করছি, তবে সে-ও এই পথে সৈন্য নিয়ে আসতে পারে।

—পারে, আপনি উত্তর পথে অর্ধেক সৈন্য পাঠাবেন। অর্ধেক পাঠাবেন দক্ষিণে। দক্ষিণের অভিযান আপনার গোপন থাকবে। বিশ্বস্ত লোক ছাড়া কেউ জানবে না। আর অভিযান শুরু হবে রাত্রে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দিনের বেলা সৈন্য জঙ্গলে লুকিয়ে

থাকবে। উত্তরে অভিযান হবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। দাউদকে যদি নদীর ওপারে নিয়ে আসা যায় তবে খুব ভালো হয়। দাউদ এখনি সেনা সাজিয়ে বসে আছে এপারে। উত্তরে দাউদকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখবে মুনিম খান। সেই অবসরে আপনি দুর্গ দখল করবেন।

একরাম আলির পরামর্শে রাজা তোডারমল খুবই সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, হ্যাঁ। তুমি আমাদের মঙ্গল চাইছ দেখছি। কি পুরস্কার চাও, বলো?

একরাম তখন তার অভীষ্ট পুরস্কারের কথা বলল। তার স্ত্রী-কে সে ফিরে পেতে চায়।

তোডারমল বললেন, তাই হবে।

দাউদ তাঁর পরিবারের সকলকে আগেই কটকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যুদ্ধ করা ছাড়া তাঁব আর কোনো উপায় ছিল না। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দাঁতনের ৯ মাইল দূরে অবস্থিত তুকরোই গ্রামের কাছে তুমুল যুদ্ধ হল। দিনটা ছিল ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ। দাউদের বাহিনী প্রথম আক্রমণ শুরু করল। তারা আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করল। মোগল সেনাপতি মুনিম খান পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু অত্যাধিক আত্মবিশ্বাস আর নির্বুদ্ধিতা দাউদের বাহিনীকে পরাজয়ের সামনে এনে দিল। তাঁর প্রধান সেনাপতি অসংখ্য সৈন্য সমেত নিহত হল। পরাজিত দাউদ পালিয়ে গেলেন। মোগল সৈন্যরা বেপরোয়া হত্যা ও লুণ্ঠন চালাতে লাগল।

তোডারমল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দাউদ কোথাও আশ্রয় না পেয়ে কটকের দুর্গে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বাঁচলেন না। ১২ এপ্রিল মুনিম খানের কাছে তাঁকে বশ্যতা স্বীকার করতে হল। ১১ এপ্রিল মুনিম খান দাউদকে ওড়িশার জায়গির দিয়ে টাণ্ডায় চলে গেলেন। কিছুদিন পর দাউদ আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোগল অধিকারভুক্ত অঞ্চল জয় করার পরে তিনি আবার বাংলাদেশ অধিকার করে নিলেন।

দিল্লি থেকে সম্রাট আকবর বিরক্ত হয়ে হাসান কুলী বেগ-কে খান-ই-জাহান উপাধি দিয়ে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন। যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক সৈন্যাধ্যক্ষদের তোডরমল অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন আবার। তারা এসে সহজেই তেলিযাগড়ি দখল করে নিল। দাউদ এবারে পালালেন রাজমহলের দিকে। সেখানে পরিখা খনন করে লুকিয়ে থাকলেন।

খান-ই-জাহান তাঁকে আক্রমণ করতে পারলেন না। তখন তিনি আরো অনেক সৈন্য সমাবেশ করালেন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই রাজমহলে মোগলদের সঙ্গে আফগান সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। অবশেষে দাউদ বন্দি হলেন। বীর দাউদ খাঁ স্বাধীনতার স্বপ্নে রক্ত অর্ঘ্যে উপহার দিল নিজের জীবন। দিল্লীশ্বর আকবরকে উপহার স্বরূপ তাঁর মাথা কেটে উপহার পাঠানো হল। বাংলার ইতিহাসে আফগান যুগ শেষ হল এই ভাবে।

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা থেকে যমুনা ও গঙ্গা নদী বেয়ে ১৮০ খানা নৌকা বাংলার তীরে এসে ভিড় করল। এই সব নৌকায় আছে হিন্দু-মুসলমান বণিকের দল। যারা লবণ, আফিম, নীল, সিসে, গালিচা ইত্যাদি নিয়ে এসেছে পশ্চিম থেকে। প্রধান নৌকা থেকে দেখা গেল

ধীরে ধীরে নেমে আসছেন একজন সাদা চামড়ার মানুষ। ইতিহাস আমাদের চেনায় এই মানুষটির নাম র‍্যালফ ফিচ।

সাতগাঁও তখন খুব সমৃদ্ধশালী বন্দর।

বাঙালিদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল পোর্তুগিজরা। তারা প্রথমে এসেই এই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল গুলিতেই শুধু নয়, তারা নদীপথে ঢুকে দক্ষিণবঙ্গের এলাকাগুলোতেও হানা দিতে শুরু করে দিল। ওদের হাতে ছিল বন্দুক। বাংলার কেউ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানে না। অবস্থা এমনিই হল যে জলপথে বাণিজ্য করা দায় হয়ে উঠল।

ফিরিঙ্গিরা পাতে গোলমরিচ না পেলে মাথা গরম করে ফেলে। ডাচ-রা গোল মরিচের একচেটিয়া ব্যবসা করে। তারা অনেক আগে থেকেই এদেশে বাণিজ্য করে আসছে। গোলমরিচের দাম তারা হঠাৎ বাড়িয়ে দিল। তাও পাঁচ সিলিং করে।

সালটা ১৫৯৯।

—হ্যাঁ মশলা ব্যবসায় ওলান্দাজ, আরব, পোর্তুগিজদের বরাবরের রমরমা ছিল। এই দেখে ইংরেজরা শুকিয়ে মরছিল। এই সময় ইংরেজরাও যোগ দিল। তারা দেখল নিজেদের প্রিয় জিনিসগুলো নিজেরা যদি কবজা করতে না পারে তাহলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। এই ভাবনায় শুরু হল তাদের দেশ জয়ের নেশা। সেই ভাবনার অনেক অনেক দিন পরে।

১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সুতানুটির সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ১৩০০ টাকায় সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি গ্রাম কিনে নেয় ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। তারপর সেখানকার সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ামের নামে কলকাতার বুকে পত্তন করা হল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের। আপনার গল্প থেকেই জানা যায় বিদেশি তোষণ আমাদের রক্তে।

লর্ড মেকলে এ দেশে এমন একটি মুতসুদ্দি-কারকুন শ্রেণি তৈরি করতে চাইলেন যারা হবে "A class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and intellect."

১৭০৭-এ দিল্লিতে চোখ বুজলেন শেষ জবরদস্ত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য কুঠি গড়ে তুলল। পোর্তুগিজ, আর্মেনিয়ানদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্নস্থান থেকে স্থায়ীভাবে এসে জুটতে লাগল হিন্দু, মুসলমান, পারশি ব্যবসায়ীরা।

তারপর ১৭৫৭-র ২৩ জুন।

দেখা গেল প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে পলাশির আমবাগানের পেটে লেজ গুটিয়ে লুকিয়ে পড়লেন ক্লাইভ সাহেব।

তবু বঙ্গ সেনাপতি মিরজাফর খানের মুখ একেবারে কালো মেঘ।

তিনি দেখছেন আকাশও বর্ষার মেঘে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে।

কোথাও বুঝি এক পশলা বৃষ্টি নেমে এল। তেমন কেউ গা করল না। কিন্তু তাতেই যা হবার হয়ে গেল। কোম্পানির গোলাবারুদ অল্প, তাই ঝটপট বাঁচানো গেল। নবাবের গোলাগুলি বারুদ প্রচুর। একে ওকে ডাকতে ডাকতেই সব ভিজে একশা। নইলে মিরজাফর সরে দাঁড়ালেও নবাবকে হারানো কি সহজ ব্যাপার ছিল?

—ইতিহাসের আনাচকানাচে এরকমের অসংখ্য ছোটো ছোটো ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে, যা পবে বড়ো ঘটনার সূচনা করেছে।

—যাকগে এসব আমার কথা নয়। আঢ়ড়ায় থাকাকালীন সময়ে শিলাবতীর তীরে কন্যা যশোদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল এক সন্ন্যাসীর। তরুণ সেই সন্ন্যাসী যশোদাকে বলেছিল, আঢড়া নগরীর কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে এই শিলাবতী। এই শিলাবতীই নগরীর সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু বহু যুগ পরে এই নদী এত নিকটে থাকবে না। ধীরে ধীরে সরে যাবে অনেক দূরে। এত ব্যবসা, এত শ্রেষ্ঠীর দল, কিছুই থাকবে না। সব স্তব্ধ হয়ে যাবে এক দিন।

যশোদা বলে তাই কখনো হয়? এই নদী এই তো জল স্পর্শ করে এলাম, সরে যেতে পাবে কখনো। নদী তো দেবী, লোকে বলে এই জল স্পর্শ করলে পুণ্য হয়। দেহ হয় পবিত্র। আমি তো ছুঁয়ে এলাম। আমি এখন পবিত্র?

তরুণ সন্ন্যাসী স্মিত হেসে বলে, তুমি এমনিতেই ফুলের মতো পবিত্র। তোমার কি মনে হয?

—আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি।

—তুমি যে পরিবারের দুহিতা, সেই পরিবার একদিন ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত। আজ তোমরা ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী। তুমি যদি নদীকে পবিত্র বলে বিশ্বাস করো, তাহলে নিশ্চয় এই নদীর জল তোমার দেহ-মনকে পবিত্র করবে। তোমার বিশ্বাসের ওপর সবটাই নির্ভব করছে। আমার ধারণা তুমি সেভাবে বিশ্বাস করো না।

যশোদা একটু নীরব থাকে। তারপব জিজ্ঞেস করে, কি করে বুঝলেন?

—করলে তুমি এই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে।

কথাটা যশোদার মনে ঝড় তুলল। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে প্রাসাদ ছেড়ে সে নদীতীরে এসেছে একটাই আকর্ষণে। সে আকর্ষণ হল এই তরুণ সন্ন্যাসী। নগরীর পথে-ঘাটে কত মানুষই তো ঘুরে বেড়ায়। এভাবে যশোদাকে কেউ কখনও আকৃষ্ট করেনি। আজ সে দ্বিতীয় দিন এল এখানে। প্রথম দিন এসেছিল রাজবাড়ির অন্য মেয়েদের সঙ্গে। আজ একা। সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনে তার মনে সংশয় জাগে। তার অন্তর সন্ন্যাসী কি দেখতে পাচ্ছেন?

—কিন্তু কেন যাব? নদীর পবিত্রতায় বিশ্বাস থাকুক আর না থাকুক, নদীর সান্নিধ্য কার না ভালো লাগে?

—তোমাদের প্রাসাদের আরও নিকট দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এই নদীই। সেখানেও তো ঘুরতে পারতে।

—বুঝেছি। আচ্ছা, আপনিও কি নদীকে দেবী বলে মনে করেন?

—ভারতের মানুষ সব কিছুর মধ্যেই প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। সেদিক থেকে বিচার করলে নদীর চেয়ে আর কিছু আছে কি? এই নদী যেদিন দূরে সরে যাবে, সেদিন আর এ নগরী সমৃদ্ধ থাকবে না। নদী এই নগরীর প্রাণ। তুমি ঘোর অবিশ্বাসী হয়েও এই নদীতে অবগাহন করো, নতুন সজীবতা অনুভব কববে। অধিকাংশ মানুষ তাই নদীকে দেবী বলে ভাবে। ভাবে প্রাণময়ী।

—নদীর প্রাণ আছে বলেই কি সে সরে যাবে?

—না। এ প্রকৃতির নিয়ম। জাগতিক নিয়মেই সে তার গতিপথ পরিবর্তন করবে। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই জগত চলছে সেই সৃষ্টিব আদি দিন থেকে। আজ যেখানে প্রান্তর, আগামীকাল সেখানে জনপদ গড়ে উঠবে। সেই জনপদও একদিন ধ্বংস হবে।

—আমি এসেছি বলে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

—না। ঠিক তা নয়। এসময়ে আমি একাকী থাকি বলে ভগবানের ধ্যান করার চেষ্টা করি।

—তবে আমি যাই।

—এসো।

—আচ্ছা, আপনি একবারও আমার পরিচয় জানতে চাইলেন না তো?

—কি হবে জেনে? তুমি সম্ভ্রান্তবংশীয়া রাজবাড়িতে থাকো, এইটুকু জানি। এইটুকুই যথেষ্ট।

—আমরা রাজ আশ্রিত। আমার পিতা জন্মভূমি ত্যাগ করে এসেছেন।

—যবনের ভয়ে?

—হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?

—তবে তুমি যদি একথা ভেবে বিচলিত বোধ করো, তবে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যাও।

যশোদা নত হয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে। তাব চোখ ছলছল করছে। আর কোনো কথা না বলে সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। নদীর বুক থেকে উঠে আসছে শীতল হাওয়া। সারা অঙ্গে মাখিয়ে দিচ্ছে শীতল মেদুরতা। সন্ন্যাসী সেই দিকে চেয়ে তাঁর দু চোখ কিছুক্ষণের জন্য বুজলেন। তাঁর চিত্ত সামান্য বিক্ষিপ্ত। তিনি যেন এই নব-যৌবনার মনের বাসনা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছেন। এমন তাঁর আগেও হয়েছে। এদেশের মেয়েরা খুব নরম, এদেশেরই মাটির মতো। অনর্থক কোনো জটিলতার মধ্যে তাঁকে যাতে না পড়তে হয় তার জন্য তিনি সাধারণত কোনো নগরীতে গেলে অবস্থানের স্থান নির্বাচন করেন নিরিবিলি কোনও বৃক্ষমূলে। তবু অনভিপ্রেত অনেক কিছুরই সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেগুলি অতিক্রম করেন।

রাজবাড়িতে থাকার মতো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যশোদা নয়। তবু রাজবাড়িতে আশ্রিত হওয়ায় রাজ পরিবারে সান্নিধ্য সে পেয়েছে। রাজা বাঁকুড়া রায় তাঁকে স্নেহ করেন। রাজপুত্র রঘুনাথও যথেষ্ট স্নেহ করেন। রাজপ্রাসাদের এক কোণে আমাদের বাস। প্রাসাদের পিছন দিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। আমরা সেটাই ব্যবহার করি। পরিচারকবৃন্দ, প্রাসাদের

মহিলারা এই পথেই যাতায়াত করেন। যশোদাও এই পথেই বাইরে যায়। দিন ও রাতের সব সময় সিংহদ্বারের মতো এই দ্বারটিতেও প্রহরী থাকে। দিন ও রাতে ছ'বার প্রহরী পরিবর্তন হয়। যশোদাকে প্রহরীরা যেমন চেনে যশোদাও ওদের মুখ চিনে রেখেছে। পথে-ঘাটে দেখা হলে যশোদাকে দেখে ওরা মাথা নোয়ায়। যশোদা অস্বস্তি অনুভব করে।

মশা মারতে মারতে ঢুলছিল মমতা। শরীর তার ভালো যাচ্ছিল না। শিবরাম ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার পায়ের শব্দে মুখ তোলে মমতা।

ঘরে ঢুকি। মমতা জড়সড় হয়ে বসেছিল, উঠে পড়ল। যশোদাকে কোথাও দেখতে পাই না।

এবার আমি লিখতে বসব। তাই আমাকে লেখার অবসর দিয়ে মমতা প্রস্থান করল অন্য ঘরে। এখন এসব বুঝতে পারি। আগে এসবে মন দিতাম না। এখন মন এমনিতেই চলে যায় এসব দিকেই।

টোল চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন অনেকেই লেখাপড়া শিখতে চায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রায় সকলেই গুরু বৃহস্পতির মতো পাঠশালা খুলে বসছে। চারদিকে একটা শিক্ষা শিক্ষা ভাব। আমার সে সবে মন নেই। এমন একটা গ্রন্থ আমি রচনা করতে চাই যা পাঠ করলে দশ ও দেশের কল্যাণ হবে। ব্যাপকতর অর্থে 'মঙ্গল' অর্থাৎ গার্হস্থ্য কল্যাণ হবে।

চণ্ডীর বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন কারণে প্রকটিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে দেবী ছিলেন সহস্রভুজা, এর কারণ দেবী সর্বচরাচর ব্যাপী বিরাজ করেন।

সংবাদ পেলাম মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র রাজশাহি জেলার তাহিরপুরে রাজা কংসনারায়ণ, অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী সঙ্গে দুই মেয়ে এবং দুই পুত্র, মস্তকোপরি স্বামী মহেশ্বর একই চালচিত্রের পেক্ষাপটে একই পীঠে দুর্গা প্রতিমার পূজা করেছেন। রাজপুরোহিত পণ্ডিত প্রবর রমেশ শাস্ত্রীর কাছে কুল্লুক ভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণ রাজসূয় যজ্ঞ করার অনুমতি চাইলে রমেশ শাস্ত্রী রাজসূয় যজ্ঞের পরিবর্তে উক্ত মূর্তিতে দুর্গোৎসব করার পরামর্শ দেন ও তদনুযায়ী রমেশশাস্ত্রী দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করে দেন। নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য "দুর্গাপূজা তত্ত্ব" গ্রন্থে পূজার মন্ত্রাদি রচনা করেছেন। সারা ভারতব্যাপী চণ্ডীর অবস্থান। সুতরাং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লেখার উপকরণ পেয়ে গেলাম।

যশোদাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় গিয়েছিলে?

যশোদা বিস্মিত হয়। এধরনের প্রশ্ন সাধারণত আমি ওকে করি না।

যশোদা জবাব দেয়, নদীর ধারে।

—বন নির্জন। মধ্যাহ্নের পরে একা যাওয়া নিরাপদ নয়। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বিপদ ঘটে না বলে যে ঘটবে না, একথা জোর করে বলা যায় না। নদীতে অনেক জলযান যাতায়াত করে, সব জলযানের সব মানুষ যে ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই।

—আমি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম।

—তমাল বৃক্ষের নীচে?

যশোদা যেন সংকুচিত হয়ে ওঠে। বলে, হ্যাঁ।

—তুমিও?

—কেন?

—খুবই সুদর্শন এবং তরুণ? তাঁর উপদেশের জন্য যুবতী:˝ লালায়িত। তুমিও কি সেই দলে?

—জানি না। তবে সন্ন্যাসীকে দেখে যে কেউ আকৃষ্ট হতে পারে। ওঁর রূপের জন্য শুধু নয়, ওঁর অবয়ব থেকে একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়।

ওর কথা শুনে হতাশ হই। কোমল স্বরে বলি, তোমার ভালো লেগেছে বুঝতে পারছি। তবে একটা কথা বলে রাখি। ওঁকে ঘিরে যেন তোমার মধ্যে অহেতুক কোনও কামনার উদ্রেক না হয়। কারণ উনি জিতেন্দ্রিয়। অনেক নারী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ওঁকে কামনা করে।

—জানি।

—জানো? যশোদার স্বীকারোক্তিতে বিস্মিত না হয়ে পারি না। বুঝতে পারি ও এখন যথেষ্ট বড়ো হয়ে গিয়েছে। যশোদা সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। বিভ্রান্ত আমার বুকের ভিতরটা টনটন করতে থাকে। ওকে ফেরাতে চেয়েও ডাকতে পারি না। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে ওর গমনপথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। মেয়ে আমার ডাগর হয়েছে। আর দেরি নয়, ওকে এবার পাত্রস্থ করা খুবই প্রয়োজন।

লেখার ঘরে দুই সলতের সেজ জ্বলছে। একটি সলতে লম্ব ভাবে থাকে, সেটি জ্বলে। অপরটি থাকে আড়াআড়ি ভাবে, পরে জ্বলবার জন্য। সেজটি অনেকদিন মাজাঘষা হয়নি। তেলচিটে ধরে গায়ে বসে আছে। সেজের অবয়ব ঢাকা পড়ে গেছে। পিতলের জিনিসটা কবেকার, জানা নেই। শিবরাম সেটি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দেয়। হালকা পিতলের দীপ এখন বেশ ভারী হয়েছে।

এ পর্যন্ত যে সব পুরাণ লেখা হয়েছে, সেখানে কেবল শক্তিবাদ। শক্তিবাদের ব্যাপক প্রয়োগ সেখানে। বর্ধমানের জায়গিরদার শের আফগান স্বাধীনচেতা মানুষ। তাঁকে দমন করতে দিল্লি থেকে ছুটে এল জাহাঙ্গিরের দুধভুত ভাই কুতবউদ্দীন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গির' নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন। শের আফগান ইস্তলুজ তরুণ তুর্কি, জায়গিরদার হিসাবে বর্ধমানের দায়িত্বে। তাঁর পত্নী অসামান্যা রূপবতী মেহেরউন্নিসা। বিবাহের পূর্বে জাহাঙ্গির তাঁকে দিল্লিতে দেখেছিলেন হারেমের মধ্যে। সে দেখাই তাঁর কাল হয়েছিল।। খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। এই নারীরত্ন কে হস্তগত করার গোপন ইচ্ছা ছিল জাহাঙ্গিরের বুকে। মানসিংহকে তিনি বাংলার সুবাদারের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। তাঁর বিশ্বস্ত ধাত্রীপুত্র কুতবউদ্দীন খান কোকা-কে বাংলা দেশের সুবাদার নিযুক্ত করলেন।

কুতবউদ্দীন বর্ধমানে এলেন সরাসরি।

শের আফগান—আসল নাম আলিকুলি ইসতাজুল। হিংস্র একটি বাঘ হত্যা করে তিনি চরম সাহসিকতায় পরিচয় দেন। ফলে, তাঁর নাম হয় শের আফগান। সুদূর ইরান থেকে ভারতে এসে একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে তিনি আকবরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। অধ্যবসায় ও শৌর্যের পরিচয় দিয়ে আকবরের পরম আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় সপ্তদশী মেহেরউন্নিসার। মেহেরউন্নিসার পিতামহ খাজা মহম্মদ শরিফ খোরাসানের তাতার সুলতান বজলার বেগের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁরই পুত্র মিরজা গিয়াসউদ্দিন (পরবর্তী নাম ইতমাদ্দৌলা) ভাগ্যান্বেষণে এসে মোগল দরবারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধ্যবসায়, প্রতিভা ছাড়াও আভিজাত্যের ধারাও তিনি বহন করেছেন। ফলে সামান্য রাজকর্মচারী থেকে তিনি কাবুলের দেওয়ান পদে উন্নীত হন।

বাংলার পাঠান শাসনকর্তারা মোগল সাম্রাজ্যের প্রাধান্য খর্ব করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত শের আফগানও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গির এ ঘটনায় খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি শের আফগানের বেইমানির উপযুক্ত জবাব দিতে তাঁর পালিত ভাই কুতুবউদ্দিনকে বর্ধমানে পাঠালেন।

শের আফগানের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ শুভ হয়নি। প্রথমে বচসা, বচসা থেকে বিবাদ, দুই সেনাপতি খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হলেন, দুজনেরই মৃত্যু ঘটল ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে। ওঁরা দুজনেই শুয়ে রইলেন বর্ধমানের মাটিতে। শের আফগানের মৃত্যুব পর মেহেরউন্নিসা বর্ধমান ছেড়ে দিল্লিতে পিতা মির্জা গিয়াসউদ্দিনের আশ্রয়ে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি জাহাঙ্গিরের বিমাতা সেলিমা বেগমের সহচরী নিযুক্ত হলেন।

জাহাঙ্গির 'নওরোজ' উৎসব উপলক্ষে আবার মেহেরউন্নিসাকে দেখতে পেলেন। মেহেরুন্নিসার বযস তখন ৩৪ বছর। তখন তিনি শের আফগানের ঔরসজাত এক কন্যার মাতা। কন্যার নাম লাডলি বেগম। জাহাঙ্গিরের গোপন বাসনা জেগে উঠল। বিমাতা সেলিমা বেগমের উদ্যোগে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে জাহাঙ্গিরের বিবাহপর্ব সম্পন্ন হল ১৬১১খ্রিস্টাব্দে। নাম হল নূর-এ-জাহান, যার অর্থ জগতের আলো। এই নামেই তিনি বিখ্যাত হলেন। সে ইতিহাস তো তোমরা জানো।

ইতিহাসের পাতা জুড়ে কত না ঘটনার ঘনঘটা। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য নজির, ভাতৃহত্যায় রাজ্যাভিষেক কিংবা কোনো সুন্দরী নারীকে ঘিরে দুই বীর শ্রেষ্ঠর অস্ত্রের ঝনঝনানি কত কিছুই তো ইতিহাসের ধুলোমালিন পাতা থেকে উঠে আসে। যত জানতে পারি, তত চমকে উঠি। আর মনে মনে বলি—

বিস্মৃত সব নীরব কাহিনি তারা সব কথা কয়, কথা কয়। সেই কথা সবাই শুনতে পায় না। পায় কেবল তারা, যাদের সঙ্গে এই বাতাস মাটি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্রের বন্ধুত্ব হয়।

আটে অষ্টবসু

শ্রীক্ষেত্র।।

পুরীধামে গিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন করলাম। জীব সেবাব মধ্যে দিয়েই যে কৃষ্ণ সেবা, জীব সেবা ব্যতিরেকে কৃষ্ণ সেবা নয়-এই উপলব্ধি গভীরভাবে আমাকে নাড়া দিল।

গ্রন্থপাঠের একটা অংশে যেমন তত্ত্ব থাকে, তেমন দরকার হয় একটা গ্রন্থশৃঙ্খল। প্রয়োজন পরে ফিরে ফিরে পড়ার মতো বই। আবাদ করার জন্য পড়ে আছে যোজন যোজন জমি। জমি মানবজমি। সেই জমি আবাদ করতে হবে। এর থেকে জীবনে চাওয়ার জিনিস আর কী হতে পারে? কী চাইব, জীবনের কাছে কী চাইতে হয় তা বুঝতে পিতৃপুরুষদের জীবন ধরে এগোতে হয়। যত এগোই ভিন্ন স্বাদ সোজাসুজি দেখি। আবার তির্যকভাবে দেখি, খুঁড়ে খুঁড়ে দেখা। এইভাবে আমি জীবনটাকে দেখতে চাই। পুরাণ-প্রতিমার ছায়ায় একেই বলে বোধহয় স্বপ্ন দিয়ে দেখা।

মাথার উপর দিয়ে পাখি উড়ে যায়। কানখাড়া করে ওদের কূজন শুনি। পাখি প্রকৃতিকে খুঁজে পায়। প্রকৃতি পাখিকে লালন করে। মানুষের ঠিকানার বদল হয়। একটি গৃহহারা হলে আবার কোথাও গৃহ মেলে। পাখির বেলা কি তা হয়?

শ্রীচৈতন্য নদের নিমাই আধুনিক সভ্যতার এই সংকট হৃদয়ঙ্গম করেছেন। জড়বাদে পূর্ণ নাস্তিক সমাজে পরমার্থিক আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে উন্নত জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন 'কৃষ্ণ নামে এবং কৃষ্ণ প্রেমে....'

দেখলাম জীবের মধ্যে কৃষ্ণই বড়ো হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

যশোদানন্দিনী জয়া যমুনাবাহিনী।
যদুঘোষা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনী।।

প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দিরে যাই বসে থাকি সকাল থেকে সন্ধে। জগন্নাথদেবের সন্ধ্যারতি শেষ হলে পুত্র শিবরামের হাত ধরে ঘরে ফিরে আসি। আহারনিদ্রা সব ত্যাগ করেছি। মুখে কিছু রোচে না। শুধু জগন্নাথের পরমান্ন মুখে তুলি। এমন করে কি মানুষ বাঁচে? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, শিষ্য দামাল সকলেরই চিন্তা আমাকে নিয়ে। ক্ষত-বিক্ষত মনের মধ্যে বিদ্রোহ জেগে ওঠে।

একনিষ্ঠ বৈষ্ণব হিসাবে আমি সংকল্প করি বৈষ্ণবীয় চিন্তায় আত্মনিয়োগ করব। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রচারিত নব্য বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শে গ্রন্থ রচনা করব। আমার লেখনীশক্তি নিয়ে জগন্নাথের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলাম। রচনা করলাম 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পুরীর মন্দিরে এই মঙ্গলগীত গাওয়া হল। কিন্তু তাতে আমার মন শান্ত হয় না। কেবলই মনে হয় চৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে নতুন কিছু ভাববার অবকাশ আর নেই।

মৌর্যযুগে কলিঙ্গভূমি বৌদ্ধ ধর্মচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর ভারত ভ্রমণ কাহিনিতে ওড়িশায় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে পাহাড়ের উপর পুষ্পগিরি নামে একটি বৌদ্ধবিহারের কথা লিখেছেন। যার অবস্থান জারকার লাঙুলি পাহাড়ে। মহানদীর শাখা বিরূপা এবং ব্রাহ্মণীর শাখা কেলুয়ার মধ্যকার ভূখণ্ডে অবস্থান উদয়গিরি, ললিতগিরি এবং রত্নগিরির।

—এই তো সেই বৈতরণি। পার হলে আমার সকল জ্বালা জুড়োবে কি?

—তুমি এ পারেই কি কম যন্ত্রণা ভোগ করছ?

ফিরে দেখি নৌকায় বসে আছেন এক সন্ন্যাসিনী।

—যন্ত্রণা বোধহয় দুই পারেই আছে।

—হ্যাঁ। যন্ত্রণা সব পারেই আছে।

—তা তুমি অন্তর্যামী। বোঝাটা এ পারে রেখে যাবার কি কোনো উপায় আছে? যদি থাকে তো বলো? বেলায় বেলায় পার হয়ে যাই।

—এত তাড়া কেন তোমার? স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে রয়েছে, তোমার তো এখন কাঁচা বয়েস।

—বেলা হলে যে বাতাস উঠবে।

—তুফানকে এত ভয় করো? তোমার বুঝি পাকা মাঝি নেই?

—পাকা মাঝি আছে বইকী। তবে তার সাক্ষাৎ পাইনি।

—তাই বুঝি বৈতরণি তীরে এসে বসে আছ?

—আরো পাকা মাঝির সন্ধানে আছি। শুনেছি শ্রীক্ষেত্রে তিনি বিরাজ করেন।

—ঠিকই শুনেছ। উঠে এস। চলো সেখানে একসাথে যাই।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুমি দিনপাত করো কীসে?

সন্ন্যাসিনী বলে, ভিক্ষায়।

—কিন্তু তোমায় দেখে সন্ন্যাসিনী বলে তো মনে হচ্ছে না। তোমায় কি আগে কোথাও দেখেছি?

সহসা সন্ন্যাসিনী প্রশ্ন করে, তুমি সন্ন্যাসী হবে?

—আমি যে গৃহী। উত্তর দিই।

—তাতে দোষ কী?

—রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, গৈরিক বসন আমি পাব কোথায়?

—সব আমার ঝুলিতে আছে।

—না।

নদী-ঘাটের এক বৃক্ষতলে আশ্রয় নিই। সেদিনের মতো এক দেবমন্দিরের অতিথিশালায় রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হয়।

পরদিন সকালে উঠে খরস্রোতা নদীর জলে স্নানাহ্নিক সেরে আবার রওনা হই।

সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞেস করে, তুমি গৃহী, তবে জগন্নাথ দর্শন করে ফিরে যাওনি কেন? শ্রীক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াও কেন?

প্রাণভয়ে। মুসলমানের রাজ্যে সম্মান নিয়ে বাঁচা যায় না। তুমি কি হাত দেখতে পারো?

—না। হাত দেখে কি হবে?

—একটা কথা আমার জানার খুব ইচ্ছে।

—তবে তোমাকে এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি যে তোমার ভূত ভবিষ্যত বলে দিতে পারবে।

—কোথায় তিনি?

—বেশ, চল আমার সাথে।

সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে উদয়গিরিতে এলাম।

এক পারে উদয়গিরি, অন্যদিকে ললিতগিরি। মধ্যে বিরূপা নদী। তার নীল জল শুকিয়ে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে দেখি বিশাল প্রান্তর। সবুজ ধানের খেত ঘিরে রয়েছে সারি সারি তাল বৃক্ষ। নদীতীরের সেই তাল বনের শোভা অপূর্ব। কী মিষ্টি পাখির গান, শুনে মন ভরে যায়। উদয়গিরি যেমন গাছপালায় শোভিত, ললিতগিরি তেমনই বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়।

এককালে এই শিখরদেশ অট্টালিকা স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন সবই ভগ্নগৃহবিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড। দেখি আর ভাবি। এই সব প্রস্তরমূর্তি যারা গড়েছিল তারা কি মানুষ ছিল? উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, পাণিনি, কাত্যায়নের এই দেশ। এই দেশে জন্ম আমার সার্থক।

ললিতগিরির নিচে হস্তীগুম্ফা দেখে বুঝি, এক সময় বড়ো রমণীয় ছিল। ছাত পড়ে গেছে। স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়েছে। ঘাস আর আগাছায় ভর্তি এই গুহার ভিতরে কিছু মূর্তি-কারো নাক ভেঙেছে, কারোর হাত ভেঙেছে, কারোর ভেঙেছে পা। পুতুলগুলো এদেশের মানুষের মতো প্রাণহীন, বর্ণহীন। এই গুহার মধ্যে বাস করছেন এক যোগী।

যোগী ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব আমরা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে অবস্থান করলাম।

পরদিন প্রত্যুষে যোগী বিরূপায় স্নান করতে গেলেন। আমরাও প্রস্তুত হলাম। যোগী ফিরলে প্রণাম করে তাব পদধূলি গ্রহণ করলাম। যোগী আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তার কথা হচ্ছিল সংস্কৃত ভাষায়।

যোগী বললেন, কাকে নিয়ে এসেছ?

সন্ন্যাসিনী বললে, যাত্রী। শ্রীক্ষেত্র দর্শনে অভিলাষী।

—এখানে কেন?

—ভবিষ্যত জানতে চায়।

আমি যোগীকে প্রণাম করলাম। যোগী আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি পথে কেন? তোমার স্থান রাজগৃহে। তবে তোমার অদৃষ্টে রাজভোগ নাই।

—আর কোনো দুর্ভাগ্য?

—ইহলোকে তোমার সুখ নেই।

—আমি কি চণ্ডীকে পাব?

—না। তবে তাঁর দয়াতেই তোমার যা কিছু হবে।

—কবে?

—খুব বেশি দেরি নেই।

যোগীর কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম। দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলাম। সন্ন্যাসিনী আমাকে থামাবার জন্য বলে, আরে একটু ধীরে চলো। ছুটলে কি ভবিতব্যকে এড়িয়ে যেতে পারবে?

—পারব না।

—এই পৃথিবীতে এমন দুঃখ আর নেই।

—এসব ভেবো না। অন্য কিছুতে মন দাও।

—কী সে যে মন দেব?

—এতবড়ো জগৎ-কত কি রয়েছে।

—পাপে?

—না পুণ্যে।

—জন্মভূমি ছেড়ে চলে এসেছি। আমার আবার পুণ্য কি আছে?

—ইস্টদেবতার তুমি নিত্য সেবা করো। তোমার পুণ্য আছে বইকী।

—হায়! এই পুণ্যের ফলেই কি জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে? এত বছর ইষ্টদেবতার পূজা করছি। চন্দন ঘষে তাঁর অঙ্গে লেপন করেছি। বাগানে বাগানে ফুল সংগ্রহ করে মালা গেঁথে তাঁকে সাজিয়েছি। অন্নকূট ভোগ তাঁকে নিবেদন না করে কখনও আহারে বসিনি। প্রণাম করতে গিয়ে মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখেছি নিত্য। তবু আমার এই দুর্ভোগ। পুত্রকে হারালাম।

বলতে বলতে আমার চোখে জল চলে এল। সন্ন্যাসিনীর চোখ-ও ছলছল করতে দেখলাম। গৃহীর দুঃখে যাঁর মন কাঁদে-এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী?

—আচ্ছা সত্যি কথা বলো তো, তোমার বাড়ি কি তেউটায়? সন্ন্যাসিনীকে প্রশ্ন করি।

—হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সন্নাসীদের কোনো পূর্বপরিচয় থাকে না। তবে সে সব ভেবে কাজ কি? যে চণ্ডীতে মন স্থির করেছ, তা ছাড়া অন্য কিছু যেন চিত্তে না স্থান পায়—তা হলেই তোমার কার্য সিদ্ধ হবে।

একথা বলে সন্ন্যাসিনী বিদায় নিল।

আমি লিখলাম—

মনেতে ভাবিআ দেখ কেহ কারো নয়
পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয়।
স্ত্রী পুত্র ভাই আপনা কেবা বলে
আপনি থাকিতে কেন তারা সব চলে।।

বন হতে পুষ্প চয়ন করি। পুষ্পের দল, কেশর, রেণু পরীক্ষা করি। পুষ্প নির্মাতার অনন্ত মহিমা কীর্তন করতে করতে বনের পথে চলি। এ পোড়ারমুখী সন্ন্যাসিনীকে জগদীশ্বর কেন এত রূপ যৌবন দিয়েছেন, সে কথা ভেবে বিস্মিত হই।

পঞ্চম শতাব্দী থেকে রত্নগিরিতে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা শুরু হয়েছিল। প্রথমে হীনযান সংঘারাম হিসাবে এটি পরিচিত হয়। পরে মহাযান, বজ্রযান কালচক্রযানের প্রভাব পরে। মন্দিরের দ্বারের অপরূপ শিল্পশ্রী দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। অপূর্ব সব মূর্তি খোদাই করা, পদ্মাসনে আসীন গজলক্ষ্মী, দু-পাশে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের মৈত্রেয় মূর্তি দেখে বিস্মিত হতে

হয়। দ্বার পেরিয়ে বিরাট প্রাঙ্গণ, তারপর মন্দির। প্রাঙ্গণের চারদিক ঘিরে মূর্তির সারি। সামনে বিশাল বুদ্ধমস্তক। প্রার্থনা গৃহের অসাধারণ খিলানগুলির কারুকার্য দেখে অবাক হয়ে ভাবি সেই শিল্পীদের হাতের কাজের কথা। হলঘরের চারপাশে ছাত্রাবাস, দক্ষিণদিকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বিশাল আর একটি বুদ্ধমূর্তি। এ মূর্তি এমনই যে, প্রথম দর্শনেই মাথা নত হয়ে আসে নিজে থেকে।

দু-নম্বর বিহারটি প্রধান ছাত্রাবাস ছিল বলে মনে হয়। এখানেও দেখি তিনটি অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধমূর্তি রয়েছে যা নয়নতৃপ্ত করে। রাজা বিষয়বসুর তিন রানি ছিল। রত্নাদেবী, ললিতাদেবী ও উদয়াদেবী। এদের নামেই তৈরি এই তিনটি বিহার। কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম শোভায় পথের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পথের পাশে একটি পাথরের উপরে বসে পড়ি। কতক্ষণ বসে থাকি। তারপর রঙ্গিন সেই পথেই উঠতে থাকি ললিতগিরির উপরে। দেখি খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকে তৈরি বিশাল চৈত্যগৃহ। স্তূপের উপরে রাখা তিনটি পাথরের পেটিকার প্রথম দুটিতে বুদ্ধদেবের কোনো প্রিয় শিষ্যের অস্থিখণ্ড রাখা আছে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ছে। চারপাশে তার রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো কৃষ্ণচূড়ার রঙে আরও মদির হয়ে উঠেছে। উদয়গিরির স্থাপত্য তথা দেবগৃহ। মনে পড়ে এই শ্যামল প্রান্তর একদিন রক্তাক্ত হয়েছিল। সম্রাট অশোককে করেছিল চণ্ডাশোক। আর সেই রক্তাক্ত প্রান্তরের ছবি দেখেই এই উদয়গিরির উপরে স্তম্ভিত হয়েছিলেন অশোক। এ আমি কী করলাম!

এই আঘাতই তাঁকে ধর্মাশোকের দিকে নিয়ে যায়। বিস্মিত হই স্থপতি ভাস্করদের স্থান নির্বাচনের কুশলতা দেখে। পাহাড়ের কোলে শ্যামলতা মাখা গাছের ছায়ায় ঢাকা ধু ধু প্রান্তর। গোধূলির সোনা-ঝরা আলোয় মনে হয় এ এক মায়াময় জগত। বিশাল প্রাঙ্গণের চারপাশে ছোটো ছোটো ঘরসহ বিশাল বিহার।

একটির নাম মাধবপুর মহাবিহার। প্রথমে বিশাল একটি স্তূপ। উপরে চারটি বুদ্ধমূর্তি আছে। রয়েছে দেড় হাজার বছরের পুরোনো কুয়ো। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নীচে নামতে হয়। পাথরের বাঁধানো বেশ বড়ো কুয়ো। মানুষের বিশ্বাস, এই কুয়োর জল পান করলে নাকি সব অসুখ সেরে যায়। সেই চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় যেন খুঁজি। কি যে খুঁজি জানি না। কিন্তু খুঁজি। কেবলই খুঁজি চারপাশে। মনে হয়ে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে গিয়েছি। তথাগত বুদ্ধের আশ্রয়ে বসে আছি তাঁর পদতলে। শুনছি তাঁর বাণী।

আমিই সে। আমাকে স্মরণ করো। সঙ্ঘের স্মরণাপন্ন হও।

জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভুলে যাই। পুত্রশোকের কথা ভুলে যাই। সামনে এসে দাঁড়ান বুদ্ধ স্বয়ং। মানুষের দৈর্ঘ্য কত বড়ো হয়? বুদ্ধ তাঁর থেকেও বিশাল বিশালতর। পৃথিবীর কত মানুষ তাঁকে স্মরণ করে শান্তি খুঁজেছে।

এক মুষ্টি সরষে যদি তুমি এনে দিতে পার এমন কোনো গৃহ থেকে যেখানে কোনোদিনও শোকের ছায়া প্রবিষ্ট হয়নি, তাহলে তোমার পুত্রকে আমি জীবন দান করব।

বলেছিলেন বুদ্ধ। এ তো কথার কথা নয়। এ হচ্ছে বাণী। জীবনদর্শন।

জন্মিলে মরিতে হবে। অমর কেউ নয়। কিন্তু অকাল মৃত্যু? তাকেও মেনে নিতে হয়। মেনে নিতে হবে।

বুদ্ধ এত করেছেন। সারা পৃথিবীর মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন! ভেবে ভেবে অবাক হই।

না। বুদ্ধর ভাবনার মধ্যেও আজকে বিশেষ কিছু পাওয়া যাবে না। সংঘের ভাবনাও আজ গুলিয়ে গেছে।

সময় সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।

আমিষ ছেড়ে পুরোপুরি নিরামিষাশী হলাম। সংসারে মতি নেই। সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকি। নিত্য প্রভাতে একবার করে স্বর্গদ্বারে আসি। কেবলই মনে হয়, দামিন্যার কারো না কারোর সঙ্গে দেখা মিলবে এইখানে। পরিচয় ঘটে অনেক মানুষের সঙ্গে। একদিন আলাপ হল, সপ্তগ্রামের এক বণিকের সঙ্গে।

তিনি বলছিলেন, বাংলার সুবাদার দরিদ্র প্রজাকে দস্যুর অত্যাচার হতে রক্ষা করতে অক্ষম।

আমি বললাম, তাহলে বাদশাহের কাছে আবেদন করছেন না কেন আপনারা?

—ঠাকুর, আমি বণিক, ম্লেচ্ছদের অত্যাচারে আমার সর্বস্ব গিয়েছে। যা কিছু আছে, দিল্লি গেলে তাও যাবে।

—কেন, বাদশাহ কি সব কেড়ে নেবে?

—না। তবে আমি বাদশাহের কাছে পৌঁছোবার আগেই সর্বস্বান্ত হব।

অবাক হয়ে চেয়েছিলাম প্রৌঢ়ের মুখের দিকে। বলেন কী? তারপর জানতে চাই তাঁর দেশ কোথায়?

তিনি বলেন, তাঁর দেশ সপ্তগ্রাম। তিনি একজন সুবর্ণ বণিক। বাণিজ্য তাঁর পেশা। সপ্তগ্রাম, গৌড়, সোনারগাঁয়ে তাঁর কুঠি আছে। দশখানা জাহাজ ছিল, একে একে সব গেছে। গৌড়ে নাকি ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়েছে। সপ্তগ্রামের অবস্থাও নাকি তাই। সপ্তগ্রাম সুন্দর শহর, গৌড় ছাড়া সুবাবাংলায় এমন সুন্দর শহর নাকি আর একটিও নেই।

আমি বললাম, আমিও আপনারই মতো একজন সহায়সম্বলহীন ভিখারি। তা আপনার দশখানা জাহাজ বিসর্জন দিলেন কীভাবে?

—পাঠানরা তার কতগুলো ডুবিয়ে দিয়েছে। বাকিগুলো কেড়ে নিয়েছে পোর্তুগিজরা।

—এখন কী করবেন?

—কী আর করব? প্রভু জগন্নাথের স্মরণ নিয়েছি।

—পাঠানদের অত্যাচার কি আর কমবে?

—জলে-স্থলে এখন অত্যাচার। স্থলে যাদের প্রভাব বেশি, তারা পাঠান। আর জলে আছে পোর্তুগিজরা। সপ্তগ্রামের কুঠিও তারা দখল করেছে। সপ্তগ্রাম তারা দখল করতে চায়। সেখানে দেশের সব গোমস্তা খরিদ-বিক্রয় করতে আসে।

—সুবাদারের কাছে দরবার করলে কেমন হয়?

—কোনো লাভ নেই। তিনি অত্যন্ত বিলাসী, পোর্তুগিজরা তাঁকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট রেখেছে। সেইজন্য তিনি এদের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে চান না।

—ফৌজদারের সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?

—না। তবে সুলতানের সঙ্গে যখন দাউদের যুদ্ধ হয়, তখন আমার পিতা ফৌজদারের সঙ্গে পিপলি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত একসঙ্গে ছিলেন।

—বড়ো সৌভাগ্যের কথা!

—যে সৌভাগ্য কোনো কাজে লাগে না, সে সৌভাগ্য সৌভাগ্য নয়।

বড়ো খাঁটি কথা। চোখের সামনে দেখি সমুদ্র-সৈকতে ছোটাছুটি করে খেলছে এক বালক। কাছেই তার বাবা মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের দেখে মনে হয় খুব সুখী দম্পতি। সুখ, ঢেউয়ের মতোই, আছড়ে পড়ে, স্নান করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওদের। হঠাৎ বালক একটা শঙ্খ কুড়িয়ে পায়। সেই শঙ্খ কানের কাছে এনে শুনতে চায় বোধহয় সমুদ্রের শব্দ।

না কোনো ‑ ুদ্র সৈকত নয়, যেন বাংলার একটা গ্রামে দাঁড়িয়ে আছি। আমাব সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রাম্য সেই বালক। তার হাতে একটা ডিম। ডিমটা কানের কাছে ধরে কিছু শুনতে চাইছে। তার ভিতরে সেও যেন শুনতে চাইছে সমুদ্রের শব্দ। কোনও বিশেষত্ব আছে কী এই ছবির?

আছে। ছোটো বয়সে মানুষ তার ভবিতব্যটা স্পষ্ট দেখতে পায়। তখন সে স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় না। তারপর যতই সে বড়ো হয রহস্যময় এক শক্তি তাকে বোঝাতে থাকে স্বপ্নটা অবাস্তব অসম্ভব। আর স্বপ্ন তাকে বোঝাতে চায়, আন্তরিকভাবে কোনো কিছু চাইলে পৃথিবীর শক্তিগুলো তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার চাওয়া যতো আন্তরিক হবে, সাহায্য তত উজান বেয়ে এগিয়ে আসবে। সৎ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। অনভিজ্ঞ ও সরল হওয়ায় মানুষ অনেক সময় ঠকেও যায়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষ কষ্টসাধ্য জটিল জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করে নিজের ক্ষমতা, যার চেয়ে বড়ো সম্পদ আর নেই।

জন্মভূমি ত্যাগ করতে হয়েছে আমাকে একরকম বাধ্য হয়ে। তারপর কত দেশ দেখলাম। দেখলাম কত মানুষ।

মমতা অনেকবারই বোঝাতে চেয়েছে কত দূর দূর দেশের মানুষ এসে বাস করছে আমাদের গ্রামে আর আমরা থাকতে পারব না?

না। সবাই নতুন খোঁজে, কিন্তু আদতে মানুষ সবাই এক রকমেরই। দেশ আলাদা হতে পারে, মানুষের চুল সোনালি হতে-পারে, কিন্তু মূলত সেই মানুষই আর পাঁচজনের মতোই সাধারণ মানুষ। কোনো নতুনত্ব নেই। বয়স হয়েছে এখন। বয়সের প্রজ্ঞা মানুষকে একটা পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড় করিয়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু সেখান থেকে সব কিছু একরকম দেখায়। প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে, দেশে দেশে, মানুষে মানুষে অনন্ত ভেদচিহ্নগুলোর দূরত্ব স্মৃতি ঘষে ঘষে মুছে দেয়। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলি সাহিত্য পড়া যে ছেলেটা গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছে। বাকশক্তিহীন প্রকৃতিকে বুঝতে পারা তার জীবনের প্রথম পাঠ। পুরোনো, পরিত্যক্ত মন্দিরের গা বেয়ে উঠেছে যে বটগাছ, সে জায়গাটা তার খুব প্রিয়। পুকুরের পাড়ে বিশ্রাম নিতে নিতে সে স্বপ্ন দেখে।

এক জ্যোতিষী বলেছিল এ স্বপ্নের মানে আমি গুপ্তধন পাব। এর পরে এক অদ্ভুত বৃদ্ধের

সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে নাকি কোনো এক দেশের রাজা। তার চাদরের আড়ালে মণি-মাণিক্যখচিত নিরেট সোনার বর্ম ঝিলিক দেয়। সে ওই স্বপ্নের সব কথা জানতে পারে। প্রচুর সোনার বিনিময়ে সে আমাকে ওই গুপ্তধনের হদিস দিতে রাজি হয়।

—সোনা! প্রচুর সোনা কোথায় পাব আমি!

—গুপ্তধনের মধ্যেই তো থাকবে কত সোনা!

—গুপ্তধন পেলে তো।

—গুপ্তধন তো পাবিই।

পাই, তারপর দেখা যাবে। দামিন্যা থেকে সেই দেশ আর কতখানি পথ হবে?

ঝোড়ো দক্ষিণ বাতাস বয়ে আনে হাসনুহানার সুগন্ধ। রাজা আমাকে একটা কালো পাথর দেয়। বলে তাতেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। তার উপদেশ, গুপ্তধনের সন্ধানে যেতে হলে দৃষ্টি খোলা রাখতে হবে। পৃথিবীর যত আশ্চর্য, যত চমৎকার, যত সুন্দর সবকিছু প্রাণভরে দেখতে হবে, কিন্তু মন সাবধানে বহন করবে মূল উদ্দেশ্যটিকে। চলতে হবে নিজের বোধের নির্দেশে। তাছাড়াও পথে পথে নানান নিশানি ছড়ানো থাকবে, সেগুলো চিনে এগোতে হবে। সংশয় হলেই পাথরের সাহায্য নিতে পারো।

প্রতিদিন চলছি আর দেখছি মানুষের জীবনযাপনের সংকট, আছে পশুদের অবস্থানের সংকট মানুষ নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে। সংকট সর্বগ্রাসী। এক এক জায়গায় এক এক রকমের অভিজ্ঞতা। এক অভিজ্ঞতা অন্য অভিজ্ঞতার দ্বারা পুষ্ট হয়, প্রভাবিত হয়। শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পটভূমি বদলে যায়। তেমনি বদলে যায় মূল্যবোধ, অগ্রাধিকার, নৈতিকতার সংজ্ঞা, বেঁচে থাকার শর্ত। ঠকে সর্বস্বান্ত হয়েছি। বিদেশ-বিভুঁইয়ে কপর্দকহীন হয়ে এক কামারের কাছে হাপর টানার কাজ নিই। মন-প্রাণ-বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে দোকানটার শ্রীবৃদ্ধি করি। কিছু অর্থ জমিয়ে আবার যাত্রা করি। একদিন দেখি পর পর অনেক মানুষ চলেছে। অনেকের মধ্যে যাচ্ছে এক বণিক, সে দূর কোনো দেশে কোনো তান্ত্রিকের সন্ধানে যাচ্ছে।

তার সঙ্গে কথা বলে জীবন সম্পর্কে অনেক সত্য বুঝতে পারি। বুঝতে পারি সেও গুপ্তধনের খোঁজে চলেছে। আমিও চলেছি। আমার আর বণিকের খোঁজ মিলে যায়। আমি তার সঙ্গী হই। দুজনেই ঠকতে ঠকতে শিখতে শিখতে প্রকৃতিতে ছড়ানো চিহ্নগুলো বুঝতে বুঝতে নিজেদের ভবিতব্যের দিকে চলতে থাকি। অবশেষে একদিন আবার এক তান্ত্রিকের সন্ধান পাই দুজনে। দুজনে সেই তান্ত্রিকের কাছে প্রকৃত শিক্ষানবিশ হয়ে উঠি।

তান্ত্রিক বলে, স্বপ্নের কথা হল হৃদয়ের নির্দেশ পালন করা। চরম পর্যায়ের কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে আবিষ্কৃত হবে খানিকটা জলীয় অংশ—যাকে বলে মৃতসঞ্জীবনী সুধা বা কেউ বলে অমৃত। আর সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে খানিকটা কঠিন অংশ—যাকে বলা হয় পরশমণি। পুরো পদ্ধতিটাই লেখা আছে একটি প্রস্তর—ফলকে গুহার ভিতরে। কিন্তু তাকে বুঝতে গেলে পড়তে হবে প্রচুর পুথি। আর সেটা করতে পারলে জগতের নিজস্ব প্রাণের ভাষা বুঝতে পারা যাবে।

এইভাবে নানান ভয়াল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অবশেষে পৌঁছোই একটা গুহার কাছে।

সেখানে আমরা দুজনে ডাকাতের হাতে পড়ি। যেটুকু সোনা তখনও ছিল, সেটুকুও কেড়ে নেয় ডাকাতরা। ডাকাতরা আমাদের প্রচণ্ড মারধর করে। বলে, মাটি খুঁড়ছিস কেনে? নিশ্চয়ই সোনা লুকিয়ে রেখেছিস।

আমি বললাম, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি এই গুহার কাছে ঠিক এই জায়গায় মাটির তলায় গুপ্তধন আছে।

তখন যে দলের সরদার, হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, ওহ, স্বপ্নে বিশ্বাস করে এসেছিস আহাম্মক? আরে আমিও তো স্বপ্ন দেখেছিলাম এক পোড়ো মন্দিরের। তার গায়ে থাকবে এক বিশাল বটগাছ, আর তার তলাতেই পাওয়া যাবে গুপ্তধন। বিশ্বাস করলেই হয়েছিল আর কি!

তখন বুঝতে পারলাম, ছি ছি কী ভুল করেছি। ওই বিশাল বটগাছ, পোড়ো মন্দির সে তো আমাদের গ্রামেই রয়েছে। এত দেশ-বিদেশ নদীনালা ঘুরেছি যার জন্য সেই গুপ্তধন লুকোনো রয়েছে আমার নিজের দেশে নিজেরই পরিচিত জায়গায়। ভিনদেশি এই ডাকাতের মুখে এই সংকেত শোনবার জন্যই তাহলে আমার এত পরিশ্রম? সব পণ্ডশ্রম? আবার ফিরে চলি। কিন্তু বণিক পিছু ছাড়ে না।

কেবলই প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। তার সঙ্গে আমার দেখা হল কেন?

চণ্ডী তেমনি আমাকে কেন দেখা দিলেন? চাষ করছে যে চাষা, মাছ ধরে যে জেলে, তাঁকে কেন চণ্ডী দেখা দিলেন না?

না ওরা অশিক্ষিত। ওরা তো লিখতে পারবে না। আমি যে লেখালেখি করি। আমি ভালো লিখতে পারব। তাছাড়া আমি যে রাজ আশ্রিত, সুতরাং মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেও পারব। রাজ দরবারে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারিত হলে, চারদিকে মানুষ চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় মেতে উঠবে। চণ্ডীর কথা মান্য হবে, প্রচারিত হবে বেশি।

রাজা বাঁকুড়া রায়ের অনুরোধ এসে উপস্থিত হল।

আড়ড়া নগরে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মনে হয় এ আমন্ত্রণ যেন ঘরে ফেরার আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে। বাঁকুড়া রায়ের আমন্ত্রণে নয় নিজের তাগিদে ফিরে এলাম শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে। পরিবার নিয়ে আড়ড়া নগরে প্রত্যাবর্তন করলাম।

স্মরণে এল স্বপ্নাদেশের কথা।

স্বপ্নাদেশকে স্মরণ করে শুরু করলাম লেখা।

'অভয়ামঙ্গল কাব্য' এবার শেষ করব।

অভয়া অনিষ্টকারী দেবী নয়। বিপন্ন জীবকুলের আশ্রয়দাত্রী। স্বাভাবিক অর্থে চণ্ডী ভয়ংকরী, কিন্তু তিনি মঙ্গলের অর্থেই ভয়ংকরী হন।

ইতিহাস ঘেঁটেছি অনেক। এবার লিখতে শুরু করি।

রাঢ়ভূমিতে উপাদান ছড়িয়ে আছে প্রচুর। ইতিহাসের পটভূমিতে দেব-দেবীর কৌলীন্য নিয়ে কোনো কাহিনির সূত্রপাত ঘটাতে গেলেও জাতপাতের লড়াইয়ের মধ্যে উঠে আসে মানুষের কথা। অধ্যাত্মশক্তি ও আত্মশক্তি মিলনের মধ্যে দিয়ে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি রচনা করেছেন আমার অগ্রজ কবি মানিক দত্ত।

মানিক দত্ত লিখেছেন—

অন্য দেবতার পূজা মাসে ছয় মাসে।
হেন ব্রত কর পূজা দিবসে দিবসে ।।

মানিক দত্ত রচিত কাহিনি আমাকে আকৃষ্ট করল সবচেয়ে বেশি।

চিয়াও মানিক দত্ত শুন দুর্গার ব্রত
মুঞি দেবী জগতের মাতা।
রঘু রাঘব তোখে দুই পুত্র দিব
বেক্ত করহ ব্রতকথা ।।

মানিক দত্ত তিনশত যাটটি পদে ব্রতকথা বর্ণিত করেছেন। তিনি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনিতে চারদিনের ব্রতকথার উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট চারদিন ধনপতি-খুল্লনার কাহিনিতে লিখেছেন—

দেবী বোলে শুন নাবদ তপোধন।
চারিদিনের ব্রতকথা হইল কেমন ।।
মুনি বোলে দেবী তুমি বুদ্ধি কেনে হর।
আমার বচনে তুমি মোহিনী বেশ ধর ।।
ধনকুবিবের পুত্র নামে কর্ণমুনি।
তাহাকে ছলিআ গিআ ব্রত কর তুমি ।।

বারবার অধ্যয়ন করলাম কাব্যটি। যত পড়ি তত মনে হয় এই কাহিনি সূত্রের পথই আদর্শ পথ। এই পথ ধরে আমাকেও অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু কোথায় নতুন কাহিনি যা নির্ভর করে আমি অগ্রসর হব?

কাহিনি চাই কাহিনি। কাহিনির সন্ধানে উন্মাদ হয়ে উঠলাম। ভালো করে ঘুমোতে পারি না। ভালো করে খেতে পারি না। সব কিছু ভুলে যাই। পুত্র শিবরাম লক্ষ্য করে সব। কিন্তু, সেও কিছু বলতে পারে না। শিষ্য দামাল লক্ষ্য রাখে সব সময়। মনে মনে ভীষণ বিচলিত বোধ করে। কিন্তু বুঝতে পারে না কি সেই কারণ যার জন্য আমি দিন কে দিন এরকম হয়ে পড়ছি।

মমতা নীরবে চোখের জল ফেলে। পুত্রহারা জননী, আর একপুত্রের কাছে জানতে চায় কোন্ পাপে তার এই শাস্তি।

পুত্র শিবরাম তাঁকে সান্ত্বনা দেয়।

পঞ্চানন মারা যাবার পর মমতা আর আমাকে প্রশ্ন করে না।

আকুল আর্তি নিয়ে সে দেবী চণ্ডীর কাছেই প্রার্থনা করে।

—কেন কেন এই শাস্তি পেতে হচ্ছে? তুমি দেবী? না পাষাণী? তুমি আসলে কী চাও?

যশোদাও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে, আর মায়ের ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

রাতে মা-র কাছে বসে থাকে শিবরাম।

দিনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে মানুষের বিচাব শক্তি ও জ্ঞানের পরিধি। ক্রমে তা বৃহত্তর আকার ধারণ করে। মানুষ তখন পুরাতনকে মুছে ফেলে না। মানুষ তখন পুরোনো ধ্যান ধারণাকে ঐতিহ্য করে সংস্কৃতি হিসাবে বাঁচিয়ে রাখে। পুরাতন অনেক কিছুই চলে যায় মাটির তলায়। আবার পুরোনো অনেক কিছুই উঠে আসে পুথিব পাতায়। অনেক কিছুই যা আছে আমাদের রক্তে, মজ্জায়, কর্মে, চিন্তায়। উঠে আসে, উঠে আসে ছড়ায় অলংকারে শোভিত হয়ে পুথির পাতায় পাতায়।

লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ   না জানি সঙ্গীত পন্থ
কৃপা করি দিলে গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তালমানে   কেমনে বুঝাব আনে
দোষগুণ সকলি তোমার ॥
যে বোল বলাও তুমি   সেই বোল বলি আমি
তুমি কর মোরে উপদেশ।
প্রচার যেমন কাব্য   নহে গো যেমন ভাব্য
কবি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ ॥

শিব দেবতা হিসাবে অনার্য-সমাজ হতে ভদ্র-সমাজে রাজ আশ্রয়ে পূজিত হচ্ছেন। চণ্ডী, মনসা আদি দেবী লৌকিক দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মেল-বন্ধনে অনার্য-সমাজ হতে দেবদেবীরা আর্য সমাজে প্রবেশ করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সংমিশ্রণ নির্বিবাদে ঘটেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লড়াই সংঘটিত হয়েছে। কালকেতু ব্যাধের সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ তেমনই একটি ঘটনা।

প্রচলিত এই কাহিনি ধর্মীয় গন্ডি অতিক্রম করে একটি শক্তিশালী সমাজব্যবস্থা গড়ার বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইঙ্গিত বলে আমার মনে হল। সেভাবেই লেখার চেষ্টা করলাম।

দিনের পর দিন আসে, বছরের পর আসে আবার নতুন একটি বছর। এইভাবে কাল অতিক্রম করে কালকে। এই ভাবে মানুষ পার হয়ে আসে সমাজ-সভ্যতা। পুরাতন থেকে আবির্ভূত হয় নতুন, সেই নতুনও একদিন পুরাতন হয়ে যায়। আসে নবীনতর কেউ। কিন্তু তাই বলে যে দিন চলে যায়, সে দিন কি সত্যিই চলে যায়? পুরাতন চলে গেলেও তাকে কি ভুলে যাওয়া যায়?

—না যায় না।

প্রথমে বন্দনা তারপর সতী পার্বতীর উপাখ্যান। তারপর কালকেতু ফুল্লরার কাহিনি। শেষে ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান এই ভাবে সাজাই। যে কোনো অনুষ্ঠানেই দেবতা বন্দনা প্রথমে হয়ে থাকে। সৃষ্টির বর্ণনা করে দেব খণ্ডের সূচনা করি। পুরাণ রচনাকাল থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। আমি সেই নিয়ম ভাঙতে চাই না।

নয়ে নবগ্রহ

অভয়া কলিকালে মর্ত্যালোকে নিজের পূজার প্রচার চাইছেন। তিনি চান তাঁর মহিমা মর্ত্যালোকে প্রচারিত হোক। তাতে তিনি ছলনারও আশ্রয় নিতে পিছপা নন। হয় কৌতুকে সন্তুষ্ট করে, নয় যুক্তিতে, তাতেও না হলে মানুষকে কষ্টে ফেলে তিনি চান তাঁর মহিমা মর্ত্যালোকে প্রচারিত হোক।

প্রথমে গণেশ বন্দনা, তারপর সরস্বতী বন্দনা, সখীবন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, শ্রীরাম বন্দনা, চণ্ডী বন্দনা শেষ করলাম।

এরপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ লিখেছি।

তারপর রচনা শুরু করেছি মঙ্গলগান। প্রার্থনা শেষ করে আদিদেব, মহামায়ার জন্ম, সৃষ্টি প্রকরণের-বরাহরূপ ধারণ, মনুর প্রজাসৃষ্টির বর্ণনা দিয়েছি। একে একে যুক্ত করেছি ভৃগুযজ্ঞে দক্ষের আগমন। দক্ষের শিবনিন্দা, দক্ষের প্রতি নন্দীর অভিশাপ, শিবস্থানে সতীর প্রার্থনা, সতীর যজ্ঞালয়ে গমন, যজ্ঞস্থানে সতীর প্রবেশ ও সতীর সঙ্গে দক্ষের কথোপকথন। দক্ষের শিব নিন্দা, শিব নিন্দা শুনে সতীর প্রাণত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে শিব দূতের আগমন, দক্ষযজ্ঞ পণ্ড, বীরভদ্রের ঠেলায় গমন দিয়ে শিবের প্রতি ব্রহ্মার স্তব শুরু করেছি। মহাদেবকে অর্চনা করার পর ইন্দ্রসভায় নারদ এলেন, দেবরাজ নারদকে সম্ভাষণ করলেন। নারদের কথাবার্তার পর, ইন্দ্র শিব পূজার আয়োজন করলেন। নীলাম্বর পুষ্পচয়নে গমন করল। ইন্দ্রের শিব পূজার পর ভগবতীর মৃগরূপ ধারণ, নীলাম্বরের খেদ, পিপীলিকা রূপে ভগবতীর পুষ্প-মধ্যে প্রবেশ। পর্বের পর পর্ব সাজিয়ে ফুলের পর ফুল দিয়ে যে ভাবে মালা গাঁথা হয় সেভাবেই নতুন একটা সাহিত্যের মালা গাঁথলাম।

শিবের প্রতি নীলাম্বরের স্তব, শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব, নীলাম্বরের মরণে ছায়ার সহমরণ, নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ দান, নিদয়ার মনের কথা, নিদয়ার সাধভক্ষণ, কালকেতুর জন্ম, এরপর পর্যায়ক্রমে আরও ৭১টি পর্ব যুক্ত করেছি। উল্লেখ করেছি গোধিকা পর্ব। সব শেষে নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ ঘটিয়েছি।

দক্ষ জীবন পেলেন, হল গৌরীর জন্ম। গৌরীর রূপ বর্ণনা করলাম।

হিমালয়ের চিন্তা, হিমালয়ের প্রতি নারদের উপদেশ দিয়ে কামদেব ভস্ম, রতির খেদ, রতির প্রতি দেবদাসী, গৌরীর তপস্যা, গৌরীকে শিবের ছলনা, হরগৌরীর কথোপকথন, হরগৌরীর বিবাহ, নাগরীগণের বরদর্শনে গমন, মেনকার খেদ বর্ণনা করেছি।

শিবের মদনমোহন রূপ ধারণ, নারীগণের পতিনিন্দা, গৌরীর মাল্যদান, গণেশের জন্ম, কার্তিকের জন্ম, গৌরীর পাশাখেলা, মেনকার তিরস্কার, হরপার্বতীর কৈলাস গমন, হরপার্বতীর বন্দনা, শিবের সংসার বিরক্তি, গৌরীর খেদ, গৌরীর প্রতি পদ্মার হিতোপদেশ কিছুই বাদ দিইনি।

সৃষ্টির আদিতে ছিলেন একমাত্র নারায়ণ। তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে বিধাতা পুরুষ ত্রিভুবন নির্মাণ

করেছেন। বিধাতার পুত্র হলেন দক্ষ। দক্ষের কন্যা হয়ে চণ্ডী সতী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ত্রিভুবন ও দেবাসুর নর সৃষ্টির পর দক্ষের কন্যার সঙ্গে শিবের বিবাহ হল। উমার বিয়ে হবে। বর সাজে শিব আসছে। পাড়ার মেয়েরা বর দেখতে ছুটে এল। তাড়াহুড়ায় কেউ সাজগোজ করল না! এমনকি বক্ষ আবরণী ঠিকমতো পরতে পারল না। চুল বাঁধলো না। ছেলেকে দুধ দিতে ভুলে গেল। কেউ কোলে বা কাঁখে পুত্র-কন্যাকে নিয়ে ছুটে গেল। বরকে দেখতে হুড়োহুড়ি, সবাই ঠেলে সামনে যেতে চায়। এই বিবাহের পর শ্বশুর-জামাতার বিবাদ শুরু হল। বিনা নেমন্তন্নে দক্ষের যজ্ঞোৎসবে সতী উপস্থিত হলেন। দক্ষ তাঁর পতিনিন্দা শুরু করলেন।

আসলে জামাতা শিবের দারিদ্র্যকে বাঙালি পিতারা চিরদিন নিজের কন্যার দুর্ভাগ্যের বিভীষিকা হিসাবে কল্পনা করেছে। মনসামঙ্গলে বিধবা পুত্রবধূ বেষ্টিত শোকাতুরা মা সনকার হাহাকার, অকাল বৈধব্য পীড়িত এই সমাজেরই নিত্যকালের ধ্বনি।

আমিও তাই অনুসরণ করলাম।

পতি নিন্দায় অপমানিত সতী দেহত্যাগ করলেন। ফলে শিব-অনুচরদের হাতে দক্ষের নিগ্রহ হল। তপস্যা করতে সতীহারা শিব চলে গেলেন হিমালয়ে। এখানে আমি কালিদাসের কুমারসম্ভবকে অনুসরণ করলাম।

দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে সতী আবার গিরিরাজ মহিষী মেনকার কন্যা হয়ে জন্ম নিলেন। নাম হল পার্বতী, গৌরী। আদরের কন্যা তাই অনেক নাম। শিবের তপস্যা ভঙ্গ হল। শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ হল। শিব হিমালয়ের ঘরজামাই হিসাবে শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে লাগলেন। প্রথমে গণেশ পরে কার্তিকের জন্ম হল।

অভাব অনটনের সংসার, দু-দুটো ছেলে। তার উপর গণেশ আবার খেতে ভালোবাসে। সংসার চালাতে পার্বতীর খুব কষ্ট হয় তবু মুখ ফুটে স্বামীকে কিছু বলতে পারেন না। মা দুর্গার সংসারে এখানে লক্ষ্মী সরস্বতী নেই। আছে কার্তিক, আছে গণেশ, আছেন শিবঠাকুর। আছে জয়া-বিজয়া, ইঁদুর-ময়ূর, সর্পকুল। বাপের বাড়িতে বেশ থাকছিলেন দুর্গা।

মা মেনকার সঙ্গে পার্বতীর মনান্তর হয়।

মেনকা একদিন মেয়েকে বললেন, দেখ কার্তিক গণেশ সকালে উঠেই খাবার বায়না ধরে। তোর ঘরে দানাপানি বলতে তো কিছুই থাকে না। ধন-সম্পদ বলতে তো তোর কেবল একটা বুড়ো ষণ্ড আর হাড়ের কতগুলো মালা। শিব চাষবাস করবে কি, কিছুই তো জানে না দেখছি। নিষ্কর্মা, গাঁজা খেয়ে শ্মশানে মশানে ঘুড়ে বেড়ায়। ও নয় বাঘছাল পরে, তোর তো বস্ত্র প্রয়োজন! তোদের অন্ন-বস্ত্র বারোমাস কত জোগাব বলতো? তুই-ও তো দেখি ওর সাথে সারাদিন পাশা নিয়ে মত্ত থাকিস। বুড়ি হয়েছি আমি। রাঁধাবাড়া করে তোর ঘরগুষ্টিকে আর কতদিন খাওয়াব?

রাঁধিবাড়ি আমার কাঁকালে হৈল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া যোগাবো কত ভাত ৷৷
দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেউ পানি।
পাশা খেলাইয়া গোঁয়াও দিবস রজনী ৷৷

যেই না বলা, অমনি গৌরীর রাগ হল। সেও হিমালয়ের মেয়ে। চুপ করে থাকবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে কষে উত্তর দিয়ে দিল।

—বাবা তাঁর জামাইকে কত জমি দিয়েছে। তাতে হয় মসুর, মাষকলাই, কাপাস, ধান। সেই খোরাকির ফসলই তো খাই আমরা। রেঁধে বেড়ে দিচ্ছ বলে এত কথা শোনাচ্ছ। সে এটা বলতেও ছাড়ল না যে—

অন্য জামাতারে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব পরে ভালো নহে তোমার বেভার ॥

বেশ তোমাদের কাছে থাকব না। এই আমি চললাম। কইরে গণশা, কেতো—।

রাঁধিবাড়ি দেউ বলে কত দাও খোঁটা।
আজি হইতে তোমার দুয়ারে দিনু কাঁটা ॥

সপরিবারে শিব চলে গেলেন কৈলাসে। অভিমানিনী গৌরী বাপের বাড়ি ছাড়লেন। কিন্তু সেখানে তো কোনো সম্বল নেই। শিবকে ভিক্ষা করতে বেরোতে হয়। ভাতের জোগাড়ে মোষের পিঠে চেপে শিবঠাকুর বের হলেন ভিক্ষায়। শিব ভিক্ষা করে আনে। তারপর ভাত চাপায় পার্বতী। দিন যায় এই ভাবে। ভিক্ষালব্ধ ধন কী? না, চাল-ডাল-তেল-লবণ। আছে মোয়া মিঠাই। আছে পান-সুপারি-ভাং-ও। কিন্তু একদিনের ভিক্ষার শ্রমেই শিব কাতর। পরদিন তাঁর বিশ্রাম চাই।

ভিক্ষেয় যেতে শিবের মন নেই। অথচ বউকে ভালোমন্দ রাঁধতে বলে। তার চাই পঞ্চব্যঞ্জনে সাজানো ভাত!

গৌরীও উত্তর দেয়—

রন্ধন করিতে ভালো বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যা দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই ॥

কারণ, গতকালের ভিক্ষালব্ধ ধনে তিনি "উধার শুধেছেন"। বাকি যেটুকু ছিল তা গত দিনের আহারেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বিশেষ কিছু পড়ে নেই। কিন্তু পরিশ্রমে শিবের অবস্থা কাহিল। অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর বিশ্রাম চাই-ই।

কিন্তু বিশ্রামের সময় পেট তো চুপ করে বসে থাকে না। তাঁর খিদে পায়। তার উপর আছে ছেলেরা। বসে বসে শিব পার্বতীকে রান্না চাপাতে বলে। তাঁর খেয়ালই নেই যে ঘরে এক মুষ্ঠি তণ্ডুলও নেই। গৌরী বলেন, আজ শিবঠাকুর যদি তাঁর ত্রিশূলটি বন্ধক রাখেন, তার বিনিময়ে কিছু তণ্ডুল ধার করে এনে তিনি রন্ধন করতে পারেন। যেটুকু হাঁড়িতে পড়েছিল—

গণেশের মুষা তাহা কৈল জলপান।
পার্বতীর কথায় পশুপতি রেগে যান।

শিব তো রেগে আগুন। বলেন, কি বললে? নিত্য এত ভিক্ষা আনি তবু নাই নাই। হুঁ। এক বেটার ইঁদুর, আর এক বেটার ময়ূর আর বউ যেন নিজেই সিংহ। ভয়ে বেচারা বলদ দুটো আমার জলপান পর্যন্ত করতে সাহস পায় না। শুকিয়ে গেল। আর না খেয়ে খেয়ে

আমার শরীরটার কি হাল হয়েছে সেদিকে কারো খেয়াল আছে? এমন লক্ষ্মীছাড়া গৃহে আমি থাকতে চাই না। তোমায় ত্যাগ করব।

আমি ছাড়ি ঘর যাব দেশান্তর
কি মোর ঘর-করনে।

পার্বতীও শুধু মুখে শোনার পাত্রী নয়, সে হিমালয়ের মেয়ে। বলে, অন্ন-কষ্ট-কাতর ব্যক্তির ভোগ লালসার একটা সীমা থাকা উচিত। শিব রেগেমেগে প্রস্থান করে। পার্বতী মনের দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তপস্যা করে পেয়েছে এমন স্বামী, যে শ্মশান-ভস্ম গায়ে মেখে থাকে সব সময়। সংসারে কোনো দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। পার্বতী একবার ভাবে বাপের বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু স্বামীর কথা ভেবে আর পারে না। শিবঠাকুর নিষ্কর্মা। সখীদের কাছে সে ভেঙে পড়ে। বলে—

এক আইয় বলে স্বামী বর্জিত দশন
শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।
জে দিবস আমি দ্রড় ব্যঞ্জন রাঁধি
মারএ পিড়ার বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।

জয়, বিজয়া, পদ্ম তাঁর তিন সখী এই অবস্থায় মর্ত্যলোকে পূজা পাবার জন্য পার্বতীকে উপদেশ দেয়। পদ্ম তাঁকে বোঝায়। মর্ত্যে পূজা প্রচার পেলে, তাঁর ভাত কাপড়ের অভাব ঘুচবে।

স্ত্রী লোকের পূজা নিতে দৈবী কৈলা মতি।
পদ্মাবতীর সঙ্গে যুক্তি করেন পার্বতী।।
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরমা সুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্তকী।।

অবশেষে পার্বতী শিবকে নিয়ে যুক্তি করতে বসে। পদ্মাবতীর পরামর্শের কথা বলে। শিব রাজি হয়ে যায়।

প্রথম উপাখ্যান শেষ করলাম এইভাবে।

দেবী জয়তি ব্রাহ্মণী ভিক্ষার আশায় একদিন ধর্মকেতুর বাসায় এলেন। দেবীকে দেখে নিদয়ার কী মনে হল, দেবীকে পিঁড়েয় বসতে দিলেন। জল খেতে দিলেন। জল খেয়ে দেবীর যেন ধড়ে প্রাণ এল।

—পুত্রবতী হও। বলে তিনি আশীর্বাদ করলেন।

নিদয়া তা শুনে খুশি হয়ে বললেন, তাই যদি হয় মা ঠাকরুন তোমার দাস করে দেব তাকে।

—তাই হবে গো তাই হবে। এসব ওষুধ আমি জানি। তোমার সোহাগ একটুও কমবে না। পুত্রের জননী হবে গো তুমি। এক কাজ করো, যাও স্নান করে এস। তোমার জন্য ওষুধ খুঁজে আনি। ভালো ছেলে হবে তোমার। বলে দেবী বাড়ির বাইরে গেলেন।

নিদয়া তো ভারি খুশি। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এলেন।

দেবী তাকে ঊর্ধ্বমুখ করে বসালেন। তারপর ওষুধ সেবন করালেন।

চাল ডাল বড়ি দিয়ে সিধা দিল নিদয়া। তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করল দেবীকে।

ধর্মকেতুও ঘরে ফিরে সব শুনে খুব খুশি হল। নিদয়াকে সেদিন রাত্রে খুব আদর করল। আদর খেতে খেতে নিদয়ার কেবলই মনে হচ্ছিল দেবীর কথাগুলো সব সত্যি।

দেবী বলেছেন, তাঁর কথা মিথ্যা হবার নয়। সেদিন সত্যিই তাঁর গর্ভের সঞ্চার ঘটল।

প্রথম মাসে কিছু বুঝতে পারল না। দ্বিতীয় মাসে মনে হল, পেটের মধ্যে কিছু যেন নড়াচড়া করছে। তৃতীয় মাসে শরীরটা ভারী ভারী মনে হতে শুরু করল নিদয়ার। সব সময় মনে হয় মাটিতে শুয়ে থাকে সর্বক্ষণ। উনানের মাটি খেতে ইচ্ছে করে। কাউকে কিছু বলতেও লজ্জা করে। একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে দেখল উনানের মাটি। ভালো লাগল তার এমন অবস্থা হল শেষে উনানটাই না ভেঙে ফেলে। পাঁচ মাসের মাথায় তাঁর মুখে ভীষণ অরুচি দেখা দিল। ছয় মাসের মাথায় তাঁর খেতে ইচ্ছা করে কুল, করঞ্জা এই সব। সাত মাসের মাথায় তাঁকে নতুন কাপড় এনে দিলেন ধর্মকেতু।

জ্ঞাতি বন্ধু সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। নিদয়ার সাধ ভক্ষণের অনুষ্ঠান হল। আট মাস পড়তেই নিদয়ার পেট বিশাল আকার ধারণ করল। চলতে ফিরতে তাঁর তখন খুবই অসুবিধা হয়। হেঁট হয়ে চাইতেই পারেন না। নয় মাসে আবার নিদয়ার সাধ দিলেন ধর্মকেতু।

নিদয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার শরীর কেমন করছে গো। বলতে বড়ো লাজ লাগে। খেতে ভালো লাগে না। পানও মুখে বাসি লাগে। আবার কখনো মনে হয় তেলে ভেজে বেতো ˙াক খাই। কখনো মনে হয়, না লাউ শাক খাই। নয়তো ছোলার শাক খাই। আবার মনে হয় বড়ি কুমড়ো দিয়ে মাছের চচ্চড়ি অথবা কুচো চিংড়ি ভাজা পেলে মন্দ হয় না। মনে হয় যদি মোষের দুধের দই পেতাম তবে চিনি খই মিশিয়ে খেতাম। পাকা চাঁপা কলা এনে দিয়োতে, খেতে বড়ো সাধ হয়েছে। সোনার থালায় দুধ, পাকা পাকা করমচা ইচ্ছে করে না ছুঁতে। চাকা চাকা মুলো, বেগুন, আমড়া, পাকা চালতা, আমসি, কাসুন্দি, কুল, করঞ্জা দ্যাখো সব পড়ে আছে। থোড় দিয়ে ইলিশ মাছ রেঁধে খেলে যেন মনে হয় মুখের অরুচি ঘোচে। আবার এই মনে হচ্ছে ক্ষীর, নারকেল অথবা ভাজা পিঠে মিষ্টি খাই। আবার মনে হচ্ছে তিল গুড় দিয়ে দুধ অথবা খুদ ভাজা মাখিয়ে খাই। নয়তো চাঁপা কলার সাথে দুধের সর।

কিন্তু উঠতে বসতে মাথা ঘুরছে। পা বাড়ালেই দেহ এলিয়ে যায়। ঘন ঘন হাই ওঠে, ঘুম পায়।

ক্ষতবিক্ষত হৃদয়, ক্ষুধায় কাতর অথচ মুখে কিছু রোচে না।

নিজের পেটের অবস্থা দেখে নিজেরই ডর লাগে নিদয়ার। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যাচ্ছে দিন দিন। স্বামীকে বলে, যদি তুমি মত দাও তাহলে কয়েক গ্রাস ভাত খাই লেবুর রস দিয়ে। মিঠে ঘোলের শরবত অথবা কাঁচা চালতার ঝোল হলে ভালো হয়। হেলেঞ্চা কলমি গিমে শাক এখন কোথায় পাই? পলতা দিয়ে বোয়াল মাছের ঝোল? পুঁইয়ের ডগার সাথে ছোটো ছোটো কচু কুচিয়ে বড়ি আর লংকার ঝাল দিয়ে পাঁকাল মাছ কেউ যদি রেঁধে দেয় তবে

খুব ভালো হয়। নকুল অথবা গোসাপের মাংস খেতে বড়ো ইচ্ছে হয়। হাঁসের ডিমের বড়া কিংবা চিংড়ি অথবা রাই খয়রা ভেজে কেউ যদি দেয় মনে হয় মনের সুখে খাই।

খালি পেটে কেবলই ঢেঁকুর ওঠে, শরীরে বল নেই। মুখে শুধু জল ওঠে।

—এক কাজ করো, মূলো বেগুন শিম দিয়ে একটু না হয় নিম পাতাই ভেজে দাও। কি আর করব, আমার এমনই কপাল। তাই খাই।

গর্ভবতী নারী কত ব্যঞ্জনের সাধ করে। নির্দেশ দেয় কোন্ দ্রব্য সংযোগে কোন্ দ্রব্য রাঁধতে হয়। নিদয়ার জন্য কত কিছু ঘরে ঘরে চেয়ে নিয়ে এল ধর্মকেতু। খড়কাঠি জ্বেলে নিজেই রান্নার আয়োজন করে। বাড়িতে বয়স্কা কোনো মহিলা নেই। কাকে কীইবা বলবে। মাসি পিসি বোন বলতে তাঁর কেউ নেই। জ্ঞাতি বন্ধু কেউ নেই এমন যে সংসারের হাল ধরবে। এমনি করে দশ মাস পূর্ণ হল। নিদয়া ধুলোতে লুটাতে লাগলেন।

সখীরা তখন আসে।

তারা নিদয়াকে সান্ত্বনা দেয়। কেউ তেল মাখিয়ে দেয়, কেউ মুখে তুলে দেয় দই।

নিদয়ার উদর এত ভারী হয়েছে যে উঠতে বসতে পারেন না নিজে নিজে। পেটের মধ্যে সব সময় ছুঁচ বিঁধোয়। এমন ব্যথা, যে মনে হয় তিনি আর বাঁচবেন না। বুকে পিঠে ভীষণ ব্যথা। প্রাণ যেন বেরিয়ে আসতে চায়।

নিদয়া পড়শিদের ডাকতে বলেন। বলেন, এবার দাই বদ্যিকে খবর দাও। নইলে আমি বাঁচব না।

নিদয়ার কথা শুনে ধর্মকেতু প্রমাদ গোনেন। বুঝতে পারেন সময় উপস্থিত হয়েছে।

তিনি এখন কি করবেন? কলিঙ্গ নগরে কাকেই বা ডাকবেন?

গর্ভিনী নারীর সন্তান প্রসবে বিলম্ব হলে তাঁকে মন্ত্রপূত জলপড়া খাওয়ানো হয়। কেউ কেউ সেই ধরনের সুপারিশ করে।

এক ব্রাহ্মণীর দেখা পেলেন হঠাৎ।

কৃপা করো ঠাকুরানি বলে তাঁর চরণে পড়লেন ধর্মকেতু।

সব কথা শুনে ব্রাহ্মণী নিদয়ার প্রসবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় নাড়ি কাটতে হয়। নাড়ি কাটার সময় উপস্থিত মহিলারা সকলে হুলুধ্বনি দেয়। ভূমিষ্ঠ শিশুর যাতে নজর না লাগে তার জন্য ঘরের দরজায় জাল, বেত, জুতো ঝুলিয়ে রেখে দেয়। ষষ্ঠ দিনে ষষ্ঠী পূজা, সপ্তম দিনে সপ্তর্ষি পূজা করা হয়। ষষ্ঠী পূজাতে আবার বলির প্রচলনও আছে। গণক ঠাকুররা এসে শিশুর নামকরণ করে। তাঁদের ভালো-মন্দ খাওযাতে হয়।

ডাল কাটি জ্বালে অগ্নি সূতিকাভবনে।
সঘনে হুলুই পাড়ে নাড়িকা ছেদনে।।
গোমুণ্ডে পাতিল ষষ্ঠী দ্বারে ডানি ভাগে।
পূজা করি ধর্মকেতু আগে বর মাগে।।

যথাকেলে নিদয়ার প্রসব হল।

শিবভক্ত ইন্দ্রের পুত্র অরণ্যপ্রেমী শাপগ্রস্ত নীলাম্বর মনুষ্যজন্ম নিল নিদয়ার ক্রোড়ে। নিলাম্বরের প্রতি নির্দেশ, মর্ত্যে তুমি চণ্ডী মাহাত্ম্য প্রচারের হেতু হবে।

সন্তান প্রসবের পরও কত কী অনুষ্ঠান আছে।

ধর্মকেতু সে সব জানেনও না।

আঁতুড় ঘরের দ্বারে গোরুর মাথার ষষ্ঠী রাখা হল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে নাড়ি কাটবার সময় এয়োতিরা হুলুধ্বনি দিল। শিশুর যাতে নজর না লাগে তার জন্য আঁতুড় ঘরের দরজার সামনে রাখা হল জাল, বেত, জুতো। তিন দিনে একটা অনুষ্ঠান হল, তারপর আবার ছয় দিনে ষষ্ঠী, সপ্তম দিনে সপ্তর্ষি ভূজা, আট দিনে, নয় দিনে, দিনে দিনে অনুষ্ঠান তরপর সেই একত্রিশ দিনে অনুষ্ঠান করতে হল। ষষ্ঠী পূজায় বলিও চড়ানো হল।

পুত্রের মঙ্গল কামনায় ধর্মকেতু ব্রাহ্মণদের হরিণশিশু উপহার দিলেন।

মা ষষ্ঠীর পূজার পর নামকরণের অনুষ্ঠান হল। গণকেরা গণনা করে পুত্রের নামকরণ করলেন কালকেতু।

দিনে দিনে শিশু বড়ো হয়। কালকেতুর অন্নপ্রাশন হল। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পুত্র হলে ছয় মাসে কন্যাদের সাত মাসে অন্নপ্রাশন হয়। পাঁচ বছর বয়সে শিশুর কর্ণবেধ অনুষ্ঠান হল।

বন্য পরিবেশে কালকেতু বড়ো হতে থাকে। তার বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু।

নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।

ভালুক ও মৃগশিশু নিয়ে সে খেলা করে। কোনো ভয়ডর নেই তার। শিশুদের দলের সে নেতা। বনময় ছুটে বেড়ায়। গভীর জঙ্গলে গিয়ে সাথিদের নিয়ে খেলা করে। তেড়ে গিয়ে শজারু ধরে। বন্য জন্তুদের ধরে, নিয়ে হেলায় খেলা করে। তারা দূরে পালিয়ে গেলে নিজের পোষা কুকুর লেলিয়ে দেয়। গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করে। দাপিয়ে বেড়ায় জঙ্গলে।

কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মতি পাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক কুণ্ডল।

ফুলের কি নাম জানতে চায় কালকেতু। বৃক্ষদের সব নাম তাকে জানতে হবে। নতুন নতুন গাছ দেখে আর তার কী নাম জেনে নেয়। কোন্ গাছের গন্ধে সর্প পলায়ন করে এসবও সে জানতে চায়।

কিন্তু কে আর এত খোঁজ রাখে। সে কারোর পরোয়া করে না। নিজে নিজেই পরীক্ষা করে জেনে নেয়, সাথিদের নিয়ে।

ধর্মকেতু এবার ছেলেকে ধনুর্বিদ্যায় হাতে খড়ি দিলেন।

কালকেতু ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগল।

সে ধর্মকেতুর পিছু পিছু বনের পথ ধরে। চলে ধর্মকেতুর আগে আগে; যেন হাওয়ার বেগে তেড়ে গিয়ে হরিণ ধরে, ওর কাণ্ড দেখে ধর্মকেতুর ভয় লাগে। তাঁর মনে শঙ্কা উপস্থিত হয়।

এ ছেলের বেঘোরে না প্রাণ যায়। তাড়াতাড়ি এর বিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের পঁচিশ বৎসর বয়সে বিবাহ মানে সেটা লজ্জার বিষয়।

পিতাপুত্র একদিন নিদয়ার সঙ্গে হাটে গেল।

হাটের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা। জিনিসপত্রের অনেক দর। মাংস বেচে ধর্মকেতুর সংসার ভালোই চলে।

নিদয়ার পাশে বসে মাংস বেচে হীরা। ফুল্লরা তার কম বয়সি মেয়ে। সেও মার পাশে বসে মাংস বিক্রি করে। কন্যার শুভ কামনা সব বাবা মা-ই করে। হীরার বাসনা হয় ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিয়ে দেন।

মেয়েরা বারো বৎসর বয়সেই অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ে।

মেয়ের বিবাহের পূর্বে বাড়ি বাড়ি ঔষধ করে ফেরে মা। উদ্দেশ্য সতীনের কুহক থেকে কন্যাকে রক্ষা করা। হীরা তাই সোমাই ওঝার সাহায্য চায়।

সোমাই ধর্মকেতুরও কুল পুরোহিত। সোমাই সঞ্জয়কেতুর বাড়ি আসে। পাত্রীসুলভ ফুল্লরার গুণাগুণ দেখে বলে,

এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভালো জানয়ে পসরা ॥
রন্ধন করিতে ভালো এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে ॥

তা তুমি তো মেয়ের পিতা। তোমার মত কী? সঞ্জয়কেতুর মনোভাব জানতে চায় সোমাই। সঞ্জয়কেতু সোমাইকে ফুল্লরার বিবাহের জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধান করার অনুরোধ করে।

সোমাই বলে, পাত্র খুঁজতে হবে কেন? পাত্র তো তোমার হাতের কাছেই রয়েছে।

সঞ্জয়কেতু অবাক হয়।

—কে পাত্র?

—কেন? কালকেতু। ঘরে ভাত আছে, ভালো বংশ। দেখতে শুনতে ভালো, জোয়ান বয়েস। তোমার কন্যা ফুল্লরার উপযুক্ত পাত্র।

কন্যাপণ বা বরপণের রীতি ভালোই প্রচলিত আছে। তবে এই বিবাহে ওসব কোনো সমস্যাই নেই। সবই দৈব নির্দিষ্ট।

সেই বর যোগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইলা যেন হাঁড়ির মুণ্ডের সরা ॥

বিয়ে পাকা হলে অভিজাতরা ভাবী জামাইকে স্বর্ণদ্রব্য দেয়, কিন্তু সঞ্জয়কেতু দিলেন 'তিনটি পাতন ফাঁড়'।

হীরাবতী আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল। বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হল। কত কি তার আয়োজন।

দরিদ্ররা পরে কুঞ্জার বসন। ধনীরা নেতের কাপড়, তসর সঙ্গে দোছুটি। ধনী পুরুষরা মাথায় পাগ বা টোপর বেঁধে লম্বা কোঁচায় আভিজাত্য বজায় রাখে। গায়ে তারা দেয় অঙ্গ রাখি বা আঙরাখা। খোসলা এরকমই পুরুষদের একটি গাত্রবস্ত্রের নাম।

মেয়েরা পরে দোছাট করে বারো হাত শাড়ি। শাড়িও কত ধরনের। পাটের শাড়ি মেঘডম্বরু শাড়ি আরো কত কি নাম শাড়ির। তাদের বুকের ওপর থাকে বিচিত্র ধরনের কাঁচুলি সব। মেয়েদের অলংকার বলতে দু হাত খিল দেওয়া শাঁখা (কুলুপিয়া শঙ্খ)-র চলন খুব। যার কিছুই নেই সে বাম হস্তে লোহা পরে। নারায়ণ তেলে মেয়েরা সকলে প্রসাধন করে।

বড়ো মানুষরা তোলা জলে স্নান করে। তারা মুখে পান ও হাতে গুয়া নিয়ে ফেরে। উচ্চশ্রেণির পুরুষরা একাধিক বিবাহ করে। তবে অনুন্নত সমাজে এক বিবাহ প্রথার চলনই বেশি।

কালকেতু-ফুল্লরার বিবাহ দিন এসে গেল। বন্ধু বান্ধব সহ সোমাই ব্রাহ্মণ অধিবাস ডালা নিয়ে কিরাতনগরে এসে উপস্থিত হলেন। ত্রয়োদশী রবিবার গোধূলি লগ্নে বসল বিবাহ বাসর। ধর্মকেতু কালকেতুর নান্দীমুখ করালেন।

হুলুধ্বনি-সহ নানাবিধ বাজনার মধ্য দিয়ে বরযাত্রীদের নিয়ে বরবেশে কালকেতু বিবাহ মণ্ডপে প্রবেশ করল। তার গলায় রত্নমালা ও হাতে সোনার তাড়বালা। তার সারা অঙ্গে কুঙ্কুম, পরনে পট্টবস্ত্র। দোলায় চড়িয়ে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিবাহমণ্ডপ সুন্দর করে তৈরি হয়েছে। চারপাশ গোবর দিয়ে লেপা। তার উপর সুন্দর করে আলপনা দেওয়া। ঘরদোর সব পরিপাটি করে সাজানো। দুই পরিবারের সবাই খুব খুশি।

কন্যা অতি অল্প বয়সেই স্বামীর ঘর করতে চলেছে। মাথায় দূর্বাধান দিয়ে বরণ করা হল বরকে।

ওদিকে স্বামীকে বশীভূত করতে বয়োজ্যেষ্ঠারা ফুল্লরাকে কামরূপ কামাখ্যার তন্ত্রমন্ত্র শেখাচ্ছে। তার হাতে কিছু ঔষধ তুলে দিচ্ছে।

হীরাবতী খুব খুশি। অলকা তিলকা মোহন কাজল পরেছে। ফুল্লরাকে সাজিয়ে সখীরা নিয়ে এসেছে বিয়ের পিঁড়িতে।

রেবতী নক্ষত্র লগ্নে ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্র উচ্চারণে গণেশের আবাহন শুরু করলেন। পঞ্চ উপাচারে, গন্ধাধিব্যসনে, শত দূর্বা, পুষ্পমালায়, শঙ্খ-কাজল-সোনায় এমনকী তামা, রূপা, গোচনায়, চামর, দর্পণ, কর্পূর দিয়ে সাজানো বিবাহ উপচারে ষোড়শমাতৃকার পূজা সমাপনান্তে বর-কনের হাতে সুতা বাঁধা হল। আনুষ্ঠানিক উপাচার কত রকমেরই না হয়। শ্বাশুড়ি হীরাবতী জামাতা কালকেতুর চরণে দই ঢেলে দিলেন। বেজায় কোলাহলের মাঝে ফুল্লরাকে পতি প্রদক্ষিণ করানো হল।

কন্যা সম্প্রদানের পর বরকনে একসাথে অরুন্ধতী দেখল। বিবাহের পর বব-কনে এক

সঙ্গে অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখে। এর অর্থ নব-দম্পতি বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মতো যেন অবিচ্ছেদে ঘর করতে পারে।

খাওয়া দাওয়ার পর আত্মীয়কুটুম্বরা একে একে বিদায় নিল।

কুসুম-শয্যা বা ফুলশয্যার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরদিন প্রভাতে শয্যাতোলা কড়ির দাবিও শুনতে হল বরপক্ষকে।

ফুল্লরা কালকেতুর ঘরে এল। নিদয়া দূর্বাধান দিয়ে তাকে ঘরে তুলল। প্রিয়জনেরা কত কি যৌতুক দিয়েছে সে সব নিয়ে মেতে উঠল সকলে।

ফুল্লরা এখন এই সংসারের কর্ত্রী। অভাবের সংসারের সে বউ। যা জোটে তাই খায়। সংসারের হাল এখন তার হাতে। শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামীকে নিয়ে তার সংসার। হোক না স্বামী কালকেতুর শোয়া খুব খারাপ তবু স্বচ্ছন্দে দিন কাটে তাদের।

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলো তোলে যেন তেআঁঠিয়া তাল ।।

কালকেতু বনে বনে ঘুরে পশু শিকার করে। ফুল্লরা সেই মাংস হাটে পসার দিয়ে কখনও কখনও বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেচে। দরিদ্র সংসার তবে সচ্ছল। ব্যাধের মেয়ে সে সুতরাং পরিশ্রম করতে সে অভ্যস্ত।

মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় ডালি বড়ি
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।

হাটে মাংস বেচে সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র চাল ডাল তেল শাক সবজি কিনে নিয়ে আসে ফুল্লরা। বাড়িতে সে নিজেই রাঁধাবাড়া করে। প্রথমে শ্বশুরকে খেতে দেয়, তাঁর যত্ন করে। তারপর কালকেতুকে খেতে দেয়।

মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে ।।
চারি হাঁড়ি অন্ন বীর খায় ক্ষুদ জাউ।
দালি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ ।।
ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু ওল পোড়া।
বনপুঁই ভাব দুই কলমী কাঁচড়া ।।

নিদয়ার তাই এখন বড়ো সুখ। জীবন তাঁর সফল। এ জীবনে মানুষ আর কি চায়? সংসার এখন ভালোই চলছে।

বেহুলার মতো ফুল্লরাকেও সতীত্বের পরিচয় দিতে হল। পরিচয় দিতে হল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের। স্বামীকে লাভ করলেও সুখের দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে পারল না। কালকেতুর মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ল বন্য নারীর সৌন্দর্যে। ফুল্লরা ভয় পেল। কালকেতুকে সন্দেহ করল। কারণ পুরুষ বহু বিবাহ করতে পারে এসমাজে। এতে কোনো সমস্যা নেই। এ সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ সরল স্বাভাবিক ঘটনা। বন্য সুন্দরীকে ঘরে নিয়ে আসায় তাই সে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। কালকেতুর নীতিবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলল। বলল—

পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শ্যা কন্যা আনিযাছো ঘরে ।।
কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলে মন।
আজি হৈতে হৈলে তুমি লঙ্কার রাবন ।।

কালকেতু সতর্ক হয়েছে। ফুল্লরার পরামর্শ মতোই চলেছে। বন্য রূপসী চণ্ডী দেবী হয়ে তাকে আংটি দিতে চাইলে ফুল্লরা নিবৃত্ত করতে চাইল। বলল—

একটি অঙ্গুরী হৈতে হৈব কোন কাম।
সারিতে নারিবে কভু ধনের দুর্নাম ।।

ফুল্লরা স্পষ্ট নির্দেশ দিল কালকেতুকে—

না লইহ না লইহ চণ্ডীকার ধন।

সংসারের রাজনীতি সে এতটাই আয়ত্ত করেছে যে বুদ্ধির খেলাতে চণ্ডীকেও পরাজিত করল। শুধু পতিপ্রেম নয়, বৃদ্ধা শাশুড়ির প্রতি বিরল কর্তব্যবোধ তাঁকে বিশেষ, মর্যাদা এনে দিয়েছে। সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে সে। শাশুড়ি-ননদ-সতিন-জা ইত্যাদি সম্পর্কগুলো পরস্পর বিরোধী হিসেবে সমাজই নির্দেশ করে দেয়। মেয়েরা মেয়েদের বড়ো শত্রু, সমাজে এই সচেতন মিথ্যের আড়ালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জাঁকিয়ে বসে আছে। অভাবি পরিবারে মানুষ হলেও পারিবারিক উষ্ণতার আরামটুকু আমাদের পরিবাবে বর্তমান ছিল। সেই কারণেই বোধহয় আমি ফুল্লরাকে লড়াই করার শক্তি জোগাতে পারলাম।

জইড় তলাতে বাইজল বাঁশী
শুইনতে পাইযেছি।
(আব) বাজাইও না পেমের বাঁশী গো,
আমি সিনানে যেছি।

চৈতন্যদেবের ঝাড়খণ্ড পরিক্রমার পর রাধা কৃষ্ণেব অপ্রাকৃত প্রেম লৌকিক নায়ক - নাযিকার প্রেমানুভূতিতে মূর্ত হয়েছে লোক সঙ্গীতের সমস্ত আদিমতা নিযে তা চলে এসেছে ঝুমুব গানে। ঝুমুব গানে প্রেমের মাধুর্য আছে। প্রেমের মাধুর্য রাখবার চেষ্টা করি ফুল্লরা-কালকেতুর জীবনে।

এদেশের পাতা নাচের গান, কাঠি নাচের গান, নাচনি নাচের গান - সব গানই মূলত ঝুমুর গান। যৌথ গান ও নাচে এর বৈশিষ্ট্য। মানুষেব বিরহ মিলন, বাগ অনুরাগ, প্রেমানুভূতি এই গানে রূপ নিয়েছে। নদী, ডুংরী, পাহাড়, ঝোরা, শাল - পলাশের জঙ্গল, নালা, জোড়, উঁচুনীচু জমি, ঝোপ-জঙ্গল, লতা-গুল্মের প্রকৃতি সব নিয়ে এই গান - সমতলের গানের থেকে আলাদা। মানুষের যখন ভাষা ছিল না তখন সে নানা আওয়াজ ও অঙ্গভঙ্গি করে নিজের কামনা বাসনাকে প্রকাশ করেছে। আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল প্রকৃতিতে যে ঘটনাগুলি ঘটছে, তার যদি প্রতীকি অনুকরণ করা যায় তাহলে সেই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি পুনরায় ঘটানো যায় এবং চাইলে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। এই ঝুমুর গানে তা মূর্ত হয়। ঝুমুর গান এ দেশের নিজস্ব সম্পদ।

গান গেয়ে একদল মেয়ে রোজগার করে। আমি রোজগার করি লিখে। শিবরাম এবং মমতা যে আমার লেখার বিষয়ে যথেষ্ট উদার এবং সচেতন এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আমি যখন লেখার সূত্রে রোজগার করেছি, মধ্যবিত্ত পরিবার হিসাবে পরিবার মোটামুটি সচল থেকেছে। শিবরাম দেখেছে কখনও কখনও মমতার আচরণ দ্রুত বদলে গেছে। তারপর গান গেয়ে রোজগার করা উপার্জনের অর্থ যখন মমতার হাতে তুলে দিয়েছি; মমতা তখন বিগলিত হয়ে বলেছে, বাবা, বাঁচালে।

—ছেলে-মেয়েরা কত দিন যে পেট ভরে খেতে পায়নি। আবদার করেছে দিতে পারিনি। আজ কতদিন পরে চণ্ডী মুখ তুলে চেয়েছেন।

মৎস্য মাংস আদি করি পরশে ফুল্লরা নারী
সুখে ভুঞ্জে কিরাতনন্দন।
যোগান ফুল্লরা বধূ ক্ষীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন ।।

ফুল্লরা শাশুড়ি নিদয়ার হাতে মাংস বিক্রি করে সম্বল তুলে দিচ্ছে।

শাশুড়ি যেমত ভনে তেনমত বিচে কেনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা।

আমার নিত্য-জীবনের ঘটনার অভিজ্ঞতায় আমি লিখলাম শাশুড়ি আর বউয়ের গল্প। শাশুড়ি - বধূ সম্পর্ক। নিদয়া বসে বসে বধূকে শুধুই খাটায় আর নিজে আয়েস করে, এমনটা নয়। নিদয়াকে 'কহে রামা হাট বিবরণ'। নিদয়া - ফুল্লরা অর্থাৎ শাশুড়ি বধূর মধ্যে একটা বন্ধুত্ব, একটা পারস্পরিক নির্ভরতা গড়ে ওঠে। আর তাই একদিন নিদয়া ধর্মকেতু সংসাবের ভার ফুল্লরার হাতে ছেড়ে দিয়ে খুশি মনে বারাণসী চলে যেতে চায়। বার্ধক্যের বারাণসী হল সুখের ফুলবন। সেখানেই তাই থাকতে চায়।

দম্পতি লুটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠায় সম্বল।

ধর্মকেতুকে নিদয়া বারণসী নিয়ে যেতে বলে।

এদিকে দিন দিন কালকেতুর পশুজিঘাংসা বাড়তে থাকে। বনেতে পশু শিকার, ভোজন আর সুখ নিদ্রায় তার কাল কাটে। কিন্তু এই সুখ তার আর সইল না।

পশুর দল বনে বনে কেঁদে বেড়ায়। তাদের প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না। কালকেতু তাদের মেরে ধরে শেষ করে দিচ্ছে। কালকেতুর জিঘাংসা এত বেড়ে গেছে যে তারা বোধহয় লোপাট হয়ে যাবে। পশুরা তাই একজোট হল। কিন্তু তারা কোনো প্রতিকার করতে পারল না।

অরণ্যভূমিতে কংসনদের তীরে তমাল বৃক্ষের তলে চণ্ডী দেবীর দেউল। দেউলে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে স্বমহিমায়। কালকেতু দেবীর ভালোরকম পূজোর ব্যবস্থা রেখেছে। পূজা পেয়ে খুশিমনে দেবী সেখানে বিরাজ করেন। একদিন অরণ্যের প্রাণীরা তাঁকে গিয়ে ধরল। তারা দেবী অভয়ার শরণাপন্ন হল। পশুরা ভগবতীর পূজা করল। পশুরাজের সভা

বসল। সেই সভায় দেবীকে তারা বলল, আপনি তো আমাদেরও দেবী। আমরাও সাধ্যমতো আপনার পুজো করি। আমাদের কথা আপনি একটু ভাববেন না?

অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক।
বর দিয়া ভগবতী কর নিরাতঙ্ক॥

তারা বলে, কালকেতু এখন ধনবান। ধনবান রাজশক্তির রক্ষক। রক্ষক রাজশক্তি তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে না। দুর্বল ও নিরপরাধী বিনা অপরাধে শাস্তি পায়। ভাল্লুক কেঁদে বলে—

উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক।
নিউগি চউধরি নহি না করি তালুক॥

দেবী অভয়া তাদের সব কথা শুনলেন। তাদের আশ্বস্ত করলেন। অভয় দিলেন। সকলকে নিরস্ত করে ভরসা দিলেন। তিনি সিংহকে করলেন বনের রাজা। অন্যদের বিশেষ বিশেষ জায়গায় যথাযথ ভাবে নিয়োগ করলেন। এই সব ব্যবস্থা করে দেবী চলে গেলেন কৈলাসে।

আসলে দেবী কালকেতুর শিকার দৃষ্টি হরণ করে নিয়ে গেলেন। পশুদের রক্ষা করতে কালকেতুর ব্যাধজীবন ঘুচিয়ে দেবী তাকে রাজা করার আয়োজন করলেন। রাজা হলে সে আর পশুবধ করবে না। কালকেতু একদিন মৃগয়ায় বার হয়েছে। দেবী তাঁর কাছে মায়ামৃগী রূপ ধরে দেখা দিলেন।

মৃগ অনুপদী বীর ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণে ক্ষণে ধূলায় লুকান ভগবতী॥
রহিয়া বহিয়া যান দীঘল তরঙ্গ।
তার পাছে ধায় ব্যাধ যেমন পতঙ্গ॥

বনে আর কোনো শিকার চোখে পড়ে না কালকেতুর। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। এরকম হলে খাবে কী? বসে বসে খাওয়া তো যায় না। কথায় আছে বসে বসে খেলে রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়। কালকেতু চোখে সরষে ফুল দেখতে থাকে।

কিরাত পাড়াতে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার॥

ব্যাধ দম্পতির জীবনে গুরুতর সমস্যা নেমে আসে। আপদে বিপদে চণ্ডিকা তাঁদের সহায়। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে দেউল নির্মাণ করা হয়েছে।

চণ্ডিকার বিশাল মন্দির, সেখানে তিনি নিত্য পূজা পান। সুতরাং তাদের এমন অবস্থা কেন হচ্ছে?

এই সব ভাবতে ভাবতে কালকেতু বিমর্ষ হয়ে পড়ে। একদিন কালকেতু বনের মধ্যে চলেছে। ডান দিকে দেখতে পেল একটা গোরু চরছে। তার সঙ্গে ক'টি মৃগ-ও রয়েছে। তারপর একজন দ্বিজ হেঁটে গেল তার পাশ দিয়ে। এসবই সুলক্ষণ। কিছু পরে দেখতে পেল আবার পূর্ণঘট জল নিয়ে মেয়েরা ফিরছে। তারপরই দেখতে পেল একটি শিবা চলে গেল। শুনতে পেল চারদিকে হুলুধ্বনি হচ্ছে। দধি দধি ডাক পাড়ছে গোয়ালিনি।

কালকেতুর মন খুবই পুলকিত হল। আজ চারদিকের সমস্তই সুমঙ্গল। অনেকদিন পর আজ নিশ্চয়ই ভালো শিকার মিলবে।

কিন্তু বনের গভীরে প্রবেশ করার পর সে কেবল একটি মাত্র গোধিকা দেখতে পেল। গোধিকাকে দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল। এই পাপ দর্শনে তাব বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

কথা আছে গোসাপ, কচ্ছপ, গন্ডার, শজারু, শশক দর্শনে যাত্রাভঙ্গ হয়।

তার মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বিষাদ মন নিয়ে সে জঙ্গলে জাল পেতে ফেরে। ঝোপঝাড়ে বাড়ি মারে। কিন্তু কোনো পশু ধরা পড়া তো দূরের কথা, কোনো পশু তার নজর সীমার মধ্যেই আসে না। এমনকী গাছের ডালে কোনো পক্ষীরও দর্শন পায় না।

বনে কোনো পশু নেই। শুখা কাননে কাঠে কাঠে কেবল ঘুরে বেড়োচ্ছে শিখীর দল।

দিন এভাবে শেষ হয়ে এল। বিফল মনোরথে গৃহের পথ ধরে কালকেতু।

দেখতে পায় আবার সেই গোধিকাকে।

মাথায় তার আগুন জ্বলে ওঠে। গিয়ে ধরে ফেলে গোধিকাকে। বাঁধে।

গর্জন করে বলে, তোর জন্যই আজ কোনো শিকার পেলাম না। চল তোকেই আজ পুড়িয়ে খাব।

সুবর্ণ গোধিকাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরে কালকেতু। দেখে গৃহে ফুল্লরা নাই। সে কোথাও গেছে। চালের খুঁটিতে গোধিকাকে বাঁধে কালকেতু। তারপর ফুল্লরার সন্ধানে বের হয়। এদিকে ফুল্লরা গেছে সখীগৃহ থেকে চাল ডাল সংগ্রহ করতে। ঘরেতে কিছুই নাই। সে চাল ডাল নিয়ে এসে দেখে গৃহের দাওয়ায় বসে আছে এক মোহিনী ষোড়শী চন্দ্রমুখী। ফুল্লরা অবাক হয়।

ঘরে চালচুলো নেই। এর মধ্যে আবার অতিথি! বিরক্ত হয়ে সে ষোড়শীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

চন্দ্রমুখী হাসতে হাসতে বলে, ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি। উঁচু বংশেই জন্ম আমার, বাপেরা ঘোষাল। বাপের বাড়িতে ভর্তি মানুষজন। এমন যেন ভর্তিজঞ্জাল মনে হয়। সতিনের জ্বালায় পতিগৃহ ত্যাগ করেছি—

সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি ৷৷

তুমি রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি। শিশুকাল থেকেই আমি বনে বনে ঘুরে বেড়োই। সে বলে,

তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি।
এই স্থানে কতক দিন করিব বসতি ৷৷

এসব কথায় ফুল্লরার মন বিষিয়ে ওঠে। সে আরো রেগে যায়। তবু সে মধুর ভাবে মোহিনীর সাথে কথা বলে। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে যায়। মোহিনীকে উদ্দেশ করে বলে,

দেখতে তো তুমি খুবই সুন্দরী। উচ্চবংশে জন্ম বলছ, তবে বনে বনে একাকী ভ্রমণ করে বেড়োও কেন?

মোহিনী উত্তর করে,

আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিয়াছে তোর স্বামী বান্ধি নিজগুণে॥

আব কোথাও যাব না। এখানেই থাকব।

ফুল্লরা দেখে মহাবিপদ। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েদের কি স্বামীর ঘর ছাড়া কোনো গতি আছে? স্বামীর ঘর ছাড়া স্ত্রীর আর কোথাও সুখ নেই।

—দ্যাখো, নিজের ভালোমন্দ আমি ভালাই বুঝি। সে তোমাকে উপদেশ দিতে হবে না। মোহিনী উলটে তাকেই পরামর্শ দেয। বলে, তোমার স্বামী আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি তো একা একাই ঘুরছিলাম বনে, বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করো তোমার স্বামীকে। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি এসেছি। আমার ধন দিয়ে তোমাদের দুঃখ ঘোচাব। রাগ কোরো না, দুজনে একসাথেই থাকব। এক সাথে আমাদের কোনো কষ্টই হবে না। দৃঢ় মনোভাব প্রকাশ করে সে বলে—

'যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব'।

ও বাবা! এ মেয়ে তো দেখছি যা তা নয়! ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

ওদের তালপাতার ছাউনি দেওয়া কুঁড়েঘর। বৈশাখের ঝড়ে নিত্য ভেঙে যায়। বৈশাখ খরার মাস। মানুষ নিরামিষ আহার করে। মাংস বিক্রি হয় না। জ্যৈষ্ঠও তাই। সেই আষাঢ় পরলে তখন কিছু খুদ কুঁড়োর সংস্থান হয়। আশ্বিনে আবার মন্দা। গ্রামে গ্রামে অম্বিকা পূজায় ছাগ, মহিষ মেষ বলি হয়। ঘরে ঘরে সবার মাংস তখন। বাজারে তখন মাংস কেউ কেনে না। আর কি যে হয়েছে আজকাল, কালকেতু বনে শিকারও পায় না। নিজের দুঃখের কথা শুনিয়ে সে ষোড়শীকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

আসলে সে বোধহয় নিজেকেই ভোলাতে চেষ্টা করে। মেয়েটির রূপ যৌবন দেখে তার ভয় হয়। এদিকে খিদের পেটে তার আগুন জ্বলছে। তবু তার জঠরে ক্ষুধা নয়, মনের মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে দ্বিগুণ ভাবে। এবার বুঝি তার কপাল পুড়েছে। স্বামী বুঝি পর হয়ে যায়। শেষ চেষ্টা করে সে বলে—

শাশুড়ী ননদ কিবা কৈল মন্দ
স্বরূপে বল না বাণী।
তোব বিরহ জ্বরে স্বামী যদি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানি॥

—দুঃখ কোরো না সতিন, আজ থেকে আমার ধনে আছে তোমারও অধিকার।

ফুল্লরার কথা শুনি কহেন পার্বতী।
আজি হৈতে দূর হৈল সকল দুর্গতি॥
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।

ফুল্লরার অভিলাষ বুঝতে পেরে মোহিনী কি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে? ফুল্লরার চোখ কপালে ওঠে। আসুক কালকেতু! মোহিনীকে দাওয়ায় বসিয়ে রেখে সে কোথায় গেল? এ কী শুনছে সে? স্বপ্ন না সত্যি? তার মনে সন্দেহ দৃঢ় হয়। চোখের জল বাধা মানতে চায় না।

—তুমি চলে যাও। এখানে তোমার থাকা হবে না। ফুল্লরা তাকে চলে যেতে নির্দেশ করে।

কিন্তু মোহিনী অনড় হয়ে বসে থাকে। চলে যাবার কোনো লক্ষণ সে দেখায় না।

ফুল্লরা রেগে যায়। সে তখন কালকেতুর সন্ধানে হাটের পথে বের হয়।

পথেই কালকেতুর দেখা পায় সে। তাব বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

—ছি ছি তোমার মনে শেষে এই ছিল!

কান্নায় ফুল্লরা ভেঙে পড়ে। জোড় হাতে সে কালকেতুকে নিবেদন করে, তুমি এটা পারলে?

কালকেতু অবাক হয় ফুল্লরার কাণ্ড দেখে। সে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে কী?

সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা
কা সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলে রাতা।

—পিঁপড়ের যেমন পাখা গজায় জ্বলে মরবাব জন্য তোমারও হয়েছে সেই দশা।

—আহা! কি হয়েছে তাই বলবে তো?

—কি আর বলব! কি হয়েছে তুমি জানো না যেন। একটা ষোড়শী মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছ।

—কি যা তা বলছ সব?

—এখন আমি যা-তা বলছি। ঘরে গিয়ে দেখবে চল।

ফুল্লরাকে নিয়ে কালকেতু গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কালকেতুর পিছু পিছু ফুল্লরা ঘরে ফেরে।

রূপসীকে দেখে কালকেতু বিস্মিত হয়। ভালো করে সে পরখ করে দেখে। তারপর সে-ও রূপসীকে চলে যাবার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করে।

তার পরিচয় জানতে চায়। ফিরিয়ে দিয়ে আসতে চায় তাকে তার বাড়িতে।

মোহিনী কোনো উত্তর দেয় না।

তার চেহারা এবং অঙ্গের আভরণ দেখে কালকেতু ঘাবড়ে যায়। সে ভয় পায়। কোনো প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় কালকেতু বিরক্ত হয়। তখন সে মারধোরের ভয় দেখায়।

তবু কোনো প্রতিক্রিয়া নেই ষোড়শীর।

ষোড়শী যখন কোনো কথা শুনতে নারাজ।

তিরস্কারে কাজ না হওয়ায় কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সে ধনুকে তির জোড়ে।

চণ্ডীর মায়া শুরু হয় তখন।

কালকেতুর ধনুর্বান জোড়া হাত স্তব্ধ হয়ে যায়।

দেবী তখন হতবুদ্ধি দম্পতির সামনে নিজেকে প্রকাশ করে আত্মপরিচয় নিবেদন করে। মৃদুস্বরে বলেন, তোমাদের দিতে এসেছি এই সাত রাজার ধন মানিকের আংটি। এই মানিক ভাঙিয়ে কাটাও গুজরাট বন। কড়ি, গোরু, ধান দিয়ে বসাও প্রজা। পুত্রের ন্যায় পালন করো তাদের। নগরের রাজা হও তুমি।

কালকেতু অবাক!

হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী।।

হিংসামতি ব্যাধের নন্দন সে জাতিতে অতি নীচ। তাই বুঝতে পারে না চণ্ডীর হঠাৎ তাকে দয়া দেখানোর কারণ কী?

চণ্ডী বলেন, ব্যাধের নন্দন তুমি ঠিকই। তা বলে অপাংক্তেয় নও। আমি চণ্ডী। তিন ভুবনের কেউ এখন আমাকে ভালো করে চেনে না। আমার পরিচিতি করানোর উদ্দেশ্যে তোমার কাছে আসা। তুমি আমাব পূজার প্রচার ব্যবস্থা করো।

ফুল্লরা সতর্ক হয়। সে বুঝতে পারে, এই মোহিনী মায়া জানে। সে আংটির যথার্থ মূল্য বিশ্বাস করতে চায় না। কালকেতুকে সে তাই শলা দেয়। ফুল্লরা কালকেতুকে মানিক গ্রহণ করতে নিষেধ করে। বলে, কি দরকার। আমরা জঙ্গলে বাস করি। পশু হত্যা আমাদের পেশা। রাজার ধন নিয়ে আমাদের কি কাজ। সম্পদ হলেই ঘরে চোর-ডাকাতের উপদ্রব হবে। আর ধন হলে লঘু-গুরু জ্ঞান লুপ্ত হয়। রাজাও রুষ্ট হয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। দরকার নেই বাবা, এই বেশ আছি।

দেবী তখন বলেন, তোমরা তো জানো, এই পৃথিবীতে কৃপণের জন্ম বৃথা। সে নিজে খায় না, পরে না, দান-খয়রাত করে না। তার তো জন্মই বৃথা। আমি তোমাদের অর্থ দিচ্ছি। সেই অর্থ খরচ করে গুজরাট বন কেটে নগর বসাও। অহোরাত্র করাও হরিসংকীর্তন। অতিথি ব্রাহ্মণদের সেবা করো। নতুন নতুন দেবালয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করো। দরিদ্রদের দান করো। তোমাদেরও পুণ্য হবে, স্বর্গে স্থান পাবে তোমরা।

—সামান্য একটা আংটি দিয়ে তুমি রাজ্য গড়ার লোভ দেখাচ্ছ আমায়?

কালকেতু স্বপ্ন দেখতে নারাজ। সে বলে, মাংস বেচে খাই বলে তুমি আমাকে এতখানি অবহেলা করতে চাও? ব্যঙ্গ করছো!

—বেশ। এই বলে দেবী মানিকের আঙটি কালকেতুর হাতে দিলেন। বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে চললেন দেবী। বললেন, এই মানিক সাত রাজার ধন। এছাড়া আরো অনেক ধন আমি তোমার জন্য রেখেছি। এসো আমার সঙ্গে আছে। তোমায় দেখাই।

কালকেতু শাবল কোদাল সঙ্গে নিয়ে চলে দেবীর পিছু পিছু।

বনের মধ্যে বিশাল এক দাড়িম্ব বৃক্ষ। সেই তরুর তলে কালকেতুকে নিয়ে এসে দেবী বললেন, এখানে সাত ঘড়া ধন আছে।

কালকেতুর বিশ্বাস হয় না। জঙ্গল পরিষ্কার করে সেই জায়গায় খুঁড়তে শুরু করে। সত্যি আরো সাত ঘড়া ধন পাওয়া গেল।

—এই ধন নিয়ে, পশু জিঘাংসা ত্যাগ করে তুমি এবার সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন কর। আমি চললাম।

—না দাঁড়াও। এই ধন একা আমি গৃহে নিয়ে যেতে পারব না। তুমি আমায় সাহায্য করো।

অস্থির দেখিআ বীরে হাসেন অভয়া।
ধন-ঘড়া কাঁখে কৈলা বীরে করি দয়া।
আগে আগে মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাত পার্বতী জান লইআ তার ধন।।
মনে মনে মহাবীর করেন জুগতি।
ধন-ঘড়া লইআ পাছে পালায় পার্বতী।।

কালকেতু দেবীর পিছনে পিছনে চলতে থাকে। তার সন্দেহ, ধন নিয়ে না দেবী পালিয়ে যায়। সে দেবীকে সামনে চোখে চোখে রাখে।

সব ধন বাড়িতে নিয়ে এসে মেঝেতে পুঁতে রাখা হয়।

—কাজ শুরু করে দাও তুমি। চললাম আমি। নিজের পুরীতে তুমি আমার দর্শন পাবে। নগবের ঠিক মাঝখানে আমার একটা বাড়ি করে দিয়ো। আর প্রতি মঙ্গলবারে আমার পুজো দেবে। নগরের রাজা হবে তুমি।

কালকেতুর দ্বিধা তখনো কাটেনি। সে জানতে চায়, টাকা নয় হল। নীচ কুলে জন্ম আমার। জাতিতে চুয়াড়, লোকে বলে রাঢ়। অর্থ হলেই কি লোকে আমায় মান্যি করবে? কোনো ব্রাহ্মণ কি আমার পূজার পুরোহিত হবে?

চণ্ডী তাকে অভয় দিলেন। বললেন, হবে হবে। এ যুগে অর্থই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

—আর মানিক? মানিক আমি ভাঙাব কোথায়?

—মানিক নিয়ে তুমি সর্ব প্রথমে নগরের শ্রেষ্ঠ বণিকের কাছে যাবে। তাকে গিয়ে বলবে, তোমাকে কেউ এটা দিয়েছে। তুমি এটা বেচতে চাও। তোমার খুব অর্থের প্রয়োজন। সে তোমাকে প্রচুর অর্থ দেবে। সেই অর্থ দিয়ে কাজ শুরু করে দাও। কেউ কোনো সন্দেহ করবে না। বণিকও বুঝতে পারবে তুমি অনেক টাকা পেয়েছ। তারপর তো মাটি কাটা, মাটি কাটার কাজ শুরু হয়ে গেলে তোমার কোনোও চিন্তা নেই। কথায় বলে টাকা মাটি, মাটি টাকা।

এই বলে, দেবী অন্তর্হিত হলেন।

ফুল্লরা কালকেতু আর একবার দেখে নিল, টাকাগুলো ঠিকঠাক আছে তো? ওগুলো দেবীর সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যায়নি তো?

না। ঠিকই আছে। এবার কি করণীয়।

দুজনে যুক্তি করতে বসে।

পরের দিন সকালে কালকেতু মুরারি শীলের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

লোকটার অনেক টাকা আছে। কিন্তু বড়ো কঞ্জুস। ঠিক মতো মাংসের দামটাও দেয় না। এরকম লোক ধারে মাংস খায় কি করে কালকেতুর মাথায় ঢোকে না।

কালুর হাঁকডাক শুনে মুরারি ও তার গিন্নি ভাবলে কালু বোধহয় এই সাতসকালে পাওনা টাকা নিতে এসেছে। সাড়া পেয়েই তাই মুরারি শীল গা ঢাকা দিল। শীল গিন্নি আরও চতুর। কর্তাকে লুকিয়ে রেখে কালকেতুর কাছে ভালোমানুষটি সেজে বললে,

বীরের বচন শুনি আসি বলে বাণ্যানি
ঘরে নাহি সহর পোতদার
সকালে তোমার খুড়া গেছেন খাতক পাড়া
কালি দিব মাংসের ধার।

কালকেতু বললে, না না। মাংসের দাম নিতে আজ আমি আসিনি। আজ আমার খুব টাকার দরকার তাই খুড়োর কাছে এসেছিলুম একটি আংটি ভাঙাতে। যা হোক, খুড়ো যখন নেই তখন 'জাই অন্য বণিকের বাড়ি'। যেই একথা বলা, অমনি ধনের আশায় খুড়ির চোখ চকচক করে ওঠে। বলে—

সহাস করিআ বাণী আসি বলে বান্যানি
দেখি বাপা অঙ্গুরি কেমন।

কই দেখি? আংটি? কিসের আংটি?

—মানিকের। তা তোমরা যদি না নাও। অন্য কোথাও বেচতে হবে। আসলে আমার এখন খুব টাকার দরকার।

—দাঁড়া দাঁড়া।

আংটির কথায় মুরারি গিন্নি বাইরে এলেন। বললেন, কই দেখি আংটিটা। আংটি দেখে তো মুরারি গিন্নির চোখ ছানাবড়া। কিছুতেই আংটি ফেরত দেবে না। আর মুরারি শীল,

ধনের পাইআ আশ জাইতে বীরের পাশ
ধায় বাণ্যা খড়কির পথে।

আংটির কথা শুনে মুরারি আর আড়ালে থাকতে পারে না। সে-ও সামনে এসে উপস্থিত হয়। আংটি দেখে সেও অবাক হয়। কিন্তু আংটি ক্রয়ের জন্য কোনো ব্যাকুলতা দেখায় না। কালকেতুর কুশল সংবাদের জন্য সে কপট আন্তরিকতা ব্যক্ত করে।

বাণ্যা বলে ভাইপো ইবে নাহি দেখি তো
এ তোর কেমন ব্যবহার।

কালকেতুর মনটাকে একটু নরম করে সে অপ্রত্যাশিতভাবে কঠিন জায়গায় আঘাত করে বসে। বলে—

সোনা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।।

কালকেতু দেখে ছিপে মাছ লেগেছে। সে ভালো দাম হাঁকায়।

কিন্তু চতুর ব্যবসায়ী মুরারি শীল। অঙ্গুরী বিক্রেতা অশিক্ষিত ব্যাধ কালকেতুকে সে জটিল হিসেবের ফেরে ঠকিয়ে নেয়। সে বলে,

রতি প্রতি হৈল বীর দশগণ্ডা দর।
দুই যে ধানের কড়ি পাঁট গণ্ডা ধর ।।
অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
বাকি আর মাংসেব ধারি যে দেড়বুড়ি ।।
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
চালু খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি ।।

আর কালকেতু ভাবে সে মোটা টাকা দর পেয়েছে। খুশি মনে সে ফিরে যায়। বন কেটে বসত শুরু হয়। তৈরি হল গুজরাট নামে এক নগর। ভালো ভালো প্রজার বসতি করিয়ে নগর জাঁকিয়ে তুলল কালকেতু। কার্তিক মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন নগর পত্তনের সূচনা হল।

নগর-চত্বর মাঝে শিবের মন্দিব সাজে
অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।
বাসাড়ি জনের তরে দিঘল মন্দির করে
প্রাবাসীগণের জথা মেলা ।।

কালকেতু নগর নির্মাণে মনোযোগী হল। যেখানে বহুজনের সমাগম ঘটে, সেখানে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি পড়ে। অন্যান্য জায়গা থেকে দোকানদার, শিল্পী, আড়তদার, মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এসে গুজরাট নগরে অধিষ্ঠান করে। কালকেতু তাদের সকলকে যত্ন করে বসায়। তৈরি হয় নতুন নতুন হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা, বন্দর।

অর্থব্যয় করে নগরকে সুশোভিত করতে থাকে কালকেতু। নগরে প্রজাবাহুল্য ঘটায় তার আয় বৃদ্ধি হয়। রাজপ্রাসাদতুল্য তাঁর নিজস্ব বাসভবন। উচ্চ দেবমন্দির, স্থানে স্থানে সোপানাবলী শোভিত সরোবর নগরকে সমৃদ্ধশালী রূপ দিতে থাকে।

বামভাগে দুর্গা-মেলা তার পিছে পাটশালা
সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়।
খড়্গী উত্তরভাগে জলহরি তাব আগে
প্রতি বাড়ি কূপের সঞ্চয় ।।

পশ্চিমে মুসলমানদের বসতি, সেখানে তৈরি হয় মসজিদ।

সুধন্য কৌসলকালা তুলিল রন্ধনশালা
বিবি চাখে বান্দি যথা রান্ধে।

কালকেতু সমস্ত প্রজাকে বলে, আমার নগরে বাস করো জমি চাষ করো। তিন সন পর দিয়ো খাজনা। আমার পুরে এসো কানের কুন্তল দেব। যত ভূমি চাষ করো না কেন, তিন সন পর হাল পিছু এক টাকা করে দিয়ো খাজনা। ডিহিদার আমি রাখব না, ব্রাহ্মণের চরণের সেবক হয়ে আমি থাকব।

গোষ্ঠী বা জ্ঞাতি সম্পর্ক গ্রাম সমাজকে বেঁধে রেখেছে। প্রতিটা গ্রাম যেন এক-একটা ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র। গ্রাম নিজেদের চাহিদার সব কিছু প্রায় নিজেরাই মিটিয়ে নিতে পারে।

বাইরের কোনো রকম সম্পর্ক না রেখেই প্রায় মুক্ত এই গ্রামজীবন। একের পর এক রাজবংশ ভেঙে পড়ে, বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ হয় কিন্তু গ্রামীণ সমাজজীবন একই থেকে যায়। কিন্তু এই গ্রামজীবন টিকে থাকে না। যদি গ্রামের সাধারণ মানুষ একযোগে সকলে গ্রাম ত্যাগ করে। এমনি করে এদেশে বহু বসতি, শহর ও গ্রাম এক মুহূর্তে গড়ে উঠেছে, আবার জনশূন্যও হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে বসবাস করা সত্ত্বেও কোনো শহর বা জনপদ থেকে লোকে যদি পালায়, তারা এমন ভাবে চলে যায় যে একদিন বা দেড়দিনের মধ্যে তার চিহ্নই থাকে না। অত্যাচারের মুখে এরকম স্থানত্যাগের অজস্র উদাহরণ আছে। খড়ের ঘর গৃহস্থালির মাটির বাসনপত্র ত্যাগ করতে মানুষের কোনো কষ্ট হয় না। গবাদি পশু সমেত তারা নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় গিয়ে আগের ফেলে আসা জীবনের মতো আবার ঘরবাড়ি তৈরি করে নিয়ে কৃষিকাজে মন দেয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অত্যাচারের প্রতিরোধে গ্রামবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ ইতিহাসে দেখা গেছে।

আমি কলিঙ্গ থেকে গুজরাটে গ্রামবাসীদের আহ্বান করার নিমিত্ত লিখলাম—

সব প্রজাগণ মিলি করয়ে বিচাব।
কলিঙ্গ রাজার ঠাঞি না পাব নিস্তার।
বুলান মণ্ডল সনে জত প্রজাগণ।
বিরলে বসিয়া সভে করে নিবেদন ॥
এদেশে শত নাঞি চাস নদীকূলে।
হাজির সকল শস্য বরিষার কালে।
মসাত করিল রাজা দিয়া খাট দড়ি।
প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি ॥
তেশনি ইনাম ঘর গুজরাটপুর।
তোমার সকল প্রজা তুমি যে ঠাকুর ॥
কলিঙ্গ তেজিয়া সভে করিলা প্রয়াণ।
বুলান মণ্ডল চলে হইয়া প্রধান ॥

বন-জঙ্গল গ্রাম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। বন কেটে আবাদ করায় এই আবাদি ভূমির স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে কালকেতুর। তার জন্য সামান্য মাত্র রাজস্ব দিতে হবে রাষ্ট্রকে। কৃষিজাত ও হস্তজাত শিল্পের ঐক্যবন্ধন গ্রাম্য সমাজকে করে পূর্ণভাবে স্বয়ম্ভর। শিল্প ও কৃষির ঐক্যবন্ধনের ফলে উৎপাদনের শর্তকে পূরণ করে এই সমাজ গড়ে উঠছে জমির যৌথ মালিকানার উপর। প্রত্যেকটি গ্রামীণ সমাজ পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন, স্বয়ম্ভর এবং নিজের কক্ষপথে নিজের গতিতেই আবর্তিত হয়।

জমিতে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকের চিরস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক দাখিল স্বত্ব। কারণ সমস্যাটা জমির নয়, কৃষকের। লোকসংখ্যা অপেক্ষা কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ অনেক বেশি। চাষের জন্য প্রচুর অনাবাদি জমি পড়ে আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকেদের নিয়ে এসে কালকেতু তার রাজ্যে আস্তানা গড়তে প্রণোদিত করতে পারলে কালকেতুর বসতির নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য শুধু মাত্র বাড়বে না, রাজ্যের উন্নতির জন্য সে মন দিতে পারবে। সেচ

ব্যবস্থার উন্নতি, নীচু জমিগুলিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসা, নতুন নতুন চাষিদের সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে সে মনোনিবেশ করতে পারবে।

গুজরাট পত্তনে তাই কালকেতু বলে—

বীর কর অবধান প্রজাগণ দেহ পান
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য কড়ি বলদ কিনিতে কড়
সাধন হইবে বিলম্বিত।
....
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কারে না কর শঙ্কা
দক্ষিণ আশায় কর বাস।

কালকেতু বিশেষভাবে কৃষকদের আকর্ষণ করে—

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
....
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
....
সাত সন বই দিয় কর।
সেলামী বাঁস গাড়ী নানা বারে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজুরাট দেশে।
পার্বণি পঞ্চক-জাত গুড়া লোন সানা ভাত
ধান কাটি কলম কসুরে।
জত বেচ চালু ধান তার নাহি দিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।

আশেপাশের নগরগুলো থেকে দলে দলে শান্ত শিষ্ট নিরীহ প্রজারা এসে জুটতে থাকে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সঙ্গে আসে সাধারণ গোপ মোদক ধীবর প্রভৃতি দলিত সমাজের মানুষেরা। এতে বর্ণবৃত্তির পরিবর্তন হতে থাকে। দেখা যায়—

নিবাসে হলিক গোপ না জানে কপট কোপ
খেতে উপমায় নানা ধন
গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্সা কাপাস
সভার পূর্ণিত নিকেতন।
....
পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিক্রী করে
বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান।

আবার—

তেলী বসে কতজনা কেহ চাষী কেহ ঘনা।
কিনিঞা বেচায় কহে তেল।

শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, মুসলমানদের মধ্যেও পরিবর্তন হয়।

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘরবাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরেব লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে॥

মুসলমান বসবাসকারীরাও নানা গোত্রে ভাগ হয়ে যায়।

নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান
সাবধান হইয়া শুন হিন্দুর উঠান।

পাইয়া বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান।
বীবের নগরে বিপ্রগণ॥

ভালো প্রজার সঙ্গে সুবিধাবাদী কিছু মন্দ লোকও এসে জুটে গেল। যেমন এল ভাঁড়ু দত্ত।

ভেট লৈয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।

কালকেতুর নগরে প্রজা বৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতাপ, খ্যাতি এবং সমৃদ্ধি হরিদত্তের বেটা, জয়দত্তের নাতি ভাঁড়ু দত্ত কে ঈর্ষান্বিত করে তোলে। ভাঁড়ু দত্ত এমনি একজন লোক, যে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে। সে এসে এমন চোটপাট করতে শুরু করে দেয় যেন সে হচ্ছে কালকেতুর খাস লোক। কালকেতু বোকা। রাজ্য চালনা বড়ো সহজ কাজ নয়। অন্তত, নতুন রাজা কালকেতুর এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কমই আছে। তাই ধূর্ত ভাঁড়ু তার নিজের জীবন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে কালকেতুকে উপদেশ দেয়—

যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধান্যে দিব নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় প্রজাজন
শেষে যেন নাহি পাহ দাগা॥

তাই কেউ কালকেতুকে ঠকিয়ে নিচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তার। ভাঁড়ুদত্ত কিন্তু তার ইষ্টদেবতার কাছে নিত্য যুক্তকরে প্রার্থনা করে - হে ঠাকুর, গুজরাট নগর ছারেখারে যাক। কলিঙ্গরাজের অনুগত হয়ে আমরা নির্বিঘ্নে দিন কাটাই। কালকেতুর মহাভয় থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করো।

কালকেতু প্রজাদের আশ্বস্ত করলে কি হবে অত্যাচারী ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে পরামর্শ দেয় লাঙলপিছু খাজনা নেবার পরিবর্তে প্রজাদের কাছ থেকে ভূমি অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ ধানে শস্য নিতে। বলে—

তাড়াবালা দিবে মান দিবে হে বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়॥

ভাঁড়ুর পরামর্শে প্রজারা আতঙ্কিত হয়।
পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি

ভাঁড়ু দত্তের অত্যাচারে হাটে বাটে মানুষ দিন দিন অস্থির হয়ে উঠল। তারা একজোট হয়ে কালকেতুর কাছে গিয়ে নালিশ জানায়। ভাঁড়ু দত্তের অত্যাচারের কথা বলে তারা কালকেতুর রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার ভয় দেখায়। যারা একদিন অন্য জায়গা ছেড়ে কালকেতুর নগরকে সমৃদ্ধ করতে এসেছে, তারাই বলে—

সেই তারা বলে কিনি-
মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ুদত্ত লইয়া
সবে জাইব বিদায় হইয়া।

ভাঁড়ু যত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে,
না জানি পালাইয়া জাব কথি।

জমি নিয়ে কোনো বাদ-বিসংবাদ নেই। কারণ তা নিয়ে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কৃষকদের জমি এভাবে দেওয়া হয়েছে। জমি চাষ করতে ইচ্ছুক লোকেরা কালকেতুর কাছে এবং নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় খুশিমতো জমি চেয়েছে। তাদের অনুরোধ খুব কমই প্রত্যাখান করেছে কালকেতু। কারণ কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-দশমাংশও চাষ করা হয় না। জমির কোনো ঘাটতি নেই। ফলে যে কেউ ইচ্ছামতো জমি-জায়গা পেয়েছে।

কালকেতু শেষে ভাঁড়ুকে ডেকে স্পষ্ট বলে দিল, তুমি ন্যায্য সীমা লঙ্ঘন করে হাটে গোলমাল পাকাচ্ছ।

কিসের কারণে খুড়া ধর মোর ছলা।
পূর্বাপর আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা॥

ভাঁড়ুও ছাড়বার পাত্র নয়। সে আস্ফালন করে ওঠে। বলে,

হরিদত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি
হাটে যদি বেচোঙ বীরের ঘোড়া হাতি
তবে সুভাসিত করঙ গুজরাট ধরা
পুনর্বার হাটে মাসে বেচঙি ফুল্লরা।

ভাঁড়ু বাঙালি বীর বটে! আস্ফালন করে সে চলে যায় কালকেতুর শত্রু কলিঙ্গরাজের কাছে। ভেট নিয়ে যায় কাঁচকলা, পুঁইশাক ও কদলীর মোচা। কিন্তু এগুলো সে নিয়ে যাবে কি করে? তাই সে ভাইকে ডাকে। কিন্তু ভাই তো সহজে কাঁচকলা মোচা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে না। সে দাদাকে ভালোই জানে। তাই তোকে লোভ দেখাতে হয়। কীসের লোভ দেখানো যায়? বিবাহের। পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বয়েস হয়েছে যার অথচ বিয়ে হয়নি, তার বিয়ের প্রতি লোভ থাকবেই। আর যার দুপায়ে গোদ, তাকে কোনো মেয়ে পছন্দ করবে? অথচ তার বিয়ের প্রচণ্ড লোভ। ভাঁড়ু তাই ভাইয়ের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়।

ভাঁড়ুদত্তের ছোট ভাই নাম শিবা
পঞ্চাশ বৎসরে তার নাহি হয় বিভা।
সাম্য বাক্যে ছোট ভাইয়ের নিবারিল ক্রোধ
বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।
ভাড়ু দত্ত বলে ভাই দড় কর হিয়া
এবার মণ্ডলি পাইলে আগে তোমার বিভা।

এমনিতেই কলিঙ্গরাজ কালকেতুর প্রভাব প্রতিপত্তিতে ঈর্ষায় জ্বলছিল। তার উপর ভাঁড়ু দত্ত গিয়ে তাকে কালকেতুর বিরুদ্ধে নানান কথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে।
বলে—

দিন গোঁয়াও মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোরখণ্ড না কর বিচার ॥

কলিঙ্গরাজ সৈন্য পাঠিয়ে কালকেতুকে ধরে আনবার নির্দেশ দেয়। কালকেতুকে ধরে আনতে গিয়ে কোটাল অপমানিত হয়। কালকেতু তো আর এখন সাধারণ মানুষ নয়। সে-ও এখন একজন নগর অধিপতি এটা কোটালের মনে ছিল না। ভাঁড়ু দত্ত কলিঙ্গরাজকে পরামর্শ দিল কালকেতুকে আক্রমণ করার।

কিন্তু কলিঙ্গরাজের সৈন্যদল কালকেতুর সঙ্গে সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। অতঃপর ভাঁড়ু দত্তের প্ররোচনায় কলিঙ্গরাজ আবার কালকেতুকে আক্রমণ করল। কলিঙ্গরাজের পুনঃপ্রত্যাবর্তনে কালকেতু বিচলিত না হলেও ফুল্লরা যারপরনাই চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়ে কালকেতুকে যুদ্ধে নিরস্ত করে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিল—

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।
যদি আছে জীতে আশ ছাড়ি এদেশের বাস
প্রাণ নিয়া যাহ মহাবীর ॥

ফুল্লরার পরামর্শ মতো কালকেতু এবার যুদ্ধ না করে ধনঘরে আত্মগোপন করে থাকে। আব এটাই তার কাল হল। কলিঙ্গরাজ ভাবলে কালকেতু ভিতু, কাপুরুষ। তার সৈন্যরা কালকেতুকে ঘিরে ধরে ফেলে। তাঁকে নিপীড়ন করার জন্য কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

ভাঁড়ু দত্ত খুব খুশি হয়। কালকেতু ধরা পড়েছে। এবার ও জব্দ হবে। আমি এবার কলিঙ্গরাজাকে দেখালাম চণ্ডীর স্বপ্ন। চণ্ডীর ভয়ে ভীত কলিঙ্গরাজ কালকেতুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সসম্মানে তাঁকে মুক্তি দিল। বন্দিশালা থেকে মুক্ত হবার পর কালকেতু কলিঙ্গরাজকে প্রণাম করতে যায়। কিন্তু কলিঙ্গরাজ তার প্রণাম নেবে কেন, তিনি তো জেনে গেছেন কালকেতুর আসল পরিচয়।

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান।
প্রণাম করিতে রাজা না দিল বিধান ॥

ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমকথা আলাপে বসিল দুইজন ॥

লোকজন সহ প্রচুর ধনসম্পদ দিয়ে সম্মানের সাথে কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে গুজরাট নগরে ফেরত পাঠালেন। চণ্ডীর পূজা আরম্ভ হল। কলিঙ্গ ভূপতি ভগবতীর স্তব করলেন।

ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুর সঙ্গে আবার ফিরে এল ভালো মানুষটি সেজে। পুনরায় সে কালকেতুর দরবারে থাকতে চাইল। সে কালকেতুকে বোঝাতে চাইল যে সে-ই নাকি কলিঙ্গরাজের অসন্তোষ ও হিংসা, ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করে তাকে উদ্ধার করেছে। শুধু কি তাই! কালকেতুর বন্দিদশায় সে-ও তার পরিবার কী চিন্তায়, কী অসুখেই না কাটিয়েছে!

তুমি খুড়া হৈলে বন্দী   অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ   পাসরিলুঁ সব দুখ।

কিন্তু কালকেতু তার কথায় ভোলে না। তাকে দরবারে আশ্রয় দেয় না। অপমান করে বার করে দেয় দরবার থেকে। ভাঁড়ুকে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, নগরের বাইরে বের করে দেবার আদেশ দেওয়া হয়। সে হুকুম তখনই তামিল হল। ভাঁড়ুকে বের করে দেবার সময় এক পাল ছেলে ও রসিক জনেরা দল বেঁধে করতালি দিতে দিতে, গান গাইতে গাইতে তার পিছু নিল।

দিনে দিনে কালকেতুর বয়স বাড়ে। তার মুক্তির সময় হয়। শাপমুক্ত হয় ফুল্লরা কালকেতু দুজনেই। নীলাম্বর হয়ে কালকেতু ইন্দ্রালয়ে ফিরে যায়। ইন্দ্র ও শচী তাঁদের পুত্রকে স্বর্গলোকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হন।

কালকেতু ফুল্লরা পর্বের সমাপ্তি ঘটালাম এইভাবে।

রাঢ়ের মুকসুদাবাদের অন্তর্গত কান্দীর কাছে বড়এঞা অঞ্চলে গোলাহাট বলে একটা গ্রাম আছে। এই গ্রামের এক ছেলের নাম ছিল কালকেতু। জাতিতে সেও ছিল ব্যাধ। বড়এঞার কাছাকাছি আর একটা গ্রামের নাম রোজখাড়া। এই গ্রামে আছে একটা বিশাল মাঠ। তার নাম কলিঙ্গের মাঠ। এখানে পাল রাজাদের অধীনস্থ এক সামন্ত রাজার আবাস ছিল। ইনি শৈব ছিলেন। শৈব ধর্মাবলম্বী এই সামন্তরাজার সঙ্গে চণ্ডী পূজা নিয়ে সেই কালকেতুর বিরোধ বেধেছিল।

এই কাহিনির উপর নির্ভর করে রচনা করলাম ব্যাধ দম্পতি কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনি। লিখলাম কালকেতুর সরল আদর্শ জীবনের কথা। কালকেতু শক্তিধর পুরুষ, তাঁর স্ত্রী ফুল্লরা সাধ্বী নারী। পশুদের সঙ্গে কালকেতুর অন্তঃকলহ, পশুদের মিলনসভা, সভায় চণ্ডী নামধারী গণতান্ত্রিক একটি মঞ্চের উত্থান হল। আর এই গণ-মঞ্চের নায়ক হিসাবে কালকেতুর আবির্ভাব হল। চণ্ডীর কৃপা লাভ। চণ্ডীর দেওয়া অর্থে বন কেটে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা। কলিঙ্গরাজের আক্রমণে তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য সাময়িক রাহুগ্রস্ত হলেও চণ্ডীর কৃপাতেই অচিরে তাঁর বিপদ কেটে যাচ্ছে। আমার গল্পে বর্ণিত পশুরা কি সত্যি-ই পশু? তোমরা কি ভেবেছ একবার? এদেশে এমন অনেক মানব-গোষ্ঠী আছে, যাদের

তথাকথিত সভ্যসমাজ মানুষ বলেই মনে করে না। তাদের তারা পশুজ্ঞানই করে। গণ-মঞ্চের যে নায়ক, তার বিপদ কেটে যাচ্ছে চণ্ডীর কৃপায়? না। তা নয়। গণ-মঞ্চই তার হাতে তুলে দিচ্ছে অর্থ। আর অর্থ সবচেয়ে ক্ষমতাবান এযুগেও কেউ অস্বীকার করবে?

—হঠাৎ যুদ্ধ বাধালেন কেন?

—যুদ্ধ না হলে যে কালকেতুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে না।

—অষ্ট অলংকার, ব্যাল্লিশ বাজনা, যুদ্ধের নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কলিঙ্গের রাজা কালকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল।

—কালকেতু তার সঙ্গে পারবে কেন?

—তাই দেবী অলৌকিক কাণ্ড ঘটালেন?

—ব্যাধ কালকেতুর সঙ্গে সামন্ত শক্তি কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ হচ্ছে। সেই যুদ্ধে সামন্তশক্তি আত্মসমর্পণ করছে কালকেতুর কাছে। কালকেতু ব্যাধ, কিন্তু ব্যাধ নয়। সে দেবতার অংশ বলে নয়। দ্বৈত ভূমিকায় সে। একদিকে সে অনার্য সমাজের নেতা। অপর দিকে সে রাজশক্তি ও সামন্তশক্তির প্রভাবমুক্ত একটি নতুন সমাজ-জীবনের পরিকল্পনার ভগীরথ। বন কেটে বসত নয়, বন্যপ্রাণী উচ্ছেদ করে বসত নয়। একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে।

পর্বত রাজপত্রদেবী আসলে অরণ্যচারিনী। অরণ্যভূমিপূর্ণ কলিঙ্গ জনপদের অধিপতিকে তিনি স্বপ্নে দেখা দিলেন। নারকেলের ভিতরে যেভাবে জল প্রবেশ করে সেভাবে কালকেতুর জীবনে দৈবের মায়া এসে উপস্থিত হয়েছে। কলিঙ্গরাজ কালকেতুর কাছে পরাজিত হয়েছেন। ভালোরকম শিক্ষা পেয়ে তিনি চণ্ডিকার ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। তিনিও শুরু করেছেন চণ্ডীর পূজা। আসলে গণ-অভ্যুত্থানের কাছে সবই উড়ে যায় খড়কুটোর মতো।

কালকেতুর নির্দেশ মতো কংস নদীর তীরে অরণ্যভূমি প্রান্তে তমাল তরুতলে দেবীর দেউল নির্মিত হল। সেই দেউলে দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হল।

—তমলুকে এরকম বর্গভীমার মন্দির আছে। 'তমলুক' নামটির উৎপত্তি তমালবৃক্ষ থেকে হয়তো। তাম্রলিপ্তির সঙ্গে এর কোনো সংযোগ নেই। মহাভারতের যুগে নদীর কূলকে বলা হত কচ্ছ। যেমন, ভারতের পশ্চিম উপকূলে কচ্ছ বা কাঁথিয়ারা আছে, তেমনই বঙ্গের পূর্ব উপকূলেও আছে কচ্ছ, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি। মহাভারতের আদি পর্ব থেকে জানা যায়, এই কচ্ছপ্রদেশে পঞ্চতীর্থের জলে স্নান করতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এসেছিলেন।

মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, রূপনারায়ণ, দামোদর ও বাগদা রসুলপুর—এই পাঁচটি নদীই পঞ্চতীর্থের জল বহন করে। সেকালে পঞ্চতীর্থের এই জলে পাঁচজন সুন্দরী অপ্সরা বিচরণ করত। জলেই তাদের বসবাস ছিল, তবে ইচ্ছে করলে, ডাঙাতেও তারা ঘুরে বেড়াতে পারত। ওদের নেত্রী ছিল বর্গা।

একবার বর্গা ও চারজন অপ্সরা এক ব্রাহ্মণের তপস্যা ভাঙাতে গিয়ে, ব্রাহ্মণের অভিশাপে কুমির রূপ নিতে বাধ্য হয়। তখন তারা আর লজ্জায় ডাঙায় উঠতে পারে না।

পরে নারদমুনি যখন পঞ্চতীর্থে এলেন, কুমির হয়ে যাওয়া অপ্সরারা জানতে চাইল, কীভাবে অভিশাপ খণ্ডন হবে?

নারদমুনি বললেন, অর্জুন এসে লজ্জা ভেঙে ডাঙায় তুলবে। তখন তাঁরা আবার আগের রূপ ফিরে পাবে।

যথাসময়ে অর্জুন এলেন এবং ওই পাঁচটা কুৎসিত কুমিরকে টেনেহিঁচড়ে ডাঙায় তুললেন।

কুমিরগুলো ফের রূপবতী অপ্সরার রূপ ফিরে পেল।

রূপযৌবন ফিরে পেয়েই তারা অর্জুনকে বিয়ে করতে চাইল।

কিন্তু অর্জুন তার আগেই অনেক বিয়ে করে ফেলেছেন। তাই নতুন করে, আর পাণিগ্রহণ করে ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চাইলে না।

সুন্দরীদের পঞ্চতীর্থে রেখেই, মনের দুঃখ মনে চেপে, তিনি ফিরে গেলেন।

অর্জুন ফিরে যেতে না যেতেই ভীম এলেন তাম্রলিপ্তে, বকরাক্ষসকে বধ করতে।

বর্তমান গড়বেতার গনগনিডাঙার মাঠে ভীমের সঙ্গে বকরাক্ষসের তুমুল লড়াই হল। যুদ্ধে রাক্ষস মারা গেল।

ভীমের পৌরুষ দেখে তাঁর প্রেমে পড়ে গেল বর্গা। ভীমেরও ভালো লাগল তাঁকে। উভয়ের গান্ধর্বমতে বিয়ে হল। অনেক সন্তানও জন্মাল। তার পর এক সময় চোখের জল মুছে ভীমকে বিদায় জানাল বর্গা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভীম ফিরে গেলেন নিজের রাজ্যে।

ভীমের বিরহ জ্বালায় বর্গা প্রাণত্যাগ করল জঙ্গলে। তার শরীর পাথর হয়ে জমে গিয়ে ছোটো আকার ধারণ করল।

বহুদিন পরে বনের মাঝে এক ধীবর বর্গার সেই প্রস্তরীভূত মূর্তি দেখতে পেল। সে এই বিগ্রহ রূপে বর্গার পুজো করতে লাগল। পরবর্তীকালে বর্গার বিগ্রহ তমলুকের রাজবংশ ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অধিকারে আসে।

এইভাবে কালক্রমে বর্গা হয়ে গেলেন তাম্রলিপ্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'বর্গভীমা'।

এহেন শাক্তদেবী বর্গভীমা হলেন নানা কাহিনি-কিংবদন্তির নায়িকা, তাঁকে নিয়ে যেন গল্পের শেষ নেই। শোনা যায়, ভীম ও বর্গার সন্তানসন্ততিদির নাম বর্গাসোই। এদের বসবাস ওড়িশা ও মেদিনীপুর সীমান্তে।

আর ভীম?

হ্যাঁ, ভীমকেও ভোলেনি তমলুক তথা মেদিনীপুরবাসী। ভীমকেও তারা দেবতারূপে পূজা করছেন। ঘাটাল, তমলুক ও তার আশপাশে মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে ভীম পুজো এখানে রীতিমতো জাঁকজমক করেই প্রচলিত আছে।

এরকম আমিও নিবিড় অন্বেষণে মেতে থাকি। খোঁজ খোঁজ উন্মাদের মতো সন্ধান করি। জানতে পারি, বড়এলা অঞ্চলে এক সময় বিরাট বন ছিল। তাকে বলা হতো গুজারের বন। আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলি বন কেটে নতুন বসতি গড়ে তোলার কথা। একটি নতুন ভাবনা। বনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে তৈরি এক নতুন সমাজ-জীবন। ঘটনা ক্রমশ বেশি করে আকর্ষণীয় হয়ে পড়ে। তা হোক, আমি উৎসাহিত। লেখা যত এগিয়েছে, নতুন নতুন উত্তেজনা আমার দেহ মনে ভর করেছে।

কালকেতুর ভালো হোক। সে হয়ে উঠুক মহাকাব্যের নায়ক। আমার এই কামনা। ফুল্লরা আর কালকেতু ওদের সার্থকতাতেই যেন আমার সব সুখ। নিজের জীবনের ব্যর্থতা সব আমি ঢেকে দিতে চাই ওদের সার্থকতায়। মর্ত্যে চণ্ডীর পুজো ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। দিন দিন তার জাঁক কমে যায়। কালকেতু স্বর্গলোকে চলে যায়।

কাজেই পার্বতীকে আবার ভাবতে বসতে হয়।

মর্ত্যে পুজোর প্রচার হয়েছে। কিন্তু সে পুজো প্রত্যন্ত ও সংকীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রয়েছে। কলিঙ্গ জনপদ এবং তৎসংলগ্ন দরিদ্র অঞ্চলের মানুষ তাঁকে কেবল পুজো করে। কিন্তু তাতে চণ্ডীর মন ভরে না। দেবী ঠিক খুশি হতে পারেন না পুনরায় পদ্মাবতীর সঙ্গে যুক্তি করতে বসেন।

পদ্মা এবার পরামর্শ দেয় দেশের উন্নত শহর উজানিতে ধনপতি নামে এক শিবভক্ত বণিক বাস করে। তাঁকে অবলম্বন করে নতুন একটা পুজো পুজো খেলা করো। তাঁকে যদি একবার রাজি করতে পারো, তাহলে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে।

ধনপতি সমাজে বণিক শ্রেষ্ঠ। তাঁকে বাধ্য করাতে পারলে তোমার নাম তো হবেই যশও হবে, বাড়বে প্রভাব প্রতিপত্তি। সেই সঙ্গে অকর্মার ঢেঁকি শিবকেও যদি কিছুটা শায়েস্তা করতে পারো।

কাজটা কি সহজে হবে? পার্বতীর নিজেরই সন্দেহ হয়। ধনপতি যে শিবের ভক্ত।

—চেষ্টা করেই দ্যাখো না।

লিখতে বসলাম আবার। এবারে লিখেছি ধনপতি সদাগরের কাহিনি। চণ্ডীর আক্রোশে তাঁকে কারাবরণ করতে হল। খুল্লনা-ধনপতির রঙিন দাম্পত্য জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিলেন চণ্ডী।

বন সন্নিহিত গ্রাম। মানুষ বসবাস করে। মানবচিত্তে কত না ভাবলহরি।

এবার আমার কাহিনি'র নায়ক তাই হল একজন সওদাগর।

ধনপতির সাত ডিঙা। প্রত্যেক নৌকোরই এক একটা নাম থাকে। প্রধান তরির নাম মধুকর। সদাগর নিজে এই তরি ব্যবহার করে। নৌকোগুলো বছরের বেশির ভাগ সময়ে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। বাণিজ্যে যাত্রার পূর্বে মাঝিরা নৌকোগুলো ওপরে তোলে। কোনো কোনো নৌকো দৈর্ঘ্যে শত গজ ও প্রস্থে বিশ গজ। নৌকোর সামনের দিকেই গলুই নানারকম জীবজন্তুর মুখের আকৃতির আকারে নির্মিত হয়। বহু মূল্যবান পাথর অথবা গজদন্ত, স্বর্ণ রৌপ্য দিয়ে তাতে নানা কারুকার্য করা হয়।

কাঁঠাল, পিয়াল, শাল, গাম্ভারী, তমাল এই সব কাঠ দিয়ে নৌকো তৈরি হয়।

প্রধান মাঝিকে বলা হয় কাণ্ডারী। নৌকোতে যারা দাঁড় টানে তাদের বলা হয় সাবর। সারিগান গেয়ে তারা সুরে ছন্দে দাঁড় টানে। পুরী, কলিঙ্গপত্তন, চিক্কাচুলি (চিকাকোল), বাণপুর, মসলিপত্তন, সেতবন্ধ-রামেশ্বর, লঙ্কাপুরী, বিজয়নগর, পাটন (গুজরাট) এগুলো সব বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর। এই বন্দরগুলোতে বড় বড় বিদেশি বাণিজ্যপোত সব সময় ভীড় করে থাকে। সূত্রধর, কামার ও ডুবুরীরা প্রতি যাত্রাতেই সঙ্গী হয়। কারণ যাত্রাপথে প্রয়োজন হয় নৌকা মেরামতির। এছাড়াও একদল পাইককে সঙ্গে রাখতে হয় জল দস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। সূর্য ও তারার গতিপথ দেখে নৌকার গতিপথ ও দিকনির্ণয় করা হয়।

এদেশের কুটির শিল্পের অস্থি-মজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে বাঁশ। নদী নালায় নৌকা চালাতে চালাতে বাংলার মাঝি যখন লগি ঠেলতে ঠেলতে বলে ওঠে, এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে না। তার মানে কী?

জেলে ও মাঝিদের কাছে জলের গভীরতা এক বাঁও জল। মানে এক বাঁশ জল, অর্থাৎ জল অনেক গভীর।

এই বাঁশ আসলে ঘাসেরই এক প্রজাতি। নলখাগড়া বা আখ বাঁশেরই রকমফের। অনেক রকমের বাঁশ আছে। যেমন লম্বা বেঁটে, মোটা, সরু, ভারী আবার হালকা। কোনও বাঁশ যদি লোহার মত শক্ত ও ভারী হয় তবে কোনও কোনও বাঁশ আবার কাগজের মতো হাল্কা। এই বাঁশের ভেলাতেই অর্থাৎ নলখাগড়ার নৌকায় চেপেই একদিন আদিম মানুষ পাড়ি দিয়েছে দিকচিহ্নহীন সমুদ্র পারাবারে। পৌঁছেছিল এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে। এই নলখাগড়া বা প্যাপিরাসেই মানুষ লিখেছে সভ্যতার আদি দলিল।

লিখছি বণিক পরিবারের কাহিনি। ধনপতি লহনা খুল্লনা আর শ্রীমন্ত।

ইন্দ্রের প্রিয় নর্তকী রত্নমালা।

ইছানী নগরে লক্ষপতি নামে এক ধনশালী গন্ধবণিকের বাস। রত্নমালা তার কন্যারূপে জন্ম নিল। নাম হল তার খুল্লনা।

ধনপতি উজানি নগরের বিশিষ্ট সওদাগর। সে বিবাহিত, তার পত্নী লহনা উজানির অনতিদূরবর্তী ইছানি নগরের কন্যা।

সে-ও ধনী বণিকের কন্যা।

ধনপতি একদিন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে পায়রা ওড়াচ্ছিলেন। একটি গিয়ে পড়ল একেবারে খুল্লনার আঁচলে। খুল্লনাও সঙ্গে সঙ্গে পায়রাটিকে আঁচলে ঢেকে ফেলল। ধনপতি ইছানিতে খুল্লনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হল পায়রার জন্য।

কে তুমি পায়রা লয়ে যাও হে সুন্দরি।
পারাবত লয়ে মোর কর প্রাণ চুরি ॥
অমূল্য পায়রা মোর জানে সর্বজনে।
লুকায়ে রাখিলা তাহা ঝাঁপিয়া বসনে ॥
পারাবত দিয়া মোরে করহ পীরিতি।
নহিলে জানাব গিয়া বিক্রম ভূপতি ॥

খুল্লনাও কোনোমতেই তার আশ্রিত পায়রা ত্যাগে রাজি নয়.....সে বলে,

প্রাণভয়ে পারাবত লয়েছে শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন ॥

লহনার খুল্লতাত বোন খুল্লনা। সে অসামান্য সুন্দরী। খুল্লনাকে দেখে তাকে বিবাহ করবার প্রবৃত্তি জাগে ধনপতির মনে। পুরোহিত ও পরামর্শদাতা জনার্দন ওঝার সঙ্গে পরিকল্পনা করে তাড়াহুড়োর মধ্যেই ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করে উজানি নগরের বাড়িতে নিয়ে আসে।

প্রথমা স্ত্রী লহনা থাকা সত্ত্বেও বণিক ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছে।

অসন্তুষ্ট হলেও এ নিয়ে গোল বাঁধল না বিশেষ। দুই সতিনে ভাব হল, কারণ তারা দুই বোন। কিন্তু বিবাহের পরই উজানি নগরের রাজার আদেশে ধনপতিকে গৌড়ে যেতে হবে। রাজার নির্দেশ সেখানে একটা সোনার খাঁচা তাকে তৈরি করে দিতে হবে। এজন্য তাকে থাকতে হবে এক বৎসর। আর তারপরই রাজার আদেশেই ধনপতি সপ্তডিঙা নিয়ে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রায় বের হবেন।

খুল্লনা চণ্ডীর ভক্ত। পতির মঙ্গল কামনায় সে চণ্ডীপূজায় বসল। কিন্তু স্বামী ধনপতি চণ্ডীকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। তার মতে একজন মেয়েছেলে আরাধ্য দেবী হিসাবে পূজিতা হবে ঘরের মধ্যে এ কোন্ দেশি কথা! এক অকল্পনীয় ব্যাপার। নিজে তিনি শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত, শুধু জানেন শিবকে। অমঙ্গল নয় মঙ্গল, ভবিতব্য নয় পৌরুষ, সর্বনাশ নয় সর্ব-অর্জন, এরই উপরে বিশ্বাস রেখে এগোতে চায় তাঁর জীবন।

এদিকে লহনা প্রথমে সপত্নীকে ভালোভাবেই নিয়েছিলেন। কিন্তু সংসারের খরচ কমানোর জন্য এবং অভিভাবিকা দুর্বলার বাঁকা বাঁকা কথায় তার ধারণা হল যে খুল্লনার জন্যই তার স্বামী সৌভাগ্য নষ্ট হয়েছে। ওকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর থেকেই স্বামী অনিশ্চিত কালের জন্য বিদেশে চলে যাবেন। কবে ফিরবেন, আদৌ ফিরবে কিনা এই সব নানা ভাবনায় তার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হল। খুল্লনাকে সে শত্রু হিসাবে দেখতে শুরু করল। তাঁকে গাল দিল প্রিয়প্রাণহন্তী বলে। খুল্লনার দুর্গ্রহ কাটাবার জন্য তাকে নীচ বেশ, নীচ আহার, নীচ শয্যা, প্রতিদিন ছাগল চরাতে হবে এই সব বিধান দেওয়া হল।

খুল্লনাকে প্রতিদিন নগরের বাইরে গিয়ে ছাগল চরাতে যেতে বাধ্য করা হল। বনে বনে ছাগল চরায় খুল্লনা আর নিজের দুঃখের কথা ভেবে কাঁদে। তাঁর স্বামী দৃপ্ত বিত্তবান খ্যাতি-সম্পন্ন পুরুষ অথচ অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন।

একদিন ছাগল চরাতে গিয়ে এক ভৈরবীর সাথে খুল্লনার দেখা হল। ভৈরবী তাকে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করল। খুল্লনার কথা শুনে ভৈরবী তাকে সান্ত্বনা দেয়।

বলে, কে কাকে মারতে পারে বলো তো? মারবার কর্তা তো একজনই। যে মরবে তিনি তো তাকে মেরে রেখেছেন। সকলেই মরে। তবে যিনি সর্বময় কর্তা তিনি যদি নির্দিষ্ট করে থাকেন যে তোমার হাতেই তাঁর সংসার যন্ত্রণার অবসান, তবে কার সাধ্য তার অন্যথা করে। তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও না কেন?

খুল্লনা দুঃখে বলে, তাই তো তাঁর সামনে হাজির হই না।

—ভুল কর। তাঁর সামনে বেশি বেশি করে হাজির হবে।

—তাঁর সামনে হাজির হলে তিনি যদি না ছাড়েন?

—ভালোই তো। তুমিই বা ছেড়ে আসবে কেন?

—আমি কি সদাগরের বামে বসার যোগ্যা?

—অবশ্যই। যখন তোমাকে প্রথম দেখি জঙ্গলে জঙ্গলে ছাগল চরাচ্ছ, তার থেকে এখন তোমার রূপ কতগুণ বেড়েছে তা তুমি বুঝতে পারছ না। কোন্ রাজমহিষী তোমার রূপের তুল্যা?

—ছি! কিন্তু আমার লক্ষণ যে প্রিয়প্রাণহন্তী?

—ভুলে যাও সে কথা। আমি বলছি তুমি সুখী হবে। পুত্র সৌভাগ্যবতী হবে।

ঢেঁকিশালে তার শোয়ার ব্যবস্থা। আধপেটা করে খেতে পায়। লোকের খেতে ছাগল ঢুকলে অকথ্য অপমান সহ্য করতে হয়। তবু তার দুঃখের মধ্যেও খুল্লনা তার হারানো ছাগলের সন্ধানের জন্য দেবকন্যাদের পরামর্শ পায়। তারা বলে,

আমরা ইন্দ্রের সুতা সকল ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর পূজা এসেছি অবনী॥
পূজার উচিত স্থান এ ভারত ভূমি।
বিপদ হইবে দূর ব্রত কর তুমি॥

সমাজে কত কি বিধান প্রচলিত আছে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে বিধবাবেশে আভরণ ত্যাগ করে অথবা সধবা বেশ ললাটে সিঁদুর ও চুলে চিরুণি আটকিয়ে অনুমৃতা হতে হয়। খুল্লনার আশঙ্কা তার স্বামী চণ্ডীর কোপানলে পড়েছেন। তিনি নিরীশ্বরবাদী। খুল্লনা তাঁকে দিয়েই চণ্ডীর পুজো করাতে চায়। কিন্তু ধনপতি মানতে চান না চণ্ডীর কোনো অস্তিত্ব, রওনা হবার সময় খুল্লনাকে চণ্ডী পূজা করতে দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি লাথি মেরে চণ্ডীর ঘট ফেলে দিলেন।

মাথার উপর ডোম-চিল উড়লে, পথে কাঠের বোঝা দেখতে পেলে, টিকটিকির ডাক শুনলে, চলার পথে হোঁচট খেলে, কাপড়ে কাঁটা বিঁধলে, শুকনো ডালে কাক ডাকলে, যোগিনী অর্ধেক লাউ ভিক্ষা চাইলে, তেলি তেল নেবে গো হাঁক পাড়লে অথবা বামে সর্প, ডাইনে শিয়াল দেখতে পেলে মনের মধ্যে কু-ডাক দেয়। তেমনি অমঙ্গলের আশঙ্কা তৈরি হয় খুল্লনার মনে। প্রতিনিয়ত অমঙ্গলের আশঙ্কা তৈরি হতে থাকে তার মনে। আর খুল্লনার রূপ যৌবনের সুখ দেখে লহনা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। সে খুল্লনার মতো যৌবনবতী নয়। তার যৌবন বিগতপ্রায়। ঈর্ষায় জ্বলে সে খুল্লনাকে বলে,

নারীর যৌবন কেবল অধম
জেমন জলের ফোঁটা

প্রভাতে সবুজ ঘাসের ওপর জলের বিন্দুর নিটোল সৌন্দর্য আছে বটে। সূর্যাভায় তার টলটলে ঝিকিমিকি রূপ সকলকে মুগ্ধ করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী, প্রভাতের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। নারীর পূর্ণ যৌবনও তেমনি সুন্দর। তাছাড়া খুল্লনা অলক্ষণা এই রকম অপবাদ দেওয়া ধনপতির একটা জাল চিঠি তাকে দেখাল দুবলা। খুল্লনার মন দুঃখে ভেঙে পড়ে। স্বামী তার পুজোর ঘট ভেঙে দিয়েছেন। তার কপাল পুড়েছে।

স্বামী বিদেশে। এর মধ্যে আবার খুল্লনার গর্ভবতী হওয়ার লক্ষণ দেখা দিল। লহনা জ্যেষ্ঠা, সপত্নী হলেও খুল্লনাকে এ সময়ে দেখতে হয়। তাছাড়া বংশধর আসছে। তাই সে খুল্লনাকে জিজ্ঞেস করে, তার কি খেতে ইচ্ছে করছে। খুল্লনা বলে,

আপনার মতো পাই, তবে গ্রাস চারি খাই।
পোড়া মাছে জামীরের রস॥
উদরে পরম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখ কথা,
ওদন ব্যঞ্জন নিমবারি।

যদি পাই মিঠা ঘোল, বদরী-শকুল ঝোল,
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি ॥
লতা পাতা বন শাক, খর জ্বালে করি পাক,
সন্তলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া ॥
সন্তাল লবণ তথি দিবে হিং জিরা মেথি,
বহিন গণি যদি কর দয়া ॥
নিদান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙা শাক।
যদি পাই কিছু পূপ আমে মসুরীর সূপ,
আমসিতে প্রাণ পাই, রাখ ॥
আমি যেন পাই সোনা শকুল মাছের পোনা,
ফোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিন কাঞ্জী, উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
বনশাকে বড়ই পিরীতি ॥

পুত্র শ্রীমন্তের জন্য হল। সে বড়ো হচ্ছে। শিক্ষাগুরু শ্রীমন্তকে তার জন্ম নিয়ে অকথা কুকথা বলতে ছাড়ে না। বলে—

পিতা তোর পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জানি আপনার জাতির মরম ॥
মরে গেল ধনপতি শুনি বহুদিন।
মায়ের আয়তি হাতে আমিষ ভোজন ॥
জারজ অধমে আমি শুনাব পুরাণ।
এই হেতু আমার এতেক অপমান ॥

তাও সহ্য করতে হয় খুল্লনাকে। ধনপতি দেশে ফিরলেও সতিন লহনা ছেড়ে কথা বলে না।

বলে—

নিষেধ না মানে ছুঁড়ি না মানে দোহাই।
ষাড় চাহিয়া বুলে যেন বাতানিয়া গাই ॥

অভাগী নারী পতি-সোহাগ কামনায় নিজের মধ্যে কত কি ঔষধ প্রয়োগ করে। এইভাবে বৎসর কেটে যায়। তবু স্বামী প্রসন্ন হয় না। শেষে চণ্ডী প্রসন্না হলেন। বিদ্যাধরীদের দিয়ে নিজের পূজাব্রত তাঁকে ভালোভাবে শিখিয়ে দিলেন। তখন সে স্বামীর আদর ফিরে পেল।

খুল্লনা স্বামীর আদরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দিন চলে যায়। ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হয়। ধনপতি স্থির করে ঘটা করে পিতৃশ্রাদ্ধ করবে। বুলন কান্তার ঘরে ঘরে গুয়া ও সন্দেশ দিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসে।

কুটুম্ব-বন্ধুজনদের খাওয়াবার জন্য বাড়ির চেড়ী দুর্বলাকে পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়ে হাটে পাঠায়।

ধনপতি বলে, ওতেও যদি না হয় তবে অমুক বেনের কাছে দু চার টাকা ধার নিবি।

দুবলা তসরের শাড়ি পড়ে কপালে চন্দন চুয়ার ফোঁটা এঁকে হাতে পান গুয়া নিয়ে হাটে যায়। সঙ্গে তার দশ জন ভারী। কড়ি দিয়ে দুর্বলা শাক-পাতা, মাছ, শশক, কচ্ছপ, খাসি, দুধ, দই, ক্ষীর, নারকেল, কলা, নবাত চিনি, গুড়, আটা, হাঁড়ি প্রভৃতি রান্নার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। খাসির দাম আট কাহন, শশকের দাম আট পণ, এক পণ পানের দাম এক পণ, এক সের তেলের দাম দশ বুড়ি, ভারীদের বেতন জন প্রতি এক পণ হিসেব রাখে।

রন্ধন সাজ কিনে দুর্বলা স্নান করে। তারপর দই, গুড়, কলা দিয়ে নিজে আহার সেরে নেয়। ভারীদের আহারের জন্য চিড়ে দই কিনে দেয়। হাট থেকে দাস-দাসী কেনে। গা টিপে টিপে তাদের দেখে নেয়, কারোর কোনো রোগভোগ আছে কিনা। দেখে রাজার কর্মচারী মণ্ডল হাটে তোলা তুলছে। কোটাল ও মোড়ল দু-পয়সা বাড়তি রোজগার করে নিচ্ছে। এসব দেখে নিজের মনেই হাসে। বুঝল সেয়ানা লোকেই রাজার কাছে মোড়লি করার কাজ চেয়ে নিয়েছে। রাজাও ঠিক লোক বাছাই করেছে। দুর্বলা হাট থেকে ফিরে হিসেব দেয়—

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুবলার প্রাণ।
লেখাপড়া নাহি জানি কহিব হৃদএ গণি
একদণ্ড কর অবধান ॥

ধনপতি নিমন্ত্রণ দিয়ে দেশ বিদেশের যত জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছিল সবাইকে নিয়ে আসলেন গৃহে। তারা সবাই উপস্থিত হলেন। বর্ধমান ও হুগলি জেলার নানা জায়গা থেকে ষোলো শত বেনে উপস্থিত হলেন। কেউ এলেন ঘোড়ায় চড়ে, কেউ এলেন দোলায়, কেউ বা হাতির পিঠে, কেউ বাঁকে করে, কেউ বা নৌকোয় চড়ে এলেন। কেউ কেউ এত ধনী যে তাঁদের রথ সাত ঘোড়ায় টানে। কারোর বার মহলে নাকি সাত মরাই টাকা থাকে। সেই সব গল্প করতে করতে পুরুষেরা এলেন হাতে তাড়বালা, কানে বউলী পড়ে। খাওয়া দাওয়া পান ভোজনের পর পাশা খেলার আসর বসল।

কিন্তু টাকা থাকলেই কি বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ধনপতি আগে কার কপালে চন্দন ও গলায় মালা দেবে এনিয়ে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হল। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে জ্ঞাতিরা মালাচন্দন দ্বারা সম্বর্ধিত হন এবং শ্রেষ্ঠ নির্বাচনে প্রায়ই গোলমাল হয়। পান খাওয়া, পান দেওয়া প্রচলিত রীতি। কাউকে সম্মান করতে হলে পাদ্য অর্ঘ, অথবা কাউকে কোনো কাজের ভার দিতে হলে তাকে পান দিয়ে আরতি করা হয়। এই হচ্ছে রীতি।

ধনপতি অতিথিদের সম্মান জানাতে এসে প্রথমে সবচেয়ে বয়স্ক, ধনী ও সম্মানিত চাঁদ সদাগরের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উঠল। একজন অতিথি বলে উঠল—

বান্যার সভার আমি আগে পাই মান।
সম্পদে মজিআ না কর অবধান ॥

ধনপতি অহংকারী তিনি জানালেন সভায় চাঁদের তুল্য মান্য কেউ নেই—

ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে জার সাত মড়াই টাকা ॥

এতে প্রতিবাদ উঠলো আরো—

কলঙ্ক খণ্ডএ ধনে কুলের প্রকাশ ॥
ছয় বধূ জার ঘরে নিবসএ রাঁড়।
ধনে হিতে চান্দ হইল সভামাঝে ষাঁড়

সম্মানিত চাঁদও বক্তার উদ্দেশ্যে ক্রোধে বলে উঠলেন,

হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আঙলা।
জতন করিআ তাহা কিনিত অবলা ॥
নিরন্তর হাথাহাথি বারবধূসনে।
নাঞি স্নান কররা বেটা বসিত ভোজনে ॥

—আচ্ছা আপনি যে ধনপতির বাড়িতে চাঁদ সদাগরকে উপস্থিত করেছেন, তাহলে কে আগে? চাঁদ সদাগর না ধনপতি?

—চাঁদ সদাগরের নাতি আর ধনপতি সদাগর দুই সমবয়সী। শৈব ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে লৌকিক অনার্য ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন চাঁদ সদাগর সেই দলের নেতা। উচ্চতর বাংলার সমাজ তখন বৌদ্ধধর্ম শৈবধর্মের মধ্যেই আত্মগোপন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম উপাখ্যান ও দ্বিতীয় উপাখ্যানের মধ্যবর্তী মনসামঙ্গল উপাখ্যানের ঘটনা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় উপাখ্যানে ধনপতি সদাগর ও মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ সদাগর দুজনে একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিত এবং সেই স্থান হল বর্ধমান। ধনপতি 'আগে জল দিলা চাঁন বেনের চরণে।।' দুজনেই বর্ধমান জেলার রাঢ় অঞ্চলের লোক। চাঁদ সদাগরের জন্মের পূর্বেও মনসার পূজা সমাজে ছিল তবে কোনো সম্মানজনক স্থানলাভ করতে পারেনি। লৌকিক চণ্ডী লৌকিক মনসা অপেক্ষা প্রাচীন। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে যখন লৌকিক চণ্ডীর প্রচার চলছে, উচ্চবর্ণ সমাজে তখন লৌকিক চণ্ডী তার আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন। কারণ চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম উপাখ্যান ও কালকেতু ও ফুল্লরাকে কেন্দ্র করে মর্ত্যে লৌকিক চণ্ডীর ঘটনা মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের ঘটনার অনতিকাল পূর্বের। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক বর্ধমানের আদিবাসী ডোম, চুয়াড়, কাঁহার, কিরাত, নিষাদদের প্রতিনিধি ব্যাধ কালকেতু আর মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক বৈশ্য সওদাগর। তিনি আসছেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় উপাখ্যানে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভাগে এই বক্তব্যের উদ্ভব। এই সাহিত্য এই সংস্কৃতি প্রেমের নয়, ভক্তির নয়, সুন্দরের নয়, এমনকি অনির্বচনীয় সঙ্গীতেরও নয়। এই সাহিত্য-সংস্কৃতি একান্তভাবে গার্হস্থ্য জীবনের। মালাধর বসু তিনিও গল্পরস নিয়ে এসেছেন পুরাণ থেকে কিন্তু আমার কাহিনি বাস্তব জীবনের।

চরিত্রহনন ও জাতপাত বিচারে ধনীলোকেদের ঘরের কুৎসা বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে আসে

এমন সব ব্যাপার যা শুনলে আজকের দিনেও তোমরা অবাক হবে। জানা যায় কারোর ঘরে ছয় ছয়টা বউ, কেউ পতির সহমৃতা হয়নি। সমাজে বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত। আর এই সব থেকে অনাচারের নেতৃত্বে বাস ধনীদের। সতিনদের কোন্দল মেটাতে স্বামীকে দিতে হয় পাটের শাড়ি, সোনার চুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। সব বড়ো লোকেদের ঘরের কেচ্ছা। ব্রাহ্মণদের ঘরেই বেশি স্ত্রী থাকে। প্রথমা পত্নী বাঁজা এবং স্বামী ধনবান তাই ঘরে দুই স্ত্রী নিয়ে এসেছেন। কারও পিতা হাটে আমলকি বেচে দিন চালায়। কেউ স্নান না করে খেতে বসে। এইসব কেচ্ছার মাঝে ধনপতির নিজের ঘরের কেচ্ছাও বেরিয়ে আসে। কথা উঠল ধনপতি যখন বিদেশে ছিলেন, তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রী কোন্দল করে মেরে ধরে দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, অভাগী খুল্লনা এক বছর ধরে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় বনে বনে ছাগল চরিয়েছে। তখন তার বয়েস সবে তেরো। বনে বনে শতেক মাতাল ঘুরে বেড়ায়। কেউ না কেউ খুল্লনার চরিত্র নষ্ট করেছে। কে জানে খুল্লনার সতীত্ব আছে কিনা! সুতরাং খুল্লনার হাতের রান্না কেউ ছোঁবে না। বলা হল তাঁকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হবে। নইলে কেউ ধনপতি গৃহে অন্ন গ্রহণ করবে না।

ধনপতি ভীষণ ফাঁপরে পড়ে গেলেন।

তাঁর শ্বশুর রাজার দোহাই দিল। কিন্তু সবাই বলে জ্ঞাতিকে রাজা বলে দেখানো তো ঠিক নয়। রাজা ধন প্রাণ নিতে পারেন। কিন্তু রাজা কি জাত-ধর্ম দিতে পারেন?

ধনপতি লক্ষ টাকা দিয়ে বন্ধুদের বশ করতে চাইলেন।

বুদ্ধিমতী খুল্লনা তাতে বাদ সাধলেন। সে জানে এরা টাকাও নেবে, আবার বদনামও দিয়ে যাবে। সে বলল,

অবোধ পরাণনাথ বলি হে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিব কলঙ্ক ॥
সাধারণ নহ হে জ্ঞানী বড়লোক।
সভায় কন্দল দ্বন্দ্বে খোটা দিব লোক ॥
পরীক্ষা লইতে তুমি যদি কর আন।
গরল ভখিআ আমি তেজিব পরাণ ॥

খুল্লনা পরীক্ষা দেবে বলেছে। গঙ্গা জলে স্নান করে সে সর্বমঙ্গলার পূজায় বসল। অভয়া তাঁকে আড়ালে অভয় দিলেন।

সভায় শত পণ্ডিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষার বিধি নির্বাচন করলেন। অশ্বত্থপত্রে মন্ত্র লেখা হল। দুই পথিক সেই পত্র মাথায় নিয়ে সরোবরের জলে ডুব দিলেন এবং উঠলেন। পত্রদ্বয়ও দেখা গেল উঠে এল তাঁদের মাথায়, খুল্লনার জয় হল।

সব দেখে শুনে হর-পার্বতী খুব খুশি। মামলা ঠিক মতো এগিয়েছে। তাঁরা আবার ছক কষতে বসলেন!

লোকে বললে, জলের পরীক্ষা? ও কিছু নয়! হয়তো পথিক দুজনের সাথে ধনপতির সাঁট ছিল।

তাই মালদের ডাকা হল। একটা নতুন ঘটের ভিতরে বিষধর সাপ ও সোনার অঙ্গুরী রাখা হল। খুল্লনা সেই ঘটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সাত সাতবার অঙ্গুরী তুলে আনলেন। এবারও খুল্লনার জয় হল।

কিন্তু নিন্দুকদের ছলনার অভাব হয়না। তারা বলল, এই পরীক্ষা কিছু নয়। সাপের মুখ বাঁধা যায়। তখন কামার ডাকা হল। কামার এসে আগুনে লোহার শাবল তাতিয়ে লাল করল। অশ্বত্থপত্রে বীজমন্ত্র লিখে আবার খুল্লনার হাতে দেওয়া হল। খুল্লনা আগুনে পোড়া সেই জবা বর্ণ শাবল হাতে করে ধরে দূরে তৃণের উপরে ছুঁড়ে ফেল দিল। তৃণ জ্বলে পুড়ে গেল।

তবুও নিন্দুকের দল শান্ত হয় না। তাদের মন ভরে না কিছুতেই। কেউ জয়ধ্বনি করে, আবার কেউ সমালোচনা করতে ছাড়তে না। অর্ধস্ফুট স্বরে বলতে থাকে, আমার তো বিশ্বাস হয় না।

এক বর্ষীয়সী বলে, পোড়া কপাল—উনি আবার সতী?

কেউ বলে, সওদাগর এ সবে ভোলেন ভুলুন, আমরা এ সবে ভুলছি না।

সব কথাই ধনপতির কানে যায়। খুল্লনাকে ধনপতি বলে, সকলে তোমার কথা বিশ্বাস করছে না।

খুল্লনার মুখ অবনত হয়। স্বামী কি বলছে? তার চোখের জল বাধা মানে না। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সামলায়। তারপর মুখ তুলে বলে, লোকের যখন বিশ্বাস হয় না, তখন আমার একমাত্র গতি এ জীবন শেষ করে দেওয়া। আপনি চিতা প্রস্তুত করতে আজ্ঞা দিন। আমি চিতায় প্রবেশ করে, সকলের সামনে পুড়ে মরি। এতে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলেছে, মরলে সে দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু আপনিও কি লোকের মতো আমাকে অবিশ্বাসিনী ভাবছেন? তাহলে পুড়ে মরেও আমার দুঃখ ঘুচবে না। আপনি যদি সবার সামনে বলেন যে, আমার প্রতি আপনার কোনো অবিশ্বাস নেই তাহলে চিতায় জ্বলে মরাকেও আমি স্বর্গ বলে মনে করব।

ধনপতি প্রমাদ গোনেন। এই পরিস্থিতি তিনি কি করে সামলাবেন?

আগুনে ঘি গরম করা হল। খুল্লনা সেই গরম ঘিয়ের ভিতরে ফেলা দেওয়া সোনা হাত ডুবিয়ে তুলে নিয়ে এল।

নিন্দুকেরা এবারে বলল, যা হোক এত দ্বন্দ্বে আর কাজ নেই বাবা! এখন ধনপতি সেই যে প্রথমে লক্ষ টাকাটা দিতে চেয়েছিল সেটা পেলে খুল্লনার সব পাপ ঘুচে যায়। আমরাও মানে মানে বাড়ির পথ ধরি।

ধনপতি তখন রেগে আগুন। বণিকেরা বারবার হেরে গেছে তবু তাদের কানাকানি থামে না। ধনপতির এক পিসতুতো ভাই, সে আবার এক কাঠি উপরে। সে রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা তুলল।

বলল, হ্যাঁ সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষা দিলে বুঝতাম সত্যি সত্যি একজন সতী।

নগরে নগরে লোক ছুটল। তারা সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা পুথিতে পড়েছে। কথকথায় শুনেছে। শুনেছে গানে। কোথাও দেখেনি, কোথাও ঘটেছে বলেও শোনেনি। দেবতার পরীক্ষা দেবতারাই জানে।

চণ্ডীকা সব শুনে তাঁর দাসী খুল্লনাকে লোক গঞ্জনা থেকে উদ্ধার করার মনস্থ করলেন।

তিনি বিশ্বকর্মাকে প্রকাণ্ড একটা ঘর নির্মাণ করতে বললেন। সেই মতো মস্ত একটা প্রকাণ্ড একটা ঘর নির্মিত হল। খুল্লনা অভয়পদ ধ্যান সেরে সেই ঘরে ঢুকলে তাতে আগুন ধরানো হল। প্রথমে নীল ধোঁয়া আকাশে উঠল। উত্তরের বাতাস তাতে দাপাদাপি শুরু করল। কলিযুগে এমন কেউ দেখেনি কোনো দিন। কেউ শোনেনি কোনো দিন। খুল্লনা জ্বলন্ত আগুন থেকে বাইরে এল।

বণিক সমাজ তখন সতীর ভয়ে তার পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কেউ বলল, আমি তোমার ভাই হই মা, কেউ বলল মান চাই না, দুটি অন্ন দাও মা, খেয়ে ঘরে যাই। কেউ বলল, আমি জানতাম, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবী। তুমি কিছু মনে কোরো না মা। আর্শীবাদ করো, ঘরের ছেলে যেন ঘরে ফিরতে পারি।

খুল্লনা তখন নতুন করে রান্নার আয়োজন করল। জ্ঞাতি গোত্র কুটুম্বরা সবাই পেট পুরে ভোজন করল। তারপর কেউ দোলা, কেউ ঝারি, কেউ কণ্ঠমালা, কেউ পাটের পাছড়া, কেউ ঘোড়া নিয়ে নিজের নিজের গৃহে ফিরে গেল।

এ কাহিনি তো খুব চেনা, বহু মানুষের চেনা। আমাদের সংস্কৃতিতেই 'মেয়ে দেখা' আর সেই সুযোগে একটি জলজ্যান্ত নারীর দেহকে অনুষ্ঠান করে মেপে নেওয়া, আলু-পটলের মতো দাগ বা পচা আছে কি না পরখ করে নেওয়ার চল দীর্ঘদিনের। নারীর পদবি বদলায় বিবাহের পর। পিতৃগৃহ ছেড়ে তাকেই আসতে হয় অন্য মানুষের বাড়িতে। স্বামী মারা গেলে বৈধব্যের দায় নিতে হয় কেবল তাকেই। তাকেই ন'মাস সন্তান ধারণ ও গৃহবন্দি হয়ে মানুষ তৈরির কারখানাটা চালু রাখতে হয়। সন্তান আর স্বামীর মাঝে দেহটাকে দুটো ভিন্ন রসে জারিয়ে রাখতে হয় জীবনভর। পুত্র এবং স্বামী উভয় ক্ষেত্রেই নারীর বদলে যায় দেহের সংলাপ, স্বরলিপি।

এত সয় যে নারী, তার পাশে যদি একটু না বসলাম, কাঁদলাম;তবে আমি কবির মর্যাদা সইব কি করে? পুরুষ হাজারটা স্খলনের পর গঙ্গাস্নানে পুণ্যি করে মুক্তি পায়। পূজা অর্চনা করে 'সৎ' হয়ে যায় চারদিনেই। নারীকে 'সতী' প্রমাণ করতে হবে আগুনে, সহমরণে জ্বলে। এ দেশের সংস্কৃতিতে এই তো চলে আসছে রামরাজ্য থেকে বহুকাল ধরে।

সংসারে যে ব্যক্তি নাম করে, প্রতিষ্ঠা পায়। গ্রাম্য মানুষেরা বিশ্বাস করে তিনি শাপভ্রষ্ট কোনো দেবতা। দরিদ্র কবি আমি। আমার শ্রোতা আমারই মতো গ্রাম্য সরল মানুষ। তাদের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই গ্রাম্য ধরনের। আমাকে তাই ওদের মতো করেই ভাবতে হয়েছে, ওদের মতো করেই লিখতে হয়েছে।

ধনপতির সিংহল যাত্রাপথে চণ্ডীকা আবার নতুন খেলা শুরু করলেন।

মগরার মোহনার কাছে তিনি ধনপতি সদাগরকে নাকের জলে চোখের জলে ডোবালেন। সিংহলে যখন পৌঁছোলেন কোনো রকমে একটি মাত্র নৌকা তখন টিকে আছে। তার আগে কালীদহ নামে এক স্থানে তিনি এমন দৃশ্য দেখলেন, যা তাঁর সওদাগরি জীবনে কোনো দিন দেখেননি। তিনি দেখলেন সমুদ্রে পদ্ম ফুলের উপর সুন্দরী এক নারী সম্পূর্ণ হস্তী গলাধঃকরণ করছে। অলৌকিক এই দৃশ্য আসলে মায়াজাল। চণ্ডীকা তাঁকে সেখানে মায়াজালে কমলে কামিনী প্রদর্শন করালেন। অপরূপ সেই দৃশ্যে মোহিত হয়ে গেলেন সদাগর ধনপতি। 'বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ' থেকে যে কাহিনির বীজ সংগ্রহ করেছি তা এখানে কাজে লাগালাম।

ধনপতি জাহাজের কর্ণধারকে কমলে কামিনী দৃশ্য দেখাতে চাইল—

অপরূপ হের আর দেখ ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগরয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার ॥

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি তা সিংহলরাজের কাছে ব্যক্ত করলেন। রাজা শুনলেন বটে কিন্তু বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস করার কথাও নয়।

রাজার অবিশ্বাস কাটাতে ধনপতি চণ্ডীর পাতা ফাঁদে পা রাখলেন।

ধনপতি রাজাকে সেই ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য সচক্ষে দেখাতে চাইলেন।

রাজা তা দেখতেও চাইলেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজা উপস্থিত হলেন। সেই দৃশ্য ধনপতি নির্দিষ্ট স্থানে দেখাতে পারলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

ধনপতি কারাগারে আবদ্ধ থাকলেন বছরের পর বছর।

ইন্দ্রের পুত্র মালাধর।

তাঁর দুই স্ত্রী। তাঁদের এবার দায়িত্ব দেওয়া হল।

মালাধর খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত রূপে জন্ম নিয়েছে। শ্রীমন্তের দুই স্ত্রীর একজন সিংহল রাজকন্যা এবং অপরজন উজানি রাজকন্যা রূপে জন্ম নিল। গন্ধবণিক পুত্র শ্রীমন্তের যখন পাঁচ বছর বয়েস তখন কর্ণবেধান্তে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁকে গুরুগৃহে পাঠানো হল। গুরুমহাশয়ের গৃহে কন্যাদেরও কর্ণবেধ হয়। কিন্তু সকলে বিদ্যা শিক্ষা করে না।

শ্রীমন্তের মা খুল্লনা পত্র লিখতে বা পড়তে পারে। কিন্তু তাঁর সৎ-মা লহনা পারে না। অথচ দুইজনে একই বাড়ির কন্যা।

ধীরে ধীরে শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে উঠল। তারপর সে-ও একদিন পিতার খোঁজে সিংহলে এল। নানাবিধ বাজনা বাজিয়ে সে নগরে প্রবেশ করল। দামামার ধ্বনি শুনে পঞ্চপাত্রসহ সিংহল-- রাজাও চমকে উঠলেন। এ আবার কোন্ দেশি বাজনা রে বাবা! কোটাল কোটাল ডাক পড়ল। কোটাল এসে সামনে দাঁড়ালে, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, নগরে কে প্রবেশ করছে?

কোটাল বলল, তার জানা নেই।

রাজাকে আগাম কোনো সংবাদ দিতে পারল না।

রাজা তাঁকে তিরস্কৃত করলেন।

তিরস্কৃত কোটাল প্রথমে বাজনা বাজাবার কারণে শ্রীমন্তকে গিয়ে ধমকাতে শুরু করল। শ্রীমন্ত তার পরিচয় জানার পরে তাকে বশ করে নিল। দুজনের মধ্যে রফা হল। কোটাল পঞ্চাশ কাহন মুদ্রার উৎকোচে বশীভূত হয়ে গেল। সে তখন রাজাকে গিয়ে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে শ্রীমন্ত আগমনের সংবাদ জানাল।

শ্রীমন্তও পথে আসবার সময় বাবার মতো একই দৃশ্য দেখতে পেয়েছে। আনন্দে সিংহলরাজকেও সেও একই রকম গল্প শোনাল। এবারও রাজা সেই দৃশ্য দেখতে চাইলেন। যথারীতি শ্রীমন্ত সে দৃশ্য দেখাতে পারল না। ফলে রাজা তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

শেষে চণ্ডীর কৃপায় ধনপতি এবং শ্রীমন্ত বিঘ্ন বিপত্তি থেকে উদ্ধার পেয়ে সিংহলের রাজাকে কমলে-কামিনী দৃশ্য দেখাতে সমর্থ হল।

কূপের মতো অন্ধকার, আর্দ্র কারাগারে ধনপতি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে আছে দীর্ঘদিন। ঘুমোতে পারে না। আহার নিদ্রা একরকম প্রায় বন্ধ। এক দণ্ডে মারা যায়, মৃত্যু তত বড়ো কঠিন দণ্ড নয়। কিন্তু কারাগৃহে দিনরাত একাকী পড়ে থাকা—এর চেয়ে গুরুদণ্ড বোধ হয় আর কিছু নেই। ভেবে ভেবে চিত্তবৃত্তি সব নিভে গিয়েছে জীবন থেকে। মন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। ক্লেশ অনুভব করার শক্তিও যেন দেহে অবশিষ্ট নেই। মনের মধ্যে দুটি ভাব তখন জেগে আছে—চণ্ডীকে ভয়, আর শিবের উপরে রাগ। ভয়ের থেকে রাগটাই বেশি। শিবকে এখন সামনে পেলে নখরাঘাতে যেন বিদীর্ণ করে দেবে। জড়পিণ্ডের মতো ধনপতি পড়ে থাকে আর এই সব ভাবে।

মধ্যে মধ্যে বাইরের কোলাহল শুনতে পায়। যে পাচক প্রতিদিন নুন-ভাত নিয়ে আসে তার কাছে শুনতে পায় সিংহলে আবার এক তরুণ সদাগরের আগমন কাহিনি। সেই সঙ্গে কমলে-কামিনীর সেই একই গল্প। মনের মধ্যে আশা জেগে ওঠে যেমন অন্ধকারে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে সেই রকম। তাহলে এবার হয়তো তার মুক্তির সময় উপস্থিত হয়েছে।

দুই প্রহর রাতে ঝঞ্ঝনার শব্দে কারাগারের বাইরের শিকল খুলে যায়। ধনপতি চমকে ওঠে, তাঁর প্রাণবায়ু শুকিয়ে যায়। এত রাত্রিতে শিকল খুলছে কেন? তাহলে কি আরো নতুন কোনো বিপদ নেমে এল?

কয়েকদিন আগে চণ্ডী তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন। বলেছেন—

> স্বপ্ন কহেন দুর্গা শিয়রে বসিয়া।
> এবে মূঢ় ধনপতি ভজ মহামায়া॥
> স্মাঙরণ করহ জদি ভবানি ভবানি!
> কালিদহে দেখাব করি-কমল-কামিনী॥

তাছাড়াও আরো নানা প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ধনপতি মাথা নোয়ায়নি। সেই একই কথা বলেছে—

> জদি বন্দীশালে মোর বাররায় পরাণী।
> মহেশঠাকুর বিনু অন্য নাহি জানি॥

ধনপতি দেখতে পেল, রাজপুরুষেরা মশাল হাতে এগিয়ে আসছে। স্তম্ভিত হয়ে তাদের দেখে। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে। একজন যুবা এগিয়ে আসে। যুবা ধনপতিকে প্রণাম করে। ধনপতি চিৎকার করে ওঠে, মহাদেব রক্ষা কর। এ আমি কী দেখছি?

যুবা বলে, বাবা, চণ্ডীর কৃপায় তুমি রক্ষা পেয়েছ। এখন বাইরে চলো। মাকে মনে আছে কী?

—মনে আছে সব মনে আছে। কিন্তু তুমি কে?

—আমি শ্রীমন্ত। তোমারই পুত্র।

বাবা ছেলের এই মিলনদৃশ্য সিংহলরাজকে মায়াজালের সেই দৃশ্যের থেকেও মোহিত করে। তিনি প্রীত হলেন। সিংহল রাজকুমারীকে বিবাহ করার জন্য শ্রীমন্তকে অনুরোধ করলেন।

শ্রীমন্ত সিংহলের রাজকন্যাকে বিবাহ করে দেশে ফিরে এল।

পিতাকে উদ্ধার করে সে রাজকন্যা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে আবার সমস্যা তৈরি হল।

উজানি নগরের রাজাও সিংহলরাজের মতো কমলে-কামিনীর অসম্ভব কল্পনাকে বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

মিথ্যাকথা বলা এবং শ্রীমন্তর আরো একটি বিবাহে ক্রুদ্ধ হয়ে দেশীয় রাজা এবারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। রাজ আজ্ঞায় সৈন্যরা তাঁকে যখন বধ করার জন্য মশানে নিয়ে যাচ্ছে, তখন চণ্ডিকা রাজার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

তিনি নদ সৃষ্টি করে তার মধ্যে কমলে-কামিনী রূপ দেখিয়ে উজানির রাজাকে তুষ্ট করলেন। উজানির রাজা সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন এবং বুঝলেন।

তারপর থেকে সিংহলে এবং উজানিতে চণ্ডিকার পূজা প্রচারিত হল।

—এই নে রে চণ্ডী বলে ধনপতি বাঁ হাতে সেই অজ্ঞান অন্ধকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁর ভেঙেছে অহংকার, জয়ী হয়েছে অন্ধকারের স্তব। আর ধনপতির মুখে উচ্চারিত হয়েছে—আশাহীন চেষ্টার সঙ্গীত, জয়দহীন শূন্য পরিণামের কথা—এ জীবন পাইয়া আমি কি করিব?

এখানেই দ্বিতীয় পর্বের ইতি টানলাম।

চণ্ডীদাস, চণ্ডীর দাস অর্থাৎ উপাসক। চণ্ডীর উপাস্য নাম এখানে বাশুলি। কাব্যে বাশুলিকে লহনা ডাকিনী নামে ডেকেছে। ডাকিনী একটি বৌদ্ধ নাম। বাশুলির আবাহনে নদীতীরে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয়। কংস নদীর তীরে তাঁর মঠ তৈরি করেছে বিশ্বকর্মা। তাঁর বাহন হাতি। বিশাল তার ক্ষমতা।

আসলে কংস কোনোও নদীর নাম নয়। কংস একটা ঘাটের নাম। মুকসুদাবাদের ভরতপুরের কাছে গঙ্গার একটা ঘাটের নাম কংসের ঘাট। গঙ্গার স্রোতধারা এই ঘাট হয়ে নবগ্রাম, খড়গ্রাম, বড়এগ্রা, ভরতপুর বরাবর বয়ে যায়। মহাপ্রভুর ভরতপুর আগমনের সময় আঙ্গারপুরের ঘাটে তাঁর পা ধুয়ে দেওয়ার জন্য সেই ঘাটের নাম হয়েছে ধোয়াঘাট।

কংসের ঘাটে চণ্ডীর দেউল নির্মাণ করে দেবী চণ্ডীর পুজো প্রচারের বিষয়টি চিহ্নিত হল।

রাজার পুজো পেয়ে অনার্য দেবী বাশুলি আর্য দেবী চণ্ডী হয়ে উত্তর রাঢ় অঞ্চল হতে দক্ষিণ-রাঢ় অঞ্চলে পূজা পেতে শুরু করলেন।

অনেক পরিণত হয়ে লিখেছি ওঁদের বারমাস্যার কাহিনি। প্রেক্ষাপট বাণিজ্য। সমাজের তথাকথিত উচ্চ শ্রেণির কথা!

কাহিনিকে আশ্রয় করে চণ্ডী এসেছেন। চণ্ডী উপাস্য দেবী হিসাবেই জাতে উঠেছেন। তবে মানুষ দেবতার কাছে এখানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেনি। মানবশক্তি নিয়েই সে দেবতার বিপক্ষে দাঁড়াতে সাহস করেছে। এমনকী দেবতাকে যাচাই করবার জন্য সে মাথা উঁচু করে পৌরুষত্ব নিয়েই সাধ্যমতো লড়াই করেছে। চণ্ডীর ভড়কিতে শুধু ধনপতি নয়, ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তরও কপাল পুড়েছে বলে তোমরা যা মনে করো, তা ঠিক নয়। সাধারণভাবে মনে হবে, শেষে ধনপতির অপরিহত বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। যে চণ্ডীকে সে বিদ্রূপ করেছে, সেই চণ্ডীকেই শেষমেশ সে পুজো করেছে। কিন্তু তার আগে আমি আমার কথা যা বলতে চেয়েছি তা বলা হয়ে গেছে।

দশে দিক

বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যু হল।

বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুতে নগরে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া হল না। নগরের অধিবাসিবৃন্দ রাজনীতি সম্বন্ধে উদাসীন। তারা দেখেছে একের পর এক রাজার উত্থান এবং পতন। কখনো দেখেছে তাঁদের অসীম প্রতাপ, আবার কখনো বা চূড়ান্তভাবে দুর্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো রাজা প্রজাদের নিজের করে নিতে পারেনি। তাই অতি বিরল ক্ষেত্রে রাজার দুঃখে তারা দুঃখ পেয়েছে, তেমনি উলটোভাবে রাজার সুখে তারও সুখ অনুভব করেছে। তারা ভালোভাবে জানে রাজার মৃত্যুতে তাদের শুভ-অশুভের কোনো তারতম্য ঘটবে না। কোনো শাসকই তাদের সুখ দিতে পারে না। তবে দুঃখ দিতে তারা অনেক ক্ষেত্রে সক্ষম। ইতিহাসে এমন ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। তাই তারা বলে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। কিন্তু সত্যই কি রাবণ প্রজাপীড়নকারী রাজা ছিলেন?

একের পর এক শাসক বদলাচ্ছে। কিছু ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। দেশের মধ্যে কিছুদিনের জন্য অনিশ্চয়তা দেখা যাচ্ছে, দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপর যে কে সেই। জিনিসপত্রের দাম আর কমে না।

রঘুনাথ রায় রাজা হয়েছে। আমিও চণ্ডীমঙ্গল রচনা শেষ করে এনেছি।

রচনা সামন্য এগোলেই গোপাল চক্রবর্তী নকল করে নিয়ে যান। নির্দিষ্ট দিনে তিনি রাজা রঘুনাথ রায়ের দরবারে চণ্ডীমঙ্গলের সেই অংশ সঙ্গীত হিসাবে পরিবশেন করেন।

সকলে শোনেন চণ্ডীর উদ্দেশে গীত সেই সংগীত।

গোপাল চক্রবর্তীর গানের গলাটা খুব ভালো। দরদ দিয়ে মনসার গান, চণ্ডীর গান করেন। আমার লেখা চণ্ডীর গান তাঁর গলায় দারুণ খেলে। দরদ দিয়ে মনসার গান, চণ্ডীর গান করেন। গোপাল চক্রবর্তীর গান মানেই কেউ আর আসর থেকে নড়বে না। প্রয়োজন হলে দু-চার ক্রোশ রাস্তা পাড়ি দিয়েই তাঁর গান শুনতে যাবে।

গোপাল চক্রবর্তী শিবরামকে খুবই স্নেহ করেন। ভারী আনন্দময় মানুষ এই গোপাল চক্রবর্তী। ছেলে-মেয়েদের গান শিখিয়ে যেটুকু রোজগার তাতেই চালিয়ে নেন সংসারের টুকিটাকি।

তাঁর নেশা গীতিপালার সুর সংযোজনা।

আমার চণ্ডীগানের সঙ্গে পূর্বসূরি মানিক দত্তের কিছু কিছু পংক্তি মিশিয়ে বিভিন্ন স্তবকের ফাঁকে ফাঁকে নিজস্ব কথকথা যুক্ত করে তিনি বেশ মৌলিকত্ব সৃষ্টি করেন চণ্ডী গানে।

সুযোগ পেলেই শিবরাম তাঁর বাড়ি চলে যায়। গিয়ে দেখে তাঁর বাইরের ঘরে যেন চাঁদের হাট বসেছে। বেশ কিছু কিশোর-কিশোরী গানের তালিমে মগ্ন। শিবরামকে দেখে

গোপাল চক্রবর্তী তর্জনীর ইশারায় এক পাশে বসতে বলেন। তারপর তিনি আবার নিজের গানের মধ্যে ডুবে যান।

তিনি গেয়ে ওঠেন—

আইস আইস কামার ভাইরে,
খাওরে বাটার পান,
ভাল কইরা গইড়্যা দিও লোহার বাসরখান।

গেয়ে হাত নাড়েন, দোয়ারকি দিয়ে ওঠে ছেলেমেয়েরা। পছন্দ হয় না তাঁর। আবও দু-তিনবার উচ্চারণ করেন পংক্তি দুটো। ফের সমবেত অনুসরণ শুরু হয়। তবু পছন্দ হয় না। কথকের চালে নিজের মতো করে বলে যান গোপাল চক্রবর্তী। শশকের মতো উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে থাকে ছেলের দল। নতুন বদ অভ্যেস হয়েছে তাঁর নস্যি নেওয়া। কোঁচড় থেকে একটা নস্যির কৌটো বের করে একটিপ নস্যি নিয়ে বিচিত্র কায়দায় হাতের তালু উলটিয়ে আঙুল বেঁকিয়ে নস্যি ঝেড়ে ফেলে তিনি ফের গেয়ে ওঠেন—

সোনার থালায় পান ওবে,
রূপার থালায় চুন,
মাইয়া-মানষের পেরথম জৈবন যেন জ্বলন্ত আগুন।

মেয়ে মানুষের প্রথম যৌবন যে কতখানি জ্বলন্ত আগুন তা বোঝার বয়স তখন শিবরামের বা তার লাগোয়া বয়সেব ছেলেমেয়েদেব যে হয়নি তা নয়। কিন্তু কথকথা গান, গান কথকথায় উদীপ্ত ওদের মন তখন ঘরটিতে সঙ্গীতের লহরি খেলায় মত্ত থাকে।

ঘরটি তখন যেন বিচিত্র এক সুরসভাব আদল নেয়। শিবরাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকে দলের মধ্যে। একদিন সেও জানে না কবে শুরু করে দিয়েছে, সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে।

পরপর ক'দিন মহলা চলে, ধনপতি সদাগর আর ফুল্লরা-কালকেতু পালাগানের।

তারপর একদিন রাজ দরবারে পরিবেশিত হয়।

'বিধির কি হইল রে...'

দোয়ারকি দাতারও সঙ্গে থাকে।

শিববাম বুঝতে পারে না একদিন গানের আসরে কেমন করে গোপাল চক্রবর্তী প্রথম এককে দুটি করে পংক্তি গাইবার জন্য কথকথার ফাঁকে বেছে নিয়েছিলেন পর্যায়ক্রমে শিবরামকে ও একটি সুরেলা গলার কিশোরীকে। সেই শুরু।

"ক্ষণে জাগা, ক্ষণে নিভা বাতি মিটমিট করে,
গহিন রাতে ঘুমের ঘোরে বেউলা ঢইল্যা পড়ে
কাট ছাউড়া কেশের বোঝা মাটির পরে লোটে,
সেই কেশ বাইয়া রে রাতে কালনাগিনী ওঠে"

"উঠ উঠ বিপুলারে কত নিদ্রা যাও,

আমায় খাইল কালনাগে,
চক্ষু মেলিয়া চাও।"

সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যুর পর শ্বশুরের নিষ্ঠুর গালি সইতে না পেরে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মৃত পতিকে কোলে করে বেহুলা গাঙুরের জলে মান্দাসে চেপে অনির্দ্দেশের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।

সেরকম শিবরামেরও মনে হয়েছে সেও ভেসে যাচ্ছে গাঙুরের জলে।

মাঝে মাঝেই এমন বিভ্রম হয় শিবরামের। এই ঘোর শিবরামকে ছাড়ে না। মাঝে মাঝেই তা হানা দেয় বুকের গভীরে। আর তাই সে ছোটে গোপাল চক্রবর্তীর বাড়ি।

বন্ধুবর গোপাল একদিন শিবরামের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। ওকে বিয়ে করতে হবে। যশোদারও বিয়ের বয়স হয়েছে, ওরও বিয়ে দিতে হবে। আমার মাথায় এ সব চিন্তা নেই। এ অবস্থায় শিবরাম বিয়ে করতে চায় না।

গোপাল চক্রবর্তী সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। পাত্রী বড়ো গুণী পরিবারের। সেই মেয়ে, যে মেয়ে গানের আসরে শিবরামের সাথে গলা মেলায়। যে মেয়ের সাথে গানে গলা দেয় শিবরাম। নাম চিত্রলেখা। সুতরাং ট্যাঁ ফোঁ করার কোনো উপায় থাকে না।

বিয়ে, বউ ভাত। অনেক আলো, সানাইয়ের সুর, বউভাতে ভুরিভোজ হয়। আত্মীয় বলতে গেলে সবাই গ্রামে। এখানে কেউ নেই। তবু বন্ধুবান্ধবরা সব কিছু পুষিয়ে দেয়। পুষিয়ে দিলেন গোপালবাবু। কী ধৈর্য! কী কথাবার্তা! শিবরাম মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে।

মনে মনে বলে, এই সব পুরোনো লোকেরা চলে গেলে পৃথিবী আনেকটা কাত হয়ে পড়বে।

ছয় আট বছরের মেয়ে আর ষোলো সতেরো বছরের ছেলে। বিয়ের পাত্র-পাত্রী।

দানে বিয়ে আর পণে বিয়ে হয়, এই হচ্ছে রেওয়াজ। যে ছেলের বিদ্যাবত্তা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে তার হয় দানে বিয়ে অর্থাৎ দান সাজ-থালা বাটি ঘড়া ঘটি সোনার আংটি দিয়ে বরকে আপ্যায়িত করা হয়। আর সাধারণ ক্ষেত্রে কন্যাপণ অর্থাৎ মেয়ের বাবা টাকা নিয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করে। কাজেই বাবা-মা নিজের তাগিদে ছেলেকে পাঠশালা পাঠায়, উদ্দেশ্য ছেলে হিসেবপত্তর করতে শিখুক। বিয়ের পাত্র হিসাবে উপযুক্ত হয়ে উঠুক।

ফুলশয্যার ঘরে ঢুকে শিবরাম দেখে, নতুন বউ গলায়, মাথায়, হাতে, কনুইয়ে ফুলের মালা জড়িয়ে ফুলে ঢাকা হয়ে বসে আছে। সারাদিন কনে বউকে একটু দেখবার ফুরসত পায়নি। একলা ঘরে কনেকে দেখে সে যেন একটু দমে গেল। ফুলের মালা, গোটা বিছানায় ফুলের পাপড়ি ছড়ানো। ধীরে ধীরে বিছানার উপরে উঠে বসল শিবরাম। ফুলের পাপড়িতে বিছানাটা কী ঠান্ডা! এক কোণে চুপটি করে বসে কনের সাজে চিত্রলেখা। চিত্র অর্থাৎ ছবির মতোই বসে আছে সে। সে যেন আরো ঠান্ডা।

শিবরামের মনে হয় যেন জোড় লাগল না। বিছানা বড্ড ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে! সব সরিয়ে নকশি কাঁথার উপরে গায়ের শালটি পেতে দেয়। গড়িয়ে দেখে, না অত ঠান্ডা

লাগছে না। কনেবউ অবাক। এ কি ধরনের স্বামী জুটেছে তার। তার রূপ দেখবার সময় নেই যেন তার। ঘরে ঢুকেই বিছানায় উঠে বসেছে। তারপর শুয়ে পড়ল। এ কী রকম স্বামী তার! প্রথম দিনেই কনেবউ বুঝতে পারল সংসারের কাজ করতেই তার দিনরাত্তির অবসান হবে।

ঠিক তাই! বাড়িতে শ্রী ফিরছে। লক্ষ্মী যেন এখন গৃহে বিরাজ করছেন।

পুত্রবধূ গৃহকর্মে নিপুণা। আমার তামাকটুকুও ঠিক সময়ে জুগিয়ে দিতে ভোলে না। আমি এখন পূর্ণ সময়ে লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

পুত্র শিবরামের ওপর সংসারের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখন নিশ্চিন্ত মনে লিখে চলি কাব্য।

মহেশ্বরের কাছে নিজের বংশের কল্যাণ কামনা করি।

বলি—

শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান।

তেমনি দেবী সরস্বতীর কাছে বংশধরদের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করি। বলি—

দিবা নিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরিয়া কবির কামে কৃপা কর শিবরাম
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

যশোদার খেলার সঙ্গী বলতে এতদিন কেউ ছিল না। এতদিন সে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে কখনো রাজোদ্যানে কখনো বা রাজপ্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে। তবু ভালো লাগত না, এখন চিত্রলেখা এসেছে। চিত্রলেখা তাকে খুব স্নেহ করে। ও অনেক মজার গল্প বলে। ওদের বাড়ির কথা বলে। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যায় যশোদা। বুঝতে পারে চিত্রলেখার মনের কোণে কোথাও একটা চাপা দুঃখ আছে। কীসের দুঃখ বোঝা যায় না। জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, বলবে না। এই দুঃখ একান্ত ওর নিজের।

এক সন্ধ্যায় রাজাকে দরবারের ধ্রুপদি আসরে জানালাম, অভয়ামঙ্গল গীতিকা সমাপ্ত করেছি।

সাধু সাধু রব উঠল।

তখনই তার কিছু অংশ সেখানে পাঠ করতে হল।

রোমাঞ্চে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল। একে আমি উপস্থিত। তায় আমার রচিত গীতিকথার প্রথম পাঠ শোনাতে হচ্ছে। কানখাড়া করে বসে আছে সবাই।

তারপরে সেই দিনটা এল।

নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় পাণ্ডুলিপি হাতে রাজদরবারে প্রবেশ করলাম। পূর্বাহ্নেই দরবারের এক পাশে কেদারা আর মাঝখানে ফরাশ পাতা হয়েছিল। কয়েকজন শ্রোতাকে বিশেষভাবে

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। দু-একটা কথা চালাচালির পর আমি গীতিকার পাঠ শুরু করলাম। সূঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায় এহেন নিবিড় ও মনস্ক নৈঃশব্দের মধ্যে শুধু জেগে রইল আমার কম্বুকণ্ঠ। পালা কথকথা ছড়ার চাল মিশিয়ে আমি যেন সেই ভাগ্যহত ধনপতি সওদাগরের নয়, পড়ছিলাম আমার নিজেরই জীবনদর্শন।

সকলের কি মনে হচ্ছিল জানি না। আমার মনে হচ্ছিল এ যেন উপলব্ধিজাত আলো আর অন্ধকারের এক বিপুল ও জটিল ভাষ্য। কয়েকটা জায়গা বোঝাবার জন্য দু-বার তিনবার পড়ছিলাম। আমার পাঠ সেই সন্ধ্যায় গুনতি শ্রোতাদের যেভাবে আবিষ্ট করেছিল তার কোনো তুলনা আগের কোনো অভিজ্ঞতায় আমি পাইনি। যখন চুপ করলাম। অনেকক্ষণ পরেও বিভিন্ন শ্রোতাদের এই পাঠ আবিষ্ট করে রেখেছিল।

সাহিত্য মানুষের সৃষ্টি। তার উপাদান মানুষ। মানুষেরই উপভোগের বিষয় সাহিত্য। গীতিকা মানুষেরই জীবনগাথা। মানুষ এখানে প্রধান উপজীব্য। নানা মানুষের সমাবেশ গীতিকায়। এদের কেউ শোষিত, কেউ প্রেমিক, কেউ বা অত্যাচারী, কেউ উদার, কেউ অনুদার। জন্মভিটে ত্যাগ করতে হয়েছে আমাকে। এই একটা ঘটনা আমায় সারা জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছে। সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে আমাকে বিদ্যা বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে। ঘটনাচক্রে বাঁকুড়া রায়ের সাহচর্য পেয়েছি। কিন্তু ছোটোপুত্র পঞ্চাননকে হারাতে হয়েছে। সুখের ও বিলাসের জীবন আমি পেতে পারতাম। কিন্তু তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি। কৃচ্ছ্রসাধন করে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছি।

ফুল্লরার জীবনদৃষ্টি অতি স্বচ্ছ। লড়াকু মানসিকতা তাঁকে অনায়াসে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কালকেতুর পাশে। বৃহৎ পরিবারের দায় এক সময় গৃহকর্তাকে ক্লান্ত করে তোলে। স্ত্রী বা পুত্রের কাছ থেকে সেই সময় কোনো সাহায্য এগিয়ে এলে স্বস্তি বোধ হয়। একই পরিবারে একের অধিক উপার্জনশীল সদস্য থাকলে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা যায়। সেইভাবে ফুল্লরার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। স্বামী নিষ্কর্মা। সংসারটা কীভাবে চলে জানে একা গৌরী। কিন্তু তাঁদের মন্ত্র-প্রচারক ব্যাধ দম্পতি ফুল্লরা-কালকেতু, তাদের তো আহার জোটাতে হাত পাততে হয় সই-এর কাছে। দু-কাঠা খুদ মাগতে হয়। সই কিন্তু খই মুড়ি দেয় কোঁচড় ভর্তি করে। কিন্তু খুদ ধার দেয় না। বলে, কাল দেব।

মা দুগ্গাই বলো, আর ফুল্লরাই বলো সংসারের এই চিত্র সার্বজনীন। এই দারিদ্র্য নিম্নবিত্ত পরিবারের নিত্যচিত্র। উপার্জন করে এনেই পুরুষদের কাজ শেষ হয়ে যায়। দৈনন্দিন ভরণপোষণ, দেখাশোনা সব মেয়েদের দায়িত্ব। পরিবারের পুরুষ শিবঠাকুরের মতোই নিষ্কর্মা। ঘরে বাইরের সবটুকু দায়িত্ব এসে পড়ে মেয়েদের ঘাড়ের উপর। তাই মেয়েদের জন্য বাপ মায়েদের উদ্বেগের অন্ত নেই। মনের দুঃখে তাই তারা বলে ফেলে—

এবার আমার উমা এলে,
আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।

কেন পাঠাবে? ওই তো বরের ছিরি। সন্ধে থেকে সিদ্ধি টানছে। ভৈরব-ভৈরবীদের নিয়ে নাচ-গান করছে। চালচুলো না থাকলে কি হবে? রসের কোঁড়া। উমার আবার নাকি একজন সতিনও আছে। উমার চুলে জটা পড়ছে। তার অমন কাঁচা সোনার মতো রং অভাবে মলিন হয়ে গেল গো।

শুধুমাত্র আদর্শায়িত ভাবনা থেকে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। ফুল্লরা সংগ্রামী এবং তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। কালকেতু শিকার করে আনলে, সে মাংস বেচে ফেরি করে। এই কাজে সে অত্যন্ত সফল। এ কাজে তাঁর কোনো লজ্জা নেই। কালকেতু শিকার না পেয়ে ঘরে এলে তার পরামর্শে ফুল্লরা সখী বিমলার মায়ের কাছে যায়। 'ফুল্লরার সম্বল সন্ধান' অংশে তাই আমি লিখলাম—একটা অসম্ভব সংকোচবোধ সমস্তক্ষণ সক্রিয় ফুল্লরার মধ্যে। এই সংকোচে অহরহ সে জ্বলছে মনের ভিতরে। এই ভাব এত সাবলীল যে দু-কাঠা খুদ চাইতেও তার সংকোচের অন্ত নেই। তাই নিজের দারিদ্র্য এবং জীবনযুদ্ধ সম্পর্কে ফুল্লরার কোনো বাড়তি সংকোচ নেই। দরিদ্র জীবনকে-জীবনের অনিবার্য লড়াইকে খুব স্বাভাবিক বলেই সে গ্রহণ করেছে। অসংকোচে তাই সে স্বীকারোক্তি করে,

বিধাতা আমারে কৈল দরিদ্রের কান্তা।
চারি প'র দিন করি সম্বলের চিন্তা॥

'সম্বলের চিন্তা যেমন' ফুল্লরাকে করতে হয় তেমনি কালকেতুরও ফুল্লরার ওপর নির্ভর না করলে চলে না।

আসিয়া প্রভাতকালে কাননে আড়িএ জালে
হাতে শরে চারি প'র ভ্রমি।
ফুল্লরা পসার করে সন্ধ্যাকালে আসি ঘরে
এই হেতু নাহি দেখ তুমি।

এসব কোনো নতুন কথা নয়, আমার জীবনের কথা। কাকে উন্মোচন করেছি? নিজের কথাই লিখেছি। কোথায় স্বপ্ন? এই তো চিরন্তন বাস্তব, একেবারে মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকা বাস্তব। এ সত্য আমি ছাড়া আর কে জানবে।

অর্ধেক আকাশ নয়, মেয়েরা যদি স্বনির্ভর হয়ে ওঠে তবে সেই সমাজ হবে সবচেয়ে শক্তিশালী। ফুল্লরার প্রতিটি কাজে একটা আশ্চর্যরকম আত্মবিশ্বাস রয়েছে। এক মাত্র ঋণ করার বিষয়ে তাঁর সংকোচ। শাশুড়ি-শ্বশুরকে রান্নাবান্না করে খাওয়ানো থেকে শুরু করে মাংস বেচা পর্যন্ত সে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। অথচ বারোমাসের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা যখন কাউকে সে বলে, তখন যথেষ্টই বিচলিত এবং জীবন সম্পর্ক হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা যে নিছক শ্রোতাকে ভয় পাইয়ে দেবার মানসে তা বুঝতে দেয় না। সংসারের রাজনীতিটা যে সে খুব ভালোভাবে রপ্ত করে ফেলেছে সেটাই প্রমাণ হয়ে যায় তার বিলাপের মধ্যে। সে পালিয়ে যেতে চায় না, তার মধ্যে রয়েছে অধিকারবোধের প্রাবল্য।

শাস্ত্রকার ও সৌন্দর্যবাদী কবিরা এই দারিদ্র্যকে বলবেন বাহ্য। বলবেন বাইরে থেকে এই অর্থভেদ অসম্ভব। শ্মশানচারী শিব তো আসলে শ্মশানচারী নন।, তাই যে দেবী চণ্ডী

অসুরনাশিনী তিনিই আবার স্বামী শ্বশুরের গৃহে বেচারি। চণ্ডী নিজের পূজার প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—এর মধ্যে বাস্তবতা নেই, রয়েছে লীলার মাধুর্য। নারীর এই দুই রূপ আমার চিন্তনে বারবার ফিরে ফিরে আসে। তাই দানবদলনী চণ্ডী আর বেচারিনী চণ্ডী দুইই আমার কাছে প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে উঠেছে। পুরুষের প্রয়োজনে চণ্ডীকে অসুরদলনী হতে হয়েছে, যেমন ভিখারিনি হতে হয়েছে চালচুলোহীন হরের ঘরণি হিসাবে।

আমি চেয়েছি কালকেতু রাঢ়ের জাতীয় বীর নায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পাক।

এই বীর নায়কের কাহিনিতে দেশের মানুষ এক ধরনের দেশাত্মবোধ ও আত্মবোধে উদীপ্ত হোক। আধাত্মিক বা সামাজিক দিক থেকে এ একটা বিরাট সামাজিক কর্তব্য পালন করেছি বলে আমি মনে করি। হয়তো মনের কোনও অলিন্দে গোপনে লালিত হয়েছে সেই কামনা যে আমারও খ্যাতি হবে, যশ হবে। দশের মঙ্গল হবে আবার নিজেরও নাম হবে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নতুন পথে চলতে চেয়েছি।

প্রাকৃতিক কারণে মাটির নীচে কারোর যে কোনো কারণেই ধনপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। এদেশে মাটির নীচে এরকম বহু ধনভাণ্ডার আত্মগোপন করে আছে। মাটির নীচের প্রোথিত অর্থ কত মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। অর্থপ্রাপ্তি হলেই আবার মানুষের জৈবিক সত্তা তাকে প্রভুত্বের দিকে পরিচালিত করাবার চেষ্টা করে। কালকেতুর জৈবিক প্রবৃত্তি তাঁকে কৌলীন্য এনে দিয়েছে, তাঁকে গুজারের বন কেটে নতুন নগর স্থাপন করতে বাধ্য করেছে। অকৌলীন্য অনার্য সম্প্রদায়ের এই প্রভাব প্রতিপত্তি কৌলীন্যের ধারক কলিঙ্গের অন্যান্য রাজাদের সহ্য হয় না। তারা তাই বাধা দিয়েছে। শেষে গণ-অভ্যুত্থানের সামনে মাথা নত করেছে। সমগ্র দক্ষিণ-রাঢ় অঞ্চল কালকেতু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা জেগে উঠুক এই আমি চেয়েছি।

আমি জানতাম, অনার্য সমাজে চণ্ডী পূজার প্রচার, আর্য অধ্যুষিত এলাকায় ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চণ্ডী পূজার প্রচার শৈবধর্মের ওপর আঘাত হানতে পারে। কলিঙ্গরাজ তাই ব্যাধ সমাজের শক্তির প্রতিভূ দেবী চণ্ডীকে নির্মূল করতে চেয়েছেন। এ এক ধর্মীয় সংঘাত। কিন্তু এই সংঘাত সমাজ জীবনে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না। তাই এই ঘটনাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিইনি। লিখেছি এক মনে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এইভাবেই।

আমার বহু পূর্বের ঘটনাকে স্মরণ করে তাকে কলমবন্দি করার প্রয়াসে আগুয়ান হয়েছি। কেমন হয়েছে জানি না। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি।

উপাখ্যানের প্রথম পর্বে সাধারণত যেমন থাকে দেব-দেবীদের স্তুতি বন্দনা। কাব্য রচনার সেই প্রচলিত ধারাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। সেই প্রচলিত ধারতেই অবগাহন করেছি। ধর্মপুজো ছিল বৌদ্ধদের পূজা। এই পূজা আপন নাম ত্যাগ করে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করেছে। একই প্রকারে চণ্ডীও বৌদ্ধধর্ম হতে হিন্দু দেবতার নাম পরিগ্রহ করে হিন্দুধর্মে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পোড়া বঙ্গদেশে এক সময় বজ্রযান বৌদ্ধদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এরা "বজ্রসত্ত্ব" নামে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির উপাসনা করতেন এবং "বজ্রসত্ত্বশ্বরী" বা "বজ্রেশ্বরী" নামে বুদ্ধশক্তির অর্চনা করতেন। হতে পারে এই বজ্রেশ্বরী পরে বাশুলি'তে পরিণত হয়েছেন। কলিঙ্গ, গুজরাট, গোলাহাট এগুলি একই এলাকার পৃথক পৃথক জনপদ।

অনার্য অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলের কেন্দ্রীয় সভ্যতা প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছিল নতুন এই দর্শন চিন্তায়। এই দর্শন সম্পূর্ণ অরণ্য প্রকৃতির। আমি আকৃষ্ট হয়েছি এই দর্শনের প্রতি। আমার মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠেছে, যে কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষ্যত্ব নিয়ে দেবতারও ঊর্ধ্বে উঠতে পারে।

আমার কাব্যে তাই আমি এই চিন্তার প্রতিফলন দেখাতে চেয়েছি। আমার অধ্যাত্মচিন্তা দৈব নির্ভর না হয়ে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। আমার লেখনীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের মানুষকে আরও প্রাণবন্ত করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছি। এ আমি অন্য আমি। নেহাত ছা-পোষা মধ্যবিত্ত মানুষ নই। আমিও পরিবর্তিত হতে শুরু করেছি।

অদৃষ্টবাদ নয়, অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধেই আমি কলম ধরেছি। দৈব কাহিনির মধ্যেও আমি আত্মশক্তির জয়গান গাইতে শুরু করেছি। সেই গানে ধনতন্ত্রের তরণি বেয়ে সরাসরি এসে হাজির হয়েছে দুঃখ যন্ত্রণাক্লিষ্ট অন্ত্যজ শ্রেণির এক জীবনযন্ত্রণা। সাহিত্যে যা আগে কোনোদিন কেউ দেখেনি। এই জীবনচিত্রে সেই উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছি। চেয়েছি ধর্মতন্ত্র হতে মুক্ত হয়ে একটা নতুন সমাজজীবন গড়ে উঠুক। আমার হৃদয়ে তখনও জন্মভূমি ত্যাগের কঠিন দুঃখ রয়েছে। রয়েছে মোগল পাঠানের অত্যাচরের স্মৃতি। অবরুদ্ধ হয়ে আছে শতশত মানুষের ক্রন্দনের অশ্রু। সবই আমি উগরে দেবার চেষ্টা করেছি সাধ্যমতো আমার কাব্যে।

ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মর্মকথায় ধ্বনিত করতে চেয়েছি এই কাব্য। যার মধ্যে থেকে উঠে এসেছে নপুংসক, ক্লীব, পঙ্গু, অত্যাচার-জর্জরিত সমাজটাকে পালটাবার আকুতি। আর এই আকুতিতে কালকেতু নায়ক থেকে হয়ে উঠেছে মহানায়ক।

আমার অতৃপ্তিতে কেবলই ছুটে বেড়িয়েছি।

যত সহজ করেই লিখতে চাই না কেন, বারবার কেবলই মনে হয়েছে কাহিনিতে আত্মশক্তি ঠিক জয়ী হতে পারছে তো? দেব-দেবীরা মানুষের আত্মশক্তিকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছে তো? দেবী চরিত্র শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও পূজা প্রচারের আলোয় মানবচরিত্রের কাছে তারা করুণাবশত অসহায় হয়ে পড়ছে তো? কোথায় কোনো খামতি থেকে যাচ্ছে না তো? মানব চরিত্রগুলো পৌরুষত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তো? তবু মনে হয়েছে কোথাও যেন একটা কিন্তু লুকিয়ে পড়ছে।

লিখেছি আবার পড়েছি। পড়েছি আবার আদ্যোপান্ত নতুন করে লিখতে শুরু করেছি। লেখার পর বারবার পড়েছি। খুঁতখুঁতুনি ছাড়েনি আমায়। রাজদরবারে পণ্ডিতকুলের অভাব নেই। প্রতিদিনই নতুন নতুন বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের সমাগম ঘটে রাজদরবারে। ওদের সাথে নানা বিষয় উঠে এসেছে আলোচনায়। নানা তথ্য সংগ্রহের আশায় ওঁদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবেও মিলিত হয়েছি। অনেক কিছু জানতে পেরেছি।

আমি জানি রাজশক্তি তথা সামন্তশক্তির উচ্ছেদ শুধু কবিতা দিয়ে সম্ভব নয়। ভূমি রাজস্ব-ব্যবস্থায় সংকট নেমে এসেছে। অত্যধিক শোষণের ফলে কৃষকের সাথে জমিদারও কোণঠাসা। রাষ্ট্র ও জায়গিরদার, মনসবদার, জমিদার ও কৃষকের ত্রিভুজ সম্পর্কের অবয়বে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। আমিররা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের প্রতিপত্তি

বাড়াতে চাইছে। তারা জমিদারদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিচ্ছে। স্থানীয় এই ক্ষমতাব মেলবন্ধনে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার যোগাযোগ নড়বড়ে হয়ে উঠেছে।

কৃষকের জীবনযাত্রার মান খুবই সামান্য হওয়ায় রাষ্ট্রের ও জমিদারদের চড়া খাঁই মিটিয়েও কৃষক নিজের উদ্যোগে কৃষিকাজ চালাতে পারছে না আর তাই গ্রাম অঞ্চলে সম্পন্ন রায়তদের বিকাশ হচ্ছে। কৃষকরা জমিদার ও জায়গিরদাররের বিরুদ্ধে রাজ দরবারে অভিযোগ করতে যেতে পারছে না। নিঃস্ব কৃষক বিদ্রোহ করতে পারছে না, দারিদ্রে কাতর হয়ে চরম হতাশায় সে ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। অন্ধকারময় এই দেশের সমাজ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনার কণ্ঠ রোধ করে ফেলেছে। একে আঘাত করতে গেলে বা সরাতে গলে চাই সংঘ শক্তি। অত্যাচারী সামন্তশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ সংগঠন। কিন্তু আমি জানি না সেই সংগঠন তৈরি হবে কীভাবে?

নিপীড়িত মানুষ আত্মকলহে লিপ্ত। আমি জানি না এই মানুষ সংগঠিত হবে কীভাবে? আত্মকলহে নিমগ্ন, শ্রেণি সংঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির আত্মপ্রকাশকে দমন করার জন্য কালকেতুর সঙ্গে পশুকুলের যুদ্ধ বাধিয়েছি। কিন্তু আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, মানুষের মতো প্রতিটি জীবকুলের বাঁচার অধিকার আছে এবং প্রতিটি জীবেরই সংগঠিত বাঁচার প্রয়াসে প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক মঞ্চ। চণ্ডীকেই তাই একটি গণতান্ত্রিক মঞ্চ রূপে কল্পনা করেছি। আর সেই গণতান্ত্রিক মঞ্চ থেকে কালকেতুকে নির্বাচন করেছি নেতা হিসাবে। একটা নতুন পবীক্ষা করেছি আমি। যে পরীক্ষার নজির অন্য কোথাও আমি পাইনি, দেখিনি।

রাজা বাঁকুড়া রায় প্রতিদিন উৎসাহ দিয়েছেন আর খোঁজ নিয়েছেন কাব্যরচনা কতদূর অগ্রসর হল।

দুর্ভাগ্য আমার, তিনিই এই কাব্য রচনার শেষ দেখে যেতে পারলেন না।

তিনি চলে গেলেন।

বাঁকুড়া রায়ের সুপুত্র রঘুনাথ রায়। তিনি এখন রাজা। মানসিংহ বাংলার সুবেদার।

দ্বিতীয় উপাখ্যানে কমলেকামিনী পর্বে প্রস্তাবনার পর রত্নমালার নৃত্য হতেই সরাসরি কাব্য শুরু করে দিয়েছি। আরো গভীরভাবে লেখার মধ্যে ডুবে গেছি। শ্রীমন্তর প্রতি ভালোবাসায় খুঁজেছি নিজের ভালোবাসার জনকে।

৩১৪টি পর্বে গিয়ে ইতি টেনেছি।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কতদিন ধরে একটু একটু করে রচিত হয়ে শেষ হল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

গোপাল চক্রবর্তী গান বাঁধলেন আর সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে শোনালেন।

তিনি আমার পাশে পাশে থাকেন, এখন চণ্ডীর ভীষণ ভক্ত।

সারা দিন সুর করে করে পাঠ করেন চণ্ডী কাব্য। অবসর মতো রাজা রঘুনাথ তা শোনেন।

গোপালবাবু আবার তুখোড় এসরাজ বাজান। এসরাজের সঙ্গে রঘুনাথের গান চলে।

রঘুনাথের গান শোনার কানটাও খুব গভীর, কোথাও সুর কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেন। তেমনই রঘুনাথের আছে বিশেষ গুণও। কোথাও ভালো সুর ভেসে এলো সঙ্গে সঙ্গে তা গলায় তুলে নেন। বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে গান-বাজনার চর্চা করেন। এসরাজের সঙ্গে চণ্ডীর গান গোপাল চক্রবর্তীর গলায় শুনে রঘুনাথ বলেন, সাধু, সাধু, আপনি সত্যিই গানের একজন সম্মাননীয় গুণী।

বিনয়ে বেঁকে যান গোপাল চক্রবর্তী। বলেন, আজ্ঞে, আমি সঙ্গীতের সামান্য একজন ছাত্র মাত্র।

জমিদার হলে কি হয়, কি বিনয়!

একদিন বসে আছি আনমনে। মনে হল, কোথাও বুঝি 'সিন্ধু-বারোয়াঁ'-র তান লাগল। এমন সুর কোথা থেকে ভেসে আসছে?

পরক্ষণেই চমক ভাঙল। ওপাশের বারান্দা থেকে ভেসে আসছে গোপাল চক্রবর্তীর এসরাজ। বাঁকুড়া রায় তখন অসুস্থ। তিনি অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তাঁকে নিয়মিত এসরাজ শোনাতে আসেন গোপাল চক্রবর্তী। তাঁর ঘরেই তিনি বাজাচ্ছেন। সুরের মূর্ছনায় রাজা ভেসে চলেছেন যেন কোনো অলকানন্দার স্রোতে। সন্ধ্যার টিমটিমে অন্ধকারের পরোয়া না করেই বেজে চলে এসরাজ একটানা বহুক্ষণ ধরে।

এসরাজের সুরে প্রায় নিথর হয়ে যান রঘুনাথও। তাঁর জীবনের সাহিত্য বলতে পিতা, সঙ্গীত বলতে পিতা, শিক্ষা বলতে পিতা।

ধীর পায়ে ঘরের বাইরে আসেন। সারা উঠোনটা সুরের আবেশে ভরে থাকে। দালানে ঝোলে অনেক পুরোনো দিনের সব ছবি। তার পাশে ছোটো ছোটো খুপরি। প্রদীপ রাখার জায়গা। সেজে-র আলো জ্বলে। প্রায় প্রাচীন সেই আলোর গা ঘিরে ঐশ্বরিক বিভা ছড়িয়ে পড়ে দালানের চারপাশে রঘুনাথ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন সব।

এসরাজের ছড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে আলোর শিখাগুলো অত্যন্ত ধীর লয়ে নেচে চলে। এ যেন কোনো অলৌকিক কাণ্ড তাঁর সামনে ঘটে চলেছে। রঘুনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। পিতার পাশে গিয়ে চুপটি করে বসেন আবার। কতক্ষণ যে বসে থাকেন মনে থাকে না।

কোল থেকে এসরাজ নামান গোপাল চক্রবর্তী। বলেন, 'প্রণাম তাবকেশ্বরায় চ'।

রঘুনাথ অস্ফুট স্বরে বলেন, 'প্রণাম তারকেশ্বরায় চ'।

অসুস্থ রাজা বাঁকুড়া রায় কোনো ক্রমে হাত কপালে ঠেকান। মনে মনে তিনিও বলেন, 'প্রণাম তারকেশ্বরায় চ'।

রাজা রঘুনাথ রায় স্থির করলেন লেখকের স্বীকৃতি মঙ্গলস্বরূপ চিহ্ন হিসাবে রাজ দরবারের আসরে তিনি কবি মুকুন্দকে অর্থাৎ আমাকে স্বর্ণকঙ্কণ দিয়ে 'কবিকঙ্কণ' হিসাবে বরণ করবেন।

দিন নির্দিষ্ট হল। রাজদরবারেই বিশেষ অধিবেশন বসবে। বিশিষ্ট শ্রোতাদের সামনে সেদিন রাজ দরবারে গোপাল চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল গান পরিবেশন করবেন। রাজা রঘুনাথ এবং বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী তা শুনবেন। শরৎ-কালকে নির্বাচন করলেন তার প্রকৃষ্ট সময় হিসাবে। এ

সময় দেবী চণ্ডীর আবাহন হয়। তাই এই সময়ই রাজা রঘুনাথ রায় কবি মুকুন্দকে সম্বর্ধনা দেবেন স্থির হল।

এমনিতে চণ্ডীর গান রঘুনাথের খুবই ভালো লাগে। তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে গানের কথার ছবিগুলি। তিনি চোখ বুজে সব কিছু যেন নজর করতে পারেন। সব কিছু তাঁর চোখের সামনে ছায়াছবির মতো জীবন্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন খুব ধূম হবে।

রাজা মানসিংহ গৌড়বঙ্গ ও ওড়িশার অধিপতি। তাঁর কাছেও খবর গেল।

রাজা রঘুনাথ রায় কবি মুকুন্দকে বরণ করবেন স্বর্ণকঙ্কণ দিয়ে।

রাজদরবারকক্ষ রাজকর্মচারীদের যত্নে সুসজ্জিত হল। চন্দ্রাতপ পট্টবস্ত্রনির্মিত, তাতে জরির কাজ। স্তম্ভগুলো সেই রকম কারুকার্য-খচিত, পট্টবস্ত্রে আবৃত। নানা চিত্রবর্ণরঞ্জিত কোমল গালিচায় সভামণ্ডপ শোভিত। চারপাশে বিচিত্র পরিচ্ছদধারী পেয়াদারা শ্রেণিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কখন কার কি প্রয়োজন, সেই নিমিত্ত। বাইরে অশ্বারূঢ় সিপাইরা শান্তি রক্ষা করছে। সভামণ্ডপের মধ্যিখানে শ্বেতমর্মরনির্মিত উচ্চ বেদি। তার উপর রাজা বাঁকুড়া রায়ের স্বর্ণখচিত, রৌপ্যনির্মিত, মুক্তাঝালর শোভিত সিংহাসন রাখা আছে।

ক্রমে ক্রমে দরবার লোকারণ্য হয়ে উঠল। সভামণ্ডপ মধ্যে উচ্চ শ্রেণির লোকেরাই স্থান নিয়েছে দেখলাম। নিম্ন শ্রেণির লোকেরা বসার জায়গা না পেয়ে সভামণ্ডপ বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে দেখছে। ওদিকে বাতায়নে চিকের অন্তরালে আসন নিয়েছে মহিলারা।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান গায়ক গোপাল চক্রবর্তী। তিনি তৈরি হয়ে এসেছেন বিশেষভাবে। পাট করা পট্টবস্ত্র পরিধান করে এসেছেন গোপাল চক্রবর্তী।

গৃহে যশোদা মমতাকে নিয়ে ব্যস্ত। রাজসভায় যেতে হবে, কাপড়চোপড় কোথায় ঠিক করে নেবে নয় মমতা ঠাকুরঘরে খিল দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে আছে। যশোদা মমতাকে বলে, কাপড়চোপড় ঠিক করে নাও। সময় হয়ে গেল যে। ঠাকুর ঘর রুদ্ধ করে মাটিতে লুটিয়ে মমতা মাথা কুটছে আর বলছে, হে মা চণ্ডী, আজকের দিনটা পার করে দাও। আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। যশোদার ডাকাডাকিতে বেশ পরিবর্তনের কথা তার মাথায় এল। দরজা খুলে যশোদার কাছে সামান্য একখানি বস্ত্র চেয়ে নিল। তাই পরে সভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হল সে।

যশোদা দেখে বলল, এ কি?

মমতা বলে, আজ আমার সাজার দিন নয় রে। মা চণ্ডী আবার কখনও সাজার দিন দেয় তো সাজব। আজ এই বেশেই সভায় যাব।

যশোদা আর কিছু বলে না। মা কি ভেবেছে কে জানে। তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

যথাকালে রাজা রঘুনাথ রায় সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়ে উপবেশন করলেন। নকিব স্তুতিবাদ করল।

গীত-বাদ্যের মধ্যে আমি সভাস্থলে সিংহাসনে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা জনসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠল। শান্তি-রক্ষকেরা তাদের শান্ত করতে থাকে। ইষৎ গোলমালের মধ্যে সব কিছু আমার কানে আসে।

রাজা আমাকে বিনম্র স্বরে বললেন, কবি এবার অনুমতি করুন গান শুরু হোক।

আমি কি বলব? আমাকে অনুমতি দিতে হবে? বিনীতভাবে নিবেদন করি, রাজ দরবারে অনুমতি দেন রাজা।

ধন্য ধন্য পড়ল।

—বেশ। তবে তাহাই হউক। বলে রাজা গায়ক গোপাল চক্রবর্তী অভিমুখে দৃষ্টি দিলেন।

গোপাল চক্রবর্তী প্রস্তুতই ছিলেন। আনত হয়ে বললেন, আদেশ করুন রাজা।

—এবার আপনি শুরু করুন। সভাস্থলের চতুর্দিকে নজর বুলিয়ে রাজা আদেশ করলেন।

বিস্ময়ে দেখলাম, ধীরে ধীরে সশঙ্কিত শিশুর মতো গোপাল চক্রবর্তী সর্বসমক্ষে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে রাজাকে, পরে গুরুদেবকে, পরে আমার উদ্দেশে দূর থেকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

দর্শকমণ্ডলী বাইরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

জয় মা চণ্ডীর জয়।

সাহস পেয়ে গোপাল চক্রবর্তী গান ধরলেন। প্রথমে অতি ধীরে ধীরে, অতি দূরাগত সঙ্গীতের মতো গান শুরু হল। সকলের কানে পৌঁছোল না। বাইরের শ্রোতৃমণ্ডলী বলতে লাগল, গুরুজি আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আমরাও শুনতে চাই। গোপাল চক্রবর্তী এবার গলা চড়াতে লাগলেন। ক্রমে আরো স্পষ্ট হল কণ্ঠস্বর।

ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই রাজ দরবারে। তিল ধারণের স্থান নেই। গোপাল চক্রবর্তী দরবারে গাইছেন আর অতিথি অভ্যাগতদের দল একটা গান শেষ হলেই সাধু সাধু রব তুলছেন।

সভার মাঝে রাজ সন্দর্শনে উপবেশন করে আছি কবি মুকুন্দ আমি নিজে। আমি নিজেই বিস্মিত। আমার নিজের লেখা গান, আমার নিজের কাছেই অবাক লাগছে। দরবারে উপস্থিত সকলেই গান শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন।

শুরু হল আমার চন্দন অর্চনা। আমাকে ফুলের মালা ও পাটের পাছড়া উপহার দেওয়া হল। রাজ সভাসদেরা একে একে আমার শিরে চন্দনের ছড়া মাখিয়ে দিলেন। উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান দুটি কুন্তল, রত্নখচিত দশ অঙ্গুরীয় দিয়ে হাতির পিঠে চড়িয়ে স্বর্ণকলসের জলে আমাকে অভিষিক্ত করা হল। তারপর পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে রাজা রঘুনাথ রায় আমাকে সভাস্থলের মাঝে দাঁড় করিয়ে স্বর্ণকঙ্কণ পরিয়ে দিলেন।

রাজা ঘোষণা করলেন, নহে আপনি শুধু কবি। আজ থেকে আপনার পরিচয় হোক 'কবিকঙ্কণ'।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল রাজদরবারে। ধ্বনি উঠল, জয় হোক কবিকঙ্কণের, জয় হোক রাজা রঘুনন্দনের।

রাজা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একে একে আমাকে বরণ করলেন নানা উপহার দিয়ে। উত্তরীয়, শাল, পট্টবস্ত্র কত যে পেলাম।

আমি অভিভূত! এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কোনোদিন।

রাজা রঘুনাথ রায় খুব খুশি। তাঁর আমলে লেখা শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছিল

যখন, তখন তাঁর পিতা বর্তমান ছিলেন। তাঁর খুব গর্ব। তাঁর খুশির অন্ত নেই। তিনি বললেন,

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতস্য মহীতলে।
তাবৎ মুকুন্দ কথা লোকেষু প্রচরিস্যতি ॥

কবি আপনার কাব্য শুধু দেবী মাহাত্ম্যই প্রচার করবে না, এই কাব্য ভবিষ্যতের মানুষকে নতুন এক শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলার জন্য পথ-নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করবে। শুধু ধর্মকে কেন্দ্র করে নয়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েই মানুষ সেই নতুন সমাজ গড়ে তুলবে। আমি দেখতে পাচ্ছি বঙ্গদেশে মানবমুক্তি আন্দোলন জেগে উঠছে। সার্থক আপনি কবিকঙ্কণ। আপনাকে প্রণাম করে আমিও ধন্য হই।

রাজ দরবারের সব কাজ শেষে গৃহে ফিরলাম অনেক দেরিতে। বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লাম। অনেক ধকল গেছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। মমতা এসে পদসেবায় নিযুক্ত হল। জিজ্ঞাসা করলাম, যশোদা কোথায়, শিবরাম?

—সকলে শুয়ে পড়েছে।

—শুয়ে পড়েছে? এমন কিছু রাত হয়নি। আজ এত আনন্দের দিন।

মমতা বুঝল, আমি এখন একা থাকতে চাইছি না। মমতা আর কোনো কথা না বলে চলে গেল ওদের ডাকতে। অন্যদিন হলে ঘুম এসে যেত। আজ ঘুম আসে না। এত কাল ধরে তিল তিল করে যে স্বপ্ন গড়ে তুলেছি, অহোরাত্র যে ভাবনা আমাকে দাহ করেছে। সেই ভাবনার আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

সুখের আশায় আজ তৃপ্ত আমি। একবার বুঝি তন্দ্রা এল। কিন্তু মনের মধ্যে চাঞ্চল্য থাকলে তন্দ্রা বেশিক্ষণ থাকে না। ঘুম চটকে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হল। চেয়ে দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সন্ন্যাসিনী। গৈরিক বস্ত্র রুদ্রাক্ষ ভূষিতা মুক্ত-কুন্তলা কমনীয়া সেই মূর্তিকে চণ্ডী ভেবে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ি।

জিজ্ঞাসা করি, এরূপ কেন?

আর তখনই মাথাটা ঘুরে গেল। চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। মুহূর্ত মধ্যে মূর্ছা ভেঙে গেল। চারিদিকে দেখতে থাকি। কাউকে কোথাও দেখতে পাই না। মমতা শিবরামকে ডাকবার চেষ্টা করি। গলা দিয়ে কোনো স্বর নির্গত হয় না। সেই দেবী প্রতিমা কোথায় গেল? এ রূপ আমি কেন দেখলাম?

মনের মধ্যে কেবলই প্রশ্ন ঘুরতে থাকে। ঘুরতে থাকে চরকির মতো। কোনো উত্তর পাই না।

গৃহস্থের কল্যাণে বাড়ি বাড়ি মঙ্গল গানের চল শুরু হয়ে গেল।

সমাজে যাঁরা সম্ভ্রান্ত, তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত চণ্ডী গানের আসর বসে। শুক্লপক্ষে গাওয়া হয় কালকেতু-ফুল্লরার গান, কৃষ্ণপক্ষে গাওয়া হয় ধনপতি সদাগরের কাহিনি আট দিন ধরে। উৎসব অনুষ্ঠানে আলাদাভাবে বসে এই আসর। পূজা অর্চনা ও ধর্মানুষ্ঠান তো আছেই।

গায়করা উৎকৃষ্ট কাব্যের খোঁজে কবিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ছন্দ-জ্ঞান

সম্পন্ন কবিদের চাহিদা ভীষণ রকম বেড়ে গেল। এ পর্যন্ত জনপ্রিয় গীতিকার মানিক দত্তের গান-ই সকলে গেয়ে থাকতেন। সেখানে এল আমার গান।

ছাপিয়ে যেতে লাগল আমার কবি খ্যাতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চাহিদা দিন দিন বাড়তে লাগল। লিপিকার ডেকে কাব্যের নকল করাতে হয়। গানের আসরে মঙ্গল গানের গায়করা কবিয়ালরা হাতে 'করভূষণ' নামে মঙ্গলসূচক কঙ্কণ ব্যবহার শুরু করল। আসরে যে যত বড়ো গায়ক তাঁর হাতে তত উজ্জ্বল এবং কারুকার্যময় স্বর্ণখচিত ভারী কঙ্কণ দেখা দিল।

এমনিতে ভাদ্র মাসে বা আশ্বিন মাসে চণ্ডীর গান গীত হয়। চণ্ডীর গান হলেই লোক সমাগম বেশি হয়। গোপাল চক্রবর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে গানের জন্য বায়না পেতে শুরু করলেন। গান গেয়ে রোজগার ভালো হল।

কবিখ্যাতি পাওয়ার পর আমাব মনে হল যেন বয়স অনেক বেড়ে গেছে।

স্থির করি, চণ্ডীর পুজো বিধি রচনা করব। দামিন্যায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাজ-আশ্রয়ে চণ্ডীর পূজা নয়। জন্মভূমিতে চণ্ডীর অর্চনা করব। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক শান্ত। রাজা রঘুনাথ রায়ের কাছে এবার বিদায় নেবার জন্য জন্মভূমি দামিন্যায় ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। রাজার অনুমতি মিলল।

গ্রামে ফিরে আসার তোড়জোড় শুরু করলাম।

রাজা সব বুঝে অনুমোদন করলেন।

এবার ফিরে চলা পিছুর টানে, মাটির টানে। দামিন্যার উদ্দেশে হেঁটে চলেছি। হঠাৎ দ্বিপ্রহরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, চারদিকটা কেমন নৈঃশব্দে ডুবে গিয়েছে। কোথাও কেউ নেই, গাছের পাতাও নড়ছে না। ঠিক এমনই সময়। থমকানো হাওয়ার বুক চিরে আড় বাঁশির একটা কান্না ফালাফালা করে দিল চারদিক। মুহূর্তে কেমন রোমাঞ্চিত, উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। বাঁশির তীক্ষ্ণ সুরটা যখন কাছে এল, দেখলাম, রোগা শীর্ণ চেহারার একটা মানুষ বাঁশি বাজাচ্ছে। লম্বাটে মুখে একগাল পাকা দাড়ি, বিবর্ণ চেহারার পড়ন্ত বয়সি মানুষটার ঠোঁটে আড় বাঁশি। মাঝে মাঝে শুকনো জিভটা বেরিয়ে আসছে। ফাঁকে ফাঁকে উদাস করা মেঠো সুরের মোচড়। লোকটার গা স্পর্শ করে ঘোমটা দেওয়া এক রমণী, তার পরিবার, তার চাহনিও উদাস রকমের।

ধুতি-পরা এক বয়স্ক মানুষ আচমকা সেই বাঁশিওয়ালাকে প্রায় দুহাতে বেষ্টন করে ভরা আবেগে বলে উঠল, আহা কী শুনাইলা। কত দিন পরে দ্যাশের সুর শুইনতে পাইলাম। বাবা তুমার বাড়ি কোথায়? দ্যাশ কুথায়?

বাঁশিওয়ালা প্রথম অপ্রস্তুত, থমকাল সে। মুখ থেকে বাঁশি নামিয়ে বাঁ হাতে মাথার গামছা দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে অপ্রস্তুত হেসে বলল, আমার কোনো দ্যাশ নেই, ঘর নাই, বাড়ি নাই। য্যখন যেইখানে যাই, সেইডাই আমার দ্যাশ হয়।

—বাবা, কী কথাটাই না শোনাইলা। আমার কুন দ্যাশ নাই। য্যখন য্যেইখানে যাই, সেই খানটায় আমার দ্যাশ হয়। বা-বাঃ। মেঘনার পাড়ে আমার বাড়ি আছিল। তুমি আমারে কোন্ ছোটবেলায় লইয়া গেলা। বাঁশিওয়ালা তুমার নামডা কী গো?

বাঁশিওয়ালা এবারও একটু ইতস্তত করল। পরে বলল, বাপের নাম আমার আমেদ শেখ। আমার গুরু। হককলে আমারে ডাকে বংশী বলে। কেউ কয় বংশীদাদা।

ধুতি পরা লোকটা এদিক ওদিক তাকিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, তুমি আমারে এট্টু 'অকূল দরিয়ার মাঝি পাল তুলিয়া দে' গানটা বাঁশিতে শুনাইবা?

বাঁশিওয়ালা অন্ধ চোখ নিয়ে এদিক ওদিক ঘাড়টা নাড়াল। পরে বাঁশিতে ঠোঁট চেপে বলল, আগে নি আমার 'বন্ধুরে' শুইনা লও।

—বাজাও। বলে লোকটা বসে পড়ল গাছতলায়।

দেখতে দেখতে সেই নিদাঘ দ্বিপ্রহরে বাঁশিওয়ালাকে ঘিরে টুকটাক ভিড় বাড়তে লাগল।

বাঁশিওয়ালা বাজায়। লোকটা ফরমায়েশ করে। শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে বলল, তুমি আমার মায়েরে মনে করাইয়া দিলা। সেই এই সব গান পছন্দ করত। গুনগুন কইরা গাইত। দ্যাশের বাড়িতে।

সঙ্গী মহিলাটি এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে বলল, কিছু দ্যান গো বাবুরা। পাঁচ জায়গায় না বাজাইলে খামু কী?

লোকটা একটা টাকা তার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে অন্ধ বাঁশিওয়ালাকে বলল, এই দিয়া কি ঋণ শোধ হয়? তুমি আমারে কান্দাইলা। ইয়ার কুন জাত নাই, ইয়ার কুন ধরম নাই। এইডা বুকের ভিতর এক্কেবারে বইস্যা আছ। কি, ঠিক কইলামনি।

লোকটা চলে গেল কাঁদতে কাঁদতে।

বাঁশিওয়ালাও চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে।

সামনের খালটায় কোনো সাঁকো নেই। সামান্যই জল। ছেলের দল লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। শ্রীমন্তর পৃথুল শরীর ডাইনে-বাঁয়ে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। সে গিয়ে সাঁকোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলের ধারে পৌঁছে বলে উঠল, বাঃ! জায়গাটা কী সুন্দর।

স্বর্গ কোথায় আছে? মনে মনে আমিও বলি।

—কী ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, তাই না? আড়চোখে দূরে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখলাম। এবারে মনের কথাটা পাড়লাম। এখানে কিছু আহারের ব্যবস্থা করলে ভালো হয় না? বাঁশবাগানটা চমৎকার!

গরিব শ্রীমন্তকে চেপে ধরে।

—আগে কোনো দিন চোখে পড়েনি, কি বলো শ্রীমন্ত?

—আগে কোনো দিন এদিকে আসিনি। তবে—হঠাৎ আমতা আমতা করে থেমে যায় শ্রীমন্ত।

—কী, কী বললে?

—আসলে, আসলে এটা হল মুসলমানদের গাঁ।

থমকে দাঁড়াল সকলে। 'মুসলমানদের গাঁ' কথাটা শুনতে ছোটো। কিন্তু ব্যঞ্জনা গভীর। এরা বড়ো রক্ষণশীল মানুষ। নিজেদের ছোট্ট আঁকা গণ্ডি। সেই গণ্ডির নিয়মের মধ্যেই বসবাসে অভ্যস্ত সবাই। বাইরের কেউ যারা পথে ঘাটে পাত পাততে চায় তারা ঢুকে পড়লে আপত্তি আসতে পারে। বিশেষ করে ঘরের মেয়েদের আবরুর কথা ভেবে।

—দিন কালের যা গতিক। গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করি, আর এগিয়ে লাভ কী? ফিরে চলো তবে।

একটু আগের দেখা সুন্দর ছবিটা, দিঘি, ওই বাঁশবন—সব কিছু তাসের ঘরের মতো এক ধাক্কায় ধ্বসে যায়।

—দেখি একবার, যদি আনোয়ার থাকে। সরু নালাটা কোনো রকমে লাফিয়ে পার হয় শ্রীমন্ত। এখানকার চেহারা জানা নেই। তবে এই এলাকার মুসলমান সম্প্রদায় উগ্র ছিল না কোনোদিন। কাছেই পলাশবুনি গ্রামে একজন পির সাহেব থাকেন। তিনি সুফি ভাবাপন্ন। তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল। তাঁর খুব প্রভাব।

—তবে তো কথাই নেই। দামাল আশায় চাগিয়ে উঠল। তাহলে আগে পির সাহেবের কাছেই যাই না কেন? যদি পটিয়ে পাটিয়ে এই গাঁয়ে দু-দিন থাকা যায়? এই সব পটন পাটন কার্যে দামাল বরাবরই পটিয়ান। একই সঙ্গে গুলগুলে হাসি আর তুলতুলে আলাপের ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে যে কোনো কাজ গোছাতে সিদ্ধহস্ত সে। কিন্তু আমি আগে গ্রামের ভেতরটা দেখে আসতে চাই। আর, সম্ভব হলে, আনোয়ার নামে যুবকটিকে নিয়ে পির সাহেবের কাছে যাবার কথা ভাবি।

গ্রামে ঢোকার মুখে খানকয়েক ছাড়া ছাড়া কুঁড়ে, একটা ডোবা। একটা মুদির দোকানে লুঙ্গি পড়া জনা চারেক লোক দাওয়ায় হইচই করে কী একটা তর্ক জুড়েছিল। হঠাৎ আমাদের দেখেই চুপ মেরে যায়। নিঃশব্দ ধারালো দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করতে থাকে। চাউনিগুলো কেমন যেন।

সামনেই একটা পাড়া। ভরদুপুর বলেই হয়তো একেবারে শুনশান। মাঝখানের নিকোনো জমিতে রাশি রাশি ধানের পালুই। রাস্তাটা তার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ভুলভুলাইয়ার মতো। একপাল ধুলোমাখা বাচ্চা লুকোচুরি খেলছে সেখানে।

আনোয়ার হোসেন বাড়ি নাই। শোনা গেল বেশ কয়েকদিন বাড়ি ছাড়া। ফেরার পথে গ্রামের অন্যদিকটা চক্কর মেরে যেতে চাইলাম আমি। যত এগোই বিস্ময় আর বিস্ময়। আঁকা বাঁকা কাঁচা রাস্তার পাশে পানা ঢাকা পুকুর, পুকুর পাড়ে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের সারি। খোড়ো চালের বসত বাড়িগুলোর পাশে পাশে বাঁশের ঝাড়। বাখাড়ি ঘেরা বার বারান্দা। মাচায় তোলা চালকুমড়োর ডগা। খিড়কি দরজা দিয়ে দেখা উঠোনের এক ঝলক—সর সর। মেয়েরা আমাদের দেখছে উঁকি মেরে।

গ্রাম এত সুন্দর হয়! যেন ছবিতে আঁকা। নিজেই মনের বলে উঠি। আর তখনই চোখের সামনে হাজির হয় কোত্থেকে ছুটে আসা এক দঙ্গল লোক। একটু দূরে। রোদে-পোড়া চেহারা। পরনে আধময়লা লুঙি। বেশির ভাগ খালি পা, কারও বা কাঁধে গামছা। সবার সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে তার হাতে ধারালো কাস্তে।

দঙ্গলটা নেহাত ছোটো নয়, দশ-বারোজন তো হবেই। কাস্তেটা যার হাতে, সে লোকটাই কী একটু আগে মুদি দোকানে আড্ডা মারছিল? আড়চোখে দামালকে দেখলাম। ভয় পেয়েছে মনে হল।

নিঝুম দুপুর। মেঠো রাস্তা থেকে অনেক দূরে ঢুকে পড়েছি। এটা মুসলমানদের গাঁ। বাতাসে কটু গন্ধ। সামনে শ্রীমন্ত গরিব দামাল। হাত দশেক পিছনে বাকি আমরা সবাই।

লক্ষ্য করে দেখি আরো পিছনে খুচবোখাচরা কিছু লোক এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। সবাই চুপ। সবাই চেয়ে আছে এদিকে।

ভয় পেলে চলবে না। সামনে পিছনে লোকগুলি যত অচেনাই হোক! যত রুক্ষই হোক ওদের চেহারা অথবা যে কটা কাস্তেই থাকুক না কেন ওদের হাতে— মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

শ্রীমন্ত ফিসফিসিয়ে বলে, দাঁড়ালে চলবে না।

জবাব না দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। জোয়ারভাটার মতো দুটো উলটো স্রোত এখন একই সঙ্গে বইছে মনের মধ্যে। ভালোয় ভালোয় এখন থেকে সরে যাওয়া দরকার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওদের মুখের ওপর পৌঁছে যায় আমার চোখ। ভালো করে দেখতে থাকি। একেবারে ভাবলেশহীন মুখ সব। কঠিন চাউনি। কাস্তেধারী যুবকটি— হ্যাঁ, যুবকই বলা যায়। বয়স তিরিশের মতো হবে। একটু সরে এসে একটা দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু এ খেলা কতক্ষণ চালানো যায়? ভাবি একবার। বড়ো জোর সামান্য কিছুক্ষণ সময়। তারপর? পরিস্থিতির মুখোমুখি তো হতেই হবে। তাহলে?

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে ফেললাম। লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম। সেই যুবকটি, হাতে কাস্তে, তার একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, আমি একজন কবি। বিপদে পড়েছি। পথ হারিয়েছি। আমার সঙ্গে পরিবার আছে। আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন?

যুবকটি জবাব দেয় না। ধারালো ঠান্ডা চোখে চেয়ে থাকে। তার সঙ্গীরা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল। ঠিক বুঝতে পারি না, সময় কত বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলে। হঠাৎ শুনতে পাই নিজেরই গলা। যুবকটিকে বলছি তখন, দেশের হালচাল সবই আমার জানা। আমরা সকলেই হিন্দু। সেটা ভেবে হয়তো আপনাদের বিরক্ত না করাই উচিত ছিল এখন।

যুবকটি আড়চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকায়। সঙ্গীরা তাকায় এ ওর দিকে। মুখে একটাও কথা নেই। যেন যত কথা সব চোখে চোখে বলছে সবাই। এই রকম অনেক নিঃশব্দ শলা-পরামর্শের পর সবাই যখন আবার কাস্তেধারীর দিকে তাকায়, কাস্তেধারী বলে, আমরা বুল্লে বিশ্বাস কইরবেন?

—তার মানে?

—মুসলমানদের কথায় বিশ্বাস কইরবেন আপনারা?

—হ্যাঁ, করব।

আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে এবার কাস্তেধারী রায় দেয়। তাহলে পাবেন সাহায্য।

—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! ভিড় ফুঁড়ে ঝরনাধারার মতো শ্রীমন্ত বেরিয়ে এল। এতক্ষণের চাপা আতঙ্ক উধাও। মুখময় ছড়িয়ে আছে আদি অকৃত্রিম হাসিটি।

—কী বলে যে আপনাদের ইয়ে জানাব। বললে বিশ্বাস করবেন না। এখনও আমাদের দুপুরের খাওয়া হয়নি। এতই মুগ্ধ আমরা এই গ্রাম দেখে যে, বলতে ইচ্ছা করছে—

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সে যে আমার জন্মভূমি।

—আপনি দামিন্যার মুকুন্দ চক্রবর্তী না?

—হ্যাঁ, তো। চেনেন দেখছি।

—আমার নাম ইরফান, কাস্তেধারী বলে। মোতাহার আলি সাহেব আমার চাচা বটে।

—তাই বলো।

শেষ দুপুরে পির সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। গ্রামের অনেকেই এসেছেন তাঁর কাছে। ইরফানের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন পির সাহেব। তারপর শান্ত গলায় বললেন, মেহমান আপনারা, এসেছেন এই গ্রামে। বাপজান দেখিস যেন গাঁয়ের মান থাকে। আমাকে বললেন, গরিব গুরবোর গ্রাম। ভুলচুক হলে সামলে নেবেন এই টুকুন আমার অনুরোধ।

—অ্যাই খবরদার! হঠ যাও! হঠ যাও! ভীষণ চেঁচিয়ে ওঠে কে যেন। দেখলাম সতেরো আঠারো বছরের একটি ছেলে। মাথায় একটা ময়লা গামছা বাঁধা। লুঙি হাঁটুর উপরে আঁটো করে পরা, হাতে একটা ছোট্ট লাঠি। ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে এলোমেলো ভিড়টার সামনে। মাটির ওপরে সেই লাঠিটা এপাশে একবার ওপাশে একবার আছড়ায় আর তড়পায়, তফাত যাও! তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়!

যাদের ভয় দেখাচ্ছে তারা কিন্তু হো হো করে হেসে উঠল। ছেলেটার লম্ফঝম্ফ থামে না। বলে, না না। কোনো কথা শুনব না। তফাত যাও!

—পাগলা খেপেছে রে। আবার একটা হাসির হুল্লোড় উঠল।

—চুপ চুপ। বলে ধমকে উঠলেন পির সাহেব। হাসি থেমে গেল। ছেলেটাও দুম করে রামভক্ত হনুমানের মতো শ্রীমন্তর পায়ের কাছে চুপ করে বসে পড়ল।

—ও হল পাগলা হামিদ। ইরফান জানায় আমাদের। মাঠে বাগালি করে তো!

বাগালি মানে গোচারণ। দিনভর মাঠে গোরু চরিয়ে, পালের গোরু ছিটকে গেলে লাঠি পেটা আর হম্বিতম্বি করে—এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে সব সময় ওর এক রা। একজন ফুট কাটে।

আর একজন বলে, তাই এখন আর মানুষ গোরুর তফাত বোঝে না।

আবার সবাই একচোট হেসে নিল।

—তবে ছেলে ভালো, অতি নিষ্ঠাবান ছেলে। ইরফান তো দেখি ওকেই বেশি ভরসা করে। পির সাহেবের মন্তব্য।

—সে কী?

—ঘাবড়াবেন না। ইরফান বলে। একবার চেনা-জানা হয়ে গেলেই দেখবেন ও কেমন আপনার হয়ে গেছে।

এবার সকলের দিকে হাত নেড়ে এগিয়ে যাই। সকলে সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তা ছেড়ে আদাব জানায়। ভিড় আরো ঘন হয়ে গেছে তখন।

গ্রাম পরিক্রমায় বের হই। আধখানা গ্রাম তখন আমাদের পিছনে চলে এসেছে। কেউ কেউ বিদায় নিয়ে চলে গেল, আবার কাল দেখা করবে বলে।

পরদিন সাতসকালেই হাজির পুরো গ্রাম। দূর থেকে গ্রামের রাস্তাটাকে চেনা যাচ্ছে না। গিজগিজ করছে লোকে। গুঞ্জন, উল্লাস, চেঁচামেচি সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা।

কিছুদূরে একটা কাঁঠাল গাছের তলায় বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে একদল মহিলা। মাথায় সিঁদুর বুঝিয়ে দেয় ওরা কেউ মুসলমান নয়।

—তফাত যাও! তফাত যাও! ভিড় ফুঁড়ে পাগলা হামিদ কোথা থেকে বেরিয়ে আসে। পেছন পেছন পির সাহেব আর ইরফান।

—ঘাবড়াবেন না। পির সাহেব বলেন। আপনার কথা সবাই শুনেছে তো খুব, তাই আশপাশের গাঁ গুলো থেকে আপনাকে সবাই দেখতে এসেছে।

—বলেন কী? আঁতকে উঠি। বলি, এত জানাজানি হলে শেষ ডিহিদারের লোক ধরে নিয়ে যাবে যে।

পির সাহেব একগাল হাসেন। বলেন, ভাবনা নাই গো। আমরা আপসে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ডিহিদারের লোক খবর পেলেও আপনাকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যায় কোন্ বাপের ব্যাটা? পালা করে সবাই দেখবে। বলে, ভিড়টার দিকে ফিরে শুধোন, না কী গো?

সবাই হ্যাঁ দেয়।

—তাহলে এবার যে যার ঘর যাও সব। আমরাও কাজে যাই। পির সাহেবের এই কথা শুনে, আশ্চর্য, ভিড়টা ঘরমুখো হতে শুরু করে।

পাগলা হামিদ ওর লাঠিটা শূন্যে দুলিয়ে হাঁকে, আসেন গো আমার পিছু পিছু আসেন সব। এই তফাত যাও। তফাত যাও।

রাস্তা পেরিয়ে খালটায় চোখ পড়তেই অবাক হই। পায়ে হেঁটে জল পেরোবার কথা ছিল, এখন দেখি ছোট্ট একটা সাঁকো। বাঁশ কঞ্চি আর ডালপালা দিয়ে তৈরি, ঠিক যেন একটা খেলনা সেতু।

—গাঁয়ের বাচ্চাগুলান বানিয়েছে কাল রাতে। ইরফান হাসে। লটবহর সব পার হবে। মায়েরাও পার হবেন।

মধুমতী নামে একটি মেয়ে তিন-চারজন মেয়েকে নিয়ে মমতা, যশোদা আর চিত্রলেখাকে ঘিরে এগিয়ে আসছে। বাচ্চারা বিচ্ছু কিন্তু লাজুক, ওদের হাত ধরে সাঁকো পার করে দিচ্ছি।

সামনে ঘন বাঁশবাগান। পথের ধারে একটা মোটাসোঁটা শিমূল গাছ হাত পা মেলে বিরাট মাথা তুলে নটবাজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাই উঠল। বুঝতে পারলাম একটু জুত করে ঘুমোনো দরকার। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। দামালের দম নেবার ফুরসত নেই। চারদিকে নজর রাখতে হচ্ছে। এর মধ্যেই ঘুম এসে ছন্দপতন ঘটাচ্ছে মাঝে মাঝে। গত রাতে সে-ও যে ঘুমোয়নি।

চটকা ভেঙে দামাল কিঞ্চিত অপ্রস্তুত। নিদ্রাজড়িত চোখদুটো কোনো রকমে খুলে নিজের মার্কামারা হাসিটি উপহার দিয়ে শ্রীমন্ত বলে, চোখদুটো যেন আপনা থেকেই একেবারে—একটা বিশাল হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে—বুজে আসছে। মা, মা গে চণ্ডী।

খারাপ লাগে। কেবল আমাদের জন্য ছেলেটা বাড়ি-ঘর ছেড়ে আপনজন ছেড়ে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে। অনেক পীড়াপীড়িতেও ফিরে যায়নি। গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছি সবাই। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। বিশ্রাম নিচ্ছে সকলে। এঁটো পদ্মপাতাগুলোর উপর কুকুরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাতাগুলো শুকিয়ে গেলে এক জায়গায় জড়ো করে

পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এঁটো কুড়োবার সময় সবাই হাত লাগায়। কে কার এঁটো ছুঁলো তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

বিকেলে শীতের রোদ্দুর হলদে হয়ে আসে। সবাই এবার গুটিগুটি উঠে পড়ে। দিন ছোট। পির সাহেব বসে আছেন আমার কাছে। ওঁর ফিরতে এখনও দেরি। শরীরের স্নায়ুগুলো এখন বেশ ঝরঝরে লাগে। খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম শান্তি এ গাঁয়ে সবই পেলাম। গাঁয়ের বাচ্চাগুলো আমাদের দূর থেকে দেখে আর হি হি করে হাসে।

বাঁশবন থেকে ঝি ঝি-ডাক ওঠে। সেই ডাক সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। পির সাহেবের সঙ্গে গিয়ে বসি মুদি দোকানের বাঁশের মাচাটার উপর। একদিন-দুদিন-তিনদিন এই গ্রামে থাকা হল। পাগলা হামিদের পাচন বাড়ি হাতে লেগে আছে সব সময়। উটকো কেউ আমার কাছাকাছি ঘেঁষার চেষ্টা করলেই হাঁক পাড়ে, তফাত যাও। তফাত যাও। পথে আগাছার ঝোপ সামনে পড়লেও লাঠির বাড়ি মেরে বলে, তফাত যাও। ছাগল কিংবা গোরু পড়লেও তাই বলে।

মাঠে মাঠে চাষের কাজ, গ্রামে মানুষের হাতে বেশি শখ মেটাবার সময় কই? তবু ভালো লাগলে রাতের বেলায় কবিগান শোনে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যায়। তারপর আবার বাড়িমুখো হয়। মেয়েদের ধৈর্য বেশি। তারা কবিগান শুনতে শুনতে পান চিবোয়, গল্প-গাছা করে। বাচ্চা-কাচ্চারা মুখে আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ে। আসলে মেয়েরা আসে ঘরের কাজ সব শেষ করে।

এক দুপুরে ইরফান পাশে এসে বসে গলা নামিয়ে বলে, ঠাকুরমশাই, আপনার ডানদিকে একবার তাকান। চেয়ে দেখুন।

ডানদিকে তাকাই। দূরে, গাছগাছালির ফাঁকে, গৃহস্থবাড়ির বেড়ার পাশে, গলির মুখে দুজন চারজন ছ-জনেব ছোটো ছোটো দল গলা উঁচিয়ে আমাদের দেখছে। কারও মাথায় ঘোমটা, বোরখা-টোরখা নেই, এ গাঁয়ের বউঝি সব। দৃশ্যটা নতুন একেবারে।

—আসলে এ গাঁয়ের বউঝিরা আর আপনাকে বাইরের লোক বলে মনে করে না।

—তাই? পুলকিত হই। কিন্তু অতদূর থেকে দেখবার প্রয়োজন কী? গিয়ে বলো না, আরো কাছে এসে ওই গাছতলায় দাঁড়াতে। ভালো করে দেখাও যাবে, আবার খানিক আড়ালও থাকবে।

সেদিন বিকালে কাজের ফাঁকে লক্ষ্য করলাম গ্রামের মহিলারা সত্যিই আর দূরে নেই।

যশোদাকে কাছে ডাকি। কিন্তু কোথায় যশোদা? খোঁজ খোঁজ। শেষ অবধি তাকে আবিষ্কার করা গেল ইরফানদের বাড়ির অন্দরে। মেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া শিখছে। কী হয়েছে? বলতে বলতে এসে হাজির হলেন পির সাহেব। বড্ড আমুদে আব আড্ডাবাজ সাড়ে-চার হাত দৈর্ঘ্যের এই মানুষটি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলকে আপন করে নেন।

আমরা এখন পির সাহেবের ঘরের লোক। দুবেলা দেখা না হলে তার ভালো লাগে না। সকালে এসে দুপুরে ঘুরে গিয়েই আবার বিকেলে হাজির ঠিক। বলেন, হ্যাঁ গো, কাছেপিঠেই একজন গাইয়ে এসেছেন। তা যাবেন নাকি একবার শুনতে?

—গেলে অবশ্য মন্দ হয় না।

—তা বেশ তো, মন যখন টানছে তখন আজ সন্ধ্যাতেই যাওয়া যাক।

সত্যি, কী মহিমা জায়গাটার। যাবার কথা মাথায় এলেই মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। ওই যে শঙ্করাচার্য বলেছেন, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—।

দামাল শ্রীমন্ত সঙ্গ নেয়। একটা বিশাল মাঠ পার হতে হয়। গৃহকর্তা আদর করে বসালেন। গান শোনা গেল। বিদায় নেবার সময় শুধালেন, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—অসুবিধে? কীসের অসুবিধে?

—দিনকাল তো গোল্লায় গেছে দেখছি। শুনচি পাঠানরা একটু ঠান্ডা হয়েছে। তবে শুনছি মক্তবমাদ্রাসা মসজিদে নানারকম ফিশফিশানি চলছে নাকি?

—না না। জানাই। না, কোনো অসুবিধে হয়নি।

—আমার হিসাবও তাই বলে। পাশাপাশি বাস, কমদিন তো দেখছি না। জোয়ানগুলোব বাপদাদাদের জন্মাতে দেখলাম। পথে-ঘাটে দেখা হলে তারা সমীহ করে, সম্মান দেয়। পুজো পার্বণে পাশে এসে দাঁড়ায়। তবে ওই যে বললাম, দিনকাল। ওখানেই ধন্দ।

—কেন?

—গত সংক্রান্তিতে সাগর থেকে ফিরছি। হঠাৎ খেয়াল হল, পাশে জনা তিন-চার গেরুয়াধারী ফিশফিশ করছে। কান পাততেই বুঝতে পারলাম ওরা শঙ্করদেবের শিষ্য।

—সে তো হতেই পারে।

ততক্ষণে মিষ্টি এসে হাজির। লুচির পাহাড়। মোহনভোগের ঢিবি। তাই দেখে পির সাহেব 'আরে বাপরে' বলে পুলকে লাফিয়ে উঠলেন। প্রথম থালাটি করায়ত্ত করে পোয়াটাক মোহনভোগ মুখে গুঁজে দিয়ে বললেন, গেরুয়া সন্ন্যাসীদের ব্যাবারটা কীওলোব?

—আজ্ঞে? হঠাৎ অচেনা ভাষা শুনে গৃহকর্তার প্রশ্ন।

কোঁত করে মিঠে একটা আওয়াজ উঠল। মুখের খাবার চলে গেছে খাদ্যনালিতে। পরবর্তী লুচির গোছা বাগিয়ে পির সাহেব বললেন, বলছিলাম যে, তারপর সেই গেরুয়া সন্ন্যাসীদের ব্যাপারটা কী হল?

—ও হ্যাঁ, ওরা আলাপ জমালে। বোঝা গেল, এ দিগরে একেবারে আনকোরা। পথঘাটও চেনে না ভালো করে। কিন্তু গেরুয়া চেনে। আমার গেরুয়া গামছাটা দেখে আমাকে আস্তে আস্তে খোলসা করে বলে ফেললে মনের কথাটা। একটু থেমে আবার যোগ করলেন, কথাটা বড়ো সহজ নয়।

—কী রকম?

—বললে কিনা যবন হঠাতে হবে।

—আপনি কী বললেন?

বললাম, এ তো খুব ভালো কথা বললে ভায়া। বলেই হাসি। হাসি থামিয়ে বলি, কিন্তু আমিও যে যবন। আমার গামছাটা কেবল গেরুয়া। আমাকে হটিয়ে ফেলবেন, তা ফেলুন। গেরুয়াধারীদের মুখগুলো তখন দেখবার মতো হয়েছিল।

স্ত্রী মমতা, পুত্র শিবরাম, ভাই রামানন্দ ও শিষ্য দামালকে নিয়ে দামিন্যাতে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু এ কোন্ দামিন্যাতে এলাম। বাড়ি-ঘর বন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সাধের পিতৃপুরুষের ভিটে ধুয়ে গিয়েছে।

বড়ো বাক্সটা দরজার সামনে নামিয়ে যখন রং-চটা নড়বড়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে গেলাম, দেখি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। শেকলটা নাড়লাম বেশ জোরে। কোনো সাড়া নেই। কান পাতলাম দরজায়। দরজাটা এবার জোরে ঠেললাম; এবার আরো একটু জোরে শিকল নাড়ালাম। ভেতর থেকে কোনো শব্দ পাওয়ার অপেক্ষা করে বুঝলাম, না কোনো শব্দ হয় না। শেষে দরজার ফাঁকে চোখ রাখলাম। দেখতে পেলাম বাড়ির ভিতর উঠোনে কতগুলো এঁটো বাসন নামানো রয়েছে।

পেছনের বাড়ির জানালা খোলার একটা শব্দ হল। জানলায় ঘুমজড়ানো উৎসুক চোখ নিয়ে একটা মহিলার মুখ ভেসে উঠল। চোখে কিছু বিরক্তি। ভোরের স্বপ্নঘুম ছিনতাই হয়েছে বুঝি। দরজার সামনে থেকে অপদস্থ ভাব নিয়ে সরে এলাম। সরে এলাম বাড়িটার উঁচু জানলার নীচে। জানলাটা বন্ধ। বাড়িতে কারা বাস করছে?

আমার চোখেমুখে বিরক্তি ও হতাশার ছাপ।

জানলার নীচ থেকে সাবধানে সরে এলাম। চারদিকে আগাছা জঙ্গলে ভরে আছে। আবর্জনা চারপাশে। এদিক-ওদিক চোখ ফেরাই। আমার আপন বাড়ি, অথচ আমি নিজেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারছি না। ক-বছর আগে দেখা ছবির খুব একটা হেরফের হয়নি। উঠোনের নারকেল গাছটা লম্বায় আরো বেড়ে গেছে। বাঁদিকের বাড়ির চালটা টালির হয়েছে। টালির রং পালটে কালো হয়ে গিয়েছে। বাগানে জাম ও জামরুল গাছটা আরো লম্বা ও জমকালো হয়েছে। কামিনী গাছটা নেই।

আবার দরজার সামনে এলাম। কোঁচকানো কপালে আমার বিন্দুবিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। তবে কি নিজের বাড়িতে নিজে প্রবেশ করতে পারব না?

এবার দরজায় বেশ জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম। ভেতরের শেকলটা ঝনঝনিয়ে উঠল। আর তখনই হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। সেই সঙ্গে হাতের হাতবাক্সটা হাত থেকে গলে নীচে পড়ে গেল। ঢাকনাটা খুলে গেল। জিনিসপত্র গড়িয়ে গেল বাড়ির ভিতর উঠোনে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সব তুলে নিলাম। শিবরাম সঙ্গে হাত লাগাল।

বাড়ির ভিতর ঢুকে মনে হল, এ কার বাড়ি? দাওয়াটা অচেনা লাগে। বারান্দায় কোনো ছাউনি ছিল না। বাড়ির বাইরের চেহারাটা মোটামুটি একই থাকলেও ভেতরে সব বদলে গেছে। বাইরেটা বেশি ভাঙাচোরা। ভেতরে সুরক্ষা বেড়েছে, কিংবা সাবধানতা। আগে বাইরেটা বেশ পরিষ্কার ছিল। এখন আগাছা আর জঙ্গলে ভরে গেছে। ঝোপঝাড় চারদিকে। বাড়ির ভেতরটা একটু বেশি ছিমছাম লাগছে। এ বাড়িতে কারা থাকে লোকগুলোই বা কোথায় গেল?

বেরনোর সময় বাড়িটা এরকম ছিল না।

বেহারা বাঁকে করে কলসি ভরে জল নিয়ে এল। সকলে মিলে হাত পা ধুলাম। তারপর থিতু হয়ে বসলাম দাওয়ায়। একে একে বেরিয়ে এল বাড়ির ভিতরের লোকজন। আমার আপন জ্ঞাতি আত্মীয় সবাই। কয়েকজনকে দেখলাম নতুন। পুরোনো সকলকে চিনতে পারি। ছোটো বাচ্চাগুলোকে চিনতে পারি না। নতুন নতুন ছেলেপিলে সব। আমাকে একে একে এসে সবাই প্রণাম করে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে সবাই। অনেকদিন পরে দেখা হচ্ছে বলে, না তাদের দখলকৃত বাড়ি হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় বুঝতে পারছি না।

বাঁকে করে কলসি ভরে মাঘ ফাল্গুনে নদীর জল তুলে আনা হত। অন্ধকার ঘরগুলোতে সারিসারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। মনে হত ওই সব স্যাঁতসেঁতে এঁদো কুঠুরিতে গা-ঢাকা দিয়ে বাস করত একদল অশরীরী। হঠাৎ হঠাৎ ওদের নাকি দেখা যেত। মস্ত বড়ো ওদের হাঁ, চোখ দুটো বুকের ওপরে, কান দুটো কুলোর মতো, পা ছিল না কারো। সেই ভূতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে আসাযাওয়া করতে ছোটবেলায় তোলপাড় করে উঠত বুকের ভেতরটা। এক দৌড়ে পার হয়ে যেতাম উঠোনটা। ভিনদেশি বেহারারা বাঁক কাঁধে গঙ্গার জল ফেরি করতে আসত। গঙ্গার জল পুজো পার্বণে কাজে লাগে বলে তুলে রাখা হত ঠাকুরঘরে। সে সব এখন ধ্বংসাবশেষ। চেয়ে চেয়ে দেখি।

পুকুরের জলে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র স্নান ও পান দু-কাজই করতে হয়।

তাঁতি বউ আসে শাড়ি কাপড় উড়নিব বেসাতি নিয়ে। নাপতানি আসে বাড়ির মেয়েদের নখ কাটতে, পায়ে আলতা পরাতে। সকলে খুশি হয় মমতা এবং পরিবারের অন্যান্য সবাইকে দেখে। কতদিন পরে দেখা। ঢেঁকিশাল পরিষ্কাব করা হল। চণ্ডীমণ্ডপে বসল পাঠশালা। সন্ধে বেলায় দাসীরা বসে উরুতে সলতে পাকায়। চণ্ডীমণ্ডপে জ্বলে আলো। নাড়ুকোটা, আটকড়ির নেমন্তন্ন আসে আশপাশের বাড়ি থেকে। আমি যেন গ্রামের ছেলে নই। গ্রামে আমি এখন সম্মানিত অতিথি। ক্রমে নিজের ভিটেতে থিতু হতে থাকি।

মনের ভেতর জ্বালা। ভিতরে ভিতরে জ্বলছি। জীবনের প্রথম দিকে দৈবশক্তিকেই বলীয়ান বলে মনে হত। পাঠান অত্যাচারের দিনগুলোতে মনে হত দৈবশক্তি কোথায়? দৈবশক্তি কি করতে পারে, কিছুই না। অভিজ্ঞতা ক্রমশ আমাকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তুলেছে। জেনেছি ভাগ্যকে অদৃষ্টের হাতে সমর্পণ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কিছু হবার নয়। এভাবে জোতজমি রাখা যাবে না। কথায় আছে জোতজমি বাপেরও নয়, দাপের। ফিরে এসেছি জন্মভূমিতে। কিন্তু এ কোন্ জন্মভূমি?

এইভাবে অবিমৃশ্যকারিতায় একদিন হারিয়েছি পুত্র পঞ্চাননকে। এবার কি জোতজমি সব হারাব?

দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছে স্থানীয় স্বজনরা। বাস্তুভিটার সামান্য অংশ কোনো রকমে যা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে দখল নিয়েছে অন্য আত্মীয়রা। বাকি সব জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। জঙ্গলাকীর্ণ বাস্তু এখন সরীসৃপের বাসস্থল, মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত। এতদিন পর জন্মভিটায় অধিকার নিয়ে আর্বিভূত হব তা বোধ হয় দখলকারী আত্মীয়দের কল্পনাতে ছিল না।

স্বাভাবিকভাবেই তারা সকলেই অসন্তুষ্ট।

চাষাবাদ করার সময় এল। বন্যার জলে ধুয়ে গিয়েছে সব। আগাছায় ভরে গিয়েছে জমি। জমি আবার নতুন করে সন্ধান করে চিহ্নিত করতে হল।

দামিন্যার মাটিতে বহুদিন পর দাঁড়িয়ে নিজেকে মনে হল আমি যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। সেই সদা হাস্যময় মানুষটি ক্রমে শীর্ণ পাণ্ডুর পক্ককেশ সমৃদ্ধ এক বৃদ্ধতে পরিণত হতে শুরু করলাম। সেই পূর্বতেজ কোথায় হারিয়ে গেল। বহুদিন যেন অনাহার চলছে

এমনই আমার শরীরের অবস্থা। ছোট পুত্র পঞ্চাননের অকাল মৃত্যুতে খুবই শোকাহত হয়েছিলাম ঠিক, তখনও কিন্তু এতটা ভেঙে পড়িনি।

টোল চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যায় গুরু বৃহস্পতিসদৃশ। পাঠশালা খুলে বসলাম কিন্তু ছাত্র আসে না। বেদখল জমিজমা সব একে একে উদ্ধার করি আর কেবলই গালে হাত দিয়ে আনমনা হয়ে ভাবি। এখানে না ফিরলেই বোধহয় ভালো ছিল। পাঠশালা থেকেই একদিন আমার লেখাপড়া আরম্ভ হয়েছিল। গণিত শিখেছিলাম। শিখেছিলাম মনকষা আর কাঠাকালি মানুষ হব বলে। একটা কথা তখন খুবই চালু ছিল।

ভারত পড়া ছেলের খুব কদর,
আদরে বিয়ে হয় পায় বড় ঘর।

ভারত পড়ার অর্থ কাশীদাসী মহাভারত পড়া।

পড়েছি অনেক। লিখেছি কণিকা মাত্র। তবু সম্মান পেয়েছি। অনেক অনেক সম্মান।

কিন্তু আজ গ্রামে ফিরে এসে কি পাচ্ছি?

বাবার কাছে হাতেখড়ি বর্ণপরিচয় হয়েছিল আমার। তারপর এখানে সেখানে আঁক কষেছি। বেশির ভাগ ছেলে নগ্ন গাত্র, গামছা পরে কেউ বা সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পাঠশালায় আসত তখন। আমি অবশ্য ধুতি পরতাম খাটো করে। দু বেলা পাঠশালা যেতে হত। একবার সকালে, একবার বিকালে। দপ্তর বগলে করে পাঠশালায় যেতাম। পাঠশালার একদিকে মুদিখানা, অন্যদিকে বিদ্যাদান কেন্দ্র। ছাত্রীর বালাই ছিল না, সবাই ছাত্র। সাত আট বছর থেকে কুড়ি একুশ বছর পর্যন্ত বয়স ছিল পড়ুয়াদের। যারা বয়স্ক, তারা হত শিরপোড়া বা শীর্ষ পড়ুয়া অর্থাৎ গুরুমশাইয়ের সহকারী। আমরা ছিলাম ছোটো। ছোটোদের তদারকির ভার থাকত ওদের ওপর। তালপাতার একটা ছোট্ট চাটাইয়ের আসন নিয়ে যেতাম সঙ্গে করে। প্রথমে সবাই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে সমস্বরে প্রার্থনা করতাম।

আমরা সকল শিশু জোড় করি হাত,
প্রণমি তোমারে প্রভু জগতের নাথ।

প্রার্থনা শেষে সবাই নিজের নিজের আসনে বসে পড়তাম। সকাল থেকে দুপুর, বিকাল থেকে সন্ধে। বিকালে কেবল তালপাতায় অথবা কালি কাগজে লেখা আর নামতা পড়ানো হত।

তিন এক্কে তিন, তিন দুগুণে ছয়, তিন তিরিক্কে নয়, তিন চারে বারো.......এই ভাবে চলত নামতার পাঠ। পাঠ চলাকালীন পাঠশালার চারপাশে ভরে থাকত ছন্দযুক্ত এক কোলাহল। নামতার পাঠটি যে শুধুমাত্র কোরাস ছিল তা নয়, পাঠটির ভঙ্গিমা ছিল অপূর্ব। অঙ্কের সঙ্গে অঙ্ক গুনে সমান্তরালভাবে ঝুঁকে ধারাপাত পড়া হত। পাঠশালার সব পাঠ শেষ হলে, ছুটি হওয়ার আগে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নামতার এই মুখস্থ আওড়ানো ছিল সঙ্গীতের মতো। এ যেন সেই সময় ও তাল বজায় রেখে কোরাস সঙ্গীত গাওয়া। তালে তালে নেচে চলে পণ্ডিতের হাতের লিকলিকে বেত। কোথাও ছন্দপতন ঘটলেই নেমে আসবে সপাত করে। যৌথ পাঠদানের বড়ো সুবিধা, পুরো প্রার্থনা সঙ্গীত না জেনেও গলা মেলানো যায় বা সব মুদ্রা মনে না থাকলেও হাত পা মেলানো যায়। তবে ধরা পড়ে গেলে রেহাই ছিল না। বুকের মধ্যে তখন পাহাড় ভাঙার শব্দ হত। জানা অঙ্কও ভুল হয়ে যেত।

প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চাটাই, আলাদা থলে। যে থলেতে ভরা থাং ছাড়ানোর ঝিনুক, গোল্লা, লবণ....আরো কত কী! শৈশবের সেই থলে ছিল এক অঙ্কে অঙ্কে ছন্দে ছন্দে ধারাপাত শেষ হত। দশ দশে একশো-ছুঁয়েই সম্মিলিত উঠত "ছুটি-ছুটি-ছুটির ঘণ্টা"। এই ছিল পাঠশালার দৈনিক অধিবেশনের রূপ।

আমি সেই পাঠশালাকে নবরূপে গড়তে চাইলাম। ছেলেবেলায় দেখেছি, গুরুমশাইরা ছিলেন দুই ভাই। তাঁদের নাম ছিল ভূদেব এবং দুর্লভ। ভীমকান্তি শুভ্র উপবীত সজ্জিত থাকত প্রশস্ত বক্ষে। মুদিখানার সঙ্গে ছিল ওদের চাষ। মুদিখানার সামগ্রী নিয়ে আসতে হত দূরবর্তী গঞ্জ শহর থেকে। কখনো বা গোরুর পিঠে ছালায় অথবা মাথায় করে। আবার চাষের সময় কৃষাণদের নিয়ে মাঠে নিয়ে যেতে হয়। দুভাইয়ের একজনকে তাই বাইরে বাইরেই থাকতে হত। যিনি দোকান দেখতেন তিনিই পাঠশালা চালাতেন। এর সঙ্গে আবার ছিল পুজোপাঠ। গ্রাম্য দেবদেবীদের নিত্যপূজা। বাড়ি বাড়ি শীতল দেওয়া, ভোগ দেওয়া, পৌরোহিত্য সবই! মুখুজ্যেদের দুই ভাই-ই কিন্তু ছিল সন্তানহীন। তাই পাঠশালার ছেলেরাই ছিল তাঁদের কাছে সন্তানবৎ।

পাঠশালার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসত মুদিখানার বারান্দায়। ছোটো ভাই ভালো খোল বাজাতে পারতেন। নগর-সংকীর্তন বার হত একাদশী পূর্ণিমায় বা অন্য কোনো গ্রাম্য উৎসবের সন্ধ্যায়।

পুরোনো এই দিনগুলোর কথা এখন বড়ো বেশি করে মনে পড়ে। একা একা বসে থাকলেই সব হুড়োহুড়ি করে চলে আসে মাথার মধ্যে। ছবির মতো সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দামাল কত দিন এসে ডেকেছে শুনতেই পাইনি। যখন হাত ধরে নাড়া দিয়েছে, তখন সম্বিত ফিরেছে।

বাড়িতে সাবেক কালের যে তোরঙ্গ আছে, ওই কাঠের বাকসোটাকেও বলা যায় স্মৃতির প্যাঁটরা। উই-কাটা নানা সাইজের অসংখ্য জীর্ণ কাগজপত্র হরেক কিসিমের ছোট বড়ো জিনিস আর পুথি-পত্তরে ঠাসা। এমনকী সামান্য কিছু সোনা রুপোর টুকরো যা মান্ধাতার আমলের সঞ্চয়, সে সবের কিছু রং-চটা নির্দশন ওর মধ্যে রাখা আছে। ওর পাশে গিয়ে বসলেই মনে পড়ে পিতামহকে। তিনি তখন ভীষণ অসুস্থ। সারাদিন দক্ষিণমুখী ঘরের কোণে প্রায় একাই বসে বা শুয়ে থাকেন। তাঁর শ্লথ, রোগজীর্ণ, বিধ্বস্ত শরীর মনে যেন নিরুচ্চারিত হচ্ছিল তখন, স্থবিরতা কবে তুমি আসবে বল। তাঁর প্রবীণ বড়ো ছেলে। অজস্র সমস্যাকীর্ণ বড়ো নাতি মাঝে-মাঝে তাঁকে দোরগোড়া থেকে উঁকি মেরে দেখে যায়। তাঁর সর্বক্ষণের পরিচারক বিরাজদাদাকে ডেকে তাঁর জন্য কী কী ওষুধ-পথ্য কী কী জেনে নেয়। হঠাৎ হঠাৎ খানিকটা অবসর ও মর্জি হলে ঘরে ঢুকে এলিয়ে থাকা পিতামহের পাশে বসে। দু চারটে কথাবার্তাও বলেই কাজের ছুতোয় বেরিয়ে যায়। সময় নেই, কারো সময় নেই। চারপাশের কাজে ঠাসা দুনিয়া চলছে তো চলছেই। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গেলে জিরোনোর ফুরসতটুকুও মেলে না সচল মানুষদের। মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজন, পাড়ার দু-একজন আসেন বটে। কুশল প্রশ্ন করেন, তারপর তিনি যে একা সেই একা। তবে এই পাথুরে

এহনীয় অস্তিত্বকে খানিকটা সহনীয় করে তোলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি। আমি যা লিখি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে ফেলেন। আর আশ্চর্য মনস্কতায় ধারাবাহিকভাবে পড়ে যান-নির্বাচনবিহীনভাবে পড়েন। বাড়িটা লেখাপড়ার বাড়ি, ফলে আর যাই হোক, পাঠ্যবস্তুর কখনও অকুলান হয় না। যা হাতে আসে, গোগ্রাসে গিলে খান। মাঝে মাঝে যখন হৃদয় আর রাখতে না পারা ভারী হয়ে ওঠে, ওই কাঠের তোরঙ্গ খুলে বেব করে আনেন সাবেক রমণীর মতো ঢলঢলে মলাটের এমন কোনো পুথি, যার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে দু-কুড়ি-চারকুড়ি। এমনই একটি পুথি এক বিকেলে পড়ছিলেন খুব মন দিয়ে। কৌতূহলী হয়ে কাছে গিয়ে দেখি অদ্ভুত রামায়ণ।

স্মৃতির সুড়ঙ্গ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাকসো থেকে রামায়ণ গ্রন্থটি বের করে মাঝে মধ্যেই সেটির উপর হাত বোলাতেন বৃদ্ধ পিতামহ। এমনই একদিন আনমনে কিছু ভাবছিলেন। আব এসবের ফাঁকে ফাঁকে এককালে তাঁর বহু পঠিত প্রিয় পংক্তিগুলি আবার পাঠ করছিলেন। সেদিন তাঁকে ওই রকম অবস্থায় দেখে চুপিচুপি বেব হয়ে এসেছিলাম তাঁর ঘর থেকে। পিতামহকে তাঁর মতো থাকতে দিয়ে মনে হয়েছিল কাব্যপাঠের ভিতর দিয়ে তিনি হয়তো নিজেরই যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিনগুলিকে স্মরণ করছেন, সেখানে অন্য কারো প্রবেশ অনুচিত।

মনস্ক সাহিত্যপাঠক মাত্রেরই জানা রামায়ণ যেমন উচ্ছল যৌবন বেদনার সলজ্জ উৎসার আবার তেমনই মগ্ন, শান্ত সমাহিত। জীবনদর্শনে নিবিড়। বিষয় ও আঙ্গিকে কবিতাধারার এমন উৎসার আজো আমাদের কাছে পরম বিস্ময় হয়ে আছে। তাই এখন আমিও মাঝে মধ্যে ডুবে যাই রামায়ণের পাতায়।

সেই পাঠশালা। ছাত্র আসে না। লেখাপড়া শিখে কি হবে? সেই তো জোয়াল বইতে হবে জমিতে। এখনকার মানুষ শুধু বুঝে নিতে চায় নিজেরটা কড়ায়গন্ডায়। তবু বসে থাকি ছাত্রের পথ চেয়ে। বসে থাকি নদীর দিকে মুখ করে। নদী আমার জীবন দেবতা। নদীর কাছে শিখেছি অনেক কিছু। তাই নদীর সামনে বসে থাকতে বড়ো ভালো লাগে। নদীর ধারে বসলেই স্মৃতির দরজাগুলো হাট করে খুলে যায়। স্মৃতি তাও যেন দরজা খোলা এক নদীর মতো।

স্মৃতিব মুখ থেকে অনর্গল উদ্ধৃতির জোয়ারে অসহায় কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে দামিন্যা থেকে সাগরে চলে যাই। এভাবেই হাজার দেড় হাজার বছর উজিয়ে আমার গলায় ভর কবে কালিদাস, ভবভূতি, ভট্টি প্রমুখেরা। ছেলেবেলায় অচিন দেশের অচিন সব কাহিনি শোনাব জন্য আমাদের মধ্যে শুরু হয়ে যেত এক ধরনেব কাড়াকাড়ি। কে কার আগে পিতামহেব বিছানায় ঢুকব। সেই অকল্পনীয় সৎ মানুষটির স্মৃতিশক্তি আমাকে বিমূঢ় করে বাখত। সংস্কৃত এবং বাংলা—দুটো ভাষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল জল ও মাছের মতো। এক একদিন পাবকশিখার মতো আলোচনা করতে করতে অমোঘভাবে তিনি এসে যেতেন পদাবলি কীর্তনে। তখন ওই শুকনো খটখটে মানুষটির দুচোখের কোনায় অসহায় প্রাণের কান্না টলটল করে উঠত।

তিনি গাইতেন আর তাঁর চোখের কোল বেয়ে নেমে আসত অশ্রুর অবিরল ধারা।

মনে হত খ্যাপা যে ভাবে পরশপাথর খুঁজে ফেরে, সেভাবে তিনি পুরোনো গল্পের সন্ধান করে ফিরছেন। জাগতিক কোনো সুখের পরোয়া না করে, শরীরে যত্নের অভাবে কৃশ

সেই পিতামহ মৃত্যুর পূর্বাহ্নে যতদিন হাঁটাচলা করতে পেরেছেন এই অভ্যাস বজায় রেখে গিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি, জানার নেশা কতখানি সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারে। মলিন, জীর্ণ বসনে আবৃত, জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া সেই মানুষটিকে না দেখলে আমার তা কোনোদিনই প্রত্যয় হত না।

এক সন্ধ্যার কথা খুব পড়ে। বারান্দায় বসে লেখাপড়া করছিলাম। পড়ায় মন বসছিল না। হঠাৎ একটা গলা ঝাড়ার শব্দে তাকিয়ে দেখলাম পিতামহ এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। পড়তে হবে না এবার তাহলে গল্প হবে—এই অভাবনীয় আনন্দে উঠে তাঁকে সাদরে আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু খুব ক্লান্ত লাগছিল তাঁকে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন। খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর একটি কাপড়ের ঢাকনা খুলে পুথিসদৃশ দুটি জীর্ণ পুথি বের করেছিলেন। যেন গন্ধমাদন ঁুড়ে বিশল্যকরণী আবিষ্কারের আনন্দে চকচক করছিল পিতামহের দুটি চোখ। সেই আনন্দ একা বহন না করতে পেরে চলে এসেছেন আমার কাছে। পিতামহের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনেও পাওয়া না পাওয়া, চাওয়া না চাওয়ার সমাধান যেন সেদিনই হয়ে গিয়েছিল আমার জীবনে।

জীবনসায়াহ্নে এসে অস্তিত্বের পরমার্থ সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলেন এমনই মনে হয়েছিল। শেষদিন পর্যন্ত দেখেছি রাধার কাছে যেমন শেষ কথা ছিল সর্বনাশা কালার বাঁশি, তেমনই পিতামহের কাছে ছিল তাঁর সেই পুথিটি। তাঁর কোনো ছোঁয়া-ছুৎমার্গ ছিল না, কিন্তু পুথিটি তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করতেন না। ওই পুথিটিকে কবজা করার এক নীরব চাহিদা জন্ম নিয়েছিল আমার সেই বয়সেই। আমার মনে হয়েছিল আমার জন্যই পিতামহ সেটিকে খুঁজে নিয়ে এসেছেন। আর সেটি যেন সাত রাজার ধন মানিক। সে ভাবেই আগলে রাখতেন।

দেখতে চাইলে বলতেন, সময় হয়নি বাবাজি। সময় হলেই পাবে, এ তো তোমারই সম্পত্তি।

যখন তাঁর পাকা চুল তুলতাম অথবা পা টিপে দিতাম। পুথিটা পড়ে থাকত বালিশের পাশে। হাত বুলিয়েছি, খুলে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি যখন দেহ রাখলেন। দেখলাম বাবা তাঁর দেহের সঙ্গেই পুথিটা চিতায় রেখে দিলেন।

বেশি বয়স হলে কোনো প্রয়াণ মনে শোকের আঁচড় কাটে না। যেন শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি মানেই মোক্ষলাভ। যেন সবাইকে অস্বস্তিতে না রেখে যাওয়ার জন্যই তিনি প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু বয়েস হয়েছে বলে শোকের তাপ কমবে কেন? তাই হয় নাকি? পিতামহের মৃত্যুতে সবাই বারে বারে বলেছিল—বয়স হয়েছিল।

আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, কীসের বয়স? মৃত্যুর? বয়স হলে মৃত্যু সম্ভাবনা নিকটবর্তী হয়। তা বলে বয়সের মৃত্যুতে শোক কমে যাবে? ষাট বছরের বাবার মৃত্যুতে এক রকম শোক হবে আর বিরাশি বছরের বাবার মৃত্যুতে অন্যরকম শোক হবে—তাই কি কখনও হয়?

আমাকে কে যেন বলেছিল, পরিণত বয়সের মৃত্যুতে, একটা সান্ত্বনা থাকে। মানুষ মৃত্যুঞ্জয় নয়, মানুষ মরণশীল তাই।

এসব কথায় বাবা কোনো কথা বলেননি। চুপচাপ শুনে গেছেন। আমার কথাগুলোও শুনেছেন।

আমি বলেছিলাম, না তা নয়। পিতামহের মৃতদেহের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে কিশোর আমি তখন কেমন যেন হয়ে গিয়েছি। নিষ্পন্দ ওই মুখে যেন শুনতে পাচ্ছিলাম চণ্ডীপাঠ— "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি...."

আসলে আমার মনে হয়েছিল সন্তানের কাছে বাবা-মায়ের মৃত্যু, তা সে যে বয়সেই হোক, একই রকমের শোকের। এই ক্ষতি অপূরণীয়। এই হারানোর বেদনা সময়, বয়স কিছুই মানে না। কেউ বলেন, মহাগুরু নিপাত। সত্যিই মহাগুরুর নিষ্ক্রমণ। যিনি কথা বলা শিখিয়েছেন। হাঁটতে শিখিয়েছেন। জীবনের চলার পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—তিনিই তো মহাগুরু। পিতামহকে নিয়ে শ্মশানযাত্রা শুরু হল। পিতামহের সঙ্গে দেওয়া হল সেই পুথিটা।

আমি কত কাঁদলাম, বললাম, এটা আমার, দাদু আমাকে দেবেন বলেছিলেন।

বাবা কিছুতেই শুনলেন না আমার কথা।

জানি না সেটা কিসের পুঁথি ছিল। পেয়েও পেলাম না পুথিটা। সেদিন আমার মনে হয়েছিল, সব পেয়েও আমি যেন সব হারালাম।

এমনি করে খোয়া যেতে যেতে হাতে পেয়েছিলাম ময়মনসিংহ গীতিকা। কবি ও পালাকার ময়মনসিংহ পাটবাড়ির 'মনসামঙ্গল' রচয়িতা বংশী চক্রবর্তীর কন্যা চন্দ্রাবতী (জন্ম ১৫৫০)। পরে জেনেছি, বিদূষী সেই মহিলা আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির অন্যতম হল 'রামায়ণগীত', 'মনসাদেবীর গান', 'মলয়া', 'দস্যু কেনারাম',। এই চন্দ্রাবর্তীর বিবাহ হয়নি। তাঁর প্রেমিক আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই শোকে তিনিও দেহত্যাগ করেন। এই ঘটনা আমার কিশোর বয়সে মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বকুল গাছটা। শৈশবে যার ডালে, তলে অতিবাহিত হয়েছে অনেক প্রভাত, অনেক বিকেল। ব্রহ্মডাঙার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে এখনো। যেমন একযুগ আগে দাঁড়িয়ে থাকত আমার জন্য। গিয়ে দাঁড়াই বকুলের নীচে। ফুল উড়ে এসে গায়ে পড়ে। বুঝতে পারি এই বকুল এখনও আমাকে ভোলেনি। শৈশবের মানুষ বন্ধুরা এখন কে কোথায় ছিটকে গেছে জানি না। হঠাৎ যদি কারো সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে যায়, চট করে চিনতে পারবে কিনা জানা নেই। আমিও কি চিনতে পারব? সংযোগহীনতা গড়ে দিয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। তা অতিক্রম করে কার সাধ্য। গাছের ক্ষেত্রে এসব অসুবিধা নেই। পুরোনো বন্ধুত্ব বহু বছর পরও সহজে ঝালিয়ে নেওয়া যায়।

পিতামহ হুঁকো খেতেন আর খুব কাশতেন। তাঁর কাছে একদিন আমি হুঁকো খেতে চেয়েছিলাম। বয়স্ক বৃদ্ধ মানুষটি সেদিন খুব হেসেছিলেন। বলেছিলেন, আমার বাবা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন হুঁকো খেতে। তুমি তো এখনও অনুমতি পাওনি দাদু।

ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার বাবা আছেন দাদু?

—হুঁ। তবে স্থূলে নেই, সূক্ষ্মে আছেন।

—তাঁর নাম কি দাদু?

পিতামহ চোখ বুজে মাথায় দুহাত ঠেকিয়েছিলেন। দশ বছরের আমি তখন হেসেছিলাম। স্থূল আর সূক্ষ্মের ব্যাপারটি তখন বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, স্থূল আর সূক্ষ্ম কি জিনিস দাদু?

—তুমি বড়ো হও দাদু। আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবে।

সেই সব বোঝা আজও আমার হল না। নদীর ধারে বাড়ি ঘিরে থাকা বাগান, কুমোর-পাড়ায় চাকের ওপর কাঁচা মাটির তাল ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে ঘটি, গেলাস, ভাঁড়, হাঁড়ি, কলসি হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে আমার বালক চোখের মধ্যে দিয়ে মাথাব ঘিলুতে শত সহস্র ঘটনা ঢুকে যেত। গ্রামে কোন্ সাধু সন্ত ফকির এসে আস্তানা বাঁধলে হালুয়া, পুলি, প্যাঁড়া, লাড্ডুর লোভে গিয়ে বসতাম ওদের পাশে। ঘুম ভাঙতো নদীর প্রাণ জুড়োনো হাওয়ায়। ঘর থেকে বেরুলেই হালকা কুয়াশার ফুল ছড়ানো জলের ছলাত-ছল শব্দ শোনা যেত। বাঁধা ঘাটে নৌকার গায়ে জল আছড়ানোর শব্দ শুনতে পেতাম। নিঃশব্দে শুশুকের ধনুক শরীরের জলের মধ্যে ঘুরে যাওয়া দেখতে দেখতে কেটে গেছে কত সকাল। চেয়ে চেয়ে দেখেছি ঢেউ-তোলা জলের মধ্যে দিয়ে উদীয়মান সূর্যের দিকে পিতামহ হাত জোড় করে বলছেন, ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতি।

গোলাপি ঠোঁট, গাঢ় চোখের পালক ও কপালের ওপর এসে পড়া অবাধ্য এলোমেলো চুল, গালের ওপর সোনালি রোঁয়ার আভা নেওয়া অবাক চোখে আমার পৃথিবী জেগে উঠত। আমার তখন কতই বা বয়েস। দশ এগারো। বাবা তারও অনেক আগে উঠে অন্ধকার থাকতে আহ্নিকে বসে গিয়েছেন। মুখ ধুয়ে পড়তে বসার আগে পাথবের গ্লাসে গরম দুধ নিয়ে আসত মা। মায়ের কথা মনে পড়ে।

নদীর চারপাশ সবুজে সবুজ। যতদূর চোখ যায় সবুজে ভরে আছে। মাথার ওপরে কেবল নীল রঙের আকাশ। তাতে পেঁজা তুলোর ভেলাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঠে মাঠে প্রসারিত শান্তি সবুজ দিগন্তে গাঢ় সবুজ চেহারা নিয়েছে। সেখানে গাঢ় সবুজের সঙ্গে মিশে গেছে আকাশের নীলিমা। দুদিন পর এই মাঠের চেহারা হবে সোনা রঙে বাঙা। আর কিছু দিন পর ধান কাটা শুরু হবে। চারদিকে রঙের এতো সমারোহ। গানের সুর ভেসে আসে। দেখি একদল মানুষ ভাদু নিয়ে বের হয়েছে। দাঁড়ানো অবস্থায় ছোটো আকারের ভাদুর মাটির মূর্তি, তার গায়ের বর্ণ কাঁচা সোনার মতো। ভাদু গানের দলটার সামনে রয়েছে একটা বাচ্চা মেয়ে। জরির কাজ করা শাড়িতে তাকে সাজানো হয়েছে। সেই হয়েছে ভাদু। গানের সাথে নাচছে মেয়েটি। ভাদু নাচ।

সংস্কৃতির জগতে ভাদু তেমন ভাবে আদৃত হয়নি। হয়ে উঠতে পারেনি আদরের। তবু ভাদ্রের এই উৎসবকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে কত গান। এই গানগুলো লোক সাহিত্যের এক একটা উজ্বল রত্নস্বরূপ। বসে পড়ি নদীর ধারে। একটু বিশ্রাম হবে, ওদের গান শোনা যাবে। সমাজের অনুন্নত, স্বল্প-শিক্ষিত, পিছিয়ে থাকা এই সব মেহনতি মানুষ ভাদুগান রচনা করে। তারা লিখতে পড়তে জানে না অথচ লোক সঙ্গীতের স্রষ্টা। এটা ভাবতেই কেমন লাগে। সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষদের মতোই সংস্কৃতির এই দিকটা অবহেলিত থেকে গিয়েছে। গ্রাম-বাংলার নানান দেব দেবীর মধ্যে ভাদুও এক লৌকিক দেবী। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের এবং হুগলির বিরাট অঞ্চল জুড়ে গোটা ভাদ্র মাসটা ভাদুপুজোর আয়োজন হয়ে থাকে।

ভাদু শ্রমজীবী অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে 'দেবী' রূপে পূজিতা। তবু এই মানুষগুলির আন্তরিকতার ঘনত্বে এই দেবীই কন্যাসম হয়ে বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়। কোথাও কোথাও ভাদ্রের প্রথম থেকেই, আবার কোনো কোনো অঞ্চলে ভাদ্রের এক দেড়

সপ্তাহের আগে থেকেই ভাদুকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। লোকগীতি, লোকনৃত্যের মাধ্যমে তার বোধন হয়। পূজোর উপচারে থাকে চাল, বাতাসা, সন্দেশ, পান-সুপারি, ধানের সবুজ শিষ, শিউলি, পদ্ম, ধান আর দূর্বা।

কিংবদন্তি আছে, পঞ্চকোটের জনৈক রাজার ভদ্রেশ্বরী নামে এক কন্যা ছিলেন। সকলের স্নেহে পালিত সেই মেয়েকে সবাই আদর করে ডাকতেন 'ভাদু' বলে। দুর্ভাগ্য, সেই মেয়ের আকস্মিক অকালপ্রয়াণ ঘটে। তখন সেই মেয়ের স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্যে নিয়মিত একটা অনুষ্ঠানের প্রচলন করা হয়। কালক্রমে সেই অনুষ্ঠানই ভাদু-পূজার উৎসবে রূপান্তরিত হয়। লৌকিক দেবী ভাদুর এই উৎসব আসলে কৃষি উর্বরতার প্রতীক। ভাদুকে নিয়ে লেখা গানে সমাজের বিভিন্ন দিকে প্রভাব থাকে, থাকে সমকালীন নানা ঘটনা। লোকগীতির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে এমন সব বিষয় যা সমকালীন ঘটনা। আবার এইসব গানের মধ্যে ঐতিহাসিক উপদানও খুঁজে পাওয়া যায়।

দামাল গল্পসল্প করে আমার মন ভালো রাখার চেষ্টা করে, দু একটি ছাত্র কোনো রকমে জোগাড় করে নিয়ে আসে। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে পাঠশালার পোড়োদের পড়া দেখিয়ে দেয়। যেন পাঠশালা চালাবার দায়িত্ব আমি ওকেই দিয়েছি। এই দামাল এক সময় কামরূপ কামাখ্যা থেকে মন্ত্র শিখে এসেছে। কামরূপ কামাখ্যা তন্ত্র-মন্ত্র, সর্পবিদ্যা বিশারদ ও গুনিন-ওঝা ওঝানির দেশ বলে খ্যাত। ওখানে একান্ন পীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ আছে। বিষ্ণু চক্রাঘাতে সতীর যোনি মুদ্রা পড়েছিল ওখানে। অম্বুবাচির দিন বিরাট অনুষ্ঠান ও মেলা বসে। বহু হিন্দু ও মুসলমান গুনিন ওঝা তন্ত্র-মন্ত্র শিখতে কামরূপ যায়। এদেশ থেকে অনেক ওঝা গিন্নি স্বামীর সাথে কামরূপ গিয়ে ফিরে এসেছে যোগিনী হয়ে। আবার কামরূপ থেকেও অনেক গুনিন ও যোগিনী এদেশে আসে সর্প ওষুধ, জড়িবুটি, মাদুলি, কবজ বিক্রি করতে। এরা সাপ ধরাতেও খুব পটু।

দামাল সর্পবিদ্যা শিখতে গিয়েছিল কামরূপে। প্রথম আপ্যায়নে কামরূপী গুরু তাকে বসতে দিয়েছিল জীবন্ত সর্পকুন্ডলী আসনে। ও কিন্তু ভয় পায়নি, বসেছিল আসনে। তারপর গুরুর কাছে পেয়েছিল সর্পবিদ্যা। মন্ত্রবিদ্যা। মন্ত্রপূত জলপড়া দিয়ে দামাল রোগ সারায়. নল চালানোর মাধ্যমে চোর ধরে, সাপে-কাটা রুগিকে বিষমুক্ত করে। এধরনের তাঁর মন্ত্র সিদ্ধির অনেক কাহিনি শোনা যায়। কিন্তু আমাদের কাউকে কখনো কোনো ওষুধ দেয় না। দামাল মনসামঙ্গলের গান গাইতে পারে ভালো। তাঁর অনেক শিষ্য আছে আশেপাশের গ্রামগুলোতে।

কথায় বলে ভূতের রোজা ভূতের হাতে মরে। একবার এই দামালের এক ওঝা শিষ্য বোঁয়াইচণ্ডী শাসপুরের দিকে গিয়েছিল ভূত তাড়াতে। এক গৃহস্থ ভদ্রলোকের মধ্যম পুত্রবধূকে ভূতে পেয়েছিল। রোগী বাড়িময় ছুটে বেড়াচ্ছে। তার গায়ের কাপড়চোপড় ঠিক থাকছে না। কখনও কাঁদছে, কখনও হাসছে এই রকম অবস্থা। দামালের সেই ওঝা শিষ্য সেই বাড়িতে যখন গিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিল, মন্ত্র তন্ত্র করছিল এবং আনুষাঙ্গিক যা করণীয় তা করছিল, ঠিক তখনই ভূতগ্রস্তা মহিলা অকস্মাৎ ওঝা মহাশয়ের ওপর চড়াও হয়েছিল।

নখদন্তের আক্রমণে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে তিনি মূর্ছা গিয়েছিলেন।

মহিলার ঘাড় থেকে ভূত অবশ্য ছেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভূত ওঝাকে একেবারে

জখম করে দিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে এসে সেই ওঝা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাঁর সমব্যবসায়ীরা তাঁর জন্য শেষে দামালকে ধরে নিয়ে যায়। সে অনেক প্রতিকার ও আরোগ্যের পন্থা বাতলে দিয়ে আসে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সমব্যবসায়ীদের কাঁদিয়ে দামালের সেই শিষ্য চলে যায় মাটিতে, মাটির উপরের মমতা কাটিয়ে।

পেটে শূলের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে পড়লাম। কবিরাজ আসে মশলা খাওয়ায়, পোষ্টাই দেয়। কোনো কাজ হয় না। কবিকঙ্কণকে রোগী পেয়ে তারা হঠাৎ বড়োলোক হবার স্বপ্ন দেখতে থাকে। রোগ নির্ণয় নিয়ে মহা হুলস্থূল পড়ে গেল। মূর্ছা, বায়ু, অম্লপিত্ত, হৃদ্‌রোগ এই সব নানাবিধ রোগের লক্ষণ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়। কেউ বাণভট্টের, কেউ চরক-সংহিতার বচন আওড়ায়, কেউ সুশ্রুতের টীকা ঝাড়েন। রোগ নির্ণিত হয় না।

নানাবিধ ওষুধের ব্যবস্থা তারা করেন। কেউ বটিকা দেন, কেউ দিলেন গুঁড়ো ওষুধ, কেউ তৈল প্রস্তুত করে বললেন, যা দিলাম তেমন আর কেউ দিতে পারবে না। একেবারে অব্যর্থ। হামানদিস্তায় মূল পিষ্ট হয়েছে, ঢেঁকিতে চাল কোটা হয়েছে, তারপর হাঁড়িতে সেদ্ধ হয়েছে। তৈলের গন্ধে পরিচর্যাকারিণীর বমন এসেছে, সে মূর্ছা গেছে। তখন তাকে দেখাবার জন্য আবার কবিরাজকে ডাকতে হয়েছে।

এদিকে রোগের কোনো উপশম হয় না। শরীরে ধ্বংসের লক্ষণ ফুটে ওঠে। দামাল প্রতিদিন এসে বসে থাকে। সেও কিছু কিছু তুক করে। দু-দণ্ড এসে কথা বলে। বুঝতে পারি খুবই চিন্তিত। সে দেখে আমার মধ্যে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। আমাকে নাকি ডাকিনি রোগে ধরেছে। ওর ঘোরতর সন্দেহ হয়, আমায় নানা রকম প্রশ্ন করে।

এর কি উত্তর দিই? কিচ্ছু খেতে ইচ্ছা করে না। খাবার দেখলেই বমনের উদ্রেক হয়। কবিরাজদের ওষুধে কোনো কাজ হয় না।

এমনই একদিন গৃহদ্বারে ত্রিশূলধারিণী সুবর্ণময়ী এক রাজলক্ষ্মী মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। মমতা ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করে জানতে চাইল, আপনি কে মা, আমাদের দয়া করুন। আমাদের ঘোরতর দুর্দিন।

—আমি ভিখারিনি, ভিক্ষার্থে হেথায় আগমন আমার।

মমতা কেঁদে পড়ে। বলে, কেন আমায় ছলনা করছেন দেবী। আমি আপনাকে চিনেছি। আমার স্বামী খুব অসুস্থ। তাঁকে আপনি বাঁচান দেবী।

—আমি সামান্যা মানবী। নইলে ভিক্ষার্থে আসব কেন? কই, কোথায় তোমার স্বামী? কি হয়েছে তাঁর?

মমতা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জানতে পারিনি।

সন্ন্যাসিনী কবিরাজের দলকে ডেকে পাঠায়। তারা এলে তাদের উত্তম-মধ্যম ভর্ৎসনা করে। বলে, যদি রোগ ভালো না করতে পারেন তবে বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করেন কেন?

প্রবীণ এক কবিরাজ এগিয়ে আসেন। বলেন, মা জননী, কবিরাজ ওষুধ দিতে পারে, পরমায়ু দিতে পারে কী?

সন্ন্যাসিনী বলে, তবে ওষুধে কাজ কী? আপনাদেরও প্রয়োজন নেই।

প্রবীণ কবিরাজ বড়ো বিজ্ঞ। তিনি বলেন, মা জননী, আমাদের অদৃষ্ট বড়োই মন্দ। নইলে আমি যে ওষুধ দিয়েছি, তা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমি আপনাকে বলছি, তিন দিনের মধ্যে রোগীর আরাম হবে। যদি আমাকে একটা সুযোগ দেন।

—কী চাই?

—আমি নিজে বসে থেকে রোগীকে ওষুধ খাওয়াব। আমার ওষুধে মরা মানুষ জেগে বসে, আর মুকুন্দ সুস্থ হবে না?

—বেশ, তবে আমিও বসলাম।

কবিরাজ পুনরায় আমাকে পরীক্ষা করলেন। ভালো ভাবে পরীক্ষা করে বললেন, কোনো চিন্তা নাই। খুব শীঘ্র আরোগ্য লাভ করবেন। সন্ন্যাসিনীর হাতে তিনি দুটি কৌটো দিয়ে বললেন, দু-রকমের ঔষধ দিলাম। প্রতি প্রহরে সেবন করাতে হবে। আর জাফরান বর্ণের চূর্ণ পাঠিয়ে দিচ্ছি রোগী অস্থির হয়ে উঠলে ওই চূর্ণ শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করাবেন।

কবিরাজ চলে গেলেন।

সন্ন্যাসিনী সেই থেকে রয়ে গেলেন। তাঁর পরিচর্যা আর কবিরাজের ওষুধে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে থাকি।

মন কিছুতেই বোঝে না ভালোবাসার জন মরে গেলেও মানুষ তার পাশে বসে থাকে। বিশ্বাস হয় না যে সে মরে গেছে। পাগলের মতো আছড়ে পড়ে সেই দেহের উপর। দেহ নড়ে না। জেগে ওঠে না। দেহ তখন জড় হয়ে যায়। খাঁচার ভিতরের সেই অচিন পাখি তখন উড়ে গেছে। সন্ন্যাসিনীকে দেখি আর ভাবি, গঙ্গাদাসবাবুর পুত্রবধূ কি এখনো তেমনিই আছেন?

মানুষ মনে করে, সে যা তাই থাকে। মানুষ যে কতবার মরে, মানুষ বোঝে না। এক দেহেই যে কতবার মানুষের পুনর্জন্ম হয় তা কেউ হিসেব করে রাখে না। দামিন্যা ত্যাগ করেছিলাম যে আমি, আর আজকের আমিতে কত তফাত। মনে হয় সন্ন্যাসিনীর জীবনে বড়ো দুঃখ আছে। সন্ন্যাসিনী আমাকে জীবন দান করলেন। তাঁকে গ্রামে থাকতে বললাম।

সন্ন্যাসিনী গ্রামে থাকতে রাজি হয় না। তারপর গ্রামের বাইরে বিশাল বটবৃক্ষের নীচে এক পর্ণকুটির গড়ে তোলে। আমার কোনো সাহায্যই নেয় না। বাঘছাল পেতে সেইখানে বসে থাকে। প্রত্যেক দিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। পৃথক আসনে বসে তাঁর সঙ্গে আলাপ সেরে গৃহে ফিরে আসি।

প্রতিদিন কি কথা হয়? যেন তার কৈফিয়ত চায় সকলে। সবার খুব জানার আগ্রহ। শুধু কি দেশ ভ্রমণের গল্প? পাহাড়ের কথা, অরণ্যের কথা, পশুপাখি ফলমূলের কথা, কত সাধুসন্ন্যাসীর কথা, কত পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা, কত দেশি-বিদেশি রাজারাজড়ার কথা, কত দেশাচার-লোকাচারের কথা।

শুধুই কি কথা? নাকি কথাগুলি যেমন মনোমোহিনী, সন্ন্যাসিনী তার থেকেও মনোমোহিনী। আগুন জ্বলে উঠল আমার মাথায়। সংসারে অশান্তি শুরু হয়। বুঝি ঘর-সংসার এবার পুড়বে।

দেহে স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধিতে রূপের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সন্ন্যাসিনীর শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বেশি তার রূপের প্রকাশ তেমনই পাল্লা দিয়ে। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো নির্মল পূর্ণ স্বাস্থ্য বিশুদ্ধ মূর্তিমতী শোভা। কোথাও এতটুকু দুঃখের রেখা নেই, চিন্তার ছায়া নেই, নেই ইন্দ্রিয় ভোগের চিহ্ন। কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও শুষ্ক নয়। সুমধুর, সুহাস্য, সুখময়, বাসনাশূন্য এক ভুবনেশ্বরী মূর্তি। তারপর আছে সেই মনোমোহিনী কথা। কৌতূহলোদ্দীপক, মনোরঞ্জক, জ্ঞানগর্ভ-আমার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনে অহরহ পুড়তে থাকি।

প্রথম প্রথম বিকালে চিত্তবিশ্রামের জন্য সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়ে বসতাম। তারপর ক্রমশ রাত্রি বেশি হতে লাগল। পৃথক আসন হলেও ক্ষুধা, নিদ্রায় পীড়িত না হলে উঠতাম না। শিবরাম ডাকতে আসত। তখন খারাপ লাগত। শিবরামকে নিষেধ করতাম। ও শুনত না।

গ্রামের মানুষ নানান কথা বলতে শুরু করল। তারা বলে, আচ্ছা এই চিত্তবিশ্রামের আসল ব্যাপারটা কী বলো তো?

অন্য জন বলে, কী দরকার? ওসব পণ্ডিত লোকেদের বড়ো বড়ো কথায়।

—হ্যাঁ। তা তো বটেই। পরম ধার্মিক এই মানুষটার এই বয়সে হল কী? আগে তো এ সব বালাই শুনিনি।

—এখন অর্থ হয়েছে। রাজ অনুগ্রহ লাভ হয়েছে। ভালোর সঙ্গে তাই মন্দ জুটেছে।

—হ্যাঁ। তা যা বলেছ। মানুষ চিরকাল তো একরকম থাকে না। ধনসম্পদ বাড়লে, মন কিছু এদিক ওদিক হয়।

—আর ওই সন্ন্যাসিনী, মাগি তো সামান্য নয়। রূপ একেবারে ফেটে পড়ছে। কোথা থেকে এল বলো তো?

—সেইটিই তো রহস্য।

—শুনেছি তেউটার গঙ্গাদাসবাবুর পুত্রবধূ যে কালরাত্রিতে বিধবা হয়েছিল তাকেও নাকি এরকম দেখতে ছিল। গঙ্গাদাসের মৃত্যুর পর বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। সেইদিন থেকে সেই মেয়েকে আর কেউ কোথাও দেখেনি। এ সন্ন্যাসিনী সে নয়তো?

—তা হলে তো মাগি অনেক ঘাটের জল খেয়েছে বলতে হবে।

—হবেও বা।

—এদিকে শুনেছ? মুকুন্দ নাকি চণ্ডীর পুজো করবে?

—আমিও তো সেই রকম শুনছি।

—এ চণ্ডী নাকি অন্য রকম?

—কেন, আমরা যে রকম চণ্ডী পুজো করি বুঝি সে রকম নয়?

—না। তবে কী রকম?

—সে আমি বলতে পারব না। তবে শুনেছি তর্কালঙ্কারের সঙ্গে আলোচনা করেছে।

—দেখাই যাক না।

একদিন সন্ন্যাসিনী বলে, তুমি তো দেখছি সারাদিন আমার কাছেই পড়ে আছ। ঘর-সংসার চলছে কীভাবে? ওঁকে বলি, ঘর-সংসার সবাই তো চায়। ক'জনা চণ্ডীকে পায়? আমি চণ্ডীকে পেয়েছি।

—ছি! ছি! এ সব তুমি কি বলছ? এর জন্য তুমি কবিকঙ্কণ হয়েছ? তোমার ধর্ম গেল, আমিই এখন সব হলাম?

—সংসার এখন শিবরাম দেখে।

—একা সে কি সামলাতে পারছে?

—সামলাতে হয়।

—নাঃ। এ পোড়ামুখ আবার লুকোতে হবে দেখছি।

—কী বলছ তুমি?

—নইলে তোমার কলঙ্ক রটবে। সে আমি সইতে পারব না। সংসার ছারখারে যাবে। আমায় অনুমতি দাও, আমি তীর্থে যাই।

—না। তা হবে না।

—আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

—কী বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি।

—মনে আছে, একদিন তোমায় এক সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞেস করেছিল তুমি সন্ন্যাসী হবে?

—মনে আছে। তখন প্রয়োজন হয়নি। আজ মনে হচ্ছে প্রয়োজন হয়েছে।

—তবে তাই করো। শিবরাম সংসার দেখুক। সন্ন্যাস নাও, তীর্থে বের হই।

—দুটো দিন সবুর করো। চণ্ডীর পুজোটা সেরে ফেলি। অনেক দিনের বাসনা—আগে মেটাই। তারপর বের হব।

কাঠগোলার ঘাটে দামোদর নদী অতিক্রম করে বর্ধমান ঘুরে এলাম। দেখে এলাম সর্বমঙ্গলার মন্দির। এত কাছে, কিন্তু কোনো দিন দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সকলের মঙ্গল করেন সেই সর্বমঙ্গলা কেবল বর্ধমানেশ্বরী নন, তিনি রাঢ়ের জননী। সর্বকল্যাণময়ী শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা। কষ্ঠিপাথরে খোদাই করা অষ্টাদশভুজা সিংহবাহিনী আশ্চর্য মূর্তির নীচে খোদিত দেখলাম অপাঠ্য পৈশাচী খরোষ্ঠী লিপি। মনে হয় এই মূর্তির বয়স দুহাজার বছর। বর্ধমানের আরো উত্তরে মঙ্গলকোট ও তার অদূরে কোগ্রাম নিয়ে অজয় ও কুনুর নদীর সংগমস্থল জুড়ে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আছে সেই উজানিনগর। অতি মনোহর এই উজানিনগরীতে একদা মহাবিত্তশালী ধনপতি সওদাগর বাস করতেন। যে ধনপতিকে নিয়ে আমি লিখেছি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এছাড়া আছে ভরতপুর, বীরভানুপুর, নডিহা, কাঞ্চননগর, পাণ্ডুরাজাদেব রাজধানী সব উল্লেখযোগ্য স্থান। গঙ্গা, দামোদর ও অজয়ের উপত্যকার এই সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক। কিছুই দেখা হল না জীবনে।

সর্বমঙ্গলাকে দেখে এসে লিখলাম—

লাড়িগ নগরে বন্দোঁ সর্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া গলে মার মুন্ডমালা॥

তারপর একদিন গ্রামের সকলের কাছে আমার সংকল্পের কথা প্রকাশ করলাম। বললাম, আমি আমার জন্মভিটায় "মা সিংহবাহিনী'র প্রতিষ্ঠা করব। একাজে আপনারা সকলে আমাকে সহযোগিতা করুন।

যেমন বলা শুরু হল কাজ। ভিটার জঙ্গল পরিষ্কার করা হল। কুমোর এল প্রতিমা গড়তে। আমার কল্পনার নতুন ধরনের সিংহবাহিনী চণ্ডী রূপ পেতে শুরু করল। প্রতিদিন কাঠামোর সামনে উপস্থিত থেকে আমি নিজে কারিগরকে পরামর্শ দিই। গ্রামের মানুষ এসে ভিড় করে, ভিড় করে তারা কবিখ্যাতি পাওয়া মুকুন্দকে দেখতে।

সিংহবাহিনী মূর্তির অবয়ব তাঁদের চিরাচরিত ধারণার সাথে মেলে না। তাঁদের কেউ কেউ সমালোচনা করে প্রতিবাদ করে ওঠে। এঁদের অনেকেই উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ।

গ্রামের মানুষ লক্ষ্য করে সবকিছু। এরা উদ্বুদ্ধ হবে আমার অভীষ্ট সাধনে? পরোয়া করি না। মধ্যবিত্তের যে অংশ রাজশক্তির দালাল হয়ে মুখোশ পরে আছে, সে মুখোশ আমি খুলে দিতে চাই।

তাঁদের অভিযোগ এইরকম যে, কবিখ্যাতি পেয়ে আমি কি ধর্মকেও সংস্কার করার অধিকার পেয়ে গিয়েছি? আমি নিজেকে কি ভেবেছি? সিংহবাহিনীর মূর্তি কীরূপ হয় তা কী আমরা জানি না?

ওদের বললাম, আমি আমার স্বপ্নাদেশ পাওয়া দেবী মূর্তিরই রূপায়ণ করতে চাই। যে দেবীর দর্শন আমি নিজে পেয়েছি, তাঁকেই মন্দিরের দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমার মনে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলন ছিল। তারই প্রতিফলন হিসাবে সিংহবাহিনীর শাক্ত মূর্তিকে আমি বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইলাম।

প্রতিবাদীর দল ভারী হয়ে উঠল। আমি তা গ্রাহ্য করলাম না।

প্রতিমা গড়ার কারিগর শেষে প্রতিমা তৈরি শেষ করতে গররাজি হল।

শেষে তাকে আমি উচ্চমূল্য দেবার প্রলোভন দেখালাম। কোনোরকমে সে রাজি হল। মূর্তি গড়ার জন্য কারিগরকে উচ্চমূল্য দিতে বাধ্য হলাম। এমনিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছে গৃহসংস্কার করতেই।

সবার ধারণা রাজা রঘুনাথ রায়ের কৃপাধন্য কবি আমি। সুতরাং প্রভূত অর্থ আমার কাছে সঞ্চিত আছে। নইলে রাজা তো রয়েছেনই, তাঁকে খবর দিলেই তিনি অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দেবেন। গ্রামের মানুষের এই ধারণাকে আমি আমল দিই না। প্রথমে সহযোগিতার কথা বললেও বাস্তবে কেউ আমাকে এক কণাও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। গ্রামের কেউ তো বটেই, আত্মীয়রাও সকলে সরে গেল।

এত খরচ করে চণ্ডীর পূজায় মমতা অসন্তুষ্ট হয়। সে মুখে কিছু বলে না।

লোকের আয় বাড়লে খরচও বাড়ে। যেমন আয় তেমন ব্যয় করলে হাতটান পড়ে না। হাতটান পড়ার আসল কারণ খরচ বেড়ে যাওয়া। আমি সংসারে কিছু দেখি না। অর্থ যা কিছু সঞ্চয়ে ছিল তাতে অভাব হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যশোদার বিয়ে দিতে খরচ হয়েছে ভালো রকম। যা কিছু সম্বল ছিল বিবাহযোগ্যা কন্যা যশোদার বিয়েতে খরচ হয়ে গিয়েছে। যেটুকু বাকি ছিল আমার চিকিৎসাতে সেটুকুও চলে গেছে। একমাত্র সম্বল এখন আমার পুরস্কার পাওয়া কঙ্কণটি। তাই বিক্রি করে দিলাম। একে একে সবই গিয়েছে। বাকি ছিল শুধু এইটি। মমতা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। রাজা রঘুনাথ রায়ের দেওয়া কঙ্কণটির প্রতি অনেকেরই লোভ ছিল। সেটি তাদের হস্তগত হওয়ায় তারা উল্লসিত হয়ে উঠল।

আমার গৃহে দেবী সিংহবাহিনী নবরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। কিন্তু তাঁর পুজোতে এল না গ্রামের কেউ।

এর কারণ বুঝলাম। বুঝলাম অনেক দেরিতে।

বুঝলাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে উপলক্ষ করে সমাজে উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের সংঘাত দানা বেঁধেছে। ফুল্লরার দুঃখের আগুনে সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণির নেতৃত্বে আমি যে সমাজ গড়ার ডাক দিয়েছি তা সমাজ জীবনের ভিত্তিভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়ার শক্তি তাই আর বসে থাকতে পারছে না। তারা উঠে পড়ে একজোট হয়ে গেছে। তারা নিষ্ঠুর ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল।

বড় নির্মম ভাবে আঘাত পেলাম। পিতৃভূমির কাছ থেকে এই বুঝি আমার পাওনা ছিল। অথচ এই পিতৃভূমির জন্য কত না অশ্রু আমার ঝরে পড়েছে।

এখানে আসার জন্য আমি কিনা রাজসুখ ত্যাগ করে এলাম?

শাস্ত্র বলে, জন্মভূমি হচ্ছে পিতৃভূমি এবং তা স্বর্গের সমতুল্য। একদিন উষালগ্নে এই পিতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। আর আজ সেই পিতৃভূমিতে ফিরে এসে কি প্রতিদান আমি পাচ্ছি? সেই পিতৃভূমির কোলে, যে পিতৃভূমির জন্য আমি হা-হুতাশ করেছি জীবনভোর। কিন্তু সেই পিতৃভূমি আজ আমাকে ঠাঁই দিতে চায় না।

এখানে একদিন একটা গণতন্ত্রমুখী সমাজ গড়ে উঠবে। যেখানে পদে পদে ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসনের বন্ধন থাকবে না। সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যশিল্পে প্রগতিমূলক চিন্তার জন্ম হবে। জীব ও জগতের সঙ্গে মানুষ নিজেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শুরু করবে। এ আমার স্বপ্নে পাওয়া স্বপ্ন। এ স্বপ্ন কি আমার বৃথা যাবে?

ক-দিন আগেই আমার খ্যাতির ডঙ্কা বেজেছিল বঙ্গদেশ জুড়ে। মানুষ দু হাত তুলে আমার জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিল। দু হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করেছিল। আজ তার এ কি ভগ্নদশা।

শরীর ভেঙে পড়েছে। গলা ভেঙে গিয়েছে। এ কয়েক দিনের মধ্যে মাথার চুল পাকা শণের মতো হয়ে গিয়েছে। গালের হনু দুটি প্রকটিত হয়ে উঠেছে। সেখানে মাসের চেয়ে অস্থির প্রাধান্য বেশি হয়ে উঠেছে। মেরুদণ্ড আর সোজা নেই, বেঁকে গিয়েছে! শুধু চোখ দুটো কথা বলে। চোখ দুটো দেখে মমতা অস্থির হয়।

সন্ন্যাসিনী বলে, এককালে এ চোখে অনেক কিছুই ছিল। চোখের তারায় এখনও ক্ষণে ক্ষণে রহস্য ঘনিয়ে ওঠে। একটা নিবিড় শান্তির ছায়া যেন তোমার চোখ সব সময় খুঁজে বেড়ায়। অসুস্থ হয়ে পড়ি।

যশোদা শ্বশুড়বাড়ি থেকে আমায় দেখতে আসে। ও এখন সুখে আছে। ওদের সবার সুখে আমার সুখ।

পুত্র শিবরামকে কাছে ডাকি। বসতে বলি ইঙ্গিতে।

ও আমাকে বোঝে। বোঝে আমার ব্যথাকে।

আমার শিয়রের কাছে এসে বসে শিবরাম।

ওকে বলি, আমি আশাবাদী বুঝলি খোকা। সহজে কোনো কিছু আমাকে সেই উজ্জ্বল পথ থেকে টলাতে পারবে না। কিন্তু সম্প্রতি আমার আশাবাদ ধাক্কা খেয়েছে। আমার মনের

আলো নিভে যাচ্ছে। আমাকে ক্রমশ এক হিংস্র অন্ধকার ঘিরে ধরছে। পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে পদে পদে। যারা দেশের শাসনকর্তা, যাদের ওপর আমাদের মঙ্গল নির্ভর করছে তাদের কর্মকাণ্ড আমাকে প্রতারিত করেছে। দেশকে এরা নিয়ে চলেছে অকল্যাণের পথে। এ পথে ভালো কিছু সৃষ্টি হবে না। তবে হবে। এই কালো দিন কেটে যাবে। রাতের গভীর আঁধার কেটে যাবার আগের কালো এখন ঘনিয়ে আছে। এ হচ্ছে সেই ঘন কালো। উষার আলোক এই কালোকে সরিয়ে দেবেই। তুই ভয় পাবি না। সেদিন আমি থাকব না। তোরা থাকবি, তুই থাকবি। সেদিন আরো ভালো ভাবে মায়ের পুজো করিস।

—মাথাটা টিপে দেব বাবা? ঝুঁকে পড়ে শিবরাম আমার মুখের কাছে।

—না।

নিজের চোখে হাতটা চাপা দিই।

--ওঃ। একটা দুরন্ত আলো যেন ছুটে আসছে উল্কার বেগে আমার চোখের সামনে। একটা আর্তনাদ বুঝি বের হয়ে আসে।

শিবরাম চমকে ওঠে। চিৎকার করে ওঠে, বাবা, বাবা! তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? ওকে বলি, না রে। কষ্ট কীসের? তোরা তো সবাই আছিস। কেবল.....সে নেই।

—কে বাবা? সে কে?

ওকে কিছু বলতে পারি না।

—প দ্মা ন ন!

আমার মুখে কথা শেষ হয় না।

মমতা ঘরে প্রবেশ করে। দূর থেকে আমার মুখ দেখে বলে, কি ভাবছ? নিশ্চয় কোনো সুখের কথা। আজ তোমার মুখ দেখছি হাসি হাসি।

আমি নিরুত্তর, কোনো কথা বলি না।

শিবরামের আর্তনাদ শুনে নিঃশব্দে যশোদা প্রবেশ করেছে গৃহের অভ্যন্তরে। শিবরাম তা টের পায়নি। ডুকরে কেঁদে মুখে কাপড় চেপে ধরে যশোদা। বাইরে একঝাঁক মানুষ অপেক্ষা করছে। তাঁরা আমার কুশল সংবাদ নিতে এসেছে। মমতার এই আচমকা প্রবেশ, যশোদার ডুকরে কেঁদে ওঠা; উঠোনে সমবেদনা জানাতে আসা গ্রামের মাতব্বরদের যা জানার তা জানিয়ে দেয়।

সকলে অবাক হয়। ধীরে ধীরে তারা কেউ কেউ উঠে আসেন দাওয়ায়। উঁকি মারেন গৃহের অভ্যন্তরে। কবিরাজ ছুটে এসেছেন, তাঁর প্রভাতকালীন পরীক্ষা শুরু করতে। কিন্তু কাউকেই ডাকলাম না আমি। আমার দেরি দেখে সবাই বুঝতে পেরেছে। তারা দেখছেন শিবরামের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি আমি। আমি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ, দীর্ঘ নিদ্রায় শায়িত আমি। ওদের কোনো সমবেদনা, কোনো বিলাপ শোনার অপেক্ষায় আমি আর নেই। মমতা ভেঙে পড়ল আমার বুকের ওপর। শিবরাম কোনোও রকমে চোখের জল আটকে রেখেছে।

মৃত্যুর শান্তির আশ্রয়ে চলে গিয়েছি আমি। সকলকে ছেড়ে চিরদিনের মতো।

আমি চলে গিয়েছি চিরদিনের জন্য। চলে গিয়েছি এই রৌদ্র-ছায়ায় ঘেরা আনন্দময় পৃথিবী থেকে। সংসারকে পিছনে ফেলে রেখে বিদায় নিয়েছি। অসুস্থ শয্যায় শুয়ে শুয়েও ভবিষ্যতে সুন্দর, একটা গতিশীল সমাজ গড়ে তোলার কথা ভেবে গিয়েছি। মনে মনে

কামনা করেছি ধীরে ধীরে আমার ভাবনা একদিন প্রস্ফুটিত হবে, হবে পদ্মের কোরকের মতো। সেই ভাবনার অন্বেষণেই আমি চলে গেলাম ইহলোক ছেড়ে অন্য কোথাও, অন্য কোনো খানে। আমার বুকের ওপর একটি শ্বেতপদ্মফুল রেখে দিয়ে সন্ন্যাসিনী কখন নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল কেউ দেখল না, কেউ জানল না।

শিবরাম মাথা তুলল কতক্ষণ পড়ে। দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামের সেই মাতব্বরদের কয়েকজন। যারা কবিকঙ্কণকে চণ্ডীর পুজো নিয়ে অহরহ বিব্রত ও নাজেহাল করেছে। এদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার চণ্ডীপুজোকে কিছুতেই মেনে নিতে চায়নি। কিন্তু এরা সবাই একটা কথা খুব ভালো ভাবে জানে, যেটা এরা কেউ পারেনি, কেউ ভাবেনি কোনো দিন সেটা আমি পেরেছি। দামিন্যার বিজয়পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছি আমি। গ্রামের সম্মানবৃদ্ধি করেছি। আমার জন্যই আজ দামিন্যার স্থান অনেক ওপরে।

সমস্ত গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এল। গৃহপ্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য বেশির ভাগের চোখ তখন অশ্রুসিক্ত। বাংলাদেশের এটাই বোধহয় সংস্কৃতি। কেউ মারা গেলে সে তখন দেবতা হয়ে যায়। তার মৃতদেহকে দেখে সকলে প্রণাম করে। এ কী শ্রদ্ধায় না ভয়ে বুঝতে পারি না।

এঁদের উদ্দেশে কেবল একটি কথাই উচ্চারিত হয় শিবরামের মুখ থেকে, আপনারা যা করেছেন, এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল? বলুন, চুপ করে আছেন কেন? বলুন আপনারা?

(আমি শ্রী কবিকঙ্কণ)

সমাপ্ত